প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর মুখপত্র

কলিকাতা।
৩৪, বীডন ষ্ট্রীট।

[সচিত্র মাসিক পত্রিকা]

দ্বিতীয় বর্ষ]　　আশ্বিন, ১৩৩৩,　　[প্রথম সংখ্যা

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY
Serial No. 2.025
UNIVERSITY OF CALCUTTA

৪৭, বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক— শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, বার-য়্যাট্-ল.
ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

সহ-সম্পাদক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

মন্ত্রণা-পরিষদ

শ্রীসরলা দেবী বি-এ, অধ্যক্ষ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ, ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পি-এইচ-ডি,
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর,
ডাঃ শ্রীমেঘনাথ সাহা ডি-এস্-সি, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ।

পরিচালক
প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন
উত্তরা অফিস, লক্ষ্ণৌ।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲]　　[প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা

উত্তরার সূচি

আশ্বিন, ১৩৩০

সম্পাদক :—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক : শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

লেখ-সূচি

✓ গান—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আর্টের সহজ পথ—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৵১

মুদ্রারেখা—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩

✓ গান—দেবেন্দ্রনাথ সেন ৮

সাময়িক টিপ্পনী—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৯

ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য (গল্প) শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪

ভারতের অর্থসঙ্কটের কারণ—শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত ২২

উদাসী (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বাগচী ২৪

বাঙ্গলাদেশের মুসলমান (চিত্র)—শ্রীঅসিতকুমার হালদার ২৬

শিল্পীদের সাহায্য দর্শন (গল্প) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক ৩৪

✓ মুক্তা-অভিসার (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৪২

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন—শ্রীসতীশচন্দ্র কবিরাজ ৪৪

অন্তরবী—শ্রীঅমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় ৫০

কথা ও কাহিনী ও সাধারণ সভ্যতার ইতিহাস—

শ্রীবসন্তকুমার নাথ ৫১

কীর্ত্তনের আসরে (গল্প) শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭

চিত্রশালার মুক্তা—শ্রীযোগিন্দ্রলাল বসুমল্লিক ৬১

সমালোচনা :—

অবসান—অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৬২

ওমর খৈয়াম—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস ৬৪

বৈষম্য (উপন্যাস) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৩

✓ ভুলের মূল্য (কবিতা) শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ৮১

প্রবাসী বাঙ্গালী :—

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি—ইণ্ডিয়ান প্রেস ৮২

সিমিটেক ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ (চিত্র)—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস ৮৮

আশ্বিনের সন্ধ্যা (গল্প)—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী ১০৫

বর্ষলিপি—শ্রীবিনয়কুমার সরকার ১০৪

অন্তঃপুরের অন্তরাল (উপন্যাস) শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ১০৬

বোম্বাই বিভ্রাটনি (কবিতা) নবরেণু ১০৭

সমালোচনা :—

ভারতীয় চিত্র-কলার অঙ্গ—শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর ১০৭

কবি এক্বাল—শ্রীকালী ভট্টাচার্য্য ১০৮

সাহিত্যে মৌলিকতা—শ্রীকুঞ্জবিহারী গুপ্ত ১১১

চিত্র-সূচি

১। বিচিত্রতা (চিত্র)—শ্রীঅসিতকুমার হালদার মুখপত্র

২। অন্তরে (ঐ)—মহম্মদ আবদুর রহমান চাগতাই ৮৫

এক রঙা

১। সাহেবীয়ানার প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিতা—অন্তঃপুর ১৭

২। অন্তরী বাজারের পথ—অন্তঃপুর ১৮

৩। সোনাটোলা মুক্তি—অন্তঃপুর ২৯

৪। বারাণসীর গোধূলিবেলা—অন্তঃপুর ৩০

৫। অন্তঃপুর প্রাঙ্গণে—অন্তঃপুর ৩২

৬। এলবার্ট হল ও বিশ্ববিদ্যালয়—অন্তঃপুর ৩৬

৭। কথা ও কাহিনী—বৈদেশিকী ৫৯

৮। কথা ও কাহিনী—পরিষদ ভবনে ৫৯

৯। ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা

৺উমেশ চন্দ্র বটব্যাল ৬১

১০। ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রথম আফিস-গৃহ ৬৯

১১। ইণ্ডিয়ান প্রেসের পুরাতন আফিস-গৃহ ৬৯

১২। স্বর্গীয় বাবু হরিদাস ঘোষ ৬৮

১৩। ইণ্ডিয়ান প্রেসের নব-বিনির্ম্মিত আফিস-গৃহ ৬৯

১৪। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ ৭৮

১৫। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন ঘোষ ৭৯

১৬। শ্রীযুক্ত হরিসাধন ঘোষ ৭৯

উত্তরার প্রথম বর্ষের সমগ্র সূচী কার্ত্তিক সংখ্যার পত্রিকার সঙ্গে পাইবেন।

চিত্রসূচী

চিত্রকর [illegible]

[illegible]

দ্বিতীয় বর্ষ | আশ্বিন ১৩৩৩ | প্রথম সংখ্যা

গান

রিঁ রিঁট খাম্বাজ,—তাল কাওয়ালি

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

ঝমক ঝমক কম ঝম্—নূপুর বাজে ;
মুখর পরাণ মম সে দু'টি চরণ মাঝে।

সে নৃত্যের তালে তালে, হেলেদুলে ফুলফুল ডালে
ওড়নায় মরাল দোলে, হিল্লোলে তটিনী নাচে।

শিশুর চরণ টলে সে চরণ-ছন্দে ;
শিখীর চরণ চলে নবীন-আনন্দে।
বাদলের ঝিনিঝিনি, বাজে সেই সিঞ্জিনী
শুনি সে চরণ-ধ্বনি, নিশীথে প্রভাতে সাঁঝে !

মৃদুল মঞ্জুল কভু বাজে সে মধুর ;
যৌবন-মুখর কভু ঘন সে নূপুর
তরুণ হৃদয় মাঝে, তাহাই আগমনী বাজে
বাজে গো সে নটরাজে আমারও অন্তর মাঝে।

আর্টের সহজ পথ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতা

পণ্ডিতেরা হন জটিল-পন্থী—সহজ কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দুর্বোধ্য ভাষার আবরণ দিয়ে বলে যান। অনেক মাথা খাটিয়ে বোঝা ছাড়িয়ে যাঁরা ভেতরের দুর্গ পাওয়ার মতো যে আনন্দ পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য ভেদ করে পণ্ডিতের কথার তাৎপর্য মর্মে পৌঁছনোর আনন্দ অনেকটা একই ধরনের।

আর্টিস্টেরা ঠিক এর উল্টো পথ ধরে চলেন, তাঁরা স্বভাবতঃ সহজ-পন্থী। সহজ কথায়, সহজ লেখায় তাঁর ধরা যাবেন তাঁদের, রস-পাত্র সহজে পরিবেশন করতে আসেন আর্টিস্টরা—অথচ এইটে দেখি যে আর্টিস্টের কাছের মধ্যে জটিল-রহস্যের সন্ধান না পেলে লোকে খুশিই হয় না!

আর্টিস্ট যে রহস্যটুকু দিয়ে নিজের গোপন কথা লুকিয়ে চলেন—লেখায়, আঁকায়, সুরে—তা অনেকটা বর্ষার মেঘের, শীতের কুয়াশার আচ্ছাদনের মতো, মোটেই দুর্ভেদ্য নয়, ভারিও নয়—মায়া-দুয়েলিকার অন্তরে সত্য পদার্থ লুকিয়ে রেখে লুকোচুরি খেলা হল আর্টিস্টের খেলা। রসিক দর্শক, পাঠক বা শ্রোতার মন উড়ন্ত পাখীর মতো কোনো বাধা পায় না সেই রহস্যের ঘের অতিক্রম করে সহজ সত্যের সঙ্গে শুভদৃষ্টি ও নিবিবিলি পরিচয় করে নিতে।

ছোট ছেলেতে যেমন সহজে দেখায় এটা তার নাক, ওটা তার চোখ, তেমনি সহজে আর্টিস্ট চিত্রিত করেন রূপ, রেখা, লেখা, সুর-সার সব দিয়ে বলবার বিষয়টির প্রতি—কিন্তু লোকে পাণ্ডিত্য চায় আর্টিস্টের কাছে, বুঝিয়ে নাক না দেখালে তাদের মনঃপূত হয় না—বলে, এ কি হল, এর সহজে বলা হল সবটা! তাবে লোকে তারা ঠকে গেল—ধরটা পাওয়া গেলনার অথবা পাওয়ার মতো কিছুই পাওয়া গেল না।

যার ভুলে সব সে একটি গোলাপের দশ টাকা মূল্য দেয় কিন্তু যার ভুলে সব নেই কিন্তু ভুল-কলিতে লোভ সে ওজন দেখে খুশি হয়ে তবে পয়েট খোলে, যদি ভুলবাড়েই ভুল-কলি নয় বাঁধা-কলি হয়ে উঠতো জগতে—তবে!

সহজে বলায়, সহজে চলায়, সহজে দেখায় সাধনায় সবাই এগোতে পারে না এটা জানা কথা, সহজ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলি আমরা আট সমালোচনা পড়ে পড়ে, যখন তখনই তাবি আর্টিস্টের ভাবে একটা গভীর অর্থ জটিল সমস্যা থাকা দরকার, না হলে সেটা উঁচু দরের আর্ট হল না।

মুসায়েরা

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

অনেক দিনের কথা, তখন সবে যাত্র লক্ষ্ণৌতে আসিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই এ দেশীয় অনেকটি সুকবির সহিত আমার পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেলাম। তন্মধ্যে একজন—হাফিজআলি খাঁ। খাঁসাহেব এক সময় ব্যারিষ্টারী করিতেন, কিন্তু অবস্থা যে ব্যবসাটা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁহার পরিচয় হয়, তখন তিনি উর্দু কবিতা ও হোমিওপ্যাথি চর্চ্চায় ব্যস্ত। উর্দু ভাষায় তিনি একজন সুকবি বলিয়া জনসমাজে বেশ যশ লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজি কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার একটু প্যাষি ছিল; তবে সেটা অনুবর্ণ উপলক্ষেই উচ্ছ্বসিত হইতেন। যৌবনারম্ভের বিলাতে অবস্থান কালে তিনি নাকি বর্ষীয়সীদের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া নানাবিধ প্রেম-কবিতার সৃষ্টি করেন। তাঁহার সমব্যবসায়িক একজন বন্ধু তাহার দুই একটি নমুনা আমাকে শুনাইয়াছিলেন। সেগুলি শুনিলে আধিব্যাধির উদ্রেক হউক বা না হউক, হাস্যরসের উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে হয়। যোর হয় খাঁসাহেব এখন সাহসে ব্যারিষ্টারী ও ইংরাজি কবিতা রচনা উভয় ক্ষেত্র হইতে বিরত হন। আমি তাঁহাকে আচকান্, চোগা চুনি ও চুড়িদার পায়জামা ছাড়া অন্য কোন পরিচ্ছদে দেখি নাই।

একদিন, তিনি আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত; বলিলেন, 'শেল, চলো আজ তুমকো মুসায়েরা মে লে চলুঙ্গা'। তখন আমার উর্দু বিদ্যা বিদ্যার অক্ষরের চাক্ষুষজ্ঞান কাছে শেষা যাওয়া-আসা বিদ্যুত্ত তিনি তখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—খাঁসাহেব, মুসায়েরা ব্যাপারটা কি? তিনি বলিয়া থাকিবেন 'খাঁসাহেব মুসায়েরা ব্যাপার ক্যা হ্যায়?' তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিলেন—'অচ্ছা আসিয়াছ, আজ, তখনকে, এক

আসল মুসায়েরা কাকে বলে?' তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, মুসায়েরায় যখ কবি-সম্মিলন, সেখানে আমন্ত্রিত কবিরা উপস্থিত কবিতা আবৃত্তি করেন আমার শুনিয়া লোভ হইল; বলিলাম—চল; কিন্তু খাঁসাহেব, একটু আগে বলাইও, বুঝাইয়া দিতে হইবে। তিনি বলিলেন—আচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু শেল, যেখানে যাইবে সেখানে ইংরাজি পড়াও। এখনও প্রবেশ করে নাই; যে স্থানটি প্রাচীন লক্ষ্ণৌর কেন্দ্রস্থল, সেখানকার লোকদের বেশ-ভূষা, ভাষা, আচার-ব্যবহার ঠিক সেকাল আদবকায়দার সময়ে যা ছিল তাই; তাহারা ইংরাজি বলেনা; ইংরাজি জানেনা; বস্তুত তাহারা ইংরাজি ভাষাকে ও ইংরাজি সভ্যতাকে ঘৃণা করে। এসব শুনিয়া আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম, তাহা ও বেশ সম্বন্ধে মনে নানা প্রকার দ্বিধা ও আশঙ্কার সঞ্চার হইল। খাঁসাহেব বলিলেন—শীঘ্র চল, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লও। তাড়াতাড়ি হিন্দুস্থানী ও বিলাতী মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়া খাঁসাহেবের সঙ্গে চলিলাম। তখন পথের এদেখানে খাঁটি খাঁসাহেবটি আমিয়ে একটু সংকোচ বোধ করিতাম। আমার বন্ধুটি হিন্দুস্থানী পোষাকের সম্বন্ধে অনেক অবাচীন যুক্তি বর্ষাইলেন; আমাকে স্বীকার করিতেই হইল যে হিন্দুস্থানী বেশ ইংরেজি পোষাক অপেক্ষা অধিকতর শোভন, সহজ ও সরল। তদবধি যথাসম্ভব অনেক তখনও এ দেশের পোষাকই করিয়া থাকি।

লক্ষ্ণৌর একটি সুপ্রাচীন পল্লীর পার্শ্বে বড় রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ী থামিল। তাঁরা তাঁরা অনেকগুলি সংকীর্ণ গলির মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিলাম, কেননা সে গলিতে গাড়ী চলিতে পারে না। দুধিকে উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা,

ভদ্রাবধি কখনও তাহার সংবাদ লয় নাই। দুই পার্শ্বে সেই সনাতন আবেষ্টনী; আমার সেই অপরিষ্কার মলিন দুই হাতে কবি, 'বাদাই', (লক্ষ্ণৌয়ে মাংসকে বলাই বলে) কবাব, চাট, জিলেবী, রুমালি ইত্যাদি খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের যোগান ও তৎসঙ্গে দেখা যাই। মাঝে মাঝে দু-একটি ভাষা ও ছাড়া বাটীর চাষা কাহারও ছিন্ন-বস্ত্র বা বিবসনে আকিয়েবিকিস নানা প্রকার অশ্লীল কবিতা বিবিধ ভেঙ্গে বিরাম করিতেছেন। পানের যোগানের অবধি নাই; দু পা হাঁটিলেই এক একটি পানের যোগান। এখানকার মুসলমানেরা পান খেতে না ঘাটে কিন্তু পান খান অজস্র। এরূপ মলিন চিত্রের ভিতর প্রায় আধ মাইল হাঁটিয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম। দূরের মাঝেই দুরওয়াজা অতিক্রম করিয়া। খাঁসাহেবকে দেখিয়াই তিনি "সলামবাবু আবদুল খাঁসাহেব, বন্দিখুদাবন্দ" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। আরও অনেক খানসি-বন্দা উঁচু বারান্দায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। খাঁসাহেব সৌজন্যের খাতিরে, তিনি প্রত্যুত্তরে কুর্নী সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, এবং দাঁড়াইয়া মাথা একটু নত করিয়া দুই হাতে একসঙ্গে তিনবার সেলাম করিলেন। আমি পড়িলাম মুস্কিলে; পূর্বে কখনও দুই হাতে কিংবা একসঙ্গে একবারের বেশী সেলাম করি নাই। আমি অতি সন্তর্পণে খাঁসাহেবের অনুকরণ করিলাম। পরিচয়ের পর বিদ্যুৎবা আমাদিগকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন।

যাহা দেখিলাম তাহা অদ্ভুত। দেখিলাম, দেখানে কবিকুল সোনাগাছে বসিয়া আছেন. খাঁসাহেবকে দেখিবামাত্র উঁহারা সকলে হাঁয়ে দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং সৌজন্য প্রকাশের একটা কলরব পড়িয়া গেল; এত ঘরে এতগুলি মানুষের উত্তেজনা ও আলোড়ন আমার কাছে এক প্রকার ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। সকলে আমাদিগকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। খাঁসাহেবের এরূপ প্রভূত সম্বর্ধনা দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন কবি। খাঁসাহেব কবিদের পরিচয়ে বসিয়া গেলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে বসিলাম। তাঁহাদের বসিবার ধরণটা ঠিক আমাদের বাঙালীদের মতন নয়। তাঁহারা হাঁটুর উপর কর করিয়া একটু অগ্রদিকে হেলিয়া বাম দুই হাতের উপর ভর করিয়া বসেন। পিছনে তাকিয়া নাই; প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া কুরতাক, তাহাতে পান রাখা। কিছু দূরে দূরেই একটি করিয়া উঁগালদান, তাহার মালিক, লক্ষ্ণৌর পানে বাদুদের মাত্র একটু অধিক। কিন্তু মুসায়েরার আসরের একটি বিধি এই যে, যখন পাঠের সময় কেহ মুসলমান করিতে কিংবা পান খাইতে পারিবেন না। মাঝে মাঝে যখন পাঠের বিরাম হয় সে অবসরে তামাকু ও পান খাইয়া লইবেন।

আমার কবিবিবরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম খাঁ সাহেব, ঐ কথা মুসলমানটি কে?' উত্তরে জানিলাম উনি একজন ভাগীরথী হিন্দু কবি—তাঁর খুব প্রতিষ্ঠা। ঐ ধোপদোরা, পাতকান পাঞ্জাবি, কোপানি চুলি ফেরোচোখে পরা, বিবসনম মুসলমানটি কে?—উনি একজন প্রসিদ্ধ মারফতিয়া; অর্থাৎ তিনি মারফতি গোত-সঙ্গীত খুব ভাবের সহিত সুকণ্ঠস্বরে পাঠ করেন, আর উত্তম কবিতাও লেখেন। উনি কে? ঐ যে লম্বিতকেশ, কুঞ্চিত কুন্তল, প্রকাণ্ড মাথার অগ্রভাগে একটি অতি ক্ষুদ্র টুপি, চুলু চুলু অর্ধনিমিত (হয়ত অহিফেন সেবন করেন) নয়নযুগ পুরুষটি? উনি? উনি একজন বিখ্যাত কবি, দাদীহুজুরের শ্রেষ্ঠ কবি আসরের বাদশাহ, ইঁহার সমকক্ষ কবি এখন লক্ষ্ণৌতে নাই। আর ঐ যে তাঁহার পার্শ্বে অত্যন্ত চঞ্চলকায়, অতি সাধারণ পোষাক পরিয়া হাতবদলে বসিয়া আছেন, উনি কে? ও লোকটি? তনিয়া হেসে ফেলিবে, উনি একখানা নামে সাহেব, লক্ষ্ণৌর একজন মুকবি; দিনের বেলা এরা কবিতা; লিখিতে বা পড়িতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেন, এবং স্বরচিত গজল মুসায়েরাতে পাঠ করিয়া বেশ যশ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার তখল্লুস লক্ষিকু। তখল্লুস মানে কবির একটি বিশেষ নাম। এদেশে কবি মাত্রেই এক একটি করিয়া তখল্লুস রাখে; এ নামেই তাঁহারা কবিতাতে

পরিচিত. কবিতার অন্তিম চরণে এ বাক্যেই তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করেন।

এইরূপ হিন্দু ও মুসলমান, ধনী ও দরিদ্র, বৃদ্ধ ও যুবক বেহেস্তের তরুবর নানা রেহেই কবিগণ যে সভায় আসীন। আমার মোমিয়া মনে বড় আনন্দ হইল. কবি-সম্মেলনে এরূপ সাম্য বড়ই দুর্লভ। তারপর, পাঠ আরম্ভ হইল। কেহ মুলতানির সুরে সুর করিয়া নিজের রচনা আবৃত্তি করিলেন: কেহ একটি নাকি সুরে, কেহবা গম্ভীর নিনাদে স্বীয় কবিতা পাঠ করিলেন। সকলেরই উচ্চারণ অতি স্পষ্ট, একেবারেই জড় নয়। ইহাদের পাঠ করিবার প্রণালী অতি সুন্দর।

মুশায়েরার পদ্ধতিটা এই। যিনি মুশায়েরা আহ্বান করেন তিনি নিমন্ত্রণ পত্রের নিম্নভাগে দুই এক চরণ কবিতার নমুনা লিখিয়া পাঠান; তাহাকে বলে 'মিস্রা-তরহ'। মিস্রাতরহের শেষ কথাটিকে বলে 'কফিয়্', আর ঠিক তাহার পূর্বের পদটিকে বলে 'রাদিফ'। একটি উদাহরণ দিতেছি :—

'লিখি ফুল গুল তো যে সুলতান বাগ বন'

ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ :—

গুল যদি লতা আর, বসন্ত। বাগ- কোথায়।

এ পংক্তিটির 'লতা' পদটি রদিফ্, আর 'বাগের' পদটি কাফিয়া। বাঙ্গলাতে হবে 'কোথায়' কথাটি রদিফ্ আর 'আনব' কথাটি কাফিয়া।

এখন, নিমন্ত্রণ পত্রে যদি কেহ ঐ মিস্রাতরহটি লিখিয়া পাঠান :—

'লিখি ফুল গুল তো যে সুলতান বাগ বন'

তবে বুঝিতে হইবে যে, নিমন্ত্রিত কবিগণ মুশায়েরায় পাঠ করিবার জন্য যে গজলটি লিখিয়া আনিবেন তাহার প্রত্যেক দ্বিপদীর দ্বিতীয় চরণের কাফিয়া হবে 'বাগের' অর্থাৎ বাগের কথার সঙ্গে মিল থাকিবে; আর শেষ কথাটি হবে 'লতা'। যথা :—

'সন্ধ্যা তুমি ঐ চমনের বাগের ঐশ্বিলাহ্ কি
বসন্ত তো আজ বাগান তুমি যে লতার লতা।'

এখানে 'বাগের' ও 'লতার' এর কাফিয়া মিলিল; আর রদিফ 'লতা'ও রক্ষা হইল। উপরি উক্ত কবিতার বাঙ্গলা অনুবাদ :—

সেফালির ফুল-চমন তুমি হবে আজ চরণ
হইয় বিনিময়ন্তি ফুলবাগের লতা চমন।

সকলপ্রকার নিয়মাবলী কোনও বিষয়ে কবির দুই একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া মুশায়েরা আরম্ভ করেন। তারপর কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত গজল পাঠ করেন। গজল ছাড়া মুশায়েরাতে আর কোন প্রকার কবিতা পাঠ করা নিয়মবিরুদ্ধ। নিমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও মাননীয় কবি তাঁহাকেই সর্বাগ্রে স্বরচিত গজল পাঠ করিতে অনুরোধ করা হয়। অনেক সময় তিনি কবিত্ব বিষয় অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার আপত্তি প্রকাশ করেন, 'আমি এখন সেকালের, আজকালকার নবীন কবিদের আমার কবিতা ভাল লাগিবে কেন? ইত্যাদিরূপে প্রথমে পত্রিতে হয় (ইহাকে বলে 'তরহ')। অমনি সভার সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রতিবাদ করেন, কেহ বলিলেন, 'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এখনও আপনার ন্যায় কবি জীবিত আছেন—ইত্যাদি'; এরূপ অনেক প্রকার বিনয় প্রকাশের পর নিজের আবৃত্তিস্থান পকেট হইতে একটি পাতা বাহির করেন। তাহাতে স্বরচিত গজলটি লিখা। একটি সৌজন্যসূচক সেলাম করিয়া তাঁহার গজলটি পঠিতে আরম্ভ করেন: দ্বিপদী গজলের প্রথম পদটি আবৃত্তি করিলে পর সভার কবিকুল সমস্বরে তাহার পুনরাবৃত্তি করেন। যখন তিনি পাঠ করিলেন 'চলতি হয় ঐ চমনের হাওয়া ঐশ্বিলাহ্ কি'। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল 'চলতি হায় ঐ চমনের হাওয়া ঐশ্বিলাহ্ কি'। তার পর কবি দ্বিতীয় কাফিয়া-সংযুক্ত দ্বিতীয় চরণটি পাঠ করিলেন, 'সবসময় তো আছ বাগানে তুমি যে লতার লতা'। যেমনি দ্বিতীয় চরণটি পঠিলেন অমনি কবিবৃন্দ ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা-ধ্বনিতে কলরবে মুহূর্তি পরিপূর্ণ হইল। কেহ বলিল—'আ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!' কেহ বলিল—'সুবহানাল্লা, কিয়া বোৎবাইয়ে'; কেহ বলিল—'বা খুব

মিয়া নাচায়া'; যেহ বলিল—'ওহো ওহ, আপনে যেমনীত মিয়া ধরি' এইরূপ আরও অনেক ছড়িয়াছে। কবি তখনই উঠু হইয়া উঠিয়া চারিদিকে তাকাইয়া সেলাম করিতে লাগিলেন, এবং কবিয়ালদের প্রশংসাধ্বনের জন্য অবনত মস্তকে প্রস্তুতভা জ্ঞাপন করিলেন। একটি কবির গজল গাই শেষ হইলে তাহার পার্শ্ববর্তী কবিটির পালা; এবং ঠিক সেই রূপ পুনরাবৃত্তি, সেইরূপ প্রশংসাধ্বনি, এবং ঠিক সেইরূপ চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেলাম। এইরূপ পাইপালার কবি-চক্রটি সম্পূর্ণ আবর্তন হইলে পর সভাপতির নিমন্ত্রণে আপনার রচিত গজলটি গাই করেন। সৌজন্যের জন্যই হউক বা কাব্য-বাহুবোধ জন্যই হউক প্রশংসার মাত্রাটা তাহার বেলাতেই একটু বেশি পড়ে।

মুসায়েরা চক্রটি একটি মনুরম; ইহার আকর্ষণ অসাধারণ। চারিদিক হইতে, এমন কি দূরের গ্রাম হইতে কাব্যামোদিগণ 'মজলিসে মস্ত আলি'র মাঠ ছাড়া আসিয়া একত্রিত হন। অনেক মুসায়েরাতে কবি মনোনয়ন ও উচ্চাসনের গজল গাই করা হয়।

বহুদিন পূর্বে মক্কোতে একটি মুসায়েরা হয়, তার বর্ণনা আজও অনেক লোকে করে। সে মুসায়েরার ভাল ভাল কবিতাগুলি অনেক কাব্যপ্রিয় লোকেরই কণ্ঠস্থ। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিয়েছি। তিনি মুসায়েরা আহ্বান করিলেন তিনি নবাবে ওয়াজিদালি শাহের দরবারের বিখ্যাত কবি আবদু-এর একটি গজল হইতে 'বিদ্যাসুন্দর' লিখিয়া পাঠান। তার দুটি চরণ এই :—

'সে মোর এল ইন নূরু ও আমার ও জিন্দগি দুনিয়া :
যে দিনই ঈদির মোহাম্মদ এল নিকাহ মে' ।

বাঙলা অনুবাদ :—

দুনিয়ায় আমি হয়, আমারো সুখ লেখা হয় :
সুখ সেদিনের আমারই প্রথমে হয়।

মুসায়েরা পরিচালনে অনেক কবি উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের রচিত গজল গাই করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গজলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়েছি। কবি 'হাফিজের' গজলের দুটি লাইন :—

'কি আমর আজমী বদ্দে বদ্দে ইন্দ আজুরদ মে :
নেওয়াজিশে কমা কুনি বেশি বদ্দে মে' ।

'শিরাজমে' আর 'বদ্দমে'র কাফিয়া মিলিল।

বাঙলা তাবানুবাদ :—

দেখে যে একজন সেবার আমল
তাহারি যে পরে বহু বেতন বাড়ল
দুঃখের যা ছিল ইহা দূর করে
দুনিয়ায় তাহার মান উচ্চারে।

এ কবিয়ালের প্রতিযোগী শ্রোতিদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা হইয়াছে।

কবি 'ওজির আযা'র গজলের দুটি চরণ :—

'যাহা ও আমার মোর দুনিয়ে যে আজব ঘুম যে,
রাখি হাত মস্ত যে দুখি হাল মস্ত যে' ।

বাঙলা অনুবাদ :—

হল যা ঘুমের যেই দুঃখের
দেখিয়ে দুনিয়া হাল দুঃখের মরে।

কবি ইউসুফের গজলের দুটি লাইন :—

মাথা আর ধর হল মস্তি কি আজুর যে।
আর পরে মন মোর বিলোর যে মস্ত যে।

বাঙলা :—

কথা-সুরা উঠিয়ে মাথায় সকল
মস্ত-উল্লাসে মোর মস্তুলিনী আজ।

কবি পণ্ডিত 'বিমলনারায়ণ দত্ত' এ-সভায় তাঁহার সুন্দর গজল গাই করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি মস্কোতে একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতার কংগ্রেস সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গজলের দুটি চরণ এই :—

'তুমুল যে সব আজই বন্ধু তুমুল মুসলমে,
সেদি কবি জিনি কত বার মোর হল মোর যে

বঙ্গানুবাদ :—

তুমুলের মোহনায় আজি দুঃখ,
হইব আজি, হয় যদি আসে।

[illegible]

মুশায়েরা—এর কোন তো ।

সবার ওয়াজিহালি সাহেব সময়ে মুশায়েরার খুব সাধক ও প্রবিষ্টা ছিল। সে সময়কার মুশায়েরার গল্প এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ওয়াজিহালি সাহ্ স্বয়ং খুব সুন্দর গজল রচনা করিতেন। বাদশাহ্ নিজেও নাকি কখনও কখনও মুশায়েরায় শরীক হইতেন। সে সময়ে কয়েকটি কবি খুব নামী হইয়া উঠেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য: একজনের কবিনাম 'আতশ্' অন্যজনের কবি আখা 'নাসিখ্'। উভয়েই প্রতিভাশালী কবি। তবে আতশের প্রতিভাই উজ্জ্বলতর। অনেকে বলেন যে 'আতশ্' সম্প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। উভয়ের মধ্যে বেশ একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও ছিল। নাসিখ্ ছিলেন একটু উদ্ধত; উভয়ের শিষ্য ও ভাবকের সংখ্যা বিস্তর।

একবার একটি বিখ্যাত মুশায়েরাতে দুজনেই আহূত হন্। নাসিখের বয়োজ্যেষ্ঠ আতশ্‌কে অপদস্থ করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করিল। নাসিখ্ ও তাঁহার দলবল নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মুশায়েরার চক্রটিকে অধিকার করিয়া বসিলেন। আতশ্ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ যখন আসিলেন তখন ঘর পূর্ণ। আতশের জন্য অবশ্য স্থান হইল; কিন্তু তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গকে স্থানাভাবে পশ্চাতে বসিতে হইল। প্রথমেই পাঠ করিলেন নাসিখ্; তাঁহার শিষ্যবর্গ খুব লম্বা লম্বা গজল বিশেষ আস্ফালনের সহিত গাহিতে লাগিলেন। এমনভাবে তাঁহারা তাঁহাদের কবিতা আওড়াইলেন যেন তাহাতেই রাত্রিটি কাটিয়া যায়, যেন আতশের আর গজল শুনাইবার সুযোগ না হয়। রাত্রিও শেষ হইল—তাঁহাদের গজলপাঠও সমাপ্ত হইল; এবং তৎপর-মুহূর্তেই নাসিখ্ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ সভা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন: জানিতেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই মুশায়েরাও সাঙ্গ হইবে, শ্রোতৃবর্গের আর ধৈর্য থাকিবে না। কিন্তু বহুক্ষণ আতশের গজল শুনিবার জন্য উৎসুক, তাঁহারা নাসিখের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্যচ্যুতি হইল না। শুভ সূর্যোদয়ের সঙ্গে আতশের গজল পড়িবার সময় আসিল; আতশ্ তখন তখনই নাসিখ্ ও তাঁহার ভাবকমণ্ডলকে বিদ্রূপ করিয়া দুটি শের রচনা করিলেন। তাহা এই :—

'যাদের যে কবিতা ও গজলের অর্থ লাভ্ না
তাদেরো দুর্দিনে যে কিসের জন্যে যজ্ঞ লাভ্ না।'

অর্থাৎ :

সারা রাত এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করেছেন :
নির্ঘাৎ কেউ ইঁদুর মারতে বেরুল বন্দুক।

আতশের এরূপ অপ্রত্যাশিত ও বিদ্রূপপূর্ণ জবাবদানে চমৎকৃত হইলেন এবং উল্লাসে ফাটিয়া সভাস্থলে ও সভার বাহিরে সকলকে—'হাতের ঐ লক্ষ্যটিতে...' এই চরণ দুটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সহরে এমন একটা জনরোল উঠিল ও হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে, নিশাথে নিদ্রিত বাদশা ওয়াজিহালি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন এবং প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এত গোলমাল কিসের? নিশ্চয় কোথাও ডাকাত পড়িয়াছে; যাও শীঘ্র সিপাহী-দিগকে খবর দিতে বল।' সিপাহীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হুজুর, ডাকাত নয় মুশায়েরার কবি আতশ নাসিখের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের দুর্ব্যবহারের এমন উচিত জবাব দিয়াছে যে, সহরময় তাহার জয়োল্লাসধ্বনি উঠিয়াছে'। বাদশাহ্ কবিতাটি শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আতশকে ডাকিয়া ইনাম দিলেন।

এত গেল সাহিত্যসভার কথা। আজকালও মুশায়েরা এদেশে খুব প্রচলিত ও সমাদৃত। সহরে সহরে—এমন কি গ্রামে গ্রামেও মুশায়েরা হইয়া থাকে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরাও মুশায়েরা উৎসব করে। এসব মুশায়েরার মজলিসে বেশ ভাল ভাল গজল শুনিতে পাওয়া যায়, তবে নিকৃষ্ট রচনারও কখনও কখনও প্রসার পায়; এমন কি তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। সময় সময়

অনুষ্ঠান সভার অবসানের পর একদল বিরোধী সদস্য অভিযোগ করিলেন যে, সে তারিখ বিরোধী কবিতাকে আমার করা হয়। আমি নিজে দেখিয়াছি, একজন কবিতা নিজের অধিকৃত ও বাসভবনের কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন এবং তাহা শুনিয়া শ্রোতারা খুব তারিফ করিতেছে এবং কবি প্রত্যুত্তরের জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিতেছে। অন্যান্য বুঝিতেছে না যে, সে তারিফ বিরোধে চলে।

• •

মূলতঃ সভার কয়েকটি কথা লিখিলাম: আমার মনে হয়, বাঙলা-সাহিত্য-সভাতে একদল একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

গান

দেবেন্দ্রনাথ সেন—এলাহাবাদ

রোদ—একতালা

আমার শ্যামা আইল—
ওমাগো আইল নয়নের মণি, জনম-দুখিনী বরন আইল।
লহিতের ওষ্ঠে এ কি গো আনন্দ,
বিভাসের গণ্ডে এ কি গো দুঃখ,
আলেয়ার আলে এ কি দুখ বহু,
ভৈরব-পরশ কথায়ে ছাইল।

যদি যদি ছল, এ কি অনুভব—
অতুল ভাব-ভরম-গোপন,
ছবি-নিভৃতের বিপুল বিভব,
ভবার ভরি ভরি যাইল।

যবে পথের নিশা হলো ভোর,
নিজেই যামিল, অরুণ ভাব,
এলোকে ও বীণা, ভুলো ভাবণ,
বিনা-আবিকল মধুর গাইল।

অতুল চেতন ঘরে দুরুদুরী
শ্যামা-তালে সেন নিজেই উদ্ভলি
এ অলক-রাগ নিজেই উথলি
শ্যামার ভাব ভরিয়ে রহিল।

সোহাগ সোহাগ মুখের হিয়ায়,
কণ্ঠে অপরাজা হেসে অভিরাম,
ভুবনমোহিনী বরণে মোর শ্যামা,
বিভাসমধে আজি ভরা ছাইল। *

---

* কবির অনুরোধে এই কবিতাটি ডঃ হিরণ্ময়ের হেন মহাশয়ের হেফাজতে রাখা হয়।

সামাজিক বিরোধ

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

ধর্ম ও রাষ্ট্র

ভারতবর্ষ ঘুরিয়া যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়াছে, তাহাতে দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক উন্নতি যে কিছুকালের জন্য ব্যাহত থাকিবে তাহা অনুমান করাই যাইতেছে। এটা ঠিক, বহু বৎসরের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিকে দেশের মঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দেশের সমস্যা দুই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দুইজনের দ্বারা যে এক সম্প্রদায় অপরকে বিশেষিত করিবে তাহারও উপায় নাই। সুতরাং লোকসংখ্যা এত বেশী যে, 'জোর যার মুলুক তার' নীতি এ ক্ষেত্রে খাটে না। মুলুক ভাগাভাগি দুই জাতি বাস করিতেছে ও বাস করিবে। কে কাহাকে হটাইবে?

এদিকে জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিচ্ছেদ-বিরোধের বীজ সম্ভাবনা নাই। ইহাদের মধ্যে যে মনের গোঁড়ামির পরিবর্তে একটা সামাজিক সদ্ভাব ও উদারতা দেখা দিয়া বন্ধ দূর হইবে, এ আশা দুরাশা। নিকার অভাবেই মনের মাঝে এখন সমাজে একটা ঘোর বিদ্বেষ-ভাব আসিয়া দেখা দিয়াছে। অন্তরে, বাহিরে দেখা এখন বহুল-পরিমাণে আঘাত পাইয়াছে। অনুন পূর্বে সমাজ যখন সংঘবদ্ধ শক্তির স্বাধীনতা খর্ব করিয়া আপনার শক্তি প্রথম অনুভব করিতেছিল, তখন বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের দেবতা রাষ্ট্র-শক্তির কেন্দ্র হইয়া অপর জাতির দেবতা বা দেবতাদের একমাত্র প্রতীকরূপে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের আসন পাইয়াছিল। দেবতা তখন বিশেষ জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি; মানুষের সাধারণ ভাবের আশ্রয় নহে। এই মূল হইল দেবতাতন্ত্র, Theocracyর মূল। সমাজের কর্মবিকাশের আধুনিক যুগে এই Theocracyর অভিনয় আজ দেশে দেশে পুনরায় দেখা দেয়। সেই মূলের বৈশিষ্ট্য, বিদ্বেষের দৃষ্টি উহাই। কিন্তু যাহা অতীত মূলে রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠনের সম্বল হইয়াছিল তাহা আজ রাষ্ট্রকে চালিতেছে, সমাজকে ভোলপাড় করিতেছে।

দেশনায়কগণ যাহার জন্য দায়িত্বভার উহণ করিয়াছেন। না হয় লোকচিত্তের উপর তাঁহাদের প্রভাব এত কম যে, তাঁহাদের উপদেশ জনসমাজে অগ্রাহ্য হইতেছে। এদিকে বর্তমান জগতের সভ্যতার যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি ঐক্যসাধনের পরিবর্তে বিরোধ সৃষ্টির উপকরণ যোগাইল। সহরের অসংখ্য মুদ্রাযন্ত্র বিপরীত বিদ্বেষভাব উদ্গিরণ করিয়া সমস্ত দেশকে ভরাইয়া দিল। দুর্জনেরা রেলপথ অধিকার করিয়া গ্রামে-গ্রামে দুই অভিসন্ধি প্রচার করিল। সহরের আন্দোলন অভিনিবেশ সহকারে গ্রামে গিয়া পৌঁছিল।

রাষ্ট্রিক সমস্যা

প্রত্যেক দেশে যে জাতি সংখ্যায় অল্প তাহারা সহরেই বসবাস করে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলা ও পঞ্জাব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় হিন্দু অপেক্ষা কিছু বেশী, মোট লোকসংখ্যার অর্ধেকের কিছু উপর। অন্য সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় কম এবং অধিকাংশে স্থলেই সহরে বাস করিতেছে। এই কারণে বোম্বাই, মাদ্রাজ, যেখ প্রভৃতি মারীভবের মত সাম্প্রদায়িক উপদ্রব সহরেই প্রথম দেখা দেয় এবং তাহার পর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু ও মুসলমানদের প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রিক সংখ্যার অনুপাতের তারতম্য অনুসারে জাতি-বিরোধ বিভিন্ন সহরে প্রথম প্রকটিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ মিমিটা একেবারে নব-রাষ্ট্রিক। নব-রাষ্ট্রিক

শাসনকার্যের দুই জাতিকে ভোট দিবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করিয়া যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনিয়াছে তাহাই রাষ্ট্রতন্ত্রবিদ্‌গণের প্রয়োজনের সামাজিক মূল্য নির্ধারিত হইল। যে সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত অল্পতর, তাহাদিগে তাহাদের মেম্বারদিগের যে বিশেষ সুবিধা।

ইউরোপ হইতে যে নূতন রাষ্ট্র-গঠন-প্রণালী আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহাই সামাজিক বিরোধ আনিয়া দিল। বর্তমান রাজা-শাসনের মত বিষ্ণু উপকরণ সবই এখন সামাজিক শক্তির পরিবর্তে হিংসা ও অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেছে।

যখন নূতন রাজ্য-গঠনের নিমিত্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি স্বীকারের ভার দেওয়া হয় না, তখন দেশের পুরাতন রীতি-নীতি বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইতে হইবে। এত কাল দেশে এমন সাম্প্রদায়িক উপদ্রব কখনও ঘটে নাই। পূর্বে কি এমন সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে এই বহুজন-বিচিত্র-জাতি-পূর্ণ দেশে সামাজিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই?

সামাজিক স্বাধীনতা

ভারতবর্ষের পূর্বদ্বারে নিত্য নূতন অতিথি আসিয়া দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষ কাহাকেও বিমুখ করে নাই। অতিথিরা কেহ কাহারও অঙ্গস্পর্শ করে না। প্রত্যেকের পৃথক্ রন্ধনশালার ব্যবস্থা হইল। কেহ কাহারও দেবতাকে মানে না। প্রত্যেকের পূজাস্থল পৃথক্ হইল। আচার-প্রচার পরস্পরের ঈর্ষিবর্ধন না করিয়া অপরের হৃদয়ে আঘাত করে। বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রত্যেক জাতি আপন ইচ্ছামত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা পালন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের বিপুল কোলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় তাহাদের পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা লাভ করিল, পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বুদ্ধিল।

লাইটন সিফেন্সের ভারতবর্ষের সমাজ-বিন্যাস বুঝিতে না পারিয়া ভারতবাসীকে Homo dissidens বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এখানকার মানুষ শুধু আপনাকে তফাৎ করিয়াই পড়ে। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র দেশবাসীর একটানা ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদ্র

দেশের মধ্যের ঘন্দ্ব এত পরাভূত করিয়া রাষ্ট্রকে বিপন্ন করিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের ভয়াবহতার যে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও রাষ্ট্রকে এমন করে নাই।

রাষ্ট্র বনাম সমাজ

যে দেশের সমাজ বুদ্ধি বিশৃঙ্খলাবিহীন সেখানকার ঐক্য আর এক প্রকারের। কোন এক জাতির সঙ্গে সর্বাংশেমূলী প্রভুত্ব স্থাপন অসম্ভব। কোন জাতি অপরের নিকট সামাজিক হিসাবে আত্মবিক্রয় করিবে না, যাহা হয় মুখে তাহার বর্ণ ও সামাজিক আচার ব্যবহারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিমের দ্বার দিয়া এত বিচিত্র জাতি বন্যার মত আসিয়াছে যে একটা জটিল, বহু-কেন্দ্রী সমাজ গঠন এখানে অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্র তাই এখানে সমাজ হইতে একবারে ভিন্ন। রাষ্ট্রের দাবী সমাজের অধিকারের নিকট খর্ব। যে যে সমাজে প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে। প্রাচ্য রাষ্ট্রের সহিত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের এইখানেই প্রভেদ। ব্যক্তির নিকট সমাজ যে দাবী করে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দাবী করে, ইহা একমাত্র ভারতবর্ষ ও চীনেই সম্ভবপর হইয়াছে। এই দুই দেশের লোক পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম রাষ্ট্র-বিশ্বাসী। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায় তাহাদের নিজেদের আইন কানুন ও পুলিশ, নিজেদের মন্দির, বিদ্যালয়, বিচারালয়, আচার-প্রচার রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

ইউরোপীয় জাতি সমূহের নির্বাচন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সমস্তদের উপর শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক মতের ও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক স্বার্থের রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা অধিকাংশ দেশে বিজিগীষু একজন নরপতির শাসনাধীনে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। সমস্ত দেশকে নরপতি আপনার করায়ত্ত করিয়া তবে প্রাদেশিক ও স্থানীয় কেন্দ্রে সভাপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসনের আরম্ভগুলির

জীবন রাজশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিত। এশিয়ার অন্যান্য জাতি সম্প্রদায় কিন্তু ভিন্ন পথে আপনার জন্য সমাজ নির্মাণের আবশ্যক প্রয়োজন জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় স্বাধীনভাবেই সমাজের প্রকৃষ্ট উপায় হইয়াছিল। রাজশক্তি বরং জাতি বা সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবের মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। চীন ও ব্রহ্মদেশে রাষ্ট্র যদি সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে সামাজিক অশান্তি ও অসন্তোষের সীমা থাকিত না। অপরদিকে সামাজিক পৃথক্করণ ও স্বাধীনতার নীতি রাষ্ট্রকে তত বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে নাই। তাই বাহির হইতে আক্রমণ হইলে রাষ্ট্র আত্মরক্ষা করিতে একবারে অসমর্থ।

সামাজিক গণ্ডী

চীনদেশে যেমন মোঙ্গলদের, এদেশে তেমন জাতি-ভেদ প্রথা মানুষকে অন্যের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বাধীন সমাজ গঠনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া চীন ও ব্রহ্মদেশ সমাজকে আক্রান্তীয় কলহ হইতে রক্ষা করিয়াছে। দক্ষিণব্রহ্মদেশে লোকের মধ্যে জাতি ও সম্প্রদায়-গত বৈষম্য সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু সেখানে জাতিভেদ ও মহাজনের এক হিসাবে যে সামাজিক অশান্তির প্রতিরোধ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ব্রহ্মদেশে জাতিগত ব্যবধান ব্রহ্মদেশের অন্যত্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। সমাজে যেমন সেখানে জাতিভেদ প্রথা কঠোরতর, তেমন নগরে প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক্ মহাল বা পল্লী নির্দেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের সব পুরাতন নগরীতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক্ মহাল বা পাড়া দেখা যায়। দক্ষিণে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মহাজনকে যেক, যাহ্ বা যেদব্ বলে। পটী, পাড়া, সাহী, মহাজন প্রায়শিক নাম। আরাকানরী ১১২ মহাজন বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বিশেষ কোন ধনী ব্যক্তি বা প্রসিদ্ধ কোন ব্যবসায় বা বাড়ী হইতে মহাজনদের নামকরণ হইয়াছে। প্রত্যেক মহাজন আরক্ষাসনের কেন্দ্র। রোহাই প্রবেশ ও অন্যান্য রাজ্যের পুরাতন নগরগুলির বিভিন্ন মহাজন যেমন, বিলাসবহিল ও নানা প্রকার কারুকার্য বিদ্যমান আছে। অনেক সময় মহাজনগুলির পৃথক্ ফটক দেখা যায়, প্রাচীর দ্বারা যেন তাহারা দুর্গের মত সুরক্ষিত। দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের নগরগুলিতে পাড়াগুলি রাত্রে তালে আপন আপন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে।

যেমন রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন নগরে এই মহাজনগুলি তাহাদের যে সুসম্পন্নভাবের সামাজিক অধিকারগুলি আজও ভোগ করিতেছে। রাজপুরুষদের বিভিন্ন ধর্মে বিউবিলিসালিটীর ভাব, মন্দির বা মন্দির রক্ষা, পূজা-পার্বণ, আমোদ-প্রমোদ, বিবাহাদি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মহাজনে জাতিসম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। আধুনিক নগরগুলিতে পুরাতন নগর স্থানের সহিত বর্তমান বিউবিলিসালিটীর একটা বিরোধ লক্ষিত হয়। এই বিরোধ বিবরণ করিতে হইবে। জাতিসম্প্রদায়ের সামাজিক অশান্তি দূর করিবার একটি প্রধান সহায়।

বিভিন্ন পল্লীতে বা মহাজনে জাতি পঞ্চায়েত পূজা বা পোজাগাজার ব্যবস্থা করিবে। সেবকা হিন্দু মহাজনে বাহির হইবেন। মুসলমান পল্লীতে হজ্জা ও মক্কা যাত্রা ভিন্ন পোজাগাজার বাহির হইবে। অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকের সম্মুখে কিছুই হইবে না। মহাজনে মহাজনে পূজা-বিধি, আমোদ-প্রমোদ অপরকে নিজের আয়োজিত না করিয়াই নির্বিঘ্নে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইবে। যখন রাজপুরে সকল জাতির সম্মুখে পোজাগাজা উপস্থিত হইলে মাথার সম্প্রদায়ে, মহাজনে মহাজনে যে সম্প্রদায় যেমন ইচ্ছা আপনার প্রথা অনুসরণ করুক, নগরে অশান্তির কারণ কিছুই থাকিবে না।

জাতি ও সম্প্রদায়ের পৃথক্-করণ অনেক সময়ে সমাজের খুব কল্যাণেই লাগিয়াছে। পশ্চিম ও মধ্য ব্রহ্মদেশের নগরে রোহঙ্গা বর্ষিষ্ণু ও মুসলমান কারুকারগণ মহাজনের সাহায্য নিয়ে ও তার বিবাহে ও পার্বণে প্রভৃতি উপলক্ষে চাঁদা তুলে। সেই চাঁদা হইতে কত মসজিদ, মক্তব ও আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দরিদ্র ব্যবসায়ী পঞ্চায়েতের নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়া

হয় হইয়াছে এবং যোগাযোগের অর্থ হইতে পরাজেয়ের চিহ্ন অন্তর্ধান পরিপূর্ণ করিয়াছে। অথচ যখন এখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যা উৎসাহিত করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধালাভ করা হইয়াছে। অন্য প্রদেশের পৌরাণি ক্ষেত্রে শুধু অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই আঘাত লাগিয়াছে, এখানে তাহা নহে। একটা কথা, আমাদের সাম্প্রদায়িক জীবন এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধও দেখা যায় নাই।

জাতি ও নগর পত্তনে

এটা কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, নগর বিন্যাসে ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের সব পুরাতন সহরেই অল্পবিস্তর তাহা বর্তমান আছে—যেখানে জাতিগত বৈষম্য প্রকটিত হয় নাই। মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের বণিক পাশাপাশি সমস্ত প্রদেশের ব্যাবসায়ীরা ব্যবসায়ের সুযোগ খোঁজাইয়াছে। কাঠ কাপড়ের দোকান, ঔষধোপাধীর দোকান, জুতার দোকান পাশাপাশি চলিয়াছে, সম্প্রদায়ের বিরোধ নাই। নগরের প্রধান অঙ্গ, যা প্রসিদ্ধ যাদের নিকট প্রধান প্রধান বণিকগণ বিভিন্নভাবে পরাজেয়ের সম্ভবের হন। নগর পত্তনেতে জাতি বা সম্প্রদায় কেহ নাই। তিনি নগর-শ্রেষ্ঠ তিনি সকলের পরামর্শ লইয়া বিদ্যুৎ-বণিকের চিন, মহাজনের চিন, বিদেশব্যাপৃতার চিন, ঔষধের চিন, অন্যান্য চতুর্দশীর চিন দোকান ঘরের মুহূর্ত দিলেন। পরস্পরের সময় কোন্ মহাল হইতে পোতাধারা বাহির হইয়া কোন্ পথ দিয়া যাইবে, বিভিন্ন শিল্পী, জাতি বা সম্প্রদায় কত টাকা দিবে, অথবা পোতাধারার আয়োজন কি অভিপ্রায়ের ভার লইবে, তাহা পরামর্শ আলোচনা করিল। কোন্ জাতি বা সম্প্রদায়ের সাথে নগর-শ্রেষ্ঠের আলোচনা অবাস্তব করিবে! জাতি বা সম্প্রদায়ের কথা কত সময়ে বিভিন্ন জাতি পরাজেয়ের সমবায়ে মীমাংসা হয়। সাম্প্রদায়িক কলহ দূর করিবার কেমন সুন্দর এই অনুষ্ঠানগুলি। নূতন নগরী অনির্দিষ্ট, বিভিন্ন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। পুরাতন নাগরিক ব্যবস্থাসনের সহিত বর্তমান মিউনিসিপাল শাসনের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তবুও কলিকাতা, কানপুর, বোম্বাই সহরেও আমরা সম্প্রদায়ের মহালের ব্যবসায়ের কিছু কিছু পরিচয় পাই। এটা যে একটা সমাজ-বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম। এতদ্ভিন্ন বন্দর, এক শ্রেণীর শিল্পী বা ব্যবসায়ী একস্থানে সমবেত হইতে পারিলে তাহাদের অনেক দিকে সুবিধা। অপর দিকে মিউনিসিপালিটির বিভিন্ন ওয়ার্ডে লোকগুলির মধ্যে যদি একটা সমান, স্বাভাবিক সামাজিক বন্ধন না থাকে তাহা হইলে নানা দিকে অসুবিধা।

যে-সব জায়গায় এখন পর্যন্ত আপন আপন ওয়ার্ডের কলাবরণে বসবাসীরা মনে কোনই সামাজিক কর্তব্যবোধ উদ্রেক হয় না, সেখানে জাতি বা সম্প্রদায় হিসাবে সামাজিক কর্তব্য ভাগ করিয়া লওয়াই কর্তব্যকর্ম। এটা বলা বাহুল্য, বড় বড় মিউনিসিপালিটি স্থানীয় ওয়ার্ড-সভা স্থাপন করিয়া আপনাদের বিরাট কার্যতা সংশোধন করিতে চাহিতেছে। এখনকার সামাজিক জীবন একেবারে নিরানন্দ, বস্তুতান্ত্রিক। অথচ এ-দেশে নাগরিকদিগের হলকর্তা, বণিক ও শিল্পীদিগের অনেক স্থান, সাধারণ লোকের আন্তোৎসর্গ কম না বিপুল। মন্দির, ধর্মশালা, অনাথাশ্রম প্রভৃতি মূল মূল নির্মাণ ও এখা করিয়া আসিয়াছে। যত দিন আমাদের নূতন স্বায়ত্তশাসিতে নাগরিকদের আন্তোৎসর্গ আবার পুনর্জীবিত না হয়, ততদিনই মিউনিসিপালিটির শাসন-প্রণালী আমাদের নিকট পৃথক্‌লের মতন মনে হইবে। এই কারণে যেখানে সম্ভব সেখানেই পূর্বেকার রীতি অনুসারে মহাজনে ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বায়ত্তশাসন পুনর্জীবিত করা উচিত। দেশ-ধর্ম যত দিন দুর্বল থাকে জাতি-ধর্মকেই আশ্রয় করিয়া সামাজিক কর্তব্যের দিকে পরিচালন করিতে হইবে। শুধু দেখিতে হইবে পরস্পর বিরোধী জাতি-সংঘের সমাবেশে সমাজে অনিষ্ট না উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষে জাতির ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গতীতে পৃথক্‌করণ ও স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ একদিকে সামাজিক বন্ধনে আগাইয়া রাখিয়াছে, অপর

দিকে সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ আসিতে দেয় নাই।

জাতি-ধর্ম বনাম দেশ-ধর্ম

এখনকার সামাজিক ধর্মের বিরোধের দিনে দেশের সেই বহুপ্রাচীন নীতিই অনুসরণ করা উচিত। যেখানে শিক্ষা নাই, সেবাধর্মের প্রভাব সীমাবদ্ধ, ধর্মের পৌরোহিত্যের নিকট লোকে দেশধর্মকে বলি দেয়, সেখানে জাতি ও সম্প্রদায়ের পৃথক্করণ, নাগরিক আইনশাস্ত্রেই হউক অথবা ধর্ম ও সমাজ-ধর্ম শাস্ত্রেই হউক, একমাত্র ব্যবস্থা। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায় আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তাহার ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করুক, কিন্তু ধর্ম গণ্ডীর বাহিরে। বাহিরের বিশ্বজনীন নাগরিক বা রাষ্ট্রিক জীবনের সংস্পর্শে আসিতে হইলে প্রত্যেককে আপনার ধর্মের পরিত্রাণ করিয়া আসিতে হইবে। কারণ, বিরাট রাষ্ট্রিক জীবন জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্মের প্রয়োজনায় এক মুহূর্ত টিকিতে পারে না।

ধীরে ধীরে তাহার পর দেশ-ধর্ম আসিবে। সামাজিক আদান-প্রদান ও সম্প্রদায় ভাব-বিনিময়ের ফলে, জাতি-ধর্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম মানুষের কর্তব্যের সীমারেখা টানিতে পারিবে না। আপনার গণ্ডীর বাহিরে সমাজ ও দেশের প্রতি নূতন কর্তব্য বোধ জাগিবে। একটা উদারতর ব্যক্তিত্বের উন্মেষ হইবে। দেশের মহাপুরুষের জন্মতিথি, একটা ঐতিহাসিক অভিনয়, একটা জাতীয় সম্মেলন, নূতন চাঁদা-সিন্নি-সভা, সামাজিক-হিত-সাধন-সভাদী, এক একটীর মধ্যে জাতি-ধর্মের বন্ধনের ও দেশ-ধর্মের প্রতিষ্ঠার অনুর নিহিত রহিয়াছে।

বহুপরাধীন ভারতবর্ষ, যখ সামাজিক দেশের মধ্যে নিজ ভারতবর্ষ জাতি ও সম্প্রদায়ের সামাজিক পৃথক্করণ ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই স্বধর্ম-সেবী দেশে সামাজিক শান্তি স্থাপনের ইহাই প্রশস্ত পথ ছিল। নূতন শিক্ষা, নূতন সভ্যতা, নূতন রাষ্ট্র, সেই পুরাতন বন্ধ সমাজ-জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। আমাদের জীবনেই আমরা সমাজ-ধর্মের পরিবর্তন দেখিতেছি। বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যু-অভিসন্ধি, ঈর্ষা দ্বেষ-কলহ, বিবাদ ভয় প্রভৃতি মিলিয়া সমাজ-ধর্মের সহজ, সরল ক্রমবিকাশের পথ রোধ করিয়াছে। সমাজ-ধর্মের এই ক্রমবিকাশের পথে ভারতবর্ষকে চলিতেই হইবে। এ-পথ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভয় এবং যুদ্ধবিগ্রহের মত বীভৎস, অবাঞ্ছিতময় পথ। প্রত্যেক জাতিরই অধীন অবস্থায়, প্রত্যেক ধর্মের অধীন পরিচ্ছন্নতা চাই, তাহা না হইলে পরাধীনতার অবসান হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্র, নূতন সভ্যতা গড়িতে হইলে "মাতৃ পন্থা বিজতে অয়নায়।"

ভগবতীর পলায়ন

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশী

পূজা এসে পড়েছে। আমরা ছেলে-ছোকরারা এল যা যাত্ত হয়ে এবারটা কলকাতার প্রতিমা কয়টা অন্তরের এল তলায়ক করে বেড়াচ্ছি আর ঐরাবত পাল্কে আমারা বিদি। যাবা-যাবাটা সকলের আমাদেরই।

চুড়ীওলারা বাড়ী বাড়ী বৌঝিদের বেচাকেনারী-চুড়ী পরিয়ে বেড়াচ্ছে। চার দিকেই—চাই আলতা সিঁদুর বিদি বাধা-বসা। জোগাড় রেখে বেড়াচ্ছে—চাই "কাপুড়"—নীলাম্বরী, শরুকে চুড়ে, চুড়-বাহার।

আমরা নিজের নিজেই ব্যস্ত,—বল-বেঁধে চাঁদনী থেকে ছুরো কিনে এনেছি—সে কী চিক্ ! এমন পাবা দুনিয়া খুঁজলেও তেমন এক-জোড়া মিলবে না ! সামনে উঠোনটার মাঝখানে "বামাবেং" পেটাবার জন্যে, আর চার দিকটা উঁচুটকে পাল চামড়ায় মোড়া, আর অন্তরাত্মাটা ঝক্‌ঝকে, তালো মার্কিন্ চামড়ার। আমার যদি কখনো বাঁচি তেমনে বিজয় করব হয় তবেই তার খোঁজ পড়বে। তাই আগবাটা ছুকে রিলুম। লাগত তম নেমনি, আই-আন্না নয়, দশ-আন্না নয়—পুরোপুরি আঠারো-আন্না। এবে পঞ্চমী দিনে বিশ্বকর্মা যার যোড়শ খুলে দেবেন তুমি ছিলনা,—অর্থাৎ বেলাবাই খুলেছিলে এবে বাড়ী ফেরা, তত্তবাই দেয়া।

তার উপর ঘোড়া, চমর, ঘোড়াগাড়ো তালাপেরে কাপড়, প্রভৃতি ত ছিলই, সর্বোপরি সে বছরের নবাগত বাজনাই (Birds eye) ছিল আমাদের দেয়া সম্ভার। কিন্তু পাকাতে গিয়ে ঘোল লাগলো ! বাজেই তখন তলাদের দরকার। যা দুর্গার কি বল—পাঁচটাকে ছুটিয়ে দিলেন। সে আর দুজন হল উঁচুলে ইতাকা দিয়ে উঁচু পাকার উঠে আসছে—অনেক এগিয়ে গেছে। সে বস্ বস্ পাকিয়ে ছিল, কিন্তু ও বাজিয়ে নিলে আর ছুঁকলে,—অবশ্য আমাদের Training (তালিম) দেয়ার ছলে,—এখনো যা মনে হলে গায়ে লাগে। বাবার সময় বলে গেল—"যা বেলবা বাজিয়ে দিয়ে গেলুম—চালালেই বুঝবি—ইয়াঃ বক্ট !"

আমাদের সে বছরের পুজোটা সব দিনিকে ছাপিয়ে ওই "ইয়াঃ" মন্ত্রে মুখরে মাতলো। পাকস্পর্শ সন্তবীর হাত থেকে,—উঃ এখনো লাগে দিব। তখন তখন পৈরে, জোগাড়ি এর বিজানি, কি—দিব যার ত' কল যাবনা ইত্যাদি সেরা সেরা মাবাক্যের জানে ছিল না। সবলা একদিন ঐ তুরীভেরি সমারো প্রমাণ করে সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

হরি ছিল আমার সমবয়সী, উঁচুবেলি এক পাড়ায় বাড়ী। তাদের বাড়ী দুর্গোৎসব হত—সেটা ছিল যেন আমাদেরি পূজা। প্রায় এক ঘন্টা সেখানেই কাটিয়ে। দুমারেরা প্রতিমার বা করছে—আমরা খুরি এদিয়ে বিদি বা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি। রাতে লাল পরানো হচ্ছে—আমরা লাল বাত্ত ছেলে প্রবীণ উস্তাদে দিচ্ছি। বলিদানের পাঁঠা চরানো, পাঁঠা নাওয়ানো, ফুল আর তলাপাতা সংগ্রহ করা, না হলে আমলে যা হয়, তাই করবার বাড়ী, এ সবই ছিল আমাদের কাজ। তাতে কী উৎসাহ, কী হৈচৈ রোল ! ঘাস্ খাঁকবার জন্যে যে লড়ালোও চলতো। হরি ছিল ঘাস্ খাঁকতে সিদ্ধহস্ত, সে আলিবাবা-চাহাড় খাঁকতো, আমরা অবাক হয়ে দেখতুম !

হরির বাপ ছিলেন সে যুগের প্রাচ্য দুর্বাসা,—একেবারে বারুদ, কথায় কথায় অগ্নিবাণ ! খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নিজের উঠানে নীরস বেরে বাসারি মনে নিয়মের, তদুপরি ছিল ব্রজবন্ধু থেকে ভিন ইঞ্চি high polish চাক, দুর্বাসরি দশাতে তা এমন ঘন্ ঘন্ ঘরতো—

মোকে "মহারাজ" ডাকা আর কিছু বাকিতে রয় পেতো।

এই রকমের মেজিন মজুর নিয়ে ব্যবসায়,—বাড়ী পরিষ্কার করা, ঘাসপাতা বাঁধা পেয়ে চলছে চাই,—আর কিন মোকা।

ভড়ক-সমস্তে তিনি ছিলেন "অভিজ্ঞাত"—কথনো ঠাট্টা হতে না। ইঁদারাটিতে জল কমে, ঘরের বাসাক মেকে টানবেন মলে আর পায়ের মলটী লাগিয়ে-ছেন, এমন সময় সীতারাম মহাশয় ধাক দিলে—"ঠাকুর মশাই কাজাকাটি বই—কাজ বাকাই যাচ্ছে।" টানা থাম হ'লনা—ইঁদো ছেড়ে হাঁকি দিতে ছুটলেন।

ধনি বললে,—"এই লক্ষ ছুঁ-টান টেনে আমাকে যে, বাবার দেরী হবে—কারবারি ঠাকুরে হাজির হয়ে আছে। এ' কদিন এইতে কম ঢালামো চাই—আমাকে। "বাবু মাই" টানেনি কি করে—পাড়ার বেটার মেয়েই সব যাবে,—সে ঐশ্বর্যির যে।"

তাও ত বটে। ইঁদো তুলে মলে মুখ দিয়ে মাজি, ধনি দিলে পাইকার্। ছেলে মেয়ে সাত হাত তফাতে পর্যন্ত—চাটুয্যে মশাই কড়ের মত আসছেন! ইঁদো থেকে থেকে পড়ে,—ঘোল ছুঁচিলাটা,—কলসে ডুবাবে। না ছুটির ভোরে প্রাণটি কেবল মধে এলো কি ঘোরে এলো বুঝতে না।

সব উলস উৎসাহ কোথায় উপে গেল; পুজো একদম মাটি! সে আপশোষ কেউ বুঝবে না! নতুন ছুতো হারানোর শতগুণ বেশী।

সন্ধ্যা দিন পরে পরে কাঁদলুম—"মা একি করলে, তোমার জন্যে দীঘি থেকে বল ছুড়ি মাটি এনেছে তাই বেচেই ঘোর বিশ ছুড়ি আনন্দ পেয়েছি: এক-ঘোড়া গরু এনেছ—তার মধ্যে তোমাকেই ঘোর বেশছুম—বেশ ছুড়িই এনেছ, এখন আমি করি কি?"

চারদিক সেই চাঁদনারা ছুতো, চঞ্চল হয়ে গাড়ালো। আর সেই অত লাফের ইঁদা:—বিশ ঘোর হয়ে লাগলো। এমি করলে মা!

চক্ষিল ঘটা মিলাদিনের মত ঠাণ্ডা লাগলে অবশ্য

যাওনা তোর করে সকালে যাইবে এলুম বেন ঘোর! হয়ে ইঁদিরের আলিঙ্গ-পাড়ায় ঠাকুরাণ ঘরের ঘুমিগুলো তোকে পড়েই আমার মেয়ে মেজ মেলুম। এখন যাই কোথা! মনে হ'তে লাগলো—চাটুয্যে মশাই ঠাকুর ঘাট-দিনের আলাদের মত' লাগা ফরকরে চুল-গুলো বেন ঘাই ঘাই করে জলছে, আর তিনি অসহ ছুতোর মত আমার ঘুমাগি করবার জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন! শিউরে উঠলুম।

ভাক্তির এসে ডাক দিলে,—"হরে অবর। "কি রে তার বেড়ে যে মড় বেলা বেটি,—কোথা গেলেছ বুঝি! আমাদের ঘোষা আছে যাবা!"

বাছের "ইঁদা"! সকলেরি ছিল ঘুমি আমার উৎসুক করে রেখেছ, বেশন আমাকেই ধিকার লাগিল করে দিলে।

"না ভাই পরীক্ষাটে ভাল নয়, কিছু ভাল লাগছেনা।"

"ভাল লাগছেনা কি বল্! তিনটে দিন যাক—এক পক্ষ নবীন মাষ্টারের মাসকোরে ঘুম দেখতে হবে না। তারপর বড়-মাষ্টারে যে-সব পাটনেরে পাঠা এসেছ,—এখন বাসন্তাগলের পিছুয়া,—তিরিশ-দোর করে ভাল ছাড়বে! ভাল লাগছেনা কি বল্! আমরা এই জন্ আর বৈঠক করে আসছি—ওঠাতে হবে তো। এতো আর ছুটো ঘোষা আর এক বিছুক ঘোল নয়, একদম মহা-প্রয়াগের মালসা-ঘোষ। তার ওপর—ইঁদা হয়েছে। আবার কি চাস্!"

অবর বললে— "আমার ভয়েছিল্—মা এবার হাসলে চড়ে আসছেন,—তারিণী পুরুষ বিয়ের ঘুম করেছে। পরীক্ষা করির মেয়েতে মেলে চলবেনা।"

তারিণ উত্তেজিত ভাবে বললে—"আসল কথাটাই বলা হয়নি যে।—ক্যাম্বো পিসি নাইতে গিয়েছেন,—সে বেলা মাথায় এক ঘলা ঘোষী দিয়ে এসে হাজির! ক্ষেত্রোর ঠাকুরা অবাক্ হয়ে বললেন—আর পরদিন ঘর ক্যাম্বোকে পুরুষ-মানুষ বলে জানতুম, কাদের উপর কাপড় উঠতে কে কখনো দেখিনি, এ আবার কি!" পিসি দেখি তাঁর ঘোমেয়াল-ঘটি গলিয়ে বিধি ঘুরে ঘটি

মাহুষের মনের মতন—"মাটে মোষ হয় চাষ-ভাসাতে এসেছেন, ডিমওয়ালা বড় বড় ডিম্ দাও।" আরো কত বাড়িয়ে ডিম্ ডিম্ করে বললেন—"আমি যে উঁচুর পাড়ার বউ ডিমুম।" এই বলে আঁচলে চোখ মুছলেন। তারপর আমাদের বললেন—"একবার দেখবো বাবা,—খেয়ে না বললে কি ভাল দেখায়। আমি মোরের মাংসটা চড়িয়ে দিইগে।"

আমরা মোক্ষ দেখবে ছুটেছি।—"চল্ দেখে আসি।" এই বলে আমিও আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

চাষ সমাপনের গল্প শোনা ছিল। অত বড় বিস্তীর্ণ লোকটির ভরাসায় ডিমা আমাদের ৮'শটা মাঠে দেখা দিয়েছে! দেখতে হবে বইকি। চট্ পা ফেলে পাড়া হলুম,—মনের হুর সবের ঘুরে ফিরে তখন এক হয়ে গেছে!

দেখি,—কিছু দেখেছে—অনেকেই ফিরছে। কেউ বলছে—"আমার কার মাড় ভেঙে এসেছে," কেউ বলছে—"নিশ্চয় ঘাস খায়," ইত্যাদি।

মাঠে পা দিয়েই চমকে গেলুম,—এরে আমাদের বিরিঞ্চি মামুলী! গ্রামে "ছুবো" বলে তিনি পরিচিত, তাঁকে কাজ কর্ম করতে কেউ কখনো দেখেনি। বয়সে দু'বেলা ডিমিয়ে যেতেন, বাড়ী এসে "ছুবো"র হাঁইলে চলেন। কাজের চলেন নেই, প্রায় সকলকেই "তি-তে" বলে সম্বোধন করেন। ভোলা, প্রকৃতি, কথাবার্তা, চাল-চলন এমন উঁচু স্তরে বাঁধা যে, কেউ কক্ষ একটা কাজে খেলতে সাহস পাবেনা। ছোট ছেলেরা তো সে ত্রিসীমাতে খুঁষি ঘেঁষে এসে পড়লেও ঘুটতে যাবেনা, কারণ তাঁর মুখটীকে মনে হবে ভেরেণ্ড মধ্যকালো, তার উপর গাম্ভীর্যের প্রকোপ থাকায়—জ্যেষ্ঠাতি পরোয়ানার চেয়েও বিকট, এই মুখটিকে চড়িয়ে-বাড়িয়ে তিনি যখন যেখানে যান মনে মনে একটা আনন্দ উপভোগ করেন। আসলে তিনি স্নেহ ছিলেন যেমন অন্য নয়—অন্তরঃ আমাদের কাছে। কি জানি কি কারণে কোন্ এক শুভমুহূর্তে আমরা তাঁর স্নেহ-নয়নে পড়ে গিয়েছিলুম। তাই

বখনো কখনো গাঁয় দরদ-বিয়ানের ছিটে-ফোঁটা আমাদের উপর ছড়িয়ে পড়তো। তখন তিনি আমাদের মা-সমান হয়ে যান।

হাত দশেক তিনি ছিলেন বহুরূপী। এবার দেখি—একদম নব কলেবর ধারণ করেছেন। পরিধানে—উঁচুইয়ের ডেসিং ফোড়, চরণে—চটবদ্ধ বাই-পাহুকা, মস্তকে—দৈবিক উষ্ণীষ, অঙ্গে—ঘোটে তুলসীর মালা, আকবোটি কণ্ঠাক্ষ, আর সা করিমের দাড়ি দাড়ি নীল আলখাল্লা,—সেই কটি সাধনের কথাটি সমূল হয়ে—দর্প-দাড়ুলো দাড়ি গোঁপে ছুঁচের ফোড়লাবার! ললাটের মাঝে ঘোপী-তিলক, পরিধে রেখা-বিভূতি; মধ্যে সিন্দুর। কেবল পদ্ম পর যোজন ঘুরে থেকে নরহরি ঘরে ঘরে যান আর ভাবেন—ভাগবিটে বুঝি যায়।

বিরিঞ্চি মামা ঘাট ছুড়ে বসেছে। একখানিতে বড় বড় কলার ঝাঁদি, কুমড়ো, অলাবুর ডাঁটাল, ঘোড়, ঘোচা আর পেয়ারে পেয়ারে ঘানকচুতে ভরাট, এক একটি যেন রাজবরের কলকাটা নারকোল গাছ। দ্বিতীয়খানি হাজলের ডাউনি—তাতে ছত্রিশটি ছাগল বহুৎ, আর একটি পাহাড়ী মোষ: তৃতীয় খানিতে ধরা আমাদের অবৈধাল আর তাঁর যে-একটে পাহাড়ী চামর গরু,—কোমরে কুড়ুল গুঁজে বেলোয়াড়ের ভোর আর জোয়ালাড়ের চা যায় করে বাঁধিয়ে আছে! কি রমণীয় দৃশ্য! সব কুড়ুল-গুলি তুলে নিয়ে হেসে ফেললুম।

কর্তার নজর এড়াতে পারিনি। তিনি যা বাজী লাগলে লম্বা করে দিয়ে তর্জনীর ডগাটা বেঁকিয়ে নীরব ইঙ্গিতে ডাকলেন। (সেকথা আর একদিন পরে মনমতে যাবার হয়ে যাবেন পেয়েছে)

কাছে, আমরা প্রকৃতি দিয়ে প্রণাম করলে, আমি মাটির ঘরে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে সেলাম করলুম। আশীর্বাদ চেটে খেয়ে দেন, বললেন—"আছিস্ আজো"!

খেলাঘরের দিন। এরই ফাঁকে আমাদের একটী করে নূতন খেতাব দিতে হ'ত। বললেন—"এবার কি ডাকবানি?"

বললুম—"বহুরূপী।"

"খেলে—প্রায় অন্ধকার ঘরে বসিয়ে।"

বললুম—"ঘরের ভয় আর নেই।"

"কেমন,—উপমাটা কবিত্বি কিনা বল্। তোদের মাস্টারমশাই এখন কপচাক বাকুনে।

"যাক—এখন কাজের কথা শোন্। নবাব বাড়ীর পাটী চুকিয়ে—যখন সেখে কিস্তি,—সেটেলের বাড়ী যাওয়া পড়লুম। সব পা ছড়িয়ে বসলে; হলে—আমাদের মহলীকা দিতে হবে, যা না হো কেমন শুভ হচ্ছে না, বড় অশান্তিতে দিন যাইছে। আমাদের শুভদিনে লক্ষ্মণ সাক্ষ্য হয়ে গেছে, কেমন "দৃষ্টিভঙ্গ" আর কেউ নেই। "বড় বউদের" ছোট বাড়ী যাও—অসম্ভবের কথা, আমাদের সেই চার-অক্ষরে—অবশ্য "বিতীয়ণ" যদি না হলে কে-মামার ঘর শুদ্ধ।"

কি দুর্দিন। বিজয়ের ঐশ্বর্যের সেবনপাত্র বীভৎস আমার অবশ্য আসা ছিল। বললুম—"ও বীভৎস যার করলে আমার সাধনার অঙ্গেক ফল জল হয়ে যাবে, দুর্গতিনী দুর্দিতা হবেন, সমস্যার সাংঘাতিক যা থেকে তখন হয়ে 'পড়বে। উঁহুঁ—যা হবে না।" তারপর বাক্যোচ্ছ্বাস। শেষে—প্রতিবাদের এক ঝাড়ান সেকেন্ডারী শুদ্ধ শোনালুম। আরো তাইতেই বলি।—বাড়িটা আপনার আমার—এ সব যা দেখছিস। ঘি, চিনি, বস্তা প্রভৃতি পড়াতে আসছে। যাদের পুজোটা এবার যোগালো করে করতে হবে,—মুস্কিল? সব তারই জোগাড়,—করতে কর্মাতে হবে তোদেরি, আমি কেবল direct করবো,—ব্যস্।

"কেমন,—পারবি তো?"

কি অবিশ্বাস! এতবড় কর্মযোগের পর্ব! তোদের যাত্রা থেকে যোগ্যতা জানালুম।

তিনি আমাদের পিঠ চাপড়ে মহাযোগ্য বিজয়-বিহারের মত যা সুখে পা বাড়ালেন—সঙ্গে নবাবর, বজলাল নিয়ে ছুটে-মনুর বাকি-মালাগা অনুসরণ করলে। ঘরে যেন নবজোড় চুকলো। পড়াতে পড়পালা।

বিজয়া বললেন—"তারপরই এই মাসে!"

যা দুর্গাকে জানলে যে, সকল বিপদ কেটে যাক—আমিই সেটা মাঝে-মাঝে জানলুম। বাড়ী ফিরেই মুখুজ্যেদের সঙ্গাতে সেই বাজনটায় ঘুরে। কোয়ার্টি—small angle of vision থেকে প্রায়শ্চিত্ত এঁকে-বেঁকে মেখে আমার বালিশের পাশে বসলুম।—'উঁহুঁ' ভুলি ওলে, যার যার তাঁকে বেরেম পাটিতে পুরলুম। চুলোয় যাক মেটার মালিশ-পরিবার!

'Moral class Book' যোগাই ছিল, কেমন গোছাতে যাচ্ছি হাঁক। আর কি ভাল লাগে,—বিকেলের পুজো! যার জন্যে! যারা যখনি মেতে, তখনি পড়া তো মেতে যাবেই, পুজো বসতে একবার যাচ্ছে নয়।

ছাগলগুলোই তো পুজোর প্রাণ—তাদের ঘরে ঢাকার পাতা ছেড়ে খাড়ি করে ফেলা গেল। মেটবিলের আড়াবোল থেকে নইবর যোড়ার ঘাসা সবারে মেখে গেল;—এ-কদিনে 'gramfed' হয়ে ওঠানো চাই।

ফুলের পালটা একবার চুকিয়ে আসতে পারলে হয়।

(২)

তখন আমরা ফুটবলটার ইস্কুলে পড়ি। ম্যালেরিয়ার আগের দিন ধান্-ইস্কুল হয়ে পুজোর ছুটি হয়ে গেল। বাবা নবীন মাস্টারের প্রবীণ বেতখানাটি নিজীবের মত' বাবা নীচু করে বেরাবের জন্যে চুকলো। অমনি আমাদের ফুর্তির ফোয়ারা যেন ফুরফুরা ফুটে ফোস্ করে বাবা ফুলে বিছিয়ে এল। আমরাও লাফ্-ঝেরে বেরিয়ে পড়লুম। সে-দিন বাবা নিয়ম করলে ফেলে, লোকা পথ ছেড়ে পাড়ার ভেতর দিয়ে চলা গেল।

ছিলাম পাঁচ জন,—'পলাশীর যুদ্ধ'ও ছিল যুদ্ধ। আমরাও চললুম—অভিনবও চললো। মাঝে মাঝে Feeling-এর মাথায় মুখোমুখী হয়ে লাফিয়ে পড়াও চোলছিলো। ফুর্তি কত!

সে অনেকদিন—পাড়ার কয়েকটি ছোঁড়া, ছুটে বাড়ীর বাইরে এসে পড়লেন। বিপিন ছিল অবশ্য শেষ, তার গলায় ছিল কাটা কাপড়ের মত আদর জবাবো। পূর্বাভাসে সেই সে বলেছে—

"যা থাকে কপালে, আয় যা করেন কালী"

প্রৌঢ়াও ছুটে এসে বাহবে বললেন—"বাবা—বেয়াই! আপনা-আপনি কি ঝগড়া করতে আছে বাবা—"

বিপিন তখন—"মাটির পায়রে আমি বেঁচেছি ভবে" বলে, সজোরে নিজের বুকে চপেটাঘাত করে বসেছে।

প্রৌঢ়া—"বলে ভয় খায়, লক্ষীটি, আমাদের কথা শোন্ বাবা" বলে, আমাদের মতো এসে পড়ায়,—আমরা হেসে এগিয়ে পড়লুম।

বেহিসাবীর প্রাণটা ছিল খোলা, সে তাদের বললে—"ভয় নেই গো—ভয় নেই, ঝগড়া নয়—আমরা খেলা করছি।"

"হেঁ—তোমাদের খেলার পরে নমস্কার বাবা,—আমাদের এখনো বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করছে।"

বাড়িটা এগিয়েই একটা বড়ির পুকুর। ঘাটে এসে পড়া গেল,—মোহনলালের খোলা থেকে ঘাম ঝরে পোড়লো। মোহনলাল ছিল কাঠির, যেমন লম্বা তেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি সমর্থদেহ। সে ঘাম ঝরে অর্দ্ধোখিত অবস্থায়, পশ্চিম দিকে দু'হাত জোড় করে আকাশ করে বিনে—

"খোদা যদি দিয়ে ছাও লম্বা বিদন,
যাবের ফিরিয়া ছাও ওরে নিজধি—"

আমাদের তখন feeling এসেছে,—সমবেদনা আমাদের তখন বিহ্বল! মোহনলালের দিকে মোহমুগ্ধের মত তাকিয়ে রেছে,—সমবিবর্ণের দিকে চাইতে ঘনাটাই তখনি, আর মনে মনে তার সঙ্গে joint application পেশ্ করছি। নিজেরা আর কে-কিকে কিরে দেখি নি যে, দুটি তরুণী অস্তি-বস্ত্র পুরুষের পশ্চিম দিকের ঘাট ছেড়ে যায় নয়ে পাথরে। আমেরটি আমাদের বলছে—"দিনমণি ডোবে যায়।" বিনয়ধির কলস কক্ষচ্যুত হয়ে জলে ডুবার মতোই, আমাদের ধৈর্য্য নয়! তার সঙ্গে আমাদের ভাবাবেগ,—সমাধান করবার আমার প্রবল! একদম নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেল মোহন!

বস্তির বাইরে এসে সুস্থির হবার আগেই অস্থির হবার অনুভূতি যেন খুঁজিয়ে ছিল। দেখি এক বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে আর বলছে—"বাবা আমি বড় গরীব, আমার আর কেউ নেই, কোথায় চার আনা পাবো! ঐ বজ্জাতটা খুব বেচে একবেলা চলে যাবে; তখন আমার চাল কিনবে,—ছেড়ে দাও!"

ভাবে,আমি বড় কর্ত্তা তাদের উপর আধিপত্য। ছেড়ে দেখি, একটু আগে এক গাছতলায় একটা বড় বড়ি ঘরে টেনে নিয়ে চলেছে।

অমর তাকে বললে—"বড় গরীব কুড়োয়ানের ঘর, ওর আর কেউ নেই হায়, ছেড়ে দাও।"

লোকটা নিশাচের মত দাঁত বার করে—"ও, হাসিব আছা।" বলে, উপেক্ষার হাসি হেসে, বস্তাটাকে হড়হড় করে টেনে নিয়ে চললো।

রক্ত পলাশী-রণভূমি রক্ত-ক্ষেত্রা যত-বীরের মতনই লড়াইয়ে জিত তখনো প্রবল। পরাজিতরা, যৌবন-চঞ্চল মোহনলাল ইতিমধ্যেই একটা প্রকাণ্ড ছেলেকে ঘাড়ে ফেলে প্রস্তুত হচ্ছিল। সে লড়াই দিচ্ছে প্রাণপণে, আচমকা, সজোরে আঘাত করেই ধনি-পথে লম্বা। মুখে মুখে হাত-পা ছুঁড়ে উপরোক্ত **অক্ষলম্বটীক্ষ্ণ পক্ষাক্রান্ত** । আমরাও বিপিন পথে অগ্রসর। বিদ্যুৎ বীর, পরাজিত তাদের পাশিয়ে, শেষ সকল পলাতেই পা বাড়ালে।

প্রতিবন্ধ একমাত্র ছেলেটি পক্ষীরাজের আগে যাবা দেয়ে। বাড়ীতে লাঙ্গল খান ফেলে, খানার হিসেবেই খান করতে ছুটেছিল, তাদের সেটা more জরুরী। সে তখন বিলে—"তোমরা করছ কি, সরকারী-মাল মারপিট করে ছিনিয়ে নিচ্ছে! এতখান বিপদের কারার আমার ভরসা পড়ে গেছে। ছেড়ারী সরোয়ান নিয়ে দারোগাসাহেব বাবু এখুনি আসবেন।"

আমরা তখন একখানে এসে আবার জড় হয়েছি। ছবি করার কথায় স্ফূর্তি ফেঁপে গেল। এর বড় বাহাদুরিটে পুরো উপভোগ করতে পেলুম না। মন-মরা হয়ে ঘরে ফেরা গেল। আমার বো ভয় পেল! যা, আমার এত ভয়ে! আমার হাত থেকে বেরোই না পেয়েই যে কেমন করল যা!

সর্দারেই বলতে পারলো—ওটা আমার মজবুত, আর আমাদের বিভিন্নটা মহাপুরুষ যে হাতড়ে হাতড়ে বাজার সেরে বেড়াচ্ছেন। সেবা হয়েই বললেন—"চিনে—মাত্র পঞ্চ নেই যে।" ঘরে ফিরে ঘড়িয়াকে।"

বিনি ঘড়িয়ার বলবের ভাষিকে। ঘড়িকের কাছে বিস্তারিত কথা শুনে তাঁর ঠাঁহুর এমন এক অভিনব মূর্তি ধারণ করলে, যা পূর্বে কখনো দেখিনি। তবের আস্তাক হাঁকলেন—"যা, তোর বাবার কাছে লিখিত মহাকাব্য আছে না? সে আর তোর কাছে পাবারে. আর রাস্কেলেরা, নিয়ে বৈষ্ণব প্রভৃতি মোটা মোটা বেখে যা পাস চট্ট এনে আমার বৈঠকখানার আলমারী আর টেবিল সাজিয়ে রেখে। এই পেটো, যা, অফিসারের মতবড়ি নিয়ের uniformটা (উর্দিটা) মার ধলোর চাপকান্ বিনে আয়। কেউটা সে-ধলো পরে বেরুবে। সে রোদের কাছে হাজির থাকবে। তাকলেই 'হুজুর' বলে ছুকুম-কোপের সেলাম চালাবে। তাকে একবার ডেকে দে।"

কেষ্ট-দা ছিলেন মোক্তারী কোয়ান। মাকড়ুই বাদ সবটাই ছিল তাঁর দাড়ি। তিনি বাড়ী থাকলে, ছেলে মেয়ে অন্ত পাড়ায় পালাতো। স্ত্রী তাঁকে বাধিয়ে পাথার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছাগত যাইও দেখেছিলেন।

বেষ্টকে বললেন—"এই সরাপ, এই রে ভিন টাকা, চট্ট পাড়ার দোকান থেকে চলোযোগা এনে পাশের ঘরে রাখ। আর এই চার আনার সাজা পান আর বইনি। বেরো।"

আমায় বললেন—"যা, ২।৩ জন ভদ্রলোক রোজ পাড়ার দোকানের পথে হাজির থাকবে। খানাপিনেরা তাদের কাছে খবর নিতে পারে। তারা বলবে—'হোঁড়াদের উৎপাতে গ্রামে আর বাস করা চলে না। আমাদের কাছে এই সময় কেষ্টটি বাবুর বাড়ী আছেন, চাবি ওঁরা হাতিয়ে!' গ্রামের ওপরও মেজাজ বিগড়েই। তিনি শুনলে নিজেই সেখান ঘরে পরিয়ে দেবেন। তাঁর কাছে কারুর রাখ্ নেই। বাপটে কলুর বাড়ে থকতে এক ঘরে বাস করে। চলুন-দেখিয়ে দিচ্ছি। উচিত শিক্ষা হয়ে যাবে, বড় বাড়িয়েছে মশাই।' তারপর সোজা আমার কাছে আসবি।"

এসে দেখি—মোক্তা, চিনে পাঞ্জাবী, ত্রিপিয়াল্ প্রিন্টার, গায়ে ফিকেট-কালোর আলোয়ান পরি, নাকে সোনার চশমা, হাতে হোমিওপ্যাথী Hollis Jar ভোলা। আলমারী Law books অর্থাৎ নক্ষ পুরাণাদিতে পরিপূর্ণ!

কেষ্টদির আসল্ নিঃ (কেষ্ট-দা), আর বৈষ্ণব ঔপনিষদিক বংশের ছেলেটি। আমাদের ঘরাবর পাশের ঘরে।

প্রেস্তাবী অফিসার এসে উপস্থিত,—Sub-Inspector বাবু ভোলা বিভূতি।

কেষ্ট-দা ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিসুবো বাবুকে?"

সেই আরক-বর্ণ ওজনাবলি ভোর স্বরে—"ওরে। বাবে ইনস্পেক্টার সাহেব আছে কি?" বলবেই কেষ্ট-দা মুখে আঙুল-চে চুপ করতে ইসারা করে Sub-Inspector বাবুর কাছে কাজ চাইলে। তিনি ধীরে বললেন "কিসুটি লয়েস কো করো। যাকে Sub-Inspector বাবু দেখতে পেয়ে যাবে কার?"

কেষ্ট-দা ঘরে ঢুকেই সাষ্টাঙ্গে আছাড় খেয়ে—"আমি কাকা"।

সাষ্টাঙ্গপ্রণামরত কাকাকে বাজারের থেকে ঘরের ঘরে Sub-Inspector বাবুকে সঙ্গে করে এনিয়ে দিলেন। তিনি গলাটা একটু সাফ্ করে নিয়ে গলা বাড়ালেন।

ইনস্পেক্টার বাবু বোধ হয় আশাই করেন নি—এমন মূর্তি সর্দার থাকতে পারে, তাই একটু সহজ হবার মুখে চুকছিলেন। চুকেই, উচ্চতা কেষ্টটে দেখে লোকের যে অবস্থা হয়, তাঁর মুখে তার পরিচয় ফুটে উঠলো। মস্তবড় হাতটা কপালে গিয়ে ঠেকলো, কিন্তু কথা সরলো না।

কিসুটি কহুয়ার নিজমূর্তির প্রভাব বিলক্ষণ জানবের। বীর গম্ভীর আওয়াজে তর্জনী বাড়িয়ে ভিন ঘর তফাতে একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—"বোসো"।

"আজে আমি বেশ আছি,—আপনার সামনে"—

"এ এলাহাবাদ নয় রে, এ আমার নিজবাসী। বড় লিখের service?"

"আজে এই বেশ বছর।"

"ও হাঁ! তোমার আগে বুঝি বছরদুই সাহেব ছিল?"

"আজে হাঁ।"

"বর্ণেছি শুনলেই সব কাজ ফেলে রেখা করতে আসবে। তোমরা একটা তেমন তেমন হয় পেলে, সাহেব ভয় খাবে। সে কাগজপত্র কাছা এনি করা হয়েছে। New Year হবার সাহেবই, রবিবারের দিন দেখা হবেই,—তেবি কি করতে পারি"—

"তিনি আপনার জন্যে বসে আছেন"—

"সেটা তো পক্ষ কথা নয় রে, একটু বুঝিয়ে বলবার। তেল থাকে গায়ে মুখে না ফেলতে পিছলেই আগুনে এসিয়ে যাবে। কতটি তো লিখেছে, অর্থাৎ তোমার কতটি দরকার, তোমার কিছুটি বাকয়, তোমায় লিখটি পাঠাতে হয়, তোমার কুঁটি টেনা চাই, তোমার কাজটুকুই হয়েই, আবার তোমার পা দুটি ধরতে হয়, এ সব সে লিখেছে। চাই বে চাই—সবই চাই। ঐ যা বলেছি তেল কাল পায়। তাহলেই লাভ করবার রাজপথই ওই;—তা, কি তোমার—কি আমার। বুঝেছ?"

"আজে আপনার উপদেশ,—আপনি নিশ্চয়ই।"

"বেশ। ঠাকুরের উঠু পক্ষে দু একটা শুনে রাখো। তাঁর এলাকায় থাকবে—তাঁর কথন কি দরকার, তাঁর my dear-এর বাগ কিনে দেবে। পক্ষী ঠিক রাখবে, পা টিপতে বা টিপে বেরোনো, কে-কুরো বলবে। যে পক্ষীতে থাকবে, তার বাগের বাগাগুলো চিনে চলবে। ভুল হবে।"

এতক্ষণে Sub-এর মুখে একটু হাসির ভাব এল। তিনি বললেন—"কথা করে যা যা বলে দিলেন, এ সব ক'জন বলে থেন,—"

"বেশ, তা বলে মুকবে পেরেছ! মনে রেখো। আমার 1st Class রেকর্ডটিতেই কম করে কাটলো রে। মৈনাক মুখার্জির নাম শুনেছ?"

Sub নমস্কার করে দাঁড়িয়ে বললেন—"আজে তাঁর নাম শোনেনি—আমাদের লাইনে এমন কে আছে। Inspector মুকুল বাবু বলেন—কেপুটি যদি কেউ থাকেন ত' তিনিই। সম্প্রতি বাংপুরে"—

"হাঁ—এই শুনেছি বটে এসেছি। একেলা মানুষের মুখো যা,—কথা করে দর্শন দেব"—

"আপনি কর লোককে কৃপা করেন,—তা আমাদের কৃপা করবেন না তো কাকে করবেন।"

"তোই যাও,—এই—যাচ্ছি দিং।"

"হুজুর" (তেই-কার প্রবেশ ও সেলাম)

Confidential Notes.

তেই-দা আলমারী থেকে বাঁধানো "বেহার পক-বিপত্তি" খানা বার করে দিয়ে, তেমনি করে যথাস্থানে রেখে।

"হাঁ—তোমার নামটি কি বাবু?

"আজে আপনি আমাকে বাবু বলবেন না। আমার নাম নন্দিনীমোহন তৌমিক।"

মোটা চশমার কাঁচ ভেদ করে আশ্চর্য চোখে—"সে কি রে! ওটা তো এ line-এর নাম নয়। ও নামে বিয়েটার চোলা চলে, রবিবারী তোরণে করতে পারে, বড় জোর ওকালতী। এ লাইনে ও সব ছেলেমি নামে কাজ হয় না, বদলে ফ্যালো—বদলে ফ্যালো। আমার District-এ আমি মিছে নাম কখন করে দি। মুকুল, মুকুল এ সব হেল falling নাম। বিজনাথ, ভজনাথ, ভ্রাতৃ, ভালো গোছের, বছরখানেক ও হয় একটা Departmental নাম নিয়ে ফ্যালো। যাও যা,—কাজে মনে সাহসের থাকা চাই রে। সাঁ-সাঁ এসিয়ে পড়বে। নামেরও কাজ আছে, নামে ভরসা পেলেই অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে যাবে। "কালভৈরব তৌমিক" শুনতে হয় না? বেশ হবে—বেশ হবে—

Sub.—ঈষৎ হাস্যে—"যে আজ্ঞে"।

"বেশ,—আর দেখ, বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছি, দেখা কোরো! শুনলোনা,—কবু। বুঝলে?"

"এটা তো আমার duty (কর্তব্য)।"

"যেন,—ওরে বর্ষিয়াৎ, আমাদের কি ইনোসান্সি বন্ধ করলি? সব মনে পড়লি নাকি?"

কার্ত্তিক—"না আত্মারামটা, এইবে আমরা" বলেই,—দুখানা বেঞ্চাকিতে ভদ্রলোকেরা আর দু-বেঞ্চার উপর নিজে বসিছে।

Sub—"এ আবার কের!"

"সে কি আমাদি, এটা কি হিঁদুর বাড়ী। এতো আমাদের শ্বশুর বেহা নয়। এক সঙ্গে তিনিসুদ্ধ না হলে আপনার লোক হয় না রে।"

কার্ত্তিক ঘরের বাইরের ত্রিমূর্ত্তির ভূমিকিষ্যান দেখে গেল। দুজনার সি কার্ত্তিককে দেখেই চিনেছিল আর বেই-এর কাছে খবরও পেয়েছিল—ত্রিপুটি সাহেবের ভাইপো। ভদ্রলোকেরা পেটে পড়তেই সাহেব বললে—"ছেলেরা বড়া বদমাস হায়—পুরা ছবি।"

ডাপুটের 1st Class Deputy বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা দেখিয়ে বললেন—"রামায়া পাঁচো ওঠিয়া পুরা সমঝান হায়, তোমায়া এলাকাসে পড়নে যায়া, তেয়া বেহা ভাল্লা হোইয়া।"

"আমরা বন্ধুর। ইয়ে সব তো অপনা ভাই হায়, বারাবারিকে বেইঠায়া হায়।"

পরে পান, বইনি খেয়ে, হাত আর মেজাজকে ডাপুটের Deputyর প্রশংসা করতে বিদায় হল। ছোট-লা ইতিমধ্যে তাদের জন্য গাড়িরও দিয়েছিলেন।

Sub. হাত ধোয় করে বললেন—"মনে থাকবেন।"

"confidential এ এসে গেছ যে।"

সব মুটীর মাথ হয়ে গেলে ডেপুটি আমাদের দিকে ফিরে বললেন—যা, এইবার ভদ্রলোকগুলো উঠিয়ে দিয়ে যা।"

ওকারো আর কি,—ছোট-লা তখন চাপরাস্ ফেলে গোস্সা শুরু করে দিয়েছেন! আমরা তাড়াতাড়ি করে —দুটো একটা যা পেলুম।

পুজোর ভরসা ছেড়ে গেল—এবং পুজো সম্বন্ধেও হয়নি। এর বন্ধের দুজাইটি বক্তৃতাও শোনা নি। ছাত্রসমাজের দুর্ভাগ্যের।

রাত্রের আমরা বেহারাদের বাসর ঘরে যাওয়ালো। ভদ্রলোক পক্ষী, ভূদেবোপাল, মুটুরাবোস—মুচুক হাসা করলেন। মনুষ্যাজনের আলোর তলে, বড় বড় ঘোষ মাছ ঘরে পড়লেন. এলাহিকাণ্ড ব্যাপারটার সব (ঘেসি jelly) খেয়ে ফেলেন; দোনা বাই এক ঘরোয়াই ছেড়ে সবাইকে পাই খাইয়ে দিলে। ভদ্রতেরা একদম বশবদ হয়ে গেল। "মিস্‌লেইনিয়" বাবু তাঁর বন্ধুবান্ধবি ওইকের কাছে ফিরলেন,—সঙ্গে চৌত্রাসি বেহারাও, সব ছবিটাপ খুব; কারণ তাঁরা ওনোভিয়া—কালিংবরে পঞ্চমস্বরে।

ভাদের ফিজিয়া দোলাও খেয়ে দোলাও—দোলাও পড় ছাড়লেন। আমরাই পরিবেশক,—বাড়ি ঘরে ঘরে দোলার চাঁদ পাড়িয়ে দেলুম!

পক্ষীরাজ ভদ্রলোক পক্ষী বিদায় বেলায় আমাদের ঘরোয়াইকে সম্বোধন বললেন—"এ পক্ষীর দেশে তোমায়? আমিজাত কবি পাবেন্ধ বলায়।" সমাপ্তি তাই! মহাপুরুষের বাণী ব্যর্থ হবার নয়—সেইদিন থেকেই অক্ষর ছাড়লে, অচিরেই আমেরিকা ঘরে পড়লুম,—সনেরো বছর পেরিয়ে গেলুম।

বোধ হয় বাইশ আমেরের শুরুতেই চট পক্ষীরাজের সঙ্গে পথে দিয়েছিলুম। বিনিবি ভিনিস দিয়া,—অব্যর্থ! পুজো সার্থক হল। মুচকণে সেই যে ঘরা পড়েছিল—বোধ হয় মুখার্জিতে ফের্ ফিরিবে।

এখনো বছর 45৪-সেই পুজো আসে, আর কানে "ইয়ে"ও কত রব রব হয়ে আসে। "অনুরূপ পুজো" বলতে যা বোঝা আসবে ওই—"ইয়ে"। এখন আর পাকাবার বালাই নেই,—পাংচাল্ড গত হয়েছে।

আজো আমরা আমাদের সেই মহাপুরুষের ত্রিপুটি-মিলির অভিনয়ের কথা আর তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও প্রবাসের কথা ভাবি আর মনে হয়—এখন যেন কথায় দুটো বক্তৃতা করতে পারলেই আমরা—"বর্ষিয়ার",তবে কিন্তু—"বিদ্বান্"—পার্থক্য কেবলই "বিদ্বান্!"

P 29286

ভারতের অধঃপতনের কারণ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত—পণ্ডিচেরী

ভারতের অধঃপতন হইল কেন? এই বড় যে জাতি, বিদ্যা-বীর্যে যে ছিল জগতের শীর্ষ স্থানে, যাহার ঘরে এত বিষয়ে এত প্রতিভা কেন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না সে কিরূপে, কোন্ কাল-পরম্পরায় আত্মবিস্মৃতির ঘোর এমন গভীর ঘুমের ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? অধঃপতনের মোটা কারণ অবশ্য সকলেরই লক্ষ্য হইয়াছে জীবনীশক্তির হ্রাসে। ব্যক্তির পক্ষে যেমন, একটা জাতির পক্ষেও তেমনি। যৌবনের বেগে দুরন্ত আশায় যেমন তখনই, যখন প্রাণের তেজ কমিয়া যায়, জীবনীশক্তির অপচয় ঘটে। কিন্তু কারণ ছিল যেন সকল শক্তির উৎসে। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, একাধিকবার সে নূতন আত্মপ্রকাশের মধ্যে শক্তিয়া পতনের দিকে মুঁকিয়াছে, কিন্তু কিছুকালের জন্য কেবল, আবার সোজা হইতে পারে সে উঠিয়া, নূতন জীবনে প্রমোদিত হইয়া বল সবল মহান্ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে • ভারত যে সঙ্কটের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এখন অবস্থা তাহার আর কোন দিন হয় নাই, বাস্তবিকই আজ তাহার জীবন-মরণের সমস্যা। কেন এমন হইল? কোন্ পাপে—কোন্ অবিনয়ে অথবা সে তাহার প্রাণশক্তি এমনভাবে হারাইয়া বসিয়াছে?

ভারতের জীবনীশক্তি বিভিন্ন কারণে হ্রাস পাইয়াছে। এই বিভিন্ন কারণগুলি প্রধানতঃ তাহার অধঃপতনের মূলে। আমরা এখন একে একে তাহাদের বিবৃতি করিতেছি।

প্রথম—কাল হিসাবে ও প্রধান হিসাবে—সোজার কেন্দ্র হইতেছে সন্ন্যাসের, বৈরাগ্যের, মায়াবাদের প্রভাব। সন্ন্যাসের আদর্শ কি বলে? অনন্ত বিদ্যা, জীবনের কারণ হইতে কর্ম হইতে অবসর লওয়াই মানুষের চরম সার্থকতা। প্রকৃতির যে খেলা, যার লইয়া মানুষের সাধারণ সামাজিক জীবন, তাহা হইতেছে মানুষের নীচের প্রকৃতি, প্রাকৃত স্বভাবের বিষয়। মানুষ যদি তাহার স্বরূপ, তাহার উচ্চতর প্রকৃতিকে চায় তবে তাহাকে প্রকৃতির দাবী সমূহ করিতে হইবে, বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, তাহাকে নিবৃত্তির পথে চলিতে হইবে। পৃথিবী হইতে আপনাকে প্রতিষ্ঠান হইতে, সকল কুরুক্ষেত্র বহির্মুখী প্রেরণা হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া পরে ব্রহ্ম সমাহিত হওয়াই পরম পুরুষার্থ। •

জীবন হইতে নিস্তার পাওয়াই যে ধর্মের মূল কথা, সে মতের প্রভাবে জীবন যে ক্রমে শুকাইয়া উঠিবে তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃতি সাধনে আপন পথে চলিতে চলিতে সমস্ত পথে যেখানে প্রতিবন্ধ হইয়াছে,—শুনিয়াছে কেবল এই কথা যে মানুষকে সে সংসার হইতে ভুলাইয়া বিদ্যায় দিতেই ডাকাইয়া লইয়াছে, তাহার আহ্বানে মূল্য বা মর্যাদা আছে কিছু নাই—সেখানে সে যে ক্রমে আপনাকে গুটাইয়া লইবে, সঙ্কুচিত ও মূর্ছা হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য কি। সমস্ত জীবনই একটা বিষম ব্যর্থতা বলিয়া যেখানে ধারণা, সেখানে জীবনীশক্তি ফুটিয়া বড় উঠিবে না, ক্রমে ক্রমে লোপই পাইবে।

• টীক ব্যক্তিগত ভাবে আজ আমরা যে ভাবে অবসন্ন অবশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন আর কখনও হইয়াছিল—তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা পাই নাই।

• অবশ্যই যে সন্ন্যাসের আদর্শ ছিল,—আজ নিশ্চিন্ন আর নেই, উপনিষদে, গীতায়—তারা জীবনের সর্বাঙ্গীন সমন্বয় ভাবে রাখে, বর্জিত করে নাই। অবশ্য এও ঠিক, 'কৃষ্ণায়নে' কর্মাদি নিষ্কামীভাবে গীত হয়;—এ তত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে। (উপ-উদ্বোধন)

অবশ্য বলা যাইতে পারে, সমাজের আদর্শ কখনো ব্যক্তিমানুষের মতের উপর নির্ভরশীল হইতে পারে না। সমাজনীতি আপাত কল্পনার মতো এমন জিনিসও না যে পৃথিবীর যাবতীয় লোক তাহাদের যার যার মত পরিত্যাগ করিয়া একমনে সেটাকে অবলম্বন চলিয়া দিয়া থাকিব হইবে। জীবনের—প্রকৃতির প্রয়োজন যাহারা জীবার করেন। সমাজ বিধানে অবশ্য সত্য না হইলেও, ব্যাবহারিক বিধানে তাহা সত্য। ব্যাবহারিক জীবনের কর্ম পালন করিতে করিতে সময়ে সময়ে বৈরাগ্য যখন আসিবে তখনই পরমার্থ সাধনার অধিকার জন্মে। সমাজের চূড়ায় সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পথ তৃতীয় পরিচ্ছেদের ভিতর দিয়া, তৃতীয় স্তর উত্তীর্ণ করিয়া।

কথাটি সত্য। কিন্তু এই সমাজের আদর্শ আমাদের মনে এমনভাবে প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছিল, জন্মে জন্মে সাধারণের মনে এমনটি ভরাইয়া দিয়াছিল, যে আর সকল আদর্শ উহার কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল ছিল। আসল সত্য, আসল কল্যাণ অন্তরের মধ্যে, ইহারা যত বড় পাকা ঘর বেঁধে-বেঁধে প্রত্যহ তাহাকে পাশে সাহিয়া চলিয়া যাওয়াই হইল সত্য। তবুই কি তাই, জীবনের ওপারে চলিয়া যাইবার পথে জীবনটা যাত্রা নয়, এটা বিপুল বাধা রূপেই দেখা ছিল। আমাদের মনে "সংসারী"র অর্থ হইল অন্ধ পাপী। জীবন আরম্ভের মধ্যে থাকিয়া আমরা জীবনকে, আমাদের কর্মকে ঘৃণা করিতে সুরু করিলাম; কর্মকে ফাঁকান ত দূরের কথা, তাহার গোড়া খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিতে চাহিলাম।

মনে এই ভাব থাকিলেও বাহিরে সত্য সত্যই সংসারের যে বিধাই হইয়া পড়িল তাহা হল—"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।" তবে ফল হইল এই,—প্রথমতঃ, কর্মজীবনের মধ্যে থাকিয়াও কর্মের প্রকৃতি আমাদের দুর্বল নিস্তেজ হইয়া আসিল, একটা নিজীব অবসাদ আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। দ্বিতীয়তঃ, কর্মজীবন আমাদের থাকিল বটে, তাহা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই, তবে তাহা থাকিল একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, খণ্ডভাবে, ছোট ছোট কাজ লইয়া, জীবনযাত্রা বাহিরা পড়িল একেবারে পাকীর মধ্যে, পক্ষপুটের বৃদ্ধিগুলিই একমাত্র সত্য হইয়া উঠিল—কর্মের বৃহৎ আদর্শ সব আমরা হারাইলাম, ব্যাবহারিক জীবনে সত্যিকার সফল প্রয়াস আমাদের লোপ পাইল, নিজের ও নিজের পরিবারের দৈনন্দিন অভাব মোচন প্রভাবে মিটাইয়া চলাই আমাদের লক্ষ্য হইল—ইহারই নাম প্রাকৃত কর্ম। জীবনী-শক্তির যে সকল মহিমময় ধারা, যেটি আমাদের কাছে অপরূপ হইয়া পড়িল নিজের ক্ষুদ্র প্রাণে যত পড়, পরম সত্য হইয়া উঠিল—ক্ষুদ্র মেহ, ক্ষিদে, ঈর্ষা আর আহার-নিদ্রা-মৈথুন ইহাই জীবনের সকল অর্থ।

চিত্তের ভিতর হইতে এই যে প্রাণশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল, বাহির হইতেও তাহাকে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলা হইল। কর্মধারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা করিয়া দিল—জীবনের প্রতিমুহূর্ত কি ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। আটঘাটবন্ধ বিধিনিষেধে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন প্রতিপদে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। বিদ্যা ও মৈথিলিক কর্মের যে সব আদর্শের কাছিয়া ছিলেন তাহার একান্ত অনুগত হইয়াই জীবন-যাপনে চলিতে হইল, সমাজের অত্যাচার ও অনাচার ভয়ে তাহার একটুও এদিকে ওদিকে চলিবার সাধ্য আমাদের রহিল না। প্রথমে মনে হয় যে বিধান ছিল সমাজের পক্ষে সুশৃঙ্খল পৃঙ্খলা, পরিণামে তাহা বাড়িয়া বাড়িয়া বাহ্য পৃঙ্খলে পরিণত হইল। কিন্তু জীবনের জীবন্তধারা শাস্ত্রের সূত্র অনুসারে চলে না, চলিতে পারে না। জীবনের আছে নিজের ছন্দ, সে সদা নবে নিজের নিয়ম। যে নিয়মাবলী এই ছিন্নের ছন্দ ও নিয়মের তোয়াক্কা রাখে না, তাহাকে দিয়া জীবনের সহজ সহজ প্রকাশ হয় না, জীবনের রেশ তাহাতে পলে পলে হারা পাইয়া ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা-কর্তারা সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য এত খুঁটিনাটি নিয়ম পর বাঁধিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে যে জীবনশক্তি তাহার সহজ আনন্দের পথ হারাইয়া একটা নির্জীব অভ্যাসের তাড়নায় কেবল চলিতে লাগিল। ফলে, আমরা প্রাণহীন হইয়া পড়িলাম, আমাদের জীবন

হইয়া পড়িল কয়েকটি মুখ-চেনাই। ভাবখানিতে যেন মনে হয় উহারা স্থায়ী হইয়া চলিতে কিছু চাহে নাই, একটা সংসর্গের দায় কিছা হারার ভয়ও যেন আছে। চাহিয়াছিলাম—কিন্তু প্রথম প্রথম তাহাই হইত, ক্রমে ক্রমে দেখে আসিয়া বসিয়াছিলাম—বন্ধুদের মধ্যে বুঝিতে কি প্রকারে ঘটটা বাদ দেওয়া হয়, বিয়োগের মধ্যে কি ধরনে যোগফলের বৃদ্ধ্যাবস্থির অবকাশ রাখা হয় সেই চাতুর্য, সেই 'কর্মকৌশলম্'। *

ভাবের যে ভাষার প্রাধান্যটি হয়াইল এই তাহার দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয় কারণটির কথা এখন আসিয়া পড়িল। তাহা হইতেছে ব্যবসায়ের—শ্রেণীবিভাগের তৃতীয় সত্তা হয়—যাহার হাতে ভাবের সততা সংরক্ষণ বিশিষ্ট বিধিত হইয়া পড়িয়াছে। ভাবব্যবসায়ী আমরা আমাদের, এই আমাদের গৌরব। কিন্তু বহুতর কারণসমূহের একখানা দিনিয়া যে ভাবব্যবসায়ীকে সৃষ্টিয়া তুলিয়াছে তাহার উল্লেখ নাই,—ভাবের ধনি কিছু আমার থাকে, তবে তাহা বলে না, বিদ্যা-দীক্ষায়—ধনির যে বিদ্যা-দীক্ষার মধ্যে আমোদের অনেক বিদ্যা-দীক্ষা মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে। তাহার যখন জীবন্ত শক্তিমান ছিল ছিল তখন সেই জীবন ও শক্তি যে আবেগখানি সাহিত্যিক প্রতিনিয়ত নূতন বন্ধের, নূতন প্রাণ-ভাবের আবদানি করিয়া। কিন্তু সেই ভাষির যখন ধরাই মৃত হইয়া মৃতদের হইতে লাগিল, একই ভাষির মধ্যে আমার নানা উপ-ভাষির সৃষ্টি হইল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান, বিবাহ সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল, তখন সকলের রক্তের জোর হ্রাস পাইয়া চলিল। রক্তের শুচি বজায় রাখিবার প্রয়োজন সময় সময় হইতে পারে বটে। একটা মৃত ছোট ধনি বিদ্যা-দীক্ষায় আকৃতিতে-প্রকৃতিতে যার একটা বৈশিষ্ট্য, তখন সেই বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অন্যান্য ছোটর সমাজে একটা অন্তরঙ্গতার ভাবকে আনিয়া চলা প্রয়োজন। কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম বা ভাবসীমাকে এই বন্ধনে অনেক দিন জিয়াইয়া রাখা চলিলেও, চিরকাল বন্ধন রাখা সম্ভব নয়; কালে তাহাদের অবলুপ্তি ঘটিবেই। তা ছাড়া, একটা বিশেষ গুণকে যাহাতে চিরকাল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা উচিত নয়; কারণ, সময়ের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরাতন ভাবসীমার সার্থকতা কমিয়া যায়, প্রয়োজন হয় নূতন ভাবসীমা, যুগধর্মানুযায়ী বৈশিষ্ট্য। শুধু ভাবনার ধারিয়ে ভাবের, তখন হয় আত্মাভিমান ও গৌরবাবোধ পরিচয়, তাহা লইয়া চলে আত্মপ্রচার পরে।

সমাজের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা আকৃতি-প্রকৃতি হিসাবে একটা মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ, এমন কি স্তর-বিন্যাসও চলিতে পারে। মানুষের স্বভাব ও প্রয়োজন আসলে হইতেই সেই দিকে ঝোঁক, বাঁধন বিশেষে যে নিয়ম-শাসন বাঁধিয়া দিবার প্রয়োজন আছে তাহা বোধ হয় না। কিন্তু আজকালকার আমাদের সমাজে যে একটি দেখিতে পাই—বর্ণে বর্ণে মূলের মধ্য, প্রত্যেক বর্ণের অন্তর্গত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মানুষ চারিদিকে এক একটি অভেদ প্রাচীর তুলিয়া রেখা হইয়াছে—তাহার ফলে হইয়াছে এই যে সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র আমাদের অতি সঙ্কীর্ণ, দুই চারিটি পরিবারের মধ্যেই পুরুষানুক্রমে যাহা কিছু আদান প্রদান চলিয়া আসিয়াছে। একই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পুরাতন খাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতে চলিতে রক্ত তমস হইয়া গিয়াছে প্রায়পক্ষি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

এই সমস্ত কারণের মোট ফল হইল ক্রমে ক্রমে সমাধীনতা। সমাজে সকল সত্যের যতটুকু যা প্রাণ ছিল তাহা নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল পরাধীনতার চাপে। ভাষার ভাষায় উপর এই হইল—Coup De grace—মৃত্যুঘাত।

* আমরা বলিয়া থাকি, তাহারা এই 'কর্মকৌশলম্'—এই কথাটি বিশেষভাবে পরের বাহাদের সম্বন্ধে, কিন্তু কথাটি নিজেদের প্রাণের মূল কথা অভিধেয়। কথাটা অনেক সময় ভুল যায়। কিন্তু আমাদের সমস্ত আদানপ্রদানের আসল সূত্র সঙ্কীর্ণতার চলিতে নিজ মধ্যে যে আমাদের ভাষা চলিত মর্মে হইত না, নিজেরা নিজেদের আপনার মত করিয়া আমরাও চলিতে—আর আমাদের চলিতে বহুদূর পর্যন্ত না হওয়া ইহার চলিত পরিধি ছোটমত নিজে অনর্থ হইত, এমন নয়। যা হয়া এই 'কর্মকৌশলম্' বহুদূর উপরের চলিয়াছে, জীবনীশক্তিকে অনুকূল বন্ধ করিয়া এক ভাষা বাঁধিয়া নিজেরা আমাদের সেই অবস্থাই করিয়াছে।

উদাসী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী—কলিকাতা

মোর মন জানেনা মনের মানুষ,
কত খোঁজনা খাঁখি,
আমি তাই চারিদিক দেখে শুনে'
উদাস হয়ে থাকি ;

আজ যাহাকে ভালো লাগে,
কালকে সেবে' বিরাগ জাগে,
পরশ তারেই দেখে' ভাখি—
সেথায় আছে ফাঁকী !

আমি তাই করিনা সঙ্গ কারো
প্রাণের মাঝামাঝি ;
মোরে ডাকে, পাশল বুঝি,
সবা উদাস খাঁখি।

আমি মনের বিথা গাইনা বুঝে',
কোথায় যে তার ব্যথা ;
মোরি, এক সুরে সে এক-এক সময়
বলে এক-এক কথা !

ভালো কেনার ব্যগ্রা-পাশে
কভু-বা সে মুচকিয়ে হাসে,
আঁখির কোণে কভু-বা তার
ঝলকে বর্জনাশা

সারা অঙ্গ ভরি' যখন-তখন
মোদের যাওয়া-আসা ;
ঠিক্-ঠিকানা পাইনা ত তাই,
কোথায় যে তার বাসা !

আমি তাইতে সবার মনে মেখে
সকল সমবায়,
মোর স্বভাব যে তাই, বলে সবাই,
পাগল সন্ন্যাসী !

সকল জনের স্বজন খুঁজে',
নয় থাকি কোথাও বুঁজে',
আপন মনের গোপন তলে
পাই যদি তার ধারা।

মোরি সেই অতলে ডিঙে যদি
সত্যিকারের সাড়া—
বলুক লোকে, যেমন খুশী,
উদাস সন্ন্যাসী !

রাজওয়াড়ার মুলুক

শ্রীমল্লিকুমার হালদার—লক্ষ্ণৌ

(১ম খণ্ড)

বি, বি, এণ্ড সি, আই রেলের বিটীয় শ্রেণীতে একলা চলেছি। রেল খুব চলল তখন "জয়পুর" "জয়পুর" চীৎকার কানে গেল; চোখ মেলে দেখি, রেলগাড়ীর আলো ফিকেটি হয়েছে, লাল্লগুলি। গায়ে দেখা যাচ্ছে। নাম ভাল পড়া যাচ্ছে না। দুনিয়া যেন ঘুমচ্ছে!

ভাড়ার মাড়োয়ারী পাশেরী-দলা তুলিয়ে তাড়াতাড়ি আলবাক্সের গাড়ী থেকে বাহির ছাপড়া গাড়ীতে চালিয়ে দিলে। ওদলাতের আরম্ভ, মাড়োয়ারীদের পরিচয় ব্যবসায়ের ধনী এই হিসাবেই—দুনী-মাড়োয়ারী এই প্রথম দেখলুম।

সকাল তখনও হয়নি। সমস্ত ধরণীর গায়ে আঁধার লেগে আছে—সব বিমলক—যেন অন্ধকারী রাত্রির মত ঘুম ঘুম! ঝিমুতে ঝিমুতে চুলুতে চুলুতে গাড়ীর জানলার ঘাড় বাড়িয়ে দেখতে দেখতে চলেছি—অন্তর ভিতর কোনো কথাই যেন আসছে না—যেন সব ভাবা। কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, কিছুই ভাবি না! যেন কোনো অদৃশ্য লোকে নিরিবিলে টেনে নিয়ে চলেছে!

এঁকে বেঁকে মাঝে-মাঝে রাস্তাটা চলেছে—দু'পাশে ঘুমুতে অশথের জোপ আর কাঁকড়া-চুলো বাবলা. ঝাঁটার গাছগুলো ঘুমে-পাগল মনের ঘুমন্ত খেয়ালের বুকে যেন কাল জড়ছেয়েছে। সব মেখানে।

মাঝে মাঝে থেকে থেকে কখন কখন গরুরেদের উৎসবের কথাগুলো মনে উঁকি মারছে "আজ রাজওয়াড়ার ঘুমুতে যাব, সর্দারা সিঙের উপর একটা গরুরে। চাদ্দার চাদ মেরে রেখো—আর কোনো কথা কানে দিও না।" (আমি যখন প্রথম মাড়োরী মুলুকে আসছে যাই তখনও এরূপ আর একটি মজার উৎসবে তিনি বিরোধিলেন "ওখানে যেয়ো না—সর্দারা বিয়েকে রাত্রিরাতে ছেড়ে রাখবে সঙ্গে কাল করবে।" তাই আমি আমার রাখবের "নাইর মশাই" বন্ধুকে লিখি, 'কাল' বন্ধুকে লিখিয়েছিলুম, মাইর কথা শুনলে পাছে মনে অহরার আসে।)

হঠাৎ একস্থানে রাস্তার উপর লাফিয়ে একজন লোক "রোকো রোকো" ব'লে গাড়ী থামিয়ে দিলে—আমার তখন চমক ভাঙল। গাড়ীর ভিতর থেকে "কা হায়, কা মাংতা" বলে উঁকি দিলুম। যেন বৈতালপুরীর বাণী গলা ফেলে ফেলেছে—সরকারী রাস্তায় চলতে এমন বাধা পেতে কখনও হয়নি। গাড়োয়ান বলে উঠল "ঘীয়ে গুষ্টি মার্ব—মাতাল যেন হোগা।" চিরকাল মাতাল হেলে আসিয়েছি—এ অভ্যাস এই প্রথম।

এবার কিছু কিছু কথা হয়ে এল, পরে থেকে থেকে মনুষের হড়াহড়ি দেখতে পেলুম। রাস্তাঘাটে এত মনুষের হড়াহড়ি আর কোথাও দেখা যায় না। রাজপুতানার ধূলায় ধূসরিত ধরণীর অঙ্গে মনুষের মলিন অবয়বগুলো পোষাকটি যেন বেমানান করছে।

সমস্তটা রাস্তাপাশে ধূ'ধূলা সমান উঁচু, ঢওড়া আর ঢেউ-খেলানো খোয়াই পাসিয়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে ঘোড়ার-গাড়ী ঘোড়া তার নীচে দিয়ে অবাধলে পার হয়ে যেতে পারে।

সাদেনিয়ার বরওয়াজ, হাতিপোল বরওয়াজ, আজমেরী বরওয়াজ, সিলোদিয়া বরওয়াজ, এমন গুটি ঘোরা বা বেউড়ি পার হয়ে এই। আমার পায় হ'য়ে ক'ল, আজমেরী গায়। এক্সেস গায় থেকে অবসর খুবই

চকচকে, দু'পাশে উঁচু মাচার চলার 'ফুটপাথ'; এগুলি সহরের অভ্যন্তরে একটা চৌমাথায় এসে মিলেছে। এই প্রত্যেক চৌমাথায় একটী করে পাক। এই পাকে বসে বসে অলস লোকেরা দিনের পর দিন কাটাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে একই ধাঁচে বৈঠকী বাজার। রাস্তা কিন্তু খুব — সবই মাঝারী — অতি বিলেতীদের চোখে সয়ে। মাঝখানটায় সোজাসুজি একটা পরিষ্কার রাস্তা চলেছে যে অপর দেশের লোক সেখানে সহজে দিশা খেই পাবে না। পাল্কী, যাত্রা, গরুর গাড়ি প্রভৃতিতে সোজাসুজি করে পরস্পরের মুখে যেন মুখোমুখি হ'য়ে যাচ্ছে। এত ভিড়ের প্রাচুর্য্য আর কোথাও আছে কি না জানি না। ইউরোপে মহিলারা আজকাল ভিড়ের চর্চ্চা করলেও তাঁদের পোষাকে। কিন্তু তাঁরা ভিড়ের মিশেই যেতেন, সবারই চোখে পড়ে যেতে না, কিন্তু এরা ভিড়ের বিভিন্ন সমাবেশের দ্বারা উজ্জ্বল ক'রে তুলিবে তোলে। রাস্তার মেলা যার ফুরায় 'মহাজনে'র গরুর, তারা জমায়েত করছে—ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাই

মাদুরাইয়ের প্রাচীন মৈনাক-মন্দির—ভাস্কর্য।

সহরে দিন রাত ধাটে সহরের লোকের ভিড় কাপড় যোগাচ্ছে।

এ সহরে চুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে, বেশভূষার এবং সহরের সমস্ত বাড়ীঘরের সোনালী আমেজে আর চোখে পড়ে এদের মেয়েদের সবার কিম-বাম-যাদি উজ্জ্বল; গড়ন মোটার দিকে খুব ঘুরে নেয়া। কথা কইতে "আমে যা যা যা—রে রে, আমে—আমে—রে রে রে" এই এক সুর নাকান খাচা ঘুরে ঘুরে শুনতে দিবারাত্র; পরে যখন একবার মাথে চোখে ফিরে কলকাতায় যাই তখন সেখানে গিয়ে মনে হয়েছিল কলকাতাটা কাঁদছে—এমন ধান ভানে ভুনে অভ্যাস হোয়ে, কলকাতা যেতার নীরব নীরস ব'লে মনে হওয়াটা আশ্চর্য্য কি!

সহরের এই বিশেষ ঢাঁচে চলা সোনালী বাড়ীগুলিতে পাথরের আসিবার ছোট ছোট আলসা দেওয়া আছে। আলিসার ধরাকরগুলি পাথরের যা চুনের বৈচিত্র্য—অ্যাথিনিক প্যাটার্ণের চূড়ান্ত আদর্শ। এঁকে বৈচিত্র্যের খুব আছে। কখন কখন ঘুলঘুলির মত চৌকোণা ছোট

যোটা দরজাগুলে মোটা-মোটা মেয়েদের মুখটুকু বা তাঁর হাতখানার অংশটুকু মাত্র দেখা যায়। দুয়ারের ফাঁকে চিত্রের দৃশ্যাবলী ভীষণ হয়ে ফুটে ওঠে। কখন কখন ফাঁকে যা মাত্রপুর চিত্রে যেমন চিত্র ঘাঁটা চলার সময় মেয়েদের ছবি ঘাঁকা থাকে—মুহূর্তের মধ্যে দূরে করতে (বাস্তবিক চিত্র) ও মধ্যাল হাতে পথ দেখাচ্ছে—এখানে যেমন তেমন প্রতিবিম্বটাই চোখে পড়ে।

দাড়িয়ে ঘুরে মোরা প্রথমে যখন ঘর আসছে যে তখন বৈকল বন্দিদের বন্দির মধ্যে মধুরাত্রি চোখে ফুটে ওঠে। তাতে ক'রে বাজার গাড়ী মোড়া কো মুলিয়ে যে যাবে স্থির করতে পারে না। প্রত্যেক বাজার একটী করে খুব বড় মন্দির আছে। মন্দির বাবরা এখানকার লোকের নৈমিত্তিক বাজে—ঠিক ওরকমটা বিলাত যাওয়ার মত।

যাই হোক, আমার অনুমতি প্রত্যেকের পর বিদি ।'ল নগরের মধ্যে শিল্পবিভাগের পাশেই একটী আস্তানায়। অফ্‌সারের গাড়ী মোড়া না থাকলে বাজনরকারের ইজ্জৎ থাকে না জেনে তাঁর করতে হ'ল। আমি অনুমতি দেখানোর পর বিদায়ে 'সুবাদারের', আমার এইে বিদি বিদি

অন্ধী মাজুরের পথ—অনুপুর।

এখানকার রাস্তাগুলি খুবই বড় বড় আর তার নীচে পর্য্যন্ত বিঁধি দিয়ে মেরে দিয়ে জল দিতে হয়। ফুলে-ফলায় দিয়েই মেয়েরা সেখানে যত্নশিল হয়। পাড়াগাঁয়ে যেমন সুপুরঘাট, জলবাজার যেমন জলতলা, এখানকার সৌরভ "বাউলী" বা কূপ।

রাস্তার পথের বাজখানে সেখানে সেখানে এক একটা চাতুর মেরজার আস্তানা বা ঘটনায় বাঁধান আছে। তাদের 'নাচেরদুয়া'—এই রাখে পর সেই চাপরাশী পথায় পথপ্রান্তে মেরে দেয়। এখানকার রাজনরকারে চাকরী করতে হলে নগরকারের ইজ্জৎ বাঁচাতে হয় অনেক রকমে, প্রথম হচ্ছে অফ্‌সারের স্ত্রী সর্বদা অনুধাবনতা হয়ে অন্তরে বন্দী থাকবেন। যদি কখন গাড়ী করে অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে দেখা করতে চান ও গাড়ীখানিকে কাপড় দিয়ে পুঁটুলি করে মেরে নিতে হবে—বাইরে রাজার ইজ্জৎ

হয়! রাজপুতানা এবং মাদ্রাজ-বিদেশ ছাড়া আর কোনো জায়গাতেই সেখানে সন্ধান মালাই নেই। বড় বড় ধনী লোকের বাড়ীর সামনে এক-আ খানা ও ঘরি ফড়ফড়া এঁটে ঘোড়া দিয়ে যান গাইতে গাইতে ভিড় ঠেলে চলে যান আর কোনো ঘানা বা যাবা নেই।

এখন যান-বাহনগুলি ভারি বিচিত্র! খুব জমকালো লাখা ঘরের কাজ-করা চুড়োওয়ালা 'রথ'—বড় বড় বলদে টানে। বলদেরও গায় সোনার খুব দাম, নীল, সবুজ, কখন কখন ওড়নার কিংবা ফুলঝুরি দিয়ে ঢাকা। তাদিকার সোনালিয়ার রাজের উপহার-করা-পাওয়া মোটরে তিনি নিজেকে চড়েছিলেন ব'লে শুনব শোনা যায়।

মহিলাদের স্বাধীনতার বেশ, সুযোগও যথেষ্ট আছে বলে মনে হয়। কেননা একবার দেখেছিলুম আমাদের গাড়ীর ঘোড়াদের একটি "জিমন" অর্থাৎ ছোট চলছিল। ছোকরা একাকারে প্রথমের সব বাধা ঘুচে যাবার দিয়ে দিয়ে চলছিল। ঠিক সেই সময়ে একজন মাইসিনের মিসিয়ার যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর মাইসিন থেকে গাড়ী ক'রে দিয়ে আর ঘরে থেকে পান

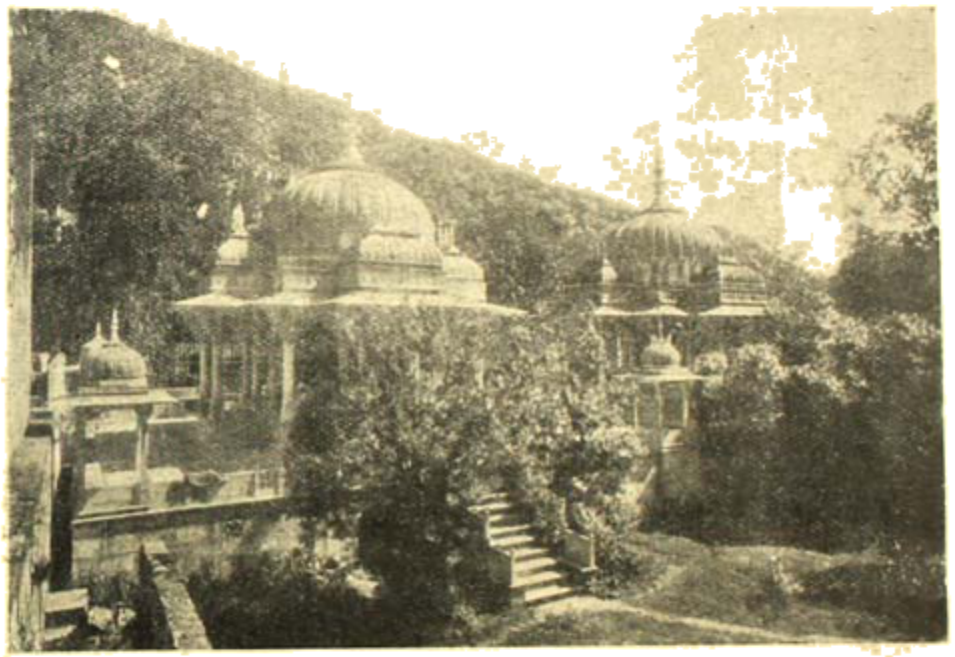

সোনাটোন ছবি— চন্দন।

চেন বিয়ে ফরাসীদের মুখে দিয়ে স্বাস্থ্যপ্রবনে সবাই ভয় ভক্ত চলেন। মোটরগাড়ের মুখে চেহারাদিকে দেখলে মনে হয়ত বছর পিছিয়ে গেছি ব'লে মনে হয়। আজকাল শুধু মোটরগাড়ী পথে-ঘাটে দেখা যায় কিন্তু পরলোকগত রাজা মহেন্দ্রসিং নহরের মেটরির মধ্যে তাঁর মোটর চুকতে দিতেন না বা নিজেও চড়তেন না। তাঁর প্রায় ৪০।৫০ বছরের রাজত্বের পর, যারা যাবার কিছু পূর্বে মা, পথ বন্ধ—গাড়ার ঘোড়ের জিমন চলতে। তিনি অবস্থা গাড়ী একটি লোকানীর জিম্মায় রেখে অন্য রাস্তা দিয়ে কোনো ক্রমে বাড়ী ফেরেন। ছোকে অর্ধ রাত্র ব্যাপী চলল—মিসিয়ার সাহেবের গাড়ী সুরক্ষা সে রাত্রির সেই রাস্তার গায়ের তলায় প'ড়ে রইল। জিমন বন্ধন হয় তখন রাজপথ বন্ধ ছিটিয়ে পাত পেতে সবাই খান খায়—ঘোড়ের বন্ধ এক দিকে আলাদা জায়গা

কানাং থেকে খাদের আর দূরত্বের আলাদা। বুদ্ধারা বড় ঝাড়া ও পরিবেশন করেন, যুবতীরা ঘনঘোরে ঘোরাফেরা ক'রে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায়। পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই গানের সুরে আলাপ তথা ছড়ায় ছড়ায় গান আরম্ভ হয়ে যায়; আবার যে যখন খাবে তখন তাদের মুখ বন্ধ থাকে আহারে ব্যস্ত। আহারান্তে যদি গান আরম্ভ হয়—তা' রাত শেষ নির্দিষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বাঙালীদের কেউ বন্ধুর মেয়েরা ভ্রমণে এসেছে আপনাদের হাতে ছেলেদের ভার। রাজার হুকুম—কেউ হারাবে থেকে থাকীর জন্যান্যদের সামনে এসে যদি পড়ে ও আমি তার হাজা বন্ধ করে দিতে হবে। শুনে যে, একজন বাঙালী মহিলার মাসীমার (অর্থাৎ মাসীর) শ্বশুরবাড়ী, তিনি হাজা না হয়ে তখন তাঁর চাকরী ও বিয়েছিলেন, তা-হলেও সাহসের সীমা ছিল না। রাজপুতানার লোক হোক ছাড়া বড় কথাটা যে কত বড় সংযমের দরকার তা' বুদ্ধিমতী মাত্রই অনুমান পারেন

মহারাজার শোভাযাত্রা—জয়পুর।

৩০০ উপর কত আছে তা' কারুর জানা নেই। তখন হাসবার এক অদ্ভুত রীতি আছে। এক এক রাণী সহরের এক এক ঠিকানার জন্য সম্বন্ধ ক'রে থাকেন। তাঁদের জন্য নানা পাকড়ী ও আচকান পত্র লোকে পাঠায়। পানু খাওয়ার জন্যানো পাঁকে ক'রে মশোর কলসে (যাদের লাল কাপড়ে ঢাকা থাকে) জল নিয়ে যায়। সেই জল দেখা করবার জন্যে সারি সারি ১০ জন মশোর

'পিকনিক' দ্বারা এখানে একপ্রকার picnic হয়। ঠিক মেলার মত। অনেক দূরে যেখানে বেশ ছায়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পায় সেখানে সবাই মিলে জড় হয়। মেয়েদের দল একটা group, পুরুষের দল আর একটা group এসে পাশিয়ে 'পিকনিক' জোর চলে। মেয়েরা দু-তিন দল পরস্পর পরস্পরকে উৎসব করে যোগ পাশিয়ে বসে গান করতে থাকে। গায়কের

কলার ধারে তাদের পোষাকের ওপর একটি আলখা সংযোজন হয়। সেরূপ প্রাকৃতিক পোষাক পরে যার থাকবার মানুষের পোষা আর বড় কোথাও দেখা যায় না—দূর থেকে দেখতে গাছপালার ফোলে কৃষ্ণকলি ফুল যেন ফুটে আছে বলে মনে হয়।

এরপর উৎসব যেমন সবাই মিলে করে, তাদেরও আবার তাই পালিয়ে। বাড় বৃদ্ধি হ'লে পাড়ার মেয়েরা সব একটা নির্দিষ্ট গাছের তলায় এসে প্রথমে সমবেত হয়। অনেকে ছাতা করে এমন সব অনেক মেয়ে বাড়িয়ে থাকে। এই সব মেয়েরা সবাই মেঠে সুরে মাথা নীচু করে বাড়িয়ে (বিনা আলাপে) বসবে—আর একজন প্রধান সে কাজার ঘুরে ঘুরেই সবার ঘাড়-মুখে হাত করে কাঁদতে থাকবে। দুর ব্যক্তির যা কিছু ভুল ত্রুটি বা ছিল সব ঘোষণা করে কাঁদতে থাকবে। তার সেই গানের উপর কাদের মিটি মুখের তার নীচে কান্নার সুর। জোর গানে এমন একটা সকরুণ দেখলে গানের রসিক কোনো অসুখ পুরীর কথাই মনে আসে। পোনা যায় যখন মহারাজার মৃত্যু হয় তখন সব পুরুষ-বাসীদের এইরূপ ভাবে রাজার বন্দোবস্তের করে কাঁদতে হয়। তাছাড়া রাজার আদেশে সব পুরুষকে মস্তক মুণ্ডন করতে হয়। এটা একটা compulsory ব্যাপার। মাথো সিং রাজার আদেশে জোরের ছাল এক বাস করে তৈরী হয়েছিল। সব যোদ্ধাই তবে মাথা ও মুখে পায়ে করে তেল তেল আরক তৈরী করা হয়েছিল। তারপর সব মেটেরী মড় করে সারা সহরের রাজপথে ছোট কি ছোট কি বড় সবাইকেই সেই সব উৎসবাদি করতে হয়েছিল—এটাও মাথাভাঙ্গুনক ব্যাপার!

রাজার আদেশে মাথাভাঙ্গুনক মাথা ও কামানো যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার, রাজার বিবাহে এক মাসের বেতন ছোট বড় সবাইকের কেউ নেওয়াও এক অপূর্ব প্রথা আছে। তবে যারা রাজার বিবাহে মাথায় যান তাঁদের বক্তা পক্ষের নিকট পদমর্যাদা হিসাবে মাত্র একটি হাতির দাম অর্থাৎ হাজার টাকা, আর দু'টি ঘোড়ার দাম অর্থাৎ পাঁচ শ' টাকা এই প্রকার দাম হয়ে থাকে। বিবাহে যৌতুকরূপ যা পাওয়া যায় তা' আমাদের সঙ্গে বলবে করা গল্প যাবার।

দুর্গাদা কি যৌতুক পেয়ে আমি না। মাথাভাঙ্গ রাজার বিবাহে আমি সেখানে যাবার এক মাসের বেতন কাটার মত হাতে হাতে অনুভব করেছিলুম। মাথাভাঙ্গ রাজার বয়স ১৩।১৪ বৎসর, বিবাহ করলেন মোক্ষদা মাজার্ঘিরিকে—তাঁর বয়স ৩৪ বৎসর। আশ্চর্য ব্যাপার! যৌতুক রূপে বিবাহে মোক্ষদাকে সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে হ'বে বলে এইরূপ অস্বাভাবিক বয়স স্থাপন করতে সে দেশের বড় বড় পণ্ডিতদের বিধান দিয়া নেই তাঁরা এই বিবাহকে শতাব্দীর অনেই মনে করে থাকেন।

বিবাহের পর কর্তব্যাদের বেতন কাটাতেও বিরাম নেই। রাজার বিয়ের বিশেষ ব্যয়ের বাবদ 'নজর' মুরোতে। তোপখানা এসে আমার মাসের সবকারী খাতের পাশ ও নম্বর দিয়ে গেল আর ঘরে গেল "তৌলদ" দোকান ক'রে গেছে প্রাসাদের মধ্যে বেগমদের পাশের পাশের ঘরে সভা বসল। বিলিতি ধরণের মিলনী কন্যা ফেল্-কেটের প্রভাব চোখে ছোট্ট সিত্ত মাজা বসলেন। তাঁর ভাইনে বাঁয়ে 'ইঙ্কং' হিসাবে চেয়ার পড়ল। সবশেষে মিশি মোক্ষদার বিলাতি পোষাক প'রে মাজা বিসেন। আর দাসপ্রাসাদের বেটেরি ভিতরেই যাবার চুপি বা পাদুকা পরতেই হবে—খালি মাথায় যাবার হুকুম নেই। বাঙালীরা যারা কলুকে তাঁর কলুকে যান বা বেড়াতে যান তাঁদের জন্যও বিশেষ মাথার অন্তর্বাস পরা একটা বাঁধতে হয়।

রাজার বক্তব্য সমবেতাদের হিসাবে বেশী কম আছে। তথাকথিত 'আরুলাহি' অর্থাৎ বাড়-বাঁকা বাঁকা বাঁকা বাড়-জোড়া বিশেষ টাকা আছে সেই টাকা বিলাতি টাকা (অবে হয় বলে কলকার বলে) অপেক্ষা ৴০আনা বেশী দাম। এই আরুলাহি টাকাতেই বক্তব্য দিতে হয়। রাজাকে তুলিয়ে ক'রে হাতের উপর হাত রেখে তার উপর কপালে টাকাটি ধরতে হয়—রাজা সেটি তুলে নিয়ে পাশে একটি থলেতে ফেলে দেন। টাকা রাজার সেবকা

হলেই তাঁকে খুশবায় খুশিদ করে শিল্প হাই ব্যাপারে ফিরে যেতে হয়। প্রত্যেক লোক যিনি তাঁর কাছে আসেন আর নজর যেন তাঁর নামে ও পদটা রেখে রেখে একজন রাজাকে তুলিয়ে দেন।

আমার গোলাম তখনে নিয়ে এক নজর-বিয়াট হয়েছিল। কোনো বিশেষ একটা মজলিসে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। সেখানে ইংরাজ রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট, এবং বিশিষ্ট ছাড়া বড় বড় মুসলমানেরাও সভাস্থল এসেছিলেন। তখন আমার পরিচিত বন্ধু হুসেনবাবু

কথা বলতে-না-বলতেই, হঠাৎ কতের মত রাজার মোটর উদ্যানের সামনে এসে হাজির হ'ল। সাহেবরা এবং প্রধান মুসীরা তাঁকে সম্বর্ধনা করতে উঠে গেলেন আর বাকী সবাই দাঁড়িয়ে হয়ে পথের দুপাশে দাঁড়ালেন। হুসেনবাবু ও আমিও সেই পংক্তিতেই দাঁড়ালুম। একটি ছোট্ট মাত্রওয়ালী ছেলে ফৌলুসার হাতে পরে হাসতে হাসতে মোটর থেকে নেমে সেই এসে আর ছুটো ছুটো সর্দার প্রভৃতি সবাই দুহাতে কুর্নিশ করতে আরম্ভ করে দিলেন—আমার হাসি

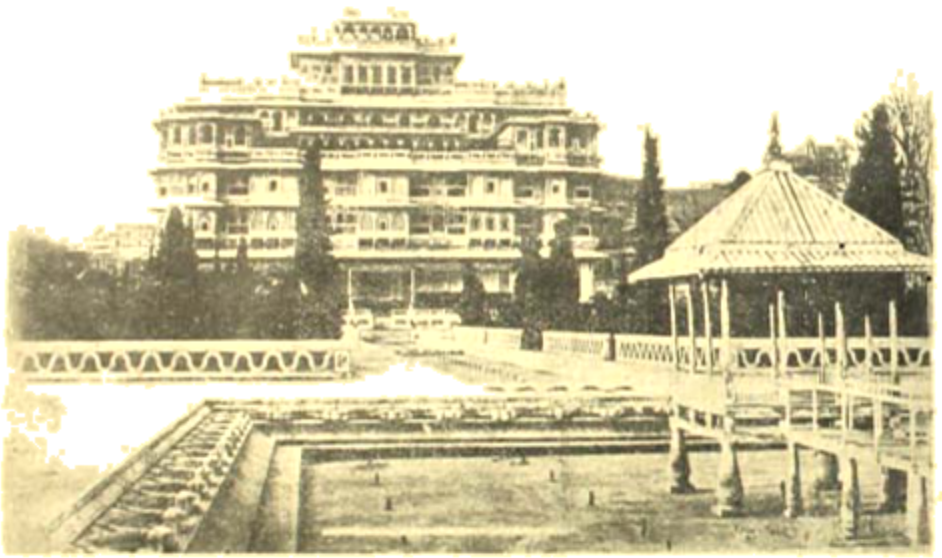

মোগল বাগান—কাশ্মীর।

করল "মশাই, তাঁরা এখানে আসবেন বোধ হয়, আপনার কাছে কাগজ কিছু আছে কি? আপনি নতুন এসেছেন কিনা, রাজাকে নজর না দিয়ে কোনো কর্মচারী এখানে থেকতে পায় না—এই হ'ল এখানকার প্রথা।" আমার কাছে অবশ্যই ইংরাজ সরকারের ছাড়পত্র ছিল। হুসেনবাবু বলেন "এখনই হয়ে যাবে—বন্ধির দুহাজারের হিসাবে আপনাকে এক রেখে কিছু বেশি দেখাই ভাল।"

দেতে লাগল—মনে হ'তে লাগল কোনো ছোট্ট মজিনের হচ্ছে—তাই বেশটি। হুসেনবাবু সেলামের পালা শেষ হতেই তাঁরা সবের আমার হাত সজোরে ঝাঁকিয়ে ওখানে বন্ধুত্ব বেঁধেছেন। আমি একে চিরদিন বাঙলার কবির আমাদের বাস করে এসেছি—কি ভাই, কি কবির সবাইকে বলে 'নমস্কার,' বা shake hands এই ভাব করতে জানি। আমি রাজার সামনে গিয়ে যে কি

করব কোথেই দেখুন না। দাঁ করে চোট হয়ে সবার দেখিয়ে টাকা দুটো বেই রাজাকে দিয়ে যায় অমনি আমার ব্যাপার দেখে মুহূর্ত বড় বড় মাথাকে ঝিলে ধপ্ করে আমার হাতটা চেপে বললেন—রাজাও হাতটা উল্টিয়ে আবার ওটিয়ে নিলেন। তখন আবার সুবোধবাবু পুনরায় আমার হাতটা কাত করে বেই বাকেন অমনি রাজা বেশে টাকা দুটো তুলে নিলেন। আমার মনে হয়েছিল আর সুবোধবাবু মহারাজের কাছে কথা চাইলেন। মহারাজ "আরেকা থেকে প্রথম এসেছেন বলেছেন কথা এঁর জানা নেই।" রাজা শুনে পুনরায় হাসলেন। তারপর থেকে যখনই মহারাজ আমার দেখতেন তখনই হাসতেন—কি জেনে যে তা' বলতে পারি না। বোধ হয় তাঁর সেই অদ্ভুত নজরের কথা মনে পড়তো।

এখানকার লোকেদের ধারণাটি অন্য। সবাই রাজ-দর্শনকে এক মহাপুণ্য বলে মনে করে। রাজা যখন সাধারণের সামনে উপস্থিত হন—প্রায় তিনি অন্যান্য-স্ত্রী-পরিবেষ্টিত প্রাসাদের ভিতর লুকিয়ে থাকেন। যখন তিনি বার হন তখন এক প্রকাণ্ড মিছিল ক'রে রাজপথকে হাতীর পিঠে সোনার রাওয়ায় করে। প্রোভাগে উটের পল্টনের সার, তারপর ঘোড়ার, তারপর পদাতিক সৈন্যের। তারপর বড় বড় অমাত্যেরা যেমন, তারপর রাজার হাতী সোনার গহনায় মুড়ে যেমন। রাজার হাতীর সঙ্গে আগে পিছনে রাজার ভাই প্রকৃতির বা খুব বড় বড় সর্দারদের হাতী থাকে। রাজার হাতী চেনা যায়, একজন হাতওয়ার পিছনে বসে চামর দোলান। এই চামর দোলানো পাখা একটা খুব বড় সম্মান। বড় বড় সর্দারদেরই এই কাজের ভার পড়ে। সাধারণ বড় কর্মচারী বা লোকের অবশ্য সর্দারদের খুঁজে পাওয়া খুব সহজ; কেন না তাঁদের হাতে সর্দারা একটা ক'রে ওয়াকার থাকে। তাছাড়া যার যেরূপ আসনীয় সেই অনুযায়ী হিসাবে কারু একপাশে ঝুলার, কারু সোনার ঘোড়া ঘন ঘেড়ীর মত করে পাগড়ীর উপর পরা থাকে। এই ঐশ্বর্যের ঘেড়ী পাগে পরা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

বিছিলের আগে রাজার হাতীর সামনে একদল সর্দারী ঘণ্টা-ঘড়ওয়ার আস্ফালিত হয়ে নাচতে নাচতে চলে। সঙ্গে একজন পুরুষ গ' গেয়ে নাচতে থাকে; এই প্রথাটা মাদুরার বিশেষ ধারা দেখতে পাওয়া যায়। রাজাদের এইরূপ ভাঁড় পরিবেষ্টিত হয়ে নাচ করা একেবারে বহু প্রাচীন প্রথা। শিলপ্পদিকারম বারক প্রাচীন কেবারে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এখানকার লোকেদের ধনী হ'তে খুব বেশী যে বেশ পেতে হয়তা নয়; কেন না রাজার ধন-বর্দ্ধিত উপরই নির্ভর করে। রাজাকে যিনি হয়ত একটু হাসাতে পারলেন বা যে একটু বেশ "যো হুকুম" "যো হুকুম" করে সন্তুষ্ট করতে পারলেন তাঁরই কপাল ফিরে গেল। এমন তিনি সরস্বতীর বিশেষ দেখেনই কখন।

রাজা মাথোদিয়ার এক 'মাওয়াস' অর্থাৎ 'খাস চাকর' ছিল—নাম বর্জি। তিনি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে এমন শ্রিয়মাণ হয়ে উঠেছিলেন যে বেশিরভাগ সময়ে ঘরের ভিতর তাঁকে ঘিরিয়ে রাজ রাজকার্য করা অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে উঠেছিল। রাজার আসন মৃত্যুকালে তাঁর প্রধান মন্ত্রী (দেওয়ান) সাহেব নাকি রাজার কাছে চার বার গিয়েও দেখা করতে পারেন নি। শেষে যেই নিরাশ হয়ে আসতে গেছে তাঁর নাকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছিল। রাজাসভীর পরম রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য হয়েছিল। ইংরাজ সরকারের হিসাব তাঁর অবশ্য চুরি করা পড়ে এবং তাঁর দশ বিশ বছরের জেল হয়। তিনি জেলে মারা যান; এ ঘটনা নিয়ে সহরে খুব হৈ চৈ পড়েছিল। রাজপরিবারের পক্ষ থেকেও তাঁর নানান নিন্দাবাদ করেছিল আর বলা করেছিল যে ইংরাজ সরকার তাকে আবার চরিত্র দৃষ্টকারি যাবিয়ে সহর প্রবেশ করবার ইত্যাদি। আবার তাঁর যৌবনে মাথের কপাল ফিরেছিল তারা এইরূপ বদনামের ইজ্জৎ নষ্ট করবে বলে ইংরাজ সরকারকে দোষ দিয়েছিল। আসলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে' একথা সবারই জীবনের সকলেই যেন অনুভব করেছিল। রাজা ঘাট সর্দারা রাজপরিবারের কথা সর্দারাসারণে যেখানে আলোচনা করে থাকে যদিও public opinionএ কিছু যায় আসে না।

রাজ্যের বড় বড় বন্দরগুলি হ'ল সরকারী (অর্থাৎ public dept) আর রাজার প্রাসাদের মৌজির অন্তর্গত অনেকটি বিভাগের মধ্যে একটি সঙ্গীত, অপরটি শিল্পবিভাগ আছে।

সঙ্গীত বিভাগের কাজ রবারে ও মিছিলে নর্তকীদের এবং তাঁদেরের নাচ দেখান, কখন কখন বেতনভোগী ওস্তাদের দ্বারের অনুষ্ঠান করানো। রাজা ওস্তাদের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে যাদের জিৎ হয় তাদের পারিতোষিক দেন। সঙ্গীতকলা এইভাবে মনের কাছ থেকে সরবারের

খাঁরা ছবির খরচা দিতে বা করে ইউরোপীয়ান টুরিষ্টদের নিকট বিক্রি করে থাকে—এবং তাদের এই অর্থ লাভই সরকারের আয় হয়েছে। শিল্পকলার ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তি পর্যালোচনা করলে মন খুব খুশী হয়ে ওঠে। অবশ্য বিক্রয় বেড়ে গেছে। এঁরা সব সুরেরবাজি এবং বিলেতের 'খবা' উপাধিতে অনুরক্ত করে খলার বজ্রসুর বাদ করেন। 'বজ্রসুর' বলতে না এগুলিকে 'উপরীত' বলতে অবাক হন। 'পোত্তিখানায়' বহুসুর থেকে চিত্র সংগ্রহ করে আনতে। আকবরের আমল

একটি হল ও মিছিলের—রাজ্য।

পৌঁছতে এখানে বেড়ে যাচ্ছে। বীণ, তুরুপ, সেতার প্রভৃতির চর্চা ছাড়াও কখন কখন অভিনয় ইত্যাদিরও ব্যবস্থা পূর্বে ছিল। এই সব নর্তকী ও ওস্তাদেরা সবাই প্রায় বংশানুক্রমে রাজার কোষ করে থাকে।

শিল্প ও চিত্রশালাটি "পোত্তিখানা" পুঁথিঘর—অর্থাৎ লাইব্রেরীর অন্তর্গত। এখানে বংশানুক্রমে রাজার-বুক 'মুসব্বর' ওস্তাদ শিল্পীরা ছবি এঁকে থাকেন। পূর্বে এঁরা দরবারে ওস্তাদি 'ওস্তাদ' বেতিয়ে বিশেষ সম্মানিত হতেন কিন্তু এখন আর সে সৌভাগ্য তাঁদের বংশধরদের অদৃষ্টে ঘটে না। এখন এই সব শিল্পীরা তাঁদের জীবনযাত্রার

খেকে এত বড় বড় শিল্পী ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন তাঁদের সবাইকার আঁকা ছবিই প্রায় সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। তার পর "জাহাঙ্গীর" অর্থাৎ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান আকবরের দরবারী শিল্পীদের আঁকা ছবিতে ভরা এখনও সেখানে রাখা আছে। একটি ঘরে যোগল ঘরে রাখা প্রায় এক লক্ষ ছবির সন্ধান আমি পেয়েছিলুম। প্রত্যেক মণিগুলির সন্ধান পর্যন্ত জানা ছিল না। সম্প্রতি আমি অনুরোধ করেছিলুম সেগুলিকে আই ক্যাটালগ করবার জন্য, কিন্তু কতদূর কি হয়েছে জানি না।

[আগামীবারে সমাপ্য]

পিসীমার লক্ষ্ণৌ-দর্শন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—জামালপুর

(১)

পিসীমার অনেক দিনের সাধ ছিল একবার তীর্থদর্শন করা। যাত্রা-বন্দোবস্ত করিতে তিনি প্রস্তুত, এবং পিসীমারও তাহা দৃঢ় বিশ্বাস। দেখিবার সাধ আহার না হয়। অর্থ, নরক, পৃথিবী প্রভৃতি দেখিবার আগ্রহ প্রকৃতি আছে বলিয়াই জীবের জন্ম ও মৃত্যু। তবুও বিশ্বের সকল সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা বিচারের ভার, যাহার অপেক্ষা স্থির সদা সাবধানই বিধাতৃন, মতের অনুষ্ঠানের বিষয়ক্ষার কথের সমালোচনা অবশ্যই হইত না, এবং সকল যোগদান অপ্রকাশিত ভাবে চিরদিন সাধিয়ের আধিক্যে থাকিত।

পিসীমার নাম নীলমাধব ঘোষ। নাম হইলেই যে নীল হইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই, এবং নীলমাধব হইলেই যে ঘোর হইবে, সেরূপও কোনো কথা নাই, অথচ ঘটনাক্রমে তিনি নীলমাধব ঘোষ। জাতিতে বৈষ্ণব। পেশা—ব্যবসায়ী। তাঁহার পূর্ব-পুরুষের বংশ-তালিকা একটা ছিল। বর্তমান তাহা নাইই—কিন্তু অনেকালের পরিবার।

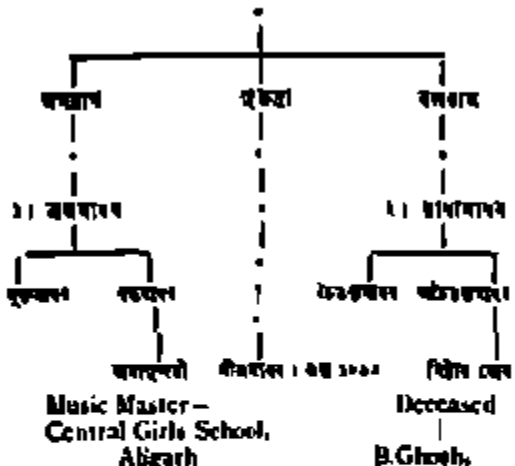

উপরোক্ত তালিকার সঙ্কেত • —কন্যা

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মধ্যে তালিকার দিকে আদিপুরুষ একজন ব্রাহ্মণ, তাহার পুত্রে একজন পুরুষ ছিলেন বিক্রম, এই প্রকারে তাঁহারে কন্যা, এবং তাহা কন্যা, সব পুরুষানুক্রমে বিবাহ করিয়া স্বামীর সহিত শিবালয়েই বাস করিতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নীলমাধব পুরুষানুক্রমে তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগের পথ অবিচারে তত্ত্ব করিয়া নেন। এই তত্ত্ব গ্রামের সকলে তাঁহাকে পিসীমা বলিয়া ডাকিতেন।

আমরা যে তালিকা দিয়াছি, তাহা প্রায় দুইশত বৎসরের। ১১৮০—১৮৯০

এই দুইশো বাংলার ইতিহাসে একটু অল্প করাইয়া রেখা যায়। ঘোর যে আদিমরা ভূমিয়া থাকিবেন সকল সময় তাঁহি বর্ণ ছিল। যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই বর্ণবিভাগ ঐতিহাসিক যুগের পূর্বে। ১১৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কিংবা শূদ্র বলিয়া কোন জাতি ছিল না। তখন বহুতর নূতন জাতির গঠন হইয়াছিল, যথা বৈদ্যবর্ত, ঘোষ, গোপালোপা, ঘোষে, বাগ্দি প্রভৃতি।

এই সময় ভারতের পরম বন্ধু সমুদ্রের অপেক্ষা অর্ণবপোতাদির এদেশে শুভাগমন করেন। তখনকীয়ন মত যে পৃথিবীতে মাত্র দুইটি জাতি থাকিতে থাকিবে।

১। ভদ্রলোক।

২। ছোট লোক।

যাহারা জাতির পরিচয় করিবেনা, কেবল বুদ্ধির জোর জোকা আরামে দিন কাটাইতে তাহারা ভদ্রলোক। বাকি ছোট লোক। ইহাই আদর্শ করিয়া তিনি বহু অন্যের ঘরজামাই দু-ঘর মানব এক অপূর্ব ঘর প্রতীয়া হইতে আয়রামী করিয়া গো-স্বামীর পরিবর্তে দু-স্বামী ধরি করিয়াছিলেন। তাহা চিরস্থায়ী ভাল আইনের হইয়া দেশে ভদ্রলোকের সংখ্যা অপরিমিত ভাবে বর্ধিত হইল।

শিশীমা বৌদিদির মোসাহেবী এবং চুকলী। 'মো' শব্দের বাংলাদিক অর্থ, তাহার মধ্যে 'চু' অর্থাৎ চুরিবৃত্তি একটা। প্রায় দুইদিন বিদ্যার 'চু' এবং প্রায় পঞ্চাশটা 'মো'র চিরস্থায়ী মালিক শিশীমা। ইহাতে তিনি একদিকে বিদ্বান হইয়াছিলেন, কারণ লেখিবার কেহ ছিল না, কিন্তু অন্যদিকে দুই দুই অধ্যায় ব্যাপিয়া বারবার বহিয়া পরীক্ষের আসরে বিলক্ষণ চুরি করিয়াছিলেন। প্রত্যহ উত্তরপাঠ করিয়া তাহা ছবাই বাহির-ছিল।

আমাদের দুরদৃষ্টে শিশীমার বন্ধুর অভাব ছিল না। তাহার মধ্যে ছবির স্নেহ প্রবল। ছবির শিশীমার জন্য চাষ করিত এবং তাঁহার মোসাহেবি করিত। একদিন বসার ঘরের ছবির ঘরিল, 'বাবা ঠাকুর! তাড়তাড় একটা পেন্সার দেল, তার খানিকটা বেন্সা বেশারিতেবীর তাড়। কি বল? একবার ঝিনী সন্ধ্যের দিকে যেলে কি হয়?'

শিশী। আমি একবার চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু হয়ে ওঠা হই নাই।

ছবির। সেবার আমি সঙ্গে যাইনিকেন, এবার আমি সেখে শুনে নিয়ে যাব।

শিশী। একবার ফেলে পড়ুক না, আমে আমে বিদ্যার ঘর্দে হবে।

অবশেষে সন্ধ্যে বেলা স্থির হইয়া গেলে বন্ধুরা অনেক অর্থের মোসাহ করিয়া রেলে চাপিলেন। প্রথম ঘাটের জন্য পয়সা দিয়া শিশীমা প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য বন্ধুর সাহায্যে অন্য কাশীধামে উপনীত হইয়া অবতীর্ণের জন্য পরিশ্রম হইল। কাশীধাম হইতে উত্তরে সন্ধ্যে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যে অবতীর্ণে শিশীমার একজন আত্মীয় ছিলেন তাহা আমিরা বুঝি বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যার কি, মোস, বলবার ঠাকুরের মতন। ছবিদাদা সম্বন্ধে ইনি একজন Authority। এখন কি লাভল পক্ষ না থাকিলেও, কি করিয়া অন্যান্য পক্ষ অবাধুনিকদের করিতে পারে তাহা তিনি অবাধলার সহকারে বহু আলোচনা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ছবির স্নেহের সন্ধ্যে যাওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে জানিয়াছিল যে, জলে-মোসনে মূর্খি প্রত্যেক ঘণ্টায় চরিত্রটা ঠিক হইতে পারে। চায়ের পরিবর্তে ঠিকঘটির তরুণির শিখিবার আগ্রহ বড় এবং ছবিদাদের বাড়ীর হইতে অন্যান্য পাওয়া যাইতেছিল। ছবির স্নেহের ধারণা ছিল, ক্রমাগত স্নেহন করেও সন্ধ্যে, এবং অন্যান্যের মধ্যে মন্দ ও মূর্খি, এবং তার মানবজাতির ঠিক। স্নেহপক্ষ শিখিলে স্নেহন অনর্গল কথা বাহির হয়, উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক সাহায্যে ইতরাদি করিলে অনর্গল ঠিক বাহির হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

অবশেষে উভয় বন্ধু প্রভূত মনে, ঘুম শরীরে, সোনপুরে আমিনাবাদের একটা সরাইতে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যে বাড়ীটা খুব দুই-অবাদে, কিন্তু বাড়ীটা বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে তত সুবিধা নয়। তাহাই হউক ছবির স্নেহ সিদ্ধ-আবার খুব পছন্দ করিয়াছিল, এবং শিশীমা বন্ধুরা এবং ঔষধের বহরির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার সময় বিছার মোষ নিয়েই মোটরবার লইয়া উপস্থিত। ঘুমো! আপনার শুভাগমনে সন্ধ্যে পবিত্র হল, আপনার চিঠী পেয়ে একটু বিলম্ব হয়েছিল, নচেৎ টেনের সময়ই টেশনে যেতে পারতেম। ঘোমো কষ্ট হয় নাই ত?

শিশীমা। বাবা, এতদিন পরে 'ঘুমো' শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হল। শিশী শুনে শুনে আলাতন। ইনি আমার বন্ধু ছবির স্নেহ।

ছবির স্নেহ সন্ধ্যেইয়া বাবার সংযুক্ত সেলাম ঠুকিয়া বলিল আমাদের ঘরের পাশের বন্ধুবেন্, উনি আমার বাল্য সখীর।

পথে যাইতে যাইতে বিছার মোষ জিজ্ঞাসা করিলেন সম্বন্ধটা কেমন মোষ হচ্ছে।

ছবির। টাকার বিষয়ে আছে।

শ্রীমান ঘোষের Agricultural Firm খুব আকর্ষণীয়। তিনি এক অংশ কৃষি-বিজ্ঞান, এক অংশ Poultry যেখানে ডিমের মুরগী হয় ও তৃতীয়াংশ Dairy অর্থাৎ গরু ও মহিষের কারখানা। সেই বিস্তীর্ণ কৃষি-ক্ষেত্রের পার্শ্বে তাঁহার কুটীর। তাহা পর্ণকুটীর বলিলেও চলে। যেন সিনেমা-করা সেট, তাহা ইটের দেওয়াল-এবং চালের মাথায় এক ফুকর আছে, তাহা অগ্নিরোধক করা হয় না, বৃষ্টিরোধ করিবে না। যেমন বাড়ীর style সেই রকম শ্রীমতী ঘোষেরও style। অর্থাৎ তাঁহার মনে ভাবনা নাই, অহঙ্কারও নাই। একেবারে নিরিবিলি অবস্থা। অন্ধ, সহায়সম্বল, অভিজ্ঞ সংসারে বাস, এবং সাধারণ আমি Firmএর কর্তাস্থানে জীবন উৎসর্গীকৃত। শ্রীমান ঘোষ অভিনয় দীর্ঘকাল, প্রায় পঞ্চাশের মতো, কিন্তু ঘোষ তাহাই মতো একটু ঘাবড়ান-সাই। তিনি মাথাতে চালনা করিতেন এবং আমী কৃষিকার্য্য চালনা করিতেন।

শ্রীমান ঘোষদার দীর্ঘ শরীর দেখিয়া শিলীমা ভয় না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্রীমতী ঘোষ বুঝাইয়া দিলেন যে দেশের হিতে জমিদারকে যখন দেশ-প্রাণ একেবারেই উৎসর্গ করা হইয়াছে তখন ভয় করিবার কারণ নাই।

শিলীমা। বৌমা! আমি কখনও ব্যাঙ্গ করার কথা শুনিতে পাইনি, কিন্তু মেরুদণ্ডের কথা পড়ি নাই। সুতরাং আমি মোটামুটি কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছি। কর্তার জন্য তাহাই যোগাড়। এর বেশী মাথাই ঢোকে না কেন, ভগবান বুঝবেন।

ভূষিত। মাতাঠাকুরের এখনো খুব ধরি চলছে, কিন্তু পরে কেবল মাছপালা ও কাঁচা ফল খুব খেলেই খুশি হবেন। উনি একজন দেবতা বিশেষ।

মিঠাই ঘোষ। আমার যে Scheme আছে মহাত্মাজির হাত সম্বন্ধে সকল অভাবই মিটিবে। আপাততঃ আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর আসনটির সেবা। তার কেবে নিয়েছি, আজ বিদায় করব।

প্রাইভেট সেক্রেটারী অভিনয় অবাধিক লোক। এবং তাহার মনে উচ্চেই পরমাপ্যায়িত হইলেন।

শিলীমা। আপনার নাম আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

প্রা—সে। (অভিনয় বিনীত ভাবে) আজ্ঞে—আমার আদি নিবাস বাঙ্গুর। মহারাজ খুব আমার পিতৃপুরুষদের রায়পুরের তেলেলা সরকারে বাহাল ছিলেন। আমার বাপ ছিল রাজবন সরকার, পরে 'বাঙ্গুরন' নাম গ্রহণ করেছি।

ভূষিত। এ কথা বাঙ্গু বলনি ত?

বাঙ্গুরন। বোধ হয় না। আমার উদ্দেশ্য যেমন বাঙ্গু সাম্রাজ্যের কথা। ইতিহাসে বাঙ্গুর অনেক কথা দেখতে পাবেন। বাঙ্গুই আসল, পালবংশ: নিমিত্ত মাত্র। বাঙ্গু অর্থে বলে সারবস্তুর প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গু যদি ঠিক চলে তবে তিনি সাক্ষী মাত্র।

শিলীমা। বাঙ্গু ঠিক চলে কিসে?

বাঙ্গুরন। সেই কথাটা খুব শক্ত। তার এক উপায় 'ফেরেন'।

শিলীমা। যদি সবগুলো ঘ'সে যায় ও দুর্বলের উপর উপদ্রব করে।

বাঙ্গুরন। বাঙ্গুর সঙ্গে সিঙ্গে সারবস্তু তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। বহিও এটা সোজা ব্যাপার নয়, কিন্তু যৌথপ্রথা কি না হয়? এই ফেরেনের ফেরফার হবে গ্রামে গ্রামে, এবং তার মূলে কৃষি বাঙ্গু ও কৃষি ফেরা। সহর থেকে সেই লোকগুলোকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে, যেমন ইন্দ্রিয়গুলোকে যখন ক'রে আমরা সংপথে যেতে চেষ্টা করি। সে পথ আছে।

ভূষিত। কেন তারা? গ্রামগুলো যে ম্যালেরিয়াতে উজাড় যেন। ভগবান্ যদি মারেন তবে কি করা যায়।

বাঙ্গুরন। গ্রাম থেকে পালিয়ে অন্ন জোটে কি যেন টিকবে? গ্রামের প্রাণ ও অন্নবস্ত্রের সেবা একই কথা। গ্রামের পরিত্রাণের ভারটা আমি নিয়ে ব্যবস্থা চলে। টাকাটা আমি। যদি সকলে মিলে গ্রাম রক্ষা না করতে পারি তবে দেহের মত দেশটারও পতন হবে।

যদি বুঝি যাবে তবে সেটা খরচ করে যাবোরিয়াটার সকলে একত্র হয়ে তাড়ানো অসম্ভব নয়। তবে কেবল উপস্থিত হয়ে জন্য।

ঋষিক ঋষির দেখের মনে কথাটা মন্দ লোগ হয় নাই, শিশীমা পুনরাবারবশতঃ বলিলেন, 'যদি সত্য কেবল হাজার আসল হাতে হাতে পাওয়া যায়, আর রাজকর্মচারী-গুলো আমাদের মাথের উপর চাপে তাহলেই ত সর্বনাশ।'

রাইবন। সেটা ভুল। তাদের কাজ সেখানেই বুঝি হবে ও তারা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে সেল রক্ষা করবে। যদি এদের মধ্যে পরিবর্তনের ভার নেটে নিতে পারে, কৃষির উন্নতি করতে পারে, রক্ষা রাখতে পারে, ছুটির সময় করতে পারে, প্রজার স্বাস্থ্য রাখতে পারে, তবেই লোকার বেতন; নতুবা অন্য লোক নিযুক্ত হবে। ঋষিক প্রথমে এটা অন্যায়ের মনে হবে, কিন্তু দীর্ঘজীবনের পরাই এটা। তখনে কোনো দেশই এটা লক্ষন করে উঠতে পারবে না। যে দেশে কৃষিকের ছুটিরো ছুটিরা হবে ও সেইগুলো নিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত থাকবে, সেখানে সহর নিয়ে ঘর-দৌলত বেড়িয়ে যাবে না, আর ছুটিরো কৃষিকের সুটুতে অন্যদেশের কেহই মোলাকলি নিয়ে আসবে না। অতএব কুকুরেরো কুকুর থাকবে না। সুতরাং মুনির অন্ন এবং কৃষিকেরাই সমকক্ষ হবে।

শিশীমা। ছোট-বড়, আলোক ও ছায়া, সম সমান কি কখনো হ'তে পারে?

রাইবন। প্রাকৃতিক অর্থাৎ সামাজিক অবস্থায় কখনও হয় না। সেটাটা বৈষম্য নিয়ে। কিন্তু অনেক সময় হয়। সেটা পরস্পরি ভেদজ্ঞানের উপর নির্ভর। যারি থাকল স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ও স্ত্রীধন। সেটাও পরিজনের দৌলত। যে স্ত্রী পরিশ্রম ক'রে নিজেই অনেক সময় অর্থ পারে, সে সকলেরই সমাজী হয়ে থাকে। তার পক্ষে স্বাধীনতা ও অধীনতা সমান।

ঋষির। কথাগুলো মন্দ লাগছে না।

শিশীমা। আমার খুব লাগছে।

রাইবন। সকলে এখনও যানে নাই, কিন্তু আমাদের জন্য মানবজাতি এই পথ খুঁজেছে।

শিশীমা। যা হয় হবে, তার জন্য মাথা খারিয়ে লাভ কি? অসুখ করানো যায় না।

প্রায় আধারের সময়। শ্রীমান যোষ সন্ত্রীক আসিয়া বলিলেন, 'যদি ইচ্ছা হয় তবে একবার কৃষিক্ষেত্রটা বেড়িয়ে আসি। রাইবনের সঙ্গে আলাপকরণ কৃষি'স বুঝি?'

শ্রীমতী যোষ। হাঁ ও সাধ্যমত।

শিশীমা। আমিও যে নিতান্ত অনাধ্যবাসী তা নয়, এবং কি আমার পরাইয়ের অর্ধেকটা বেঁটে নেয় তবে তার সঙ্গে সমান হ'তে রাজি।

ঋষির। যার আমা বেঁটে নিলেও চলে।

রাইবন। কেবল পরিশ্রম লাগেক।

যোষ। আমাদের কৃষিক্ষেত্র প্রায় দু'মাইল লম্বা ও তিন মাইল চৌড়া।

ঋষির। আলাহাবাদের পরীরের মতন?

শিশীমা। আচ্ছা একবার বেঁটে দেখা যাক। চটি জুতো এনেছি ঐ রক।

শ্রীমতী যোষ। সেখানে একজন নূতন লোক দেখতে পাবেন।

কৃষিক্ষেত্রে। অনতিদূরেই বালিকাবিদ্যালয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া শ্রীমতী যোষ তাঁহার 'নূতন লোকের' সহিত শিশীমাকে Introduce করাইয়া দিলেন।

সেই আলাপটা খুব pathetic হইয়া পড়িল। কারণ "নূতন লোক" মাতাপুত্রী—(তাহিকা দেখুন) বহুকালের বন্ধু, অতএব বিধবা যোষের সিনী এবং শিশীমার দুহিতৃত ভগ্নী। এবং স্থলে অশ্রুবর্ষণ খুব স্বাভাবিক। মাতাপুত্রী সজল নয়নে বলিলেন, 'মাগো, কেঁচে আছ, বেশে আছ, অন্তত কি একখানা চিঠি লিখতে নাই।'

শিশীমা নিতান্ত লজ্জিত ভাবে বলিলেন, 'সোইবার্থ

সব সময় ভিড়ে পাওয়া যায় না, আর—রবিবারেই সব বেচে যায়।'

যাদুঘরটী। আমিও Music স্কুলে এবার রবিবার প্রোগ্রাম আরম্ভ করেছি, তবে কি জান রবিবার সাহেবরা পছন্দ করেন না। সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের নিয়ে শুনাব।

রবির। মা ভাবেন, খোকার নাম কর, আমার নাম কর। সবই এলো মিলি।

যথার্থ শিল্পী প্রকাশ একজনে, শিল্পীরা বলিলেন "আজ থেকে আমি আমার আসল নাম নীরবাবর গুহ ক'রেছি। তোমরা সব এখন আমাকে 'নুরো' বলে ডেক।

সম্মুখেই ঈষান খোকার বিরাট ব্লকিফলক। Sign-board এ বড় বড় অক্ষরে লেখা "The Agricultural Expert, Grandson of অটলবিহারী, the genealogical descendent of the Mythological বলরাম Elder brother of শ্রীকৃষ্ণ who dictated the ঈষা near কুরুক্ষেত্র Station Delhi—Amballa Railway, not far off from the site of the great battle of Panipat."

ফেজ উপস্থিত হইয়াই ঈষান খোকা ঐতিহাসিক ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং একটা ছোটো-খাটো বক্তৃতাদ্বারা দর্শকমণ্ডলীর মনোযোগ রবিবার প্রত্যাশী হইলেন।

(বক্তৃতা)

"আজ যে Ceremony টা হচ্ছে"—মোটা family (পারিবারিক) প্রদর্শনী বলা'ও চলে। হয়ত আপনারা ভেবে থাকবেন যে এই ব্লকিফলকের মধ্যে কমল নাই! গন্ধ বাহুর নাই! দুধী ঘাস নাই! কিন্তু সবই আছে। মিসেস্ বোস দেখিয়ে দেবেন। অবশ্য বৃষ্টিমতী ঐতিহাসিক ইতিপূর্বে এখানে আসেন নাই।

[মিসেস্ বোস রবির খানিকটা তোয়ালি দ্বারা মুখ মুছিয়া দেওয়াতে মিসেস্ যে কুরুক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ঘাসাদাদু ও তৃণ জন্মিয়া আছে।

বোস। এইটুকু বিজ্ঞানের ব্যাপারটি! এই ঘাসাদাদু ও তৃণ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বাঙালীর প্রধান খাদ্য, এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীর লোকের প্রধান খাদ্য হয়ে পড়বে। এতে দুধীর দরকার নাই, লাঙ্গল গরুরও বিশেষ দরকার নাই।

রবির। চাষ করে কে?

বোস। রবির মধ্যে এক রকম পুরুষে লোক আছে তারাই রবি তৈরি ক'রে দেয়।

[মিসেস্ বোস খোকা কতক লোক রবির রবিত্ব দেখাইয়া দিলেন।]

বোস। সমস্ত ব্লকিফলক বাড়ির নীচে। বাড়িতে কমল নাই, গরু মহিষ চ'রে খেতে পারে না, গাদলের জোগাড় নাই, লোকজনও অল্প লোকজনদের তাড়িয়ে দেয়। কমলটা পকেটে নিয়ে চলে যেতে পারেন, কাটা যায়, সিদ্ধ করা, পুড়াইয়া যায়, একটা আধারে রক্তি, কণা, ও জলের ভাগ প্রমুখগুলি অধিকার ক'রবে। এই পরাধীন প্রধান সমস্যা যে বিনা ব্যয়ে কোনো একটা কমল সংগ্রহ ক'রে, সেই ব্যয়বটা অন্য কোনো productive purpose-এ ব্যবহার হতে পারে কি না। তা'হলে খাদ্যেরও জোগাড় হবে, ও শিল্পের অনুশীলন কিংবা সাহিত্যের চর্চাও হবে।

রবির। এবং রাষ্ট্র সংগঠনও হবে।

বোস। ঠিক কথা। এখন, ক্ষেত্রে যেমন যে রাষ্ট্র সংগঠনের প্রথম ধাপ ঘাসাদাদু ও তৃণোদ্যান। যেমন, ঘি, দুধ, সবই বিনামূল্যে, মজুরের সঙ্গে সাধারণ বিধান', চাউল ডাল-পত্র, অন্য কোনো জব্যের ও কথাই নাই। কিন্তু অট্টালিকে ভেবে যেমন ঘাসাদাদু ও তৃণে তেমন চলে না, আর, যদি সৃষ্টি হয় তবে সাধারণ চাষ ক'রে সব ছড়িয়ে দিতে পারেন। উপরে ও নীচে দু-রকম কমল পাবেন।

এক কথা Stratagetical farming অর্থাৎ বৃষ্টিভেদে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কমল। এখন কি Spring

Jewel পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে আলো ও জল বন্ধ পাবেন।

ঋষিঃ। ভালো চাকুর! যেমন ডিমে আমি এই ফোয়ারি দেখাব। এখন ডিমের কারখানাটা একবার দেখুন।

শ্রীমতী ঘোষ। Poultry Firmটা প্রায় এক মাইল ঘুরে।

সকলে সোৎসাহে পরস্পরে এক মাইল হাঁটিয়া ফেলেন। ঋষিও নিশীথার কষ্ট অনুভব করিতেছিল, কিন্তু তিনি ঋষির বিচিত্র ব্যাপারে আকৃষ্ট। ইহা পারীরিক ক্লেশের কষ্ট অনুভব করেন নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, ঋষি থাকিলে ও পরিশ্রম করিলে অনেক বিষয়ের হাত এড়ানো যায়। এবং সেই পরিশ্রমে দশ জন যোগদান করিলে নিষ্কৃতি সহজসাধ্য হয়।

পথের মধ্যে বাসাহকারী তাঁহার ঋষিমাতের মুক্তন একটা গান বালিকাদিগের সঙ্গে মধুর স্বরে গাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

ডিমের ফেরে উপস্থিত হইয়া শ্রীমান ঘোষ বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহার কৌশল Histological principle এর উপর সংস্থাপিত। সকলেই পাখী হইতে ডিম হয়, কিন্তু কৌতুক, ডিম যে ডিম হইতে ডিম হয়। মুরগের উদাহরণ দিয়া বোঝাইলেন, যে প্রথমে একটী ডিম ফুটিয়া মুরগী, মুরগী ফুটিয়া চারিটি, এই প্রকারে সংখ্যাতিত ডিম একত্রে চার ঝুড়িতে রাখা আমরা দেখি তাহাই আমরা ডিম বলিয়া খাই। সাহিত্যেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। একটী ভাব ফুটিয়া, দশটী হয়, একটী কবিতা কিম্বা উপন্যাস ফুটাইয়া দশজনে দশটী উপন্যাস কিম্বা কবিতা লিখিতে পারে। সেই মতন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্যে একটী ডিম হইতে দুইটী ও দুইটী হইতে চারিটী এইরূপ ক্রমশঃ, দশদিনে সংখ্যাতিত ডিমের উৎপত্তি সম্ভব।

শ্রীমতী ঘোষ। কিন্তু ইহার অন্য দোষটী বলা যায়। প্রথমতঃ দশজন মুরগি কি হাঁসের একটী ডিম ফুটিয়ে ফুটী করা যায় না। আমরা যে সব পাখী সংগ্রহ করেছি তাদের পূর্ণ পুরুষ হয়ত কাশিয়ান সমুদ্র কিম্বা মানস সরোবরের তীরে বাস ক'রত।

ঋষিঃ। আপনি দেখতে পাচ্ছি না ত?

শ্রীমতী। তাদেরও মাটির নীচে ঘর করে রাখা হয়েছে। চলুন সেখানে নিয়ে যাই।

[ইহা বলিয়া শ্রীমতী ঘোষ একটী লুকায়িত দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকলে অন্ধকার একটী সুড়ঙ্গ ও একটী হল ঘরের মধ্যে লইয়া দেখাইলেন। সকলে তাহাদের সম্পর্ক ও সুচেতনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।]

এখানে অনেক পরিশ্রমের দরকার। কতকগুলো Incubator, Thermometer, Refrigerator, প্রভৃতি নিয়ে তিনজনকে চাঁছিয়া থাকতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানিক ডিম ফুটে ডিমই হয়, মাংস হয় না।

ঋষিঃ। খাওয়া ডিম্?

শ্রীমান ঘোষ। ঠিক্। যেমন আমাদের অন্ত। যেটাকে খাওয়া ক'রবার দরকার সেটাকে Grand Incubator নামক ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে তা' ডিমে হয়। যদি দু একদিনের Refrigerator মধ্যে রাখতে হয়।

শ্রীমতী। আপনারা জানেন ঘোষ হয়, যে বেশভিন্নে যত যত্নদোষ আমাদের আমেরি ডিম পছন্দ করেন, তাদের অবস্থান সুদূরে। পক্ষীশাবকও অনেক আছে, তারা এমনিই হাওয়া খেতে বেরোবে।

মাইকেল সকলের অনুরোধে কৃষ্ণকায় প্রায় বত্রিশটী যার উদ্ঘাটন করিয়া সদ্যপ্রসূত সুড়ঙ্গ ও ঘরের সাথ সকলিবারে বাহির করিয়া দিল। পাখগুলি ভারী ভারী ডেকে ছাইয়া ফেলিল এবং ডেকের ভীত পক্ষীর আহারে রত হইল।

ঋষিঃ। বাহে—বাঃ! জয় আমার। কি সুন্দর! কি সুন্দর।

মাইকেল। এরাও মাইকের প্রতিমূর্তি।

শিল্পীদা। আমার মোষ হয় বৈজ্ঞানিক চিজ খেলে জীবন্তিদা হয় না?

আমাদুল্লী। বাবা! এখন জীবই এর জন্যে বাই তখন ছিলা কি?

শিল্পীদা। তবেছি আখন ও দুজন এখানে তৈরি হয়, কিন্তু তার ও মোনো চিজ খেয়েছিলে। সেটাও কি মানির মীচে?

ঈমান মোষ। এটা আমাদের নৈতুক ব্যাপার, সুতরাং তার উপরিত্ এরটু আল ক'রে করা হয়েছে। প্রথমে ভেবে দেখুন এদিকে খাদ্যের বড় অভাব। সোয়াল নাই বল্লেও চলে। খলি দুষ্প্রাপ্য। দুধ অবশ্যে হতে আমদানী করা যায় না। মাখন ও ঘি, চর্বি ও তেলাদি পরিপূর্ণ, অথচ প্রত্যেক খাদ্যের অভাব সেখানে মিটানোই আমাদের রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। অতএব গাভীদুগ্ধের বালখান খাদ্যের উপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে ক'রে নিইছি।

হুমিরা। এটা বড় সহজসাধ্য হয়েছে।

মোষ। ঐ যে খাদ্যটা খেয়েছেন তাহাই মধ্যে এই কারখানায়। খরগুলো মধ্যে মধ্যে খেয়ে আসে, খেয়ে খনিলোক মোতাবেক হ'তে থাকে। কিন্তু যেই সময় গায়ে ব'লেই পাবা যায় ও মলে তৈরি মোখনের মাখ মেহন করে। তাতে দুধ অপর্যাপ্ত হয়।

বাগানে পৌঁছিয়া মোষ পরিবার 'বৈজ্ঞানিক উপায়ে গো-জাতির উন্নতি' বুঝাইয়া দিলেন।

প্রথমে, কৃষাণদের ইতিহাস সরলপূর্ণভাবে অবীত হইয়া ঈমান মোষ কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনা করিয়া শ্রীমতী মোষ বলিলেন—"অন্যান্য হিংস্রক দেশের উন্নতি গোলাতির উপর নির্ভর করে, কিন্তু ভারতের উন্নতি গোজাতির উপর নির্ভর। আমাদের উন্নতির আদর্শ আধ্যাত্মিক। যারা আধ্যাত্মিক পথে যাবে, তারা শুদ্ধ না পেলে মুষড়ে যায়, অসহায় হয়ে যায়।

ঈমান মোষ। কিন্তু গো-পালন ও গো-সেবা বড় সহজ নয়। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরাই গো-সেবা করেছেন, এবং সেই পরিশ্রমের ফলে ছেলে-মুলে দুধ খেতে পেত। এখন দুধের অভাবে সকলে অস্থিসর্বস্ব অবস্থায় হয়েছে। সেই দুধ নিবৃত্তির জন্য আমাদের এই বৈজ্ঞানিক গো-শালা স্থাপন। সেবার ও চারাবোর লোক পাওয়া যায় না। অতএব জাপানের মতো গাভী নিজের সেবা নিজে করিবে আশয়। অতঃপর, সকলে শ্রীকৃষ্ণধাম যেন। এই সকল কারণে এর কৃষকদের ও'ষিত কিছিৎ উচ্চশ্রেণীর আমরা রক্ষা দিয়ে যাদান রেখে মোষন করা করি। হিংস্রক পশু আক্রমণ করে পারে না এবং দুষ্ট বাদুড়গুলোকে খেয়ে তাদের বাদুড়াদের উন্নয়ন হয়। খোয়ালে যাই ছেড়ে দিই দিনের বেলা।

হুমিরা। আসল বাদুড়গুলো কোথায়?

মোষ। সে গুলোকে লেখা-পড়া শেখান হচ্ছে। আজকাল বুদ্ধি না থাকলে চাকুরি মেলা শক্ত। অবশ্য তারা আমাদের বই পড়ে না, বৈজ্ঞানিক কৌশলে শিক্ষা দেওয়া হয়।

হুমিরা। তারা খায় কি?

মোষরা। খাদ্যের অভাবে পরস্পরের খাদ্য লেহন করে। তবে আমরা বাদ্যবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় Glaxo মতো একটা খাদ্য প্রস্তুত করেছি, সেটা খায় খাবিয়ে দিই। উপরন্তু, তাদের চা' ও পাউরুটী অভ্যাস করিয়েছি।

শিল্পীদা। মোটের মাথায় এসব অনেক ব্যয়সাধ্য। তবে, গোজাতির উন্নতি হ'তে পারে।

মোষ। তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব-প্রথায় দুধ দুহন করা এখন অবস্থাসংযের সঙ্গে অসম্ভব। কোনো হলে উন্নতি দিতে গরু নিকট, তাদের অবাহার সম্বন্ধে, দুধ সংগ্রহ করা এই পরাধীন বৈজ্ঞানিক সমস্যা। এ সম্বন্ধে আমার Research আরম্ভ হয়েছে, তবে কি দাঁড়াবে বলা যায় না।

ছবির শেষ আঁকিতেছিল যে বাহুবন্ধনকে দেখা পড়া না গিয়ের ধরাই যাবার দিনে, হয়ত যেটি রোজগার হইতে পারিত, কিন্তু তাহা দিগ্‌বধূ-বিচ্ছেদ অতএব করুণা-পরবশ হইয়া চুপ করিয়া গেল।

মোহনের ছবি দেখিয়া ধর্মভূষণ বিশেষতঃ বালিকা-মহলে অতিশয় গৌরবাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। বিদেশ্‌ রোজ বলিলেন, "আপনারা এখানেই একটা লুচি ও সন্দেশের ইস্কিতাবি করে পারেন।"

পূর্বেই বলা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইলা তৈয়ারি। তখন জল দিয়া ধুয়। মহুল পাতু ও মহুল তাহাতে নিমেষের মধ্যে হইয়া গেল। বাসন্তী ঘরে সকলে যো-দেবার নিযুক্ত হইলেন। মোহনেরা দলে দলে যো-পাঠশালা হইতে আসিয়া নবাগত সঙ্গীদের গায় লেখন করিল। যাদুসুন্দরী বলিলেন, 'এরা খুব সভ্যতব্য।'

একটা দিন কাটিয়াছিল ভাল। আহারান্তে, যো-সেবা এবং সন্ধ্যাকালে হরি-সংকীর্তনে যাইয়া, দুঃখের সংসারের মধ্যে যে সুখের সন্ধান হইতে পারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, তাহা সকলেরি ধারণা হইয়াছিল। অন্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে বাস্তবের ছাপ ঐটুকু। বাকি সব ইতিহাসের ছোঁয়া।

মৃত্যু-অভিসার

শ্রীনরেন্দ্র দেব—কলিকাতা।

খুলে দাও গো,—হাত দাও খুলে—
জীবন-যৌবন-ভার,
এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে—
চাহে না বেদন আর!

জানো কি, অধীর কত যে দিবস
তব আবাহন মানে নাই বশ,
কত যে যামিনী জেগেছি একাকী
আসেনি ও চোখে ঘুম!

তব মুকুল-বন-কুসুম
পাসরি' পিয়িব অমৃত-ভোর
সে এক সফল-আবেশ-নিমীথে
পড়েছিল মনে মোর!

যৌবন ধরণে এনেছিনু যবে
মুছায়ে আনবে, আপন গরবে
ভরা আষাঢ় মধু-সৌরভে
দিয়াছিল সে যে ভরি;
একটি রাতের উৎসব-শেষে
শেষ-নিঃশ্বাসে—হেসে—চাহিতেই
প্রভাতে সে গেছে মরি!

দীর্ঘ-শুষ্ক-বনতলি তার
আবাহনে আজি ভরে বসুধা॥
ললাটে-অঙ্ক-দিয়ে সাথে
যৌবনে ফিরাছি—দিয়েছে বরষ—
অমনি মোর ঘনালি দিয়েছে
মোহ-সন্ধ্যার ঘন ছবি!

যেখানে-যাকি বিজাতে সে দু'দু
যাযাবরী অঙ্ক সঞ্চারিণী তনু
উৎসব ছুটি যাঁথি হ'তে মোর
নীরবে মেলিল নিষ্ঠুরে ধরি!

হায় পরও মেয়ে বিধ—!
মেয়ে অর্পিত বিধির-হাতে,
কত অভাগা ঘুরেছি মাথাত
একাকী পথিহীন!

জানো কি, বিজনে ভেবেছি যে কত—?
যায় কি যাবনা
পাশল ভাবনা

ধরিয়াছে যবে যুগবল প্রাণ
কেহ-নয়, কোন্ অপর আমার
যৌবন-যুগাবল—
না জানি কেমনে সেদিনও ছিলাম
প্রলাপ অধিচল!

আজিকে অকস্মাৎ—
কাহারও কোন্ ওকিত পরশে
কঠিন যন্ত্রণাত—
জেগে গেছে যামায়ার!

দুর্দিত ত্যার ঘরে-ঘরে—ঝলিয়েছে হাহাকার!
আজ শুনিয়াছি আপনার কানে
মোহর-আর্ত কী করুণ তানে
কাঁদে উপবাসী অন্তর মোর!

তাইত' এ বিধি না মেনেই মোর
এসেছি নির্ভিধারে—
সকল বিধা—সব যাধা ঠেলি—
তোমার দ্বার-ধারে!

যাক্ ডুবে যাক্—সুখ—দুরাশা—
এমন করিয়া বুঝি অধিকার
আপনার মাঝে আপনি রয় না—
কতদিন যাবা যায়?

সব্য-বিধা—পুণ্য বা পাপ
পুঞ্জ সকলই,—সমাজের চাপ
বিধি-নিষেধের বিপুল প্রভাব
আজ যে মোর নিকটায়!

বিশ্ব-যাবারে দু'পায়ে যাড়ায়ে
অন্তর মোর দু'বাহু যাড়ায়ে
তোমারে খুঁজিয়া যায়!

বিচিত্র ধরার সীমানা ছাড়ায়ে
বিদ্রোহী মন উঠেছে যাড়ায়ে,
—তোমারেই চেয়ে চায়!

জানি, জানি,—প্রিয়া—!
আজিকার এই
নিজন-রজনী-শেষে,
সার্থক মোর মুহূর্ত যাকে
উজ্জ্বল-হাসি মেখে,
দীর্ঘ-কুহেলি অঙ্গনে তব
ধীরে-ধীরে কিরে যায়,
উষার এই রজনীরে ঘরি
পরাণ আমার উঠিবে শিহরি,
শুধু অনুরাগে ভরিটি তুমরি
তব যাথা বুকে পাব!

হোক্,—তাতে ক্ষতি নাই,
সারা জীবনের আশা বিনিময়ে
—তোমারেই শুধু চাই!
শুধু একদিন……
দু'টি বুকে মুখে……
একটি নিশার স্বপনের সুখে
হ'য়ে যাব চির-লীন!

পিপাসিত-চিত্ত ব্যাকুলিছে সাধ
জীবনী-রসের শুধু-আস্বাদ
নিঃশেষে তারি আজও পান
গেয়ে যাব দু'টী প্রণয়ের গান
শুধু একটান
হবো গো মাতাল
বিলনের উৎসবে!
স্বপন-ব্যথার আনন্দ মোর নিষ্ফল কেন হবে?

ঘরো ভুলে ঘরে—ও-রূপের আলো,
পাকু-ঘরে প্রাণ-বঁধু চালো
জীবনের দীপে অন্তর-মাঝে—
কেওয়ালীর দীপ জ্বালো!

শুধু একদিন, নিশেষের তরে
বুকের-দুলালো ও-মুখের পরে
নিশেষারা দু'টি আঁখি-তারা মম
নির্নিমেষ হ'য়ে চায়,
ঘরো দু'টি কথা, শুধু মনোব্যথা
গদ্‌গদ হ'য়ে ঝরে যায়।
চির-সুন্দরে ধরিবে ধোর
ধরিতে দিন আর কি পাব?
জীবনের পরপারে—
দূর-দিগন্তে ঐ শোনো আজ,—তাকে ডেকে যাব যাব!

ঘরে না যে মম অন্তর্যামী
ঘরে না কবিতা পড় শুনিবে
চির-কলঙ্ক-পঙ্ক লেপনে
হয় না ঘরনো কালো!

যাহিত যে যে নিবিড় বুকনে
বিস্মৃতি তারে রাখিবে ঢেকনে
পরজনে পুন জনমে জীবনে
তোমে তারে লাগে ভালো!

এসেছি তো আজ—
দু'দিন ফেলে দিয়ে শেষ-ঘুমেরে
ধরি পায়ে দিয়ে যাব!

দেখ, চেয়ে দেখ—চির-ব্যাকুল বুকুল ঐ মুখে—
শোনো গান গেয়ে—কী সুর বাজিছে অশান্ত এই বুকে!
নয়নে তোমার কেন লাগে?
কেন ফুটে ওঠে মহা বিস্ময়?
ভাবো কি এ শুধু সপন নয়
জীবনের এই পারে?

আমি যে মানুষ—মহিমা দেবতা—মরণের অভিসারে
আসিয়াছি তাই, সুখে—হাসি মুখে,
চির-বঞ্চিত হবো তোমা হতে?
স্মৃতিত-ভাসিত-তুষারের বুকে
যদি গো ফুটি পারি,
সব-সন্তাপ-বিনাশী-বধূ-দুয়ারে তাই চাই!

ও দু'টি তোমার কমল-চরণে
চুমন করি যদির যতনে,
মরিয়া তোমার মহিমা মরণে—
সার্থক শুধু তাই!

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ—কাশী

পূর্বপ্রকাশিতের পর

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ মার্গের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। অধিকার-ভেদে প্রত্যেকটি মার্গই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। তবে তাহাতে নিষ্ঠা থাকা চাই,—নিষ্ঠার অভাবে ফললাভের আশা সুদূর-পরাহত। নিষ্ঠার মূল সাধন। সাধন ব্যতিরেকে কোন মার্গেই ফল পাওয়া যায় না। জ্ঞানে নিষ্ঠা হইলে সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। কর্মনিষ্ঠার ফল চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিনিষ্ঠার ফল ভগবৎপ্রেমলাভ। যাহারা মনে করেন, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের উপদেশ হইতেই অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শিষ্য গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই সর্বজ্ঞ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় না। তবে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, সাধারণতঃ যাহা জ্ঞান বলিয়া পরিচিত তাহা বাস্তবিক জ্ঞান নহে। ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করার অনুষ্ঠান করিলেও বুঝিতে পারা যায়,—কবের মুখে কল যে চিত্তশুদ্ধি তাহা প্রাপ্ত হয় না। প্রচলিত ভক্তিও জ্ঞানের অঙ্গরূপে পরিচিত। ভক্তির বিষয়ও ভাবনাকল্পিত। তাই ভগবদ্বুদ্ধিতে ভগবৎ সেবা, যাহা ভক্তি লাভের মুখ্য অবলম্বন, তাহা দিতে হয় না। কাজেই, এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা ভক্তির দ্বারা ভগবৎ-প্রীতি হয় না।

কালক্রমে বর্তমান সময়ে সকল অধিকারই এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে। সাধনের দ্বারা অধিকারার্জন এখন আর তত সুসাধ্য নহে। এখন ভক্তিপূর্বক (শুধু বিধিপূর্বক নহে) ভগবৎ-সেবা ভিন্ন ফললাভের আশা নাই। জীবের অধিকার না থাকিলেও ভক্তিসম্পৎ থাকিলে ভগবৎ-কৃপা-বলে ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অতিসূক্ষ্ম ভক্তিযোগের সিদ্ধি পথে অনুকূল সময়।

ভক্তি অতি প্রাচীন বিদ্যা নহে—ইহা ভগবৎ-কৃতি-তুল্য অথচ ভগবৎ স্বরূপানুরূপ, সুতরাং নিত্য। মায়া নামী এক অচিন্ত্য শক্তি ঐশ্বর্যময় ভগবানের স্বীকার করেন। এই শক্তির প্রভাবে ভগবান্ অনেক লোককে বিদেহভাবে সর্বজ্ঞভাবে থাকিতে দিতে পারেন। যাহাকে আমরা প্রলয় বলি তাহা ভগবানেরই আত্মরমণ, শুধু মায়াশক্তির বলে প্রলয়রূপে প্রতিভাত হয়। মায়ার প্রায় অধিকাংশ ঐশ্বর্যই শক্তি। এই শক্তির বশীভূত হইয়াই জীব সংসার দশা ভোগ করিয়া থাকে। প্রলয় ও সংসার এক পদার্থ নহে। 'আমি', 'আমার'—ইহাই সংসারের রূপ। অজ্ঞান, মল প্রভৃতি পঞ্চ সংসারবাচক, প্রলয়বাচক নহে। প্রলয় ব্রহ্মাত্মক, তাহা ভগবৎ অজ্ঞানকল্পিত বা মায়া হইতে হইতে পারে না। শ্রুতিতে আছে "স বৈ ন দেবো" "ঐক্ষতেক্ষাং ন ময়ৈ" "স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিৎ"—ইহা হইতে জানা যায় যে ভগবান্ রূপ বা আত্মসাক্ষাৎকারের জন্যই প্রলয়রূপে আবির্ভূত হন। প্রলয়াবস্থিত পুরুষ, ব্রহ্মের সাধন, ব্রহ্মলোক—সবই ভগবানের রূপ। এরূপ অবস্থায় কেহ যদি নিজেকে কর্তা বা ফল-ভোক্তা জ্ঞান করে, তবে তাহা তাহার ভ্রান্তি মাত্র। ইহাই "আমি-আমার"-রূপ সংসার। অবিদ্যাবশতঃ এই ভ্রমের উদয় হয়। যখন তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্তি হয়, যখন সবই ভগবানের রূপ বলিয়া জানা যায়, তখন ঐ ভ্রম বা সংসার নিবৃত্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মাত্মক প্রলয়ের নিবৃত্তি হয় না। প্রলয় সত্য, তবে তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব এই দুইটি অবস্থা আছে। মুক্তি—অর্থাৎ জীবন্মুক্তি কালে সংসারের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু প্রলয়ের নিবৃত্তি হয় না। উৎপাদক ও নাশকের পার্থক্য-নিবন্ধন সংসার এবং প্রলয়ের স্বরূপগত ভেদ অবশ্য

থাকায়। সংস্কার সহজে জীব মুক্ত হইয়া গেলেও প্রলয়ে লোপ হয় না। তবে যখন তত্ত্বজ্ঞান আত্মস্বরূপ বিষয়ে ইচ্ছা করেন তখন প্রলয়ের মত তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থায় জীবন্মুক্তই বিদ্যা-সুখ অনুভব করে। কিন্তু ইহা মুক্তি নহে। মুক্তিতে অজ্ঞান থাকে না, সংসার নিবৃত্ত হয়, আর এই অবস্থায় অজ্ঞানের অস্তিত্ব রহিয়া যায়, তবে প্রলয়ের ন্যায় হয়। তত্ত্বজ্ঞানের ইচ্ছাই প্রলয়ের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ। অবিদ্যা জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যারই নিবৃত্তি হয়, প্রলয়ের নিবৃত্তি হয় না।

অবিদ্যার বিনাশ হইলে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হয় বটে, কিন্তু দ্বারা সর্বতো বিনাশ নহে। সেই জন্য ঐ মুক্তিও যথার্থ মুক্তি নহে। সহকারীর নাশ হইলেই কার্যের সম্ভাবনা বিনাশ হয়। বিদ্যা স্বাশ্রিত, তাহার দ্বারা স্বজনক মায়ার বিনাশ হয় না। আর যতক্ষণ মায়া আছে ততক্ষণ সুপ্তজনে অবিদ্যা অবশ্যই থাকিবে। অতএব বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার অস্তিত্ব মাত্র, যথার্থ বিনাশ নহে। অবিদ্যা হইতে যে দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের অভাব উপপন্ন হয়, বিদ্যা দ্বারা শুধু তাহাই উপপন্ন হয়; সুতরাং জন্ম ও মরণ হইতে অব্যাহতি লাভ হয়। কিন্তু অজ্ঞান না থাকিলেও যেহেতি প্রলয়কর্তৃত্ব বলিয়া তাহার স্বরূপ লোপ হয় না। ইহাও এক প্রকার মোক্ষ বটে—ইহার নামান্তর ব্রহ্মনিবৃত্তি। শঙ্করাচার্য বলেন—"অবিদ্যাকৃত সকার্যস্য ব্রহ্মসম্বন্ধস্যাত্যন্তোচ্ছেদো বিদ্যাফলমাত্মনঃ।" কিন্তু বিদ্যাজন্য ব্রহ্মনিবৃত্তিই যথার্থ মুক্তি, তাহা বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিদ্যাজন্য মোক্ষে অবিদ্যা স্বকারণ মায়াতে অবস্থান করে। মায়াই জগৎ সৃষ্টির বীজভূত কারণভূত। মায়াতে অবিদ্যা থাকে বলিয়া বৎপ্রযুক্ত সংসারের অঙ্কুরটুকু কিঞ্চিৎ অবিদ্যমান থাকিয়া যায়। যেহেতি অজ্ঞান অবশ্য থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—যদি যেহেতি অজ্ঞান না থাকে তাহা হইলে যেহেতি সৃষ্টি একেবারেই থাকিতে পারে না। যেহেতি অজ্ঞান বিদ্যমানই মূল। এখন অবস্থায় যেহেতি অজ্ঞান না থাকিলে যেহেতি স্থিতি কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে সাধু লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে জীবন্মুক্তি অবস্থা যেহেতি সত্তেও হইয়া থাকে বলিয়া জানা যায়। সুতরাং যেহেতি অজ্ঞান না থাকিলেও তাহাদের অবস্থান সম্ভবপর, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। অতএব সংসার থাকিয়া যেলেও প্রলয়ের সত্তা বাধিত হয় না।

জীবের জীবন্ত যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ সংসারের লয় হইলেও পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা থাকিবে। কারণ সে অবস্থায় যেহেতি সংসার সত্তাপ্রাপ্ত হয়, মূল কারণে বিলীন হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্তের নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলে যা অজ্ঞান লীন হইলে, সংসার মূলকারণে লীন হইয়া যায় বলিয়া আর কোন চিন্তা থাকে না।

ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত। কিন্তু প্রলয়কালীন অজ্ঞানসমূহ অনন্তর যখন সৃষ্টির প্রারম্ভকাল উপস্থিত হয় তখন ঈশ্বরের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানাত্মিকপ্রায় হইয়া যায়। ঈশ্বরের প্রথম কার্য ইচ্ছাশক্তির ও জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াশক্তির সূক্ষ্মরূপ মায়া শক্তির প্রকাশ। এই মায়া দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ হন অর্থাৎ তাহার ব্যাপকতা তিরোহিতপ্রায় হয়। তখন যেন প্রকৃতির হয়, যাহাবলে অল্পজ্ঞ পরিচ্ছিন্ন হয়, ও'এই পরিচ্ছিন্ন ভাব দ্বারা তিনি ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। মায়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন শক্তি। মায়ার সম্বন্ধের অস্তিত্ব হয় ও অন্য হইতে বিলক্ষণ অনির্বচনীয় মায়া ব্রহ্মাভাষা স্বীকার করেন না।

কেহ বলেন, যে ব্রহ্ম অখণ্ড ও অবিভক্ত বস্তু হইলেও তাঁহাতে অনন্ত রূপ আছে, এই সকল মতের মধ্যে পরস্পর কোনও ভেদ নাই। ইচ্ছাবশতঃ অনন্তরূপের প্রাকট্যনিবন্ধন তাঁহাতে বিভাগ আছে বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র। ইহাই ভ্রমরূপ—সৃষ্টির উপাদান। ভ্রমের বস্তু হইবার সত্তা বা ভাবনা সৃষ্টির নিমিত্ত। এই ভাবনা সত্তা ও বিভ্রমের অন্যতমিতারিণী।

তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ তাঁহা হইতে তাঁহারই স্বরূপভূত অনন্ত চিদংশ প্রথম সৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়। এই সকল চিদংশ জীবস্বরূপ বলিয়া সাধারণ হইলেও উহাদের ভাবনা নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ ভাবনার বলে বিভাবায় হইয়াই আছে।

ইহাদিগকে পাপে জীব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল জীবের স্বরূপ ও গতি উভয়ই ভিন্নতর। ভ্রমের সংসর্গ হইতে ভ্রমপন্থী ও আত্মপ্রাধান্যে অন্ধতামী সকলের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। জীব যেমন অনন্ত, তেমনি অন্তর্যামীও অনন্ত। প্রতি জন্মেই ইচ্ছারূপে জীব ও অন্তর্যামী উভয়ের স্থিতি আছে। অতএব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ যত, চিদংশে জীব এবং আনন্দাংশে অন্তর্যামী বা অন্তরাত্মা। জ্ঞানে চৈতন্য ও আনন্দে বিমোহিত থাকে, জীবে আনন্দ বিমোহিত থাকে। আনন্দই ভগবানের আকার—তাহার লোপ ঘটিলে জ্ঞান ও জীব উভয়ই নিরাকার।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীব চিৎপ্রধান স্বভাবে, তাহাতে আনন্দাংশ বিমোহিত থাকে। এই বিমোহিত আনন্দাংশ আবির্ভূত হইলেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভাব প্রকটিত হয় ও ব্যাপকত্বাদি ধর্মের আবির্ভাব হয়। ইহাই ভগবত্ত্ব বা ব্রহ্মত্ব।* অভিব্যক্তির অন্যোন্যভাবে যে প্রকার বাহ্যতা প্রকৃতি ধর্মের অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মভূত জীবের দেহেও ব্রাহ্মণজীবনের বিলক্ষণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তখন আর দেহের জন্ম থাকে না,—উহার বিকারাত্মকতা ঘটিয়া যায় ও ব্রহ্মতনুতা আবির্ভূত হয়। সেহী জীবও তখন আর ভোগ ধামে না, ব্রহ্মভূমে প্রকাশ পায়। বিমোহিতানন্দের প্রাকট্য একমাত্র ভগবানের ইচ্ছাধীন। তাঁহার ইচ্ছা বলে। তিনি উৎপ্রকাশ অর্থাৎ আনন্দাংশে আবাহিত আত্মাকেও ব্রহ্মভাবে ধারণ করেন, আবার তা অন্তর্ধানমুখে ধারণ করেন।

ভগবান্ স্বতন্ত্রতা এক হইলেও অনেক প্রকারে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কখনও সঙ্কল্পমাত্রে করেন, কখনও বা পরম্পরাক্রমে করেন। পুরুষ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্টি পুরাণ ও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। কখনও কখনও ভগবান্ স্বয়ংই প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আবার অন্য সময়ে জ্ঞান্ ঐশ্বরাদিদের দ্বারা বাহ্যিক সৃষ্টিও করিয়া থাকেন। বাহ্যিক সৃষ্টি ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টিতে ভগবান্ স্বয়ং অন্তর্যামী থাকেন। বাহ্যিক সৃষ্টিতে আবাহিত জীবসমূহ থাকে। সেখানে অন্তর্যামিরূপে ভগবান্ থাকেন। বাহ্যিক সৃষ্টি ভিন্ন অন্যান্য সৃষ্টিতে ভগবান্ স্বয়ং অন্তর্যামী থাকেন। বাহ্যিক সৃষ্টিতে আবাহিত জীবসমূহ থাকে। সেখানে অন্তর্যামিরূপে ভগবান্ থাকেন না

এবং জ্ঞানক্রিয়োত্তরবিবিধি, এই তিন প্রকার। বেদের পূর্বকাণ্ডের প্রতিপাদ্য বস্তু যজ্ঞ। অধিকারী ভেদে ইহা জ্ঞানক্রিয়োত্তরবিবিধি হইলেও অনুষ্ঠান হইতে ফলানুভব পর্যন্ত অবস্থায় সাধনাঙ্গক ক্রিয়া রূপেই প্রতীত হয়। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য বস্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ইহার রূপ, গুণ ও শক্তি সকলই অনন্ত। অধিকারী ভেদে জ্ঞানবিবিধি ভগবৎস্বরূপ বুঝাইতে কোন সন্দেহ নাই, তথাপি শুদ্ধসত্ত্বি হইতে ভগবদ্ভক্তির উদয় পর্যন্ত ইহা জ্ঞানরূপেই প্রতীত হয়। নীতা ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে যে ভগবান প্রতিপাদিত হইয়াছেন তাহা ভক্তির বিষয় বলিয়া জ্ঞানক্রিয়াবিধি, সাধ্যের এবং অনন্তস্বরূপ। ইহাই কৃষ্ণ বা পুরুষোত্তমতত্ত্ব। সাধক ভক্তির বলে ভগবানের এই সাকার রূপই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অনন্তস্বরূপ, অনন্তরূপ, অনন্তগুণ, অনন্তশক্তি—সব ভগবৎস্বরূপের অন্তর্গত। অন্তর্যামী পরমাত্মা হইলেও জীবের সহিত থাকিলেও অনুপ্রবিষ্ট থাকে বলিয়া অনন্ত জ্ঞেয়বিধি। কিন্তু তথাপি ইহা কারণাত্মক ভগবদ্বিগ্রহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সাহায্যে সম্পাদন করিয়া থাকে। এই জন্য অন্তর্যামী কারণব্রহ্মের অন্তর্গত। বস্তুতঃ মনে মনে ভগবদাত্মক উপাসনা অত্যাবশ্যক। তন্ত্রাদি সাধারণতঃ পঞ্চবিধোপাসনা করে এবং সর্বাপি তাহার অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, এই মতে প্রকৃতি ও ভগবানের মধ্যে পরস্পর ধর্মবিপর্যয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সাংখ্য হইতে ভেদও লক্ষণের পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মতে পুরুষের নির্লিপ্তত্ব কেবলাদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ তাহাতে অবস্থা থাকে না। পুরুষ এক, অজ্ঞ ও চিন্ময়। জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব শুধু অবস্থা-ভেদমূলক, স্বাভাবিক নহে। অবস্থাভেদের হেতু বিভিন্ন প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যাবহারিক ও মূল, এই দুই প্রকার। যখন পুরুষ ভগবদ্বিগ্রহবশতঃ মোহিনী প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করেন তখন ইহার ব্যাপারভূত মোহক গুণের দ্বারা আবৃত হইয়া জীবাবস্থা প্রাপ্ত হন। আর যখন মূল প্রকৃতিকে গ্রহণ করেন, তখন স্বরূপে থাকিয়াই জগতের কারণরূপে থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে এই পুরুষের এবাপেক্ষা মূল প্রকৃতি, অন্যরূপে মোহিনী প্রকৃতি অবস্থিত আছে। উভয়ের অধিষ্ঠাতা একই পুরুষ। ইনি ভগবানের রূপ। কিন্তু ইনিও ভগবান্ নহেন। জীব চিন্ময় বলিয়া পুরুষের সজাতীয় হইলেও পুরুষ হইতে পৃথক্। জীবকে পুরুষের অংশও বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, পুরুষাংশই হউক অথবা অন্যরূপই হউক, জীব যে ভগবদ্রূপ নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মের রূপ আছে কি না, এই প্রশ্নের প্রতি অনেকের মনে উদিত হয়। আচার্য বলেন যে 'রূপ' শব্দের অর্থ ব্যবহারের * বিষয় অথবা ব্যবহারের সাধন উভয়ই হইতে পারে। ইহার কোন অর্থেই ব্রহ্মের রূপবত্ত্ব স্বীকার্য নহে। রূপ এবং রূপবান্ পরস্পর ভিন্ন, ইহা লৌকিক প্রতীতি-সিদ্ধ। ব্রহ্ম কখনও রূপাশ্রিতাশ্রয়ী হইতে পারেন না। বস্তুতঃ রূপও ব্রহ্মাত্মক,—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোনও জ্ঞেয় নাই। সেই জন্যই "আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি" প্রভৃতি শাস্ত্র-বচনে ভগবান্ ও ভগবদ্বিগ্রহের চিন্ময়ত্ব-মাত্রত্ব সমভাবে অঙ্গীকার করা হয়।

এই চিন্মাত্রই রস পদার্থ। ইহাই জীবের প্রাপ্য হইবার প্রয়োজক ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া—ভক্তরূপীদের ইহার অভিব্যক্তি হয়। ভক্তগণে যে রসের বিবরণ পাওয়া যায় তাহা বস্তুতঃ ভগবানেরই লীলাভূত রূপ। রসাভিব্যক্তির প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, সেই জন্য রস বস্তুতঃ এক হইয়াও নানারূপে প্রকাশমান হয়। বাস্তবিক পক্ষে পরব্রহ্মই প্রণালী ভিন্নতে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া রসস্বরূপ হন। অনন্তশক্তি বারিধিতে এই প্রকার আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। তবে বাস্তবিক ভগবানের আবির্ভাবও বস্তুতঃ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজের পুরুষোত্তম বলিয়াছেন—"অবিরাবির্ভূতাপি ভগবতো ভগবদ্ভাবেন।" আর এক কথা। ভগবান্ যেমন রস স্বরূপ, তেমনই তিনি রসের ভোক্তা। তিনি রস হইয়াও ভগবান্। রস ভগবান্ নিজের রসের দ্বারাই ভগবান। নিজরসের ভক্তিভাবক

* ব্যবহারের ও অনুষ্ঠানের ভাষান্তরে এখানে 'ভগবান' অর্থ বুঝিতে হইবে।

স্বামী ভাবময়। তত্ত্বতঃ তদ্ব্যতীত স্বরূপতঃ কিছি ও কিছিমান্। কিছি যাহা আলম্বনবিভাব (যেমন কৃষ্ণ-সোপী) আশ্রয় ভাবাস্বাদনেরই তত্ত্বমাত্র স্বভাবসাত্ত্ব। আলম্বন যে প্রকার, তাহার প্রতি ভগবানের ভাবও সেই প্রকার। মনে রাখিতে হইবে ভাবও ভগবৎ স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কোনও পদার্থ নহে। ভগবান্ নিজেই রতি এবং নিজেই তাহার আস্বাদনকর্ত্তা। * যাহারা মনে করেন লীলা অনুকরণময় এবং প্রিয়া বিরহ ও তজ্জন্য ক্রন্দনাদি পূর্ণজ্ঞানময় পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক ভগবানে সম্ভবপর নহে, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে লীলাময় বিভু ভগবানের পূর্ণত্বের বাধক নহে। আর লীলা যে অনুকরণ, ইহাও ঠিক নহে। ভগবান্ পূর্ণরস স্বরূপ, এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রিয়াবিরহ ও মিলন এবং তৎকার্য্যাদি তাঁহাতে অবশ্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোনই হেতু নাই। আর তাহাতে মহত্ত্বের হানিও হয় না। কারণ, ভগবদ্ভাবে যাহাতীত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ আছে। শ্রুতি তাহাই বলেন এবং সিদ্ধভক্তগণও তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার অচিন্ত্য মহিমা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ।

ভগবানের ন্যায় তাঁহার ভক্তও নিত্য ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। যে সকল ভক্তকে তিনি স্বকীয় ঐশ্বর্য্যাদি দান করেন, যতদিন তাঁহার ইচ্ছা ততদিন তাঁহাদিগের জন্যও ঐ সকল বস্তু অবস্থান করে। এই জন্যই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ লীলাকেও নিত্য ও নিত্যই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অনায়াসে প্রিয়বাক্য কথনকে লীলা বলা হয়। ইহা প্রতিযোগি-সাপেক্ষ, এবং প্রতিযোগিবিরহেও, এই দুই প্রকার। স্বাভাবিক নিত্য লীলাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু ভগবল্লীলার প্রতিযোগীর অপেক্ষা নাই। যাহা হউক, যদি লৌকিক দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া আলোচনা করা যায় তাহা হইলে লীলা ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কি কি বাধক আছে যা কল্পিত হইতে পারে তাহার নির্ম্মোচন আবশ্যক। পূর্ব্বপক্ষের মহাবাক্য যে সকল সম্ভাব্যমান বাধক উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে ভগবল্লীলার নিত্যত্ব সম্বন্ধে তাহার মধ্যে একটিও প্রযোজ্য নহে। ভগবানের নায়ক লীলাবৎ নিত্য। তাঁহার যে নাম যে রূপবিশিষ্টরূপধারী, সেই রূপবিশিষ্ট রূপের সেই নাম নিত্যই আছে। তবে ভক্তের ভক্তভেদের বিভিন্ন রসানুভবের জন্য কখনও কোনও রূপের আবির্ভাব হয়, কোনও রূপের তিরোভাব হয়, ইহাই বিশেষ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলেন—"লোকে পরম ভোগ্য ভক্তানাং ভক্তানুগ্রহার্থং রূপেণাবির্ভবতি: কদাচিৎ কদাচন, ভক্তি-বিজ্ঞানসিদ্ধিযোগ্য: ভবতি। যেন ভগবান্ গোবর্দ্ধন-মুদ্ধরন্ ন্যায় বর্দ্ধত ইতি 'গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ' ইতি ক্রিয়ানামভাক্ত: সন্নিধৌ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণকর্ত্তা ন্যায় বর্দ্ধতে। অতএবাত্মাদি ভক্তনাং তথানুরূপ: ভবতি।" প্রতিক্রিয়াতে ভজন ও সাধনের ব্যবস্থা আছে। যদি ভজন করিয়া হয় ও ভগবান্ও না হয় তাহা হইলে তাহাকে ভগবদ্ভজনের অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। তাহা ভগবানের প্রসন্নতা-হেতু ভজন নহে। কিন্তু ঐ প্রকারে ভজন করিয়া যে ভগবৎ প্রসাদ লাভ করা যায় তাহা সত্য কথা। ভজন হইলেই ভাবেরও আবশ্যকতা আছে—ভাবও ভগবদ্ভাবরূপ ও নিত্য। বস্তুতঃ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম সবই নিত্য ও চিন্ময়। *

—ক্রমশঃ

---

* দ্রষ্টব্য—"ভক্ত ভক্ত ভাব ভাবুক ভাবনাময় ভগবৎ ভগবদ্ভাবময় যে. ভক্ত ভাবুক ভাবিত ভাবনাময় ভাবুকভাবিত ও ভক্ত ভগবান্। ভগবদ্ভাব এব। ভক্ত ভাবের ভাবী ভাবনী ভাবনাময়।" (বিষ্ণুধর্ম্ম, পৃ ১৮২)।

* দ্রষ্টব্য—"ভক্তভাবনি ভাবভাবী ও ভক্ত ভগবানি নিত্য পূর্ণবিজ্ঞানময় ভক্তভাবের ভাব। যে ভক্তের ভাবনি ভাবনী ভাবনি ভাবনাময়ী ভাবনাময়ভক্তভাবনাময়ী ভাবনাময়। যেন ভগবদ্ভাবনি ভাব ভক্তের ভাব ইতি ভাবনাময়ভাবনী যেন। ভগবদ্ভাবনি ভাবনাময়ী ভাবনাময়ভাবনাময়ী ভাবনাময়ভাবনাময়ী যেন। পূর্ণবিজ্ঞান এব ভাবের ভগবদ্ভাবনাময় ভাবনাময়ী যেন।" (বিষ্ণুধর্ম্ম)

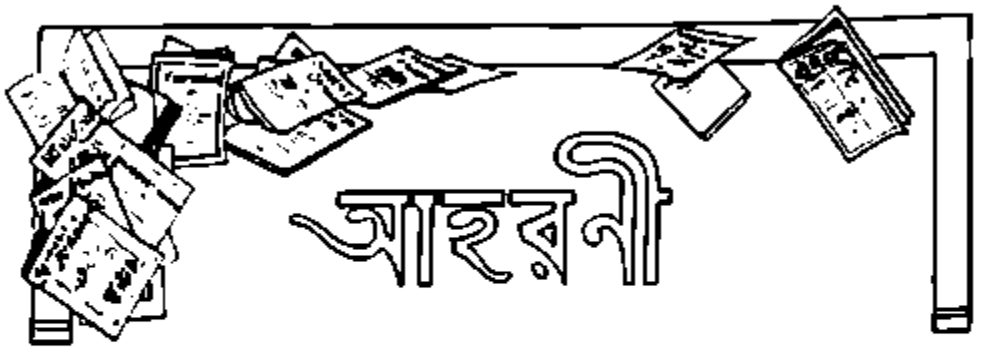

নারী-জাগরণ

সমস্ত জগতে নারী-জাগরণের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশের মহিলারা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছেন। যে সব দেশে মহিলা-আন্দোলনের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, সে সব দেশেও মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য নারীরা আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। ইঁদের অনমনীয় মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সব মানব-মানিকাদের একাসনে বসা নিশ্চয়। বিশ্বের ও ভূগতে মানিকারা আজ পরের হক অমানুষিক মূল্য পুরুষ অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে হ'চ্ছে। আজ কাল এই সব দেশের মহিলারাও জাগরিত হয়েছেন ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য নানা রকম আন্দোলন চালাচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়ার মেলের তুলনায় আমেরিকার শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা বেশ বেশী। শিক্ষা তাঁদের নানা রকম জনহিতকর কার্যের উপযোগী করেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছেন।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে মহিলারা ভোট দেবার অধিকার পেয়েছেন। অনেকজন মহিলা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্যও নির্বাচিত হয়েছেন।

রুশিয়া ও ইটালি দেশগুলিতে স্ত্রীজনের নানা ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইটালির দেশগুলির স্বামীরা পরিবার ও স্ত্রীর উপর স্বামী অনেক দিন পূর্বেই ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তবে ইটালি মহিলারা ভোট দেবার অধিকার এখনও লাভ করেন নি।

রুশিয়াতে বালক-বালিকারা একত্রেই শিক্ষা লাভ করে ও চিকিৎসাক্ষেত্রে পেশাদার মহিলাদের স্বাধীনতা আছে। তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মহিলাদের তুলনায় রুশিয়ার মহিলারা অনেক বিষয়ে এখনও পশ্চাতে প'ড়ে আছেন।

মহিলা ও ছোট ছেলেদের জন্য নিউজীলণ্ডে (New Zealand) বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানকার মহিলাদের ভোটের অধিকার আছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন। কেবলমাত্র সভ্য হবার অধিকার তাঁরা এখনও পান নি। বিধবা ও অবিবাহিতা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের পেনসন দেবার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের এক-তৃতীয়াংশ মহিলা।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও মহিলারা জাগরিত হয়েছেন। চীন দেশে অসংখ্য মেয়ে দলে দলে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছেন। সব রকম আন্দোলনেই তাঁরা পুরুষের সমান যোগ দিচ্ছেন। জীবনের নানা বিভাগে মহিলাদের অধিকার যাতে প্রাপ্ত হয় সেই জন্য তাঁরা আন্দোলন করছেন।

ভারতবর্ষে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্তা রাধা প্রভৃতি মহিলারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। সম্প্রতি মহিলাদের ভোট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

জাপানে মহিলা আন্দোলন এখনও তেমন প্রবল হয়নি। তবে কিছু দিন পূর্বে সেখানকার ইম্পিরিয়াল ডায়েট (Imperial Diet) মহিলাদের ভোটের অধিকার দেবার জন্য একটি বিল আনা হয়েছে। জাপানে উচ্চশিক্ষিতা মহিলার অভাব নেই, তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে তাঁরা এখনও অগ্রসর হননি। সাহিত্য, রাজনীতি, কলা, খেলাধূলা বা সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানেও তাঁদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। জাপানী মহিলারা তাঁদের চরিত্রের মাধুর্য না হারিয়ে যাতে এই সব ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে পারেন, এই জন্য শ্রীমতী ফুজিনো, শ্রীমতী ফুজো, শ্রীমতী শিরোসে প্রভৃতি মহিলারা চেষ্টা করছেন।

(Indo-Japanese Journal :—Japan.)

মণি ও মুক্তা

বহু দিন থেকে মণি ও মুক্তার ব্যবহার চলে আসছে। কোন্ দেশে যে এগুলির ব্যবহার আরম্ভ হয় এখন তা জানবার কোন উপায় নেই। অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষেই প্রথমে এগুলির ব্যবহার আরম্ভ হয়।

Mr. Tetis বলেন, এশিয়াতেই সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয় ও অনেক জিনিষের জন্য এশিয়ার কাছে ইউরোপ ঋণী। এশিয়াবাসীরা নানা ভাবে রাজার মুকুট ও সিংহাসনে, দেবমন্দির মূর্তিতে, বর্ম অস্ত্রশস্ত্রে ও কৃত্রিম সংস্কারের জন্য মণি ও মুক্তা ব্যবহার করতেন।

প্রাচীন হিন্দুরা রত্নগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। প্রত্যেক রত্নকে আবার চার বর্ণে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ভাগ করা হয়েছিল।

হীরা, মুক্তা, নীলা, মরকত ও পদ্মরাগ এই ক'টি মণিকে ব্রাহ্মণ বলা হতো।

জেসিন্থ (Jacinth) জোপাজ (Topaz পোখরাজ) কোরাল (Coral—প্রবাল) এইগুলিকে ক্ষত্রিয় বলা হ'তো।

শুক্রনীতিসারে নবরত্ন এই ক'টি মণিকে বলা হতো—বজ্র (হীরা) মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, নীলা, বৈদূর্য, পুষ্পরাগ, মরকত ও মাণিক্য (পদ্মরাগ)।

রত্নগুলির মধ্যে হীরাই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। হীরা ধারণ করলে, ধন, সাহস, দৃঢ়তা আসে ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয়।

হীরা ব্যবসায়ীদের বিষ, পাপ ও দুষ্টলোক থেকে রক্ষা করে। হীরা ধারণ করলে রোগ স্পর্শ হয় না। আহত ও পীড়িত রোগের রোগেরা মনে করলে হীরা ধারণ করলে রোগমুক্তির উপায় হয়।

হিন্দুরা হীরাকে চার বর্ণে ভাগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ (শ্বেতবর্ণ) বজ্র ও সত্যকি আনে। ক্ষত্রিয় (রক্তাভ হল) জয় ও বাড়ন্ত সুখ করে। বৈশ্য (পীত) সকল কার্যে সফলতা আনে। শূদ্র (কাল) সর্ব প্রকারে দৌর্ভাগ্যের সূচনা করে।

জল করে ধারণ করলে রত্নগুলির বিশেষ গুণ নষ্ট হয়ে যায়। কোন লোকের কাছ থেকে উপহার স্বরূপ পেলে তবে এগুলি ব্যবহারে উপকার হবে। হীরা বিষ নাশ করে ও রোগ দূর করে।

মানবের জীবন আকাশের গ্রহগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রহগুলির কোপ-দৃষ্টি দূর করবার ও অনুগ্রহ লাভের জন্য বিভিন্ন রকমের রত্ন ব্যবহার করা হ'তো।

রবি (bat's eye, এক রকমের পাথর) চন্দ্র (মীনা), মঙ্গল (প্রবাল), বুধ (চুনী), বৃহস্পতি (মুক্তা) শুক্র (হীরা) শনি (নীলা), রাহু (Zircon), কেতু (মরকত)।

চালডীয়ার ও ইউরোপের লোকেরা রবির জন্য হীরা ব্যবহার করেন।

মুক্তা—স্বাস্থ্য, পুত্র দান করে ও সব রকম রোগ দূর করে এবং রূপ অধিক সরল করে। বৃহস্পতির অনুগ্রহ লাভের জন্য ধারণ করা হয় ও চন্দ্রের অনুগ্রহ লাভের জন্য আভরণের দান করা হয়।

চুনী—স্বাস্থ্য ও শক্তি আনে। চিন্তা দূর করে, ক্রোধ ও রোষ আসতে দেয় না।

নীলা—বহুমূত্রে ব্যবহৃত হয়। বাতের বেদনাতে অত্যন্ত লাভ হয়। চন্দ্রের মৃগুরীর জন্য ব্যবহৃত হয় ও শনির জন্য দানে করার ব্যবস্থা আছে। মুক্তা ব্যবহারে শক্তি ও উৎসাহ আনে।

মরকত—ব্যবহারে ভবিষ্যৎ জানা যায়। জ্ঞানবৃদ্ধি ও অর্থ লাভের জন্য মরকত ব্যবহার করা উচিত। বাতের দুর্বলতা আরোগ্য হয়। মুখ ও ঠোঁটের ফোস্কা দূর করবার জন্য ধারণ করা উচিত। দুর্জয় শত্রু বাধা করলে লাভ হয়।

প্রবাল—যকৃতদোষ আরোগ্য করে।

গোমেদ—কোষ পরিষ্কার করে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রদান করে।

গোমেদ—যশ ও জ্ঞান লাভের জন্য ধারণ করা উচিত।

(C. Koneri. Indian Review.)

ভারতবর্ষে মিউজিয়াম

মিউজিয়াম শুধু আমাদের কৌতূহলী তৃপ্তিসাধন করে না, আমাদের নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণেও সাহায্য করে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসীরা শিক্ষাক্ষেত্রে মিউজিয়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, সুখের বিষয়, আজকাল তাঁদের এ বিষয়ে মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে।

কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ মিউজিয়ামের কথা সকলেই জানে আছেন, এই কারণে সেগুলি সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কোন উল্লেখ থাকবে না। এগুলি ছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আরো অনেকগুলি মিউজিয়াম আছে। এ প্রবন্ধে সেগুলির বিষয় আলোচিত হবে। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে একটি চমৎকার মিউজিয়াম আছে। একটি সুরম্য উদ্যানের মধ্যস্থলে, ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শে মিউজিয়াম গৃহটি নির্মিত হয়েছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ এডওয়ার্ড এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ৭০ একর জমির উপর, Dr. De Fabrecki-এর উপদেশ মত ৪০,০০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে জয়পুর মহারাজ এই সুন্দর উদ্যানটি রচনা করেছেন। এই উদ্যানটির পরিচর্যার জন্য প্রতি বৎসরে মহারাজা তিন হাজার টাকা ব্যয় করেন।

মিউজিয়ামটিতে মহারাজা আধুনিক সুন্দর শিল্প ও কলার নিদর্শন ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছেন। এখানকার সিল্ক, কার্পেট, পর্সিলেন, (Porcelain) ও মাটির পাত্রগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিউজিয়ামের পাশেই একটি কলা-ভবন আছে। এই বিদ্যালয়টিতে গেলেই প্রাচীন ও নবীন শিল্পধারার পার্থক্যটি সহজেই চোখে পড়ে। আধুনিক সুন্দর শিল্পে শিল্পীদের প্রাণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন সুন্দর শিল্পীদের কাজ কিন্তু তাদের প্রাণের রসে ভরপুর ছিল। এগুলি ছাড়া মিউজিয়ামটিতে নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্র, সুন্দর কারু-কার্য-খচিত ছুরী ও অসির খাপ, আসবাব ও অস্ত্রপত্রের বিভাগে নানা রকমের শিল্পের নিদর্শন আছে।

রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যেও একটি মিউজিয়াম আছে কিন্তু জয়পুরের মিউজিয়ামটির সহিত কোন বিষয়েই এটির তুলনা হয় না। রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে এটির নাম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট রাখা হয়েছে। উদয়পুর রাজ্য সুন্দর পট্টবস্ত্রাদির জন্য বিখ্যাত। এখানকার অশ্ব রাজীগুলির মত মিউজিয়াম গৃহটিও শ্বেতবর্ণের ও মুসলমান স্থাপত্যের আদর্শে তৈরী। মিউজিয়ামটিতে একটি ছোট লাইব্রেরিও আছে। বিশ্ব জাতি নানা বর্ণ ও শ্রেণীতে বিভক্ত। সব শ্রেণীর লোকের রচিত গ্রন্থগুলির তৈরী জন্যার ছাঁচ এই মিউজিয়ামটিতে আছে। এগুলি ছাড়া উদয়পুর রাজ্যের শিল্প ও কলার নমুনা ও প্রাচীন দ্রব্যাদির সংগ্রহও আছে।

বর্তমান ভারতবর্ষের বেশী রাজ্যগুলিতে বহুকেটি মিউজিয়াম আছে। এখানকার রাজাদের আগ্রহ আর উৎসাহে তাঁদের রাজ্যের নানা রকম জিনিষ এই মিউজিয়ামগুলিতে স্থান পেয়েছে। মিয়াপুর রাজ্যের রাজধানী সিকেন্দ্রাবাদে একটি বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যখানে একটি মিউজিয়াম আছে। এই মিউজিয়াম

ও তার পাশে বাগানটি এখানকার অধিবাসীরা বহুদূর থেকে দেখতে আসে। এই রাজ্যের ভূতপূর্ব রেসিডেন্ট General Cullen এটির পত্তন করেন। তিনিই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এখানকার পাথরগুলি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। জিবাদুর রাজ্যের উদ্ভিদ, জীবজন্তু, এখানকার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার, শিল্প ও কলার পরিচয় এই মিউজিয়াম থেকে পাওয়া যায়। এখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মূর্তি ও বাসগৃহের একটি নমুনাও আছে। এখানকার রৌপ্য, ধাতুনির্মিত ও চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্য বহুমূল্য ও সমৃদ্ধির যথেষ্ট সাক্ষ্য এই মিউজিয়মটিতে রাখা হয়েছে।

মহীশূরের রাজা তাঁর রাজধানী, ব্যাঙ্গালোরে (Bangalore) Cobham Park নামক সুন্দর বাগানে একটি মিউজিয়াম স্থাপিত করেছেন। এটি সাল পাথরের তৈরী। রাজ্যের প্রধান আকরের পরিচয় এখানকার সংগৃহীত জিনিষগুলি দেখতে পাবে। মিউজিয়মটিতে নানা রকম বন্য পশু, পক্ষী, সর্প, প্রজাপতি, মহীশূর অধিবাসীদের পোষাক ও অলঙ্কার এবং কুকুর-দম্পতীর অনেক রকম নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যালয়ের জন্য অল্প কয়েকটি সরেস ছোট ছোট মিউজিয়াম স্থাপনের চেষ্টা চলছে।

ব্রিটিশ ভারতে স্থাপিত দুটি মিউজিয়মেরও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। Dr. Marshall ও তাঁর সহকর্মীদের যত্নে মথুরার প্রাচীন প্রত্নবস্তুগুলি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। মথুরার প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তিগুলি খুব সুন্দর ও প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে বলে দর্শকেরা সহজেই গুপ্তলি সম্বন্ধে সব জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারেন।

সারনাথে বৌদ্ধ-যুগ খুঁড়ে মূল্যবান অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এখানকার ইহা জিনিষগুলির মধ্যে অশোক স্তম্ভের উপরের সিংহমূর্তিগুলি সকলেরই খুব ভাল লাগে। এছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলির শিল্পনৈপুণ্য যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

পাথর ও সিমেন্টের মিশ্রণের ফলে প্রাচীনকালের অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়েছে। সেগুলিকে রাখবার জন্য খুব সম্ভব আর একটি মিউজিয়াম তৈরী করতে হবে। Taxilaতে Sir John Marshall যে সব জিনিষ পেয়েছিলেন, সেগুলি সেখানেই একটি ছোট মিউজিয়মে রাখা হয়েছে।

লাহোর মিউজিয়মে প্রাচীন যুগের অনেকগুলি খোদিত মূর্তি ও মুদ্রার নমুনা আছে। এগুলি দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত নানা রকম অক্ষরেরও সুন্দর সংগ্রহ আছে। শ্রীনগর মিউজিয়মে কাশ্মীরের মহারাজা সেখানকার প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন ও কাশ্মীর রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদির নমুনা সংগ্রহ করেছেন। (Modern Review.)

—শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রম্যা রলাঁ ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইতিহাস

শ্রীকালিদাস নাগ—কলিকাতা।

শিল্পী কবি ও ভাবুক হিসাবে রম্যা রলাঁ আমাদের কাছে অপরিচিত নহেন, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে তাঁকে 'সঙ্গীতজ্ঞ' বলে শুনে আমাদের অনেকেরই লাগে ধাঁধা; সেই যে সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর সাধনার যোগ কোন্‌খানে। আমাদের দেশে 'সঙ্গীতজ্ঞ' বল্‌তে আমরা সাধারণতঃ বুঝি সেই সব মানুষকে, যাঁরা হয় কণ্ঠ, নয় যন্ত্র-সাধনায় জীবন পাত করেছেন; কিন্তু ইউরোপে তাই তার আর একটু ব্যাপক অর্থ। সে গান, সে বাজনা শুধু সে নয়—যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সুরের বিচিত্র ছন্দে গড়ে তোলে ওই সেই সঙ্গীতজ্ঞ। 'গাইয়ে' 'বাজিয়ে' ছাড়াও পৌঁছে দেয় কাণ যাঁরা, আর তাকে "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়ে" দেওয়ার মানুষ আছে সুর-রসিকদের কাছে। প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় বলে Musician সুধীজন, দ্বিতীয় শ্রেণীকে বলে Musicologist সুর-রসিক। রলাঁ এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের গুণী। সুর ও সুরস্রষ্টাদের বিবিধ রহস্যময় ও অসীম রসোপলব্ধির অনুশীলন করে' পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইতিহাসে তিনি অমর কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন। সঙ্গীতকে কেবলমাত্র শ্রবণের এবং চক্ষুর সাধনার জিনিষ করে' না রেখে, তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, বিশ্বমানবের শিল্প-সৃষ্টি ও ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার একটি সুন্দর সুর আছে—সেই সুর চেনা ও সেই সুর-বোধ সাধারণের, অন্ততঃ আমাদের একটি বড় কাজ, কারণ তার ভিতর দিয়ে মানব-সভ্যতার একটি বড় ঐক্য-বুদ্ধিতে আমরা উপনীত হতে পারি। এই ভরসা রলাঁ তাঁর "ইতিহাসে সঙ্গীতের স্থানে" (De la place de la Musique dans l' Histoire generale.) বিষয় প্রবন্ধে পরিস্ফুট করেছেন।

সঙ্গীতের ক্রিয়া দিয়ে তার বড় সম্বন্ধে পৌঁছান যায়, তবে কেবল উহা মানুষ কি অনুভব বল সৃষ্টি করতে পারে তার দ্বারা বর্ণাঢ্য সমগ্র জীবন ও সাধনা। "Music and Life" (Visva Bharati Quarterly April 1925) এবং "সুর-রসিক রম্যা রলাঁ" (প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩২) এই দুই প্রবন্ধে আমি তাঁর নিজের ভাষায় ঐ কথাটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। আজ তাঁর সঙ্গীত-রস-পাথেয়ের সাধনার ইতিহাসে একটু দিতে চাই। যাইবার পূর্ব্বে রলাঁর জন্ম বহুরা তাঁর সম্বন্ধে নানা দিক দিয়ে আলোচনা করে' তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বরূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন; তাঁর শিল্পজীবনী সঙ্গীতজ্ঞ Mon Henri Prunieres * অনেক খবর দিয়েছেন; তাঁর প্রবন্ধ এবং রলাঁ সম্বন্ধে অন্য বই ও লেখা অবলম্বন করে' কিছু কিছু আভাষ আমা 'উত্তরা'র পাঠকদের উপহার দিই।

১৮৯৪-১৮৯৫ এর মধ্যে রলাঁ তাঁর মৌলিক গবেষণা শেষ করে' দুটি থীসিস্ প্রস্তাব এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের Doctorat es lettres উপাধি লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ, ফ্রান্সে অধ্যয়ন শেষ করে' তিনি ইতালীয় সঙ্গীত ও শিল্প নিয়ে তখন মেতে আছেন; তাঁর প্রথম থীসিস্ সুষ্টী ও তাঁর সমসাময়িক পূর্ব্বোক্ত ইটালীয়ান অপেরার ইতিহাস—কথাটী একটেরীর পুরুষার লাভ করে। দ্বিতীয় থীসিস্‌টি লাভিন ভাষায় লেখা; গন্তব্যস্থল সঙ্গীতীয় ইতালীর চিত্রকলার অবনতি; ইহা ১৮৯৬ সালে প্যারিসের প্রসিদ্ধ পত্রিকা La Revue

* ফরাসী মাসিক পত্রিকা "Europe" (Feb 1925) বিশেষ সঙ্গীত-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রম্যা রলাঁ—কৈশোরে

[প্রবাসীর সৌজন্যে]

রম্যা রলাঁ—পরিণত বয়সে

de Paris'ে ছাপা হয়। এই সময় আর একটি পত্রিকা Le Revue de l' Art dramatique প্রকাশিত হয় এবং উক্ত দুটি পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে বর্লিয় সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রবন্ধ আলোচনাদি ছাপতে থাকে। তাঁর প্রথম নাট্যাভিনয়াত্মক একটি কাজের ছাপা হয়। Saint Louis (১৮২৯) Acis (১৮৩০) Le Triomphe de la Raison (১৮৩৩) প্রভৃতি নাটকগুলির মধ্যে দু'একটি পারিসের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে পারে। বর্লিয় শিল্পজীবনের এই হল সুরু। Don Lorenzo Perosi, Mozart Richard Strauss প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুর-শিল্পীদের নিয়ে বর্লি সঙ্গীত আলোচনা করে' প্রবন্ধ থেকেই বেশ আভাস দিয়েছিলেন যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ঐতিহাসিক গবেষণার সঙ্গে তাঁর জন্মগত শিল্প-প্রেরণা, অসীম সুর সম্বন্ধে তাঁর গভীর অনুভূতি ও মানবহৃদয় সম্বন্ধে তাঁর নিবিড় অনুভবের তাঁর কাজের মধ্যে সমন্বয় খুঁজছে। এই সমন্বয়টি তাঁর মধ্যে বেশ বেশী যায় এমন কম শিল্পীর মধ্যেই পাই। ফ্রাঙ্কে La Fage, Fetis প্রভৃতি দু'একজন সঙ্গীত নিয়ে লেখালিখি আগেই করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁরা সমালোচনার কোন স্থায়ী পদ্ধতি তাঁর করতে পারেন নি। ১৮৩৪ সালে বর্লিয়ের সঙ্গে সঙ্গে একদল সুরতাত্ত্বিকের আবির্ভাব হয়: Michel Brenet, Henry Quittard, Pierre Aubry প্রভৃতি মিলে সঙ্গীত-ইতিহাস লেখার বিধি পদ্ধতি করতে লেগে যান। তবু এঁরা ও সুর-শিল্পীর খাঁটিরা ও তফাৎ তাঁরা বিশ্লেষণ করতে থেকে উঠার করে' গেছেন। সঙ্গীত গানের উঠার করতে হলে এখন গান ও রঙ্গমঞ্চ প্রত্নতাত্ত্বিকদেরও বিশেষ প্রয়োজন; না হলে অনেক ঘরগড়া নিছক ও কাল্পনিক মতামত সঙ্গীতের ইতিহাসে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গীতের চিরন্তন সত্যের মিলন যিনি করতে পারেন তিনিই যথার্থ শিল্পী; প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে একমাত্র Andre Pirro এই কাজ করতেও করেছিলেন, এবং তবুও বর্লি এই অপূর্ণ সমন্বয়টি নিজের হাতের তুলিতে করে' অনেক বাকী রেখে গেলেন। বড় তাকে অবশ্য তাঁর সঙ্গীত তাৎপর্য তার ধারাই তাঁর সঙ্গীত প্রবন্ধের মূল্য উৎস।

এই উদ্দেশ্যটি সাধন করবার সুযোগও মিলেছিল। ১৯০০ সালের জুলাই মাসে প্যারিসে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত মহাসম্মেলন (International Congress of Music) প্রথম অধিবেশন হয় এবং বর্লিকে তার সভাপতি করে' গৌরবান্বিত করা হয়, তার ফলে সঙ্গীতের ইতিহাস ও সমালোচনা সম্বন্ধে সাধারণের যে উদাসীন্য ও তাচ্ছিল্য লক্ষিত হয়েছিল সেটা দূর হয়। বর্লির প্রতিভার সমাদর করল: তাঁকে প্যারিসের বিদ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে টেনে নিয়ে যায়: প্রথম তিনি তাঁর নিজের বলেই Ecole Normale-এর শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপনা করবার ভার নিযুক্ত হন; সেই সুযোগে ক্রমে ক্রমে তিনি সঙ্গীত শিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তার মৌলিকতা সাধারণে উপলব্ধি করবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৩ সালে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের (Sorbonne) সঙ্গীত ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে বৃত হন। কিছু পূর্বে ১৯০১ সালে প্রসিদ্ধ Revue Musicale পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয়। Pierre Aubry, Jules Combarieu প্রভৃতির সঙ্গে বর্লিও একজন প্রধান পাণ্ডা হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে Ecole des Hautes Etudes Sociales নামক যে গবেষণা-কেন্দ্র প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয় তার মধ্যে সঙ্গীত পাঠাদির পরিচালনার ভার বর্লির উপর পড়ে। এই বছরেই বর্লি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Musique et sa place dans l' Histoire লিখে অধ্যাপনা সুরু করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়-বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে কত বড় কাজ তিনি করে' গেছেন:—(১) অপেরার ইতিহাস (১৯০২-১৯০৩), (২) Gluck-এর সঙ্গীত-শিল্প (১৯০৩-১৯০৭) (৩) Grétry ও Hugo Wolf (১৯০৪-১৯০৫), (৪) বেটোফেন্ (Beethoven)-এর পূর্বেকার ইতিহাস (১৯০৪-১৯০৬), (৫) Reinhard keiser। ফ্রান্সে অপেরার ইতিহাস (১৯০৬-১৯০৭), (৬) অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস (১৯০৭-১৯০৮) (৭) Handel ও তাঁর যুগের সঙ্গীত (১৯০৮-১৯০৯) (৮) অষ্টাদশ

পরাজীর সঙ্গীত ইতিহাস (১৯০৩-১৯১০) (৯) Melodrama-সঙ্গীতে কথা-রূপের প্রকাশ (১৯১০-১৯১১) (১০) Mozart (১৯১১-১৯১২)।

একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরিষদগৃহে বিশেষজ্ঞের যত এই সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্যদিকে সঙ্গীত ও ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ প্রাণ ভরে তোলা—এই দুটি ধারার অপূর্ব মিলনই রলাঁর জীবন ও রচনাকে এত বড় করেছে। ১৯০৩ সালে রলাঁ "জনসাধারণের নাটক ও থিয়েটার" (Le Theatre du Peuple et le drame du Peuple) নামে প্রবন্ধ লিখে আধুনিক নাট্য-শিল্পের অবনতির জন্য জনসাধারণের স্বাভাবিক নাট্যপ্রেরণার বিকাশে বাধা বলতে লেখে যান। আমাদের দেশের "যাত্রা" একদিন নাট্য-কলা ও অপেরা (Opera) আভিজাত্যের দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীর ভেঙে সর্বসাধারণের প্রাণের ভিতর দিয়ে ফুলে-ফলে সুরভিত আমাদের কাছে রলাঁর এই প্রবন্ধের বিশেষ আবেদন ছিল। Le Theatre du Peuple (১৯০৩) বইখানি আমাদের পড়ে নিয়ে পড়া উচিত। সাধারণের এই "ভাষা হারিয়ে গথা বোবার" বেদনা রলাঁর মনে খুব প্রবল, বিশেষতঃ যত বড় বেদনা তাদের যখন আর প্রাণে তখন তিনি ছুটে বেরিয়ে পড়ে তার মধ্যে টান দেন—দুঃখের দুরন্তপ্রাণ যেন অবগাহন করে' জীবনের সব সঞ্চয় সব সম্বল নিয়ে এক মহান্ সুর-সঙ্গতিতে যেন রূপায়িত করেন। ১৯০১ সালে তাঁর জীবনে এক বড় আঘাত-লাভ আসে, তাঁর মুখই চেয়েছি, প্রাণ খুলে হৈরাণে একেবারে ভেঙে পড়ে—তাঁর ভিতরের গোটা মানুষটির যেন প্রাণ থাকলেও নয়—সামনে শুধু অন্ধকার আর ব্যর্থতা—তখন রলাঁ হঠাৎ খবর পান Mayence-এর শিল্পী Beethoven-এর বেদনা মূর্তির; তাঁদের রলাঁ ছুটে গিয়ে সেই বেদনা জনসাধারণের সঙ্গীত-স্রোতে মিলিয়ে দেন; যেন সাহিত্যে গিয়ে এসেন সব সংস্কার যেন মিটে গেছে—সব সঙ্কোচ যেন দূরীভূত হয়েছে। এই সুর অবগাহনের ফলেই তিনি Beethoven-এর অনুপম জীবনী; এই একটি ঘটনা রলাঁর প্রতিভার নানা ঐশ্বর্যময় বৃত্তিকে বিকশিত—সফলে অনুকূল করেছিল একথা বড় নিশ্চয় আশ্চর্যের হবে না।

Beethoven বেদনার সেই উজ্জ্বল জয়মুকুটটি জাঁ ক্রিস্তফের (Jean-Christophe-এর) অনুপম জয়মুকুটে জীবনের রচয়িতা। রলাঁর অনেকেই বিশ্বাস ও বিশ্বাসের কিন্তু রলাঁর ভিতর দিয়ে একটা সমগ্র মূলের সুর ঘুমে, আশা বৈরাগ্য, জীবন-মরণের সমস্যা জীবন ভরা—শুধু তাই নয়, তার সঙ্গীতের মহান্ প্রেরণায় পূর্ণ হয় দৃষ্টি নয় ভরা—আমাদের এই দুর্বলচিত্ত একটি ভরসা করে' রাখা—এই রলাঁর সব চেয়ে বড় কাজ; এখানে তিনি তাঁর আরাধ্য Beethoven-এর মতই একজন অমর Composer; মানব-জীবনের চিরন্তন সমস্যাগুলিকে বড় সহজ অনুভূতি, বড় তান বন্ধনে, সীমে, মূর্ছনায় তুলিতে যেন এক বিরাট সঙ্গীত-মন্ত্রির গড়ে তুলেছেন। ১৯০৪ সালে প্রথম খণ্ড "উষসী" L' Aube প্রকাশিত হয় আর ১৯১২ সালে "নব দিবসের অভ্যুদয়" (La Nouvelle Journee) শেষ খণ্ড রলাঁর বন্ধু Charles Peguy-র Cahiers de la (Quinzaine) নামক মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়।

দুঃ-উদ্যমের মাঝখানে এই সুদীর্ঘকাল আমরা কত সৃষ্টি করে' যেতেন কে জানে কিন্তু বাধা পড়ল, হঠাৎ ১৯১৪ সালে ভয়াল যুদ্ধের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে যেন বেসুরো সুরের সূচনা হল, এই বেসুরকে রূপায়িত করে' ধ্রুবসঙ্গতি (Harmony) ধরে বোলবার কাজে আমা এগিয়ে এলেন? সে রাজনীতি অর্থনীতির মাতব্বররা নয়—ছুটে এলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ও সুরতরিক রলাঁ—

"তোমার পথ তুলায় পথে
কেমন করে' রইব ?"

এই সুর-বেসুরের মুখোমুখীতে পৌঁছে দিয়ে আমি 'উষসী'র পাঠকদের কাছে উপস্থিত বিদায় নেব' কারণ এ পর্যন্তটা সকলেরই জানা আছে। সঙ্গীতের রক্ষণশীল (academic) ও গণতান্ত্রিক (democratic) দৃষ্টি নিয়ে নানা প্রশ্ন আলোচনা আমাদের দেশে আজ দেখা দিয়েছে—একদিকে প্রাচীন যেসান আর একদিকে নবীন আধুনিক আমাদের নানা সুর সঙ্গতির আকর্ষণ টানছে। এ সময়ে রলাঁর মত মহান জীবনী নিয়ে একটু আলোচনা করলে হয়ত যুক্তিতর্কের ভেতর অনেক বিষয় বুঝবার বেশী সুবিধা হবে এই আশায় 'উষসী'র দ্বিতীয় খণ্ড সমাপনের সময় আমার গুরু উমার সঙ্গে অক্ষোভ ঐতিহাসিক বন্ধুদের এই ছবিটি উপহার দিয়ে বিদায় নিই।

কীর্ত্তনের আসরে

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশী

কাশীর এক ঠাকুর-বাড়ীতে সেদিন কীর্ত্তন হচ্ছে। গানা—বিয়াই-সম্বাদ। মেয়েদের বসবার জায়গা প্রায় সব ভরে গেছে,—সেই সময় একটী বছর্যা মহিলা এসে আমার কাছে বসে পড়লেন।

সেই মাত্র গৌরচন্দ্রিকা শেষ হয়েছে। এতক্ষণ সমস্ত সকলে থাকিয়ে উঠে নানা ঢঙে ও নানা ভঙ্গীতে কি-সব বলে একটা হট্টগোল করছিল। কথা কিছু বোঝা না গেলেও মাঝে মাঝে তার-স্বরে 'এসরে! অয়! এলো রে!' শুনে শুনে আমি আন্দাজে বুঝলুম, বোধ হয় সমাজনে গৌরচন্দ্রের আবাহন করা হচ্ছে। যা হোক, দুর্বোধ্য হলেও তাদের শরীরের ও সঙ্গীতের ভঙ্গীর কসরৎ ও তন্ময়তা বেশ উপভোগ্য—তবে সেখানে যাপারটা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। ভেবে তারা সব ঠিক করে বসে পড়লো—আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

মহিলাটির বয়স প্রায় ৫০ বছর হবে—বর্ণ শ্যাম, মুখখানি অত্যন্ত সুন্দর, যেন কোন সুদক্ষ শিল্পীর হাতটানি দিয়ে ফুটে বার করা। মাথার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা, কপালে চন্দন, মাথে সিন্দুর! তাঁর প্রশান্ত সৌম্য চেহারা। দেখলেই খুব বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের বলে মনে হয়।

আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি চির-পরিচিতের মত একটু হেসে বল্লেন—একটা পথ ছুটে আসছি কি না? হাঁপ ধরে গেছে! সুকো মানুষ—বেশি ছুটোছুটী পোষায় না।

আমি বল্লুম—অনেক দূর থেকে আসছেন বুঝি?

—দূর বই কি! আমি থাকি দিঘির চৌহাট্টায়—এ অঞ্চলে বড় একটা আসি না। বিয়েছিলুম চৌরাস্তাবাড়ী, গৃহাবনদাসের অবস্থা হচ্ছে কি না। তাই শুনতে রোজই যাই সেখানে! আজ একজন বলে এখানে কেত্তন হবে, ভাবলুম একবার শুনেই আসি, অসুবিধা না হবে। সেখান থেকে সবারই চলে আসছি।

আমার আর কিছু বলবার না থাকায় চুপ করে রইলুম।

তিনি একটু পর নিজে আমায় বল্লেন—তোমায় ত কোথাও দেখিনি! কোথা থেকে আসছো তুমি?

আমি বল্লুম—আমি কাছেই থাকি। তবে এখানে আমি আজ দিনই এসেছি। আমাদের বাড়ী কলকাতায়।

—তাই বলো! তোমরা নতুন লোক! তাই ত বলি—এখানকার লোক হলে আমি আর চিনতে পারি নি? আমার হলো সে আজ প্রায় পঁচিশ বছরের বাস এখানে! এখানকার মেয়েরা প্রায় সবাই আমার মুখ-চেনা—গঙ্গার ঘাটে, মন্দিরে মন্দিরে নিত্য এই যাত্রা বিদ্যেটার হলে দেখছিই তো হামেসা সবাইকে!

কথা শেষ করে তিনি আরও একটু আমার কাছে ঘেঁসে হঠাৎ হেসে বল্লেন—দেখ, আমি বাপু মানুষ বড় ভালবাসি! মুখ বুঁজে বসে থাকা আমার ধাতে পোষায় না। পাঁচটা গল্প-সল্প না করলে বেশ পেট ফুলে ওঠে! তা তোমার সঙ্গে পোরছ হল ভালই, বেশ কথাবার্ত্তায় সময়টা কাটবে!

কীর্ত্তন আরম্ভ হলো।

'ধনি সুবদনী ধনি! ও সুবদনী ধনি! এইবার উঠ্‌বে না কি? রাত হলো, ফেরতে হবে অনেক পথ। উঠে এলো!'

শিয়র থেকে এই চীৎকার শুনে ফিরে দেখি, একটী

আবাহনী বিধবা স্ত্রীলোক থাকিবে। হাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন; মুখে অত্যন্ত উদ্বাস্ত ভাব।

একবার কাঁটাকে দেখিয়া ফেলে আমার নূতন বন্ধু বলেন—ব্যাপার দেখছো? এখানকার বাসীদের ব্যাপারই ঐ! আসছেও বেজন—যাবার বেলায়ও তাই! ঐ তো সব মৌলিকা শেষ হয়ে কেত্তন সুরু হল, এর মানেই হচ্ছি যাবার ঘুম, তবে ওনারি কি যাই?

কথাটা শেষ করে এ সময়ে আমার মতটা কি জানবার জন্য তিনি পরাণে আমার দিকে চাহিলেন।

আমি কিছু না বলে শুধু একটু হাসলুম।

বন্ধু আমার পিঠে হাত দিয়ে খুব খুশি মনে বলেন—তোমার বাড়ী কলকাতায় বলে না? ও কলকাতা আমার খুব ভাল করেই দেখা আছে। আমাদের বাড়ী হলো ফিরে···পুর! বড়ত ছিলেন বড় জমীদার—নাম ডাক এখনও কিছু আছে। বড় জমীদারের ছিলেন কি না? তিনি যারা গেলে পাওনাদার সবে আমার ভাইদের যোকদমা বাধালে, সে কি যেমন-তেমন মামলা? একেবারে লক্ষটি বড়ন! কথাটা কি জানো? পাওনাদী অনেক বিষয় হাত্যাতা করে ফেলেছিলেন—পাচ-পাচ বেরে! বড়া মেজদের নামে যা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা ছাড়া আরও সব অনেক জিনিষ-পত্তর, হীরে-জহরৎ, টাকা-কড়ি নানা রকমে মেয়েদের চুপি চুপি গোলা হচ্ছিল—জানো তাই আমাদের পেতে বাধা দিলেন। পাওনাদীর ভাব আর ছেলেও কম নয়, তাহলে—

'ধলি, কই গো? ও হুজুর বাবি! উঠবে, না গাল সব সাঁঝিয়ে থাকবো এইখানে? ভাসা আসাজনেই পড়েছি ত গোড়।'

ভিতর থেকে আমার বন্ধুজনে আওয়াজ সেই ভাসা! মেয়েদের মধ্যে থেকে একটি তরুণী বিধবা উঠে এলো। বর্ষীয়সী বলে—এখনও বসলে আর তোমার ওঠবার বাড়ী নেই! মেটিয়াবুরুজের সেই অন্ধকার গলি আর পাশ পাশ দুহুর! সেইখান থেকে মেয়েমানুষ—যদি আসে সেই?

মেয়েটির বোধ হয় সে সময় ওঠবার ইচ্ছা ছিল না। সে বিরক্ত হয়ে বলে—তা হলে তো না এলেই হতো! বিদায়ী থেকে এসে মাঝ থেকে সেই কীর্তন আরম্ভ হলো, আমি যাই-যাই!

তখন কীর্তনীয়া সৌরাঙ্গের প্রথম উদাস অবস্থা বর্ণনা করছেন—ঘর থেকে বিরে এসে অবধি গৌরাঙ্গের মনে সুখ নেই—চোখ বুজে দিলেন—হাজারের পরাণে যেমনই বাদি কৃষ্ণ নাম মুখে আসে! শচীদেবীর আহার-নিদ্রা, বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা, বন্ধুদের স্নেহ কিছুই ভাল লাগে না। লোক-সঙ্গ বর্জন করে নিরালায় বসে সবাই যেন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবনার বিভোর—কীর্তনীয়াসহ সকলে তাঁর ভাব দেখে চিন্তিত—তাদের মনেও যেন একটা অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার ছায়া।

কীর্তনীয়া সুরটা—বড়রা বিষয় ভাল করে বুঝিয়ে হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার তাঁর যেন কসরত—কীর্তন জমে উঠেছে।

বন্ধু কিছুক্ষণ শুনে আমায় বলেন—কি এর ওজ্জো মন দিয়ে? নিমাই-সন্ন্যাস আমার অনেক বার শোনা আছে। আমার ভাইঝি-জামাই খুব কথকতা করে কি না? কলকাতায় তো যার খুব নাম তো! শুনে থাকবে বোধ হয়। তা আপনার লোক—নিজের মুখে তার কথা বলা সাজে না, কিন্তু একবার তার মুখে কথকতা শুনতে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। যেমন বিদ্যে গলা, আর তেমনি কি ব্যাখ্যা! চমৎকার বলে যায়! আমি ও এত লোকের মুখে কেত্তন, পাঠ, কথকতা অনেক শুনেছি—কিন্তু এমনটি কোথাও শুনি নি। আর না হবেই বা কেন? মাতুলালয়ের জন্য? তারপর তার নিজের কথা যদি শোন—মাহ-মাংস খাওয়া, কি হাত-তার হাতে খাওয়া, সে-সব তার চলবে না! দিনান্তে একবার স্নানাহ্নিক করিয়ে, আর রাতে একটু ফল-দুধ! ব্যস্! পূজো-আহ্নিক গীতা-ভাগবত, এই সব নিয়েই আছে!

একটা ফল খাওয়ার পর চুপ করে থাকা তার সহ্য হয় না। আবার আমি বন্ধুর—খুব নিষ্ঠাবান যে!

উৎসাহে বন্ধুর চোখ দুটি জ্বলে উঠলো। মাথাটি

নাড়তে নাড়তে তিনি বলেন—বিয়ে হলে বিয়ে? এই সে-বার আমার ভাই-ঝি দুধভাতে ছুটো ছেলে হয়ে অমনের অসুখে একবারে যেতে বসেছিল—যা যার কিছু হবার নেই, কেবল পেটের অসুখ—আর যদি? বাঁচবার আশা ছিল না। শেষে ডাক্তার-বদ্যি বলে—সিন্ধী-মাড়ওয়ের ঘোল আর সেদ্ধ চালের পোয়ের ভাত খেতে—না হলে এ ছেলে বাঁচানো যাবে না। আমাই শুনে বলেন কি, বরফের বিছে খেয়ে বাঁচতে হবে? এমন বাঁচায় লাভ কি? সে-সব হবে না! হবোও তাই। বিলেত না ওসব থেকে। হুঁ:! এ তো আর লোক-দেখানো ভণ্ডামীর বিছে নয়? বোঝো! ইতিমধ্যে মাঝারাস্তার ওধার থেকে দুটি স্ত্রীলোক একটি অল্পবয়সী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াল। তারা বোধ হয় বলবার অবসর পায় নি, একজন আপন মনে বক্ বক্ করছিল—'মাইরা যেন বাপ-মোকপুক্ষের মৌরসি কথা আমলা পেয়েছে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেল, একটু বসবার আয়গা দিলে না গো! এসেছিস্ তীরথ শুনতে, সবাই মিলেমিশে আয়গা অড়ে বোস্, তা না-এখানের আড়ি-দিয়ে! মুখ আগুন!'

একটি বয়স্কা মহিলা বেশ রীতিমত আয়গা জুড়ে আমাদের বসেছিলেন। তাঁর বেহায়পি দিব্য পরিপুষ্ট—সর্বাঙ্গে আড়ি আড়ি সোনার গয়না, মুখটি বেশ হাসি-হাসি, একখানি জাল শাল ঢালা দিয়ে গাড়ীটি ছড়িয়ে বসেছিলেন। পিছনের ছেলেটি তাঁকে বলে—তুমি একটু পা গুটিয়ে বসলেই আমাদের বসবার জায়গা হয়ে যায়—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

মহিলাটি বলেন—পা কি আর মুড়ে বসবার যো আছে রাই! যে বাত—বাতের কামড়ানিতে জর আসি!

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আমার উপর পড়লো—বাতের ব্যথা ভুলে তিনি আমার দিকে অনেক চেয়ে রইলেন, বললেন—আপনি কোথায় থাকেন এখানে? এ-সব জায়গায় আপনাকে ত আগে কখনো দেখি নি?

আমি একটু হেসে বললুম—আজকে আমি অল্পদিন এসেছি। কলকাতায় থাকি।

তাঁর হাসি-মুখখানি আরো প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। বলেন—ঠিক ধরেছি আমি। কলকাতার লোক দেখলেই চেনা যায়। সে তো আর এখানকার লোকেদের মুখে লিখা থাকে না। কথার শেষে তিনি সমবেত মেয়েদের দিকে একবার হাসি-মিশ্রিত বাক্যিলাভনীতে চাইলেন।

কাছের জন একটি সুশ্রী মেয়ে তার সখীকে বলছিল—কালীঘাটীতে তার 'কর্ণাঞ্জুন' যাত্রা হবে শুনছি। যাবে যাবে সেখানে, বুঝলি? আমি তাই 'কর্ণাঞ্জুন'টা শুনতে বড় ভালবাসি।

মহিলাটি তার দিকে চেয়ে বলেন—'কর্ণার্জুন' তার লাগে তোমার? আমিও তা খুব ভালবাসি। তবে যাত্রা নয়, থিয়েটার। কলকাতায় অনেক বার আমি গেছি।

তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন—কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন বুঝি? বাসী ভালমানুষ, আমি বড় ভালবাসি। আমার ছেলে এখানে ডাক্তারী করে কি না! পাঁচের ক'টা মাস আমি প্রতিবছরই এখানে কাটিয়ে যাই। এই ছেলে না, কলকাতায় ত আমাদের পাড়ী-পাড়ী না হলে এক-পা বেরোবার যো নেই, আছেই, বাড়িতে বসে থেকেই বেশির ভাগ কাটাতে হয়। এখানে সে বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা। পাড়ী-ঘুড়ির কোন বালাই নেই—ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়া যায়! নয় কি?

আমি তাঁর কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করলুম।

তিনি আরও উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগলেন—তার পর দেখুন, বাবার বাড়ির মুখ এখানে কলকাতার চেয়ে ঢের বেশি। তরি-তরকারির মধ্যে কপি, ওলকপি, বেগুন, মূলো, এ-সবের অভাব—বাজনদরের বেগুনগুলো কি নরম আর মিষ্টি, দেখছেন ত? মূল পেয়ারা মুড়ি-মুড়ি—লাফের লম্বা; দুটো খেলি—চাকার মত পেট হবে; দই রাবড়ি সবই আছে—খাবও অনেক! কলকাতায় দই খাচ্ছ ত এখন খুব টাকা পাচ্ছ দিয়ে যাঁরা খাও, আর এখানে আট আনা—ছোট মণ আনা। বুঝিয়ে নয়!

তীর্থের শুনতে এসে এসব সম্বন্ধে আলোচনা করবার

প্রতি মা যশোদের চমকার বাড়িয়ে যাত্ত মেরে বহুর—তা ঘুরিয়ে আছে বৈ কি।

ডাক্তার-জননী বলেন—বাড়ীর আর একটা ঘুরিয়ে এই যে, বাংলা দেশের সব জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। তা এই পলমা ঝাঁচকলা থেকে মুক্তি-মুক্তকি পর্যন্ত—

আমার পূর্ব-বন্ধু এতক্ষণ বিশেষ সহিষ্ণুতার সহিত এই আলোচনা শুনছিলেন। মুক্তি-মুক্তকির পর আর তাঁর ধৈর্য রইলো না, তিনি আমার পিঠে সজোরে এক চৌকা দিয়ে বলেন—চলি, এখানে কেবল শুনতে এসেছো, না গল্প করবে? এবেলা যাই বাড়ি, খোকা না মন দিবে।

হঠাৎ বন্ধুর এ-রকম অধিকার-বোধ ও শাসন দেখে বিস্মিত হলেও আমার মনে আশা হল, এবার বুঝে এঁর ভুলটির উদয় হয়েছে, কৌতুকটা বোধ হয় ভাল করে খোলা যাবে।

কিন্তু সে বৃথা আশা। ডাক্তার-জননীর কাছ থেকে কৌতুকের ঝোলাটি নিয়ে আমার সহিতে নিয়েই তিনি মুখরকে বলেন—বাড়ীর আয়োজন দেখেছো? বুঝো হয়ে মরতে চললি—এখন জলযোগের নাম শুনে, যে খায় হবে,—তা না, শুধু খাবার গল্প, আর খাই-খাই! লজ্জাও করে না! বিষনাথের নাম একবার মুখে এলো না, বাড়ীতে এসেছেন খাবার মুখ করতে! ছিঃ! ছিঃ!

তার পরে গলাটা আরও একটু নামিয়ে বলেন—দেখ, এটাও বোঝো না যে যখন না ডাকলে কারুর নিমন্ত্রিত হয় না, এই যে আজ ডেকে ডেকে গণ্ডাখানি খাবারি, তা আর কি হিসেবে? ডিবেতে কি করে? এবে শুধু আগুনে ঘি ঢালা, আমার ভাই-কি-আমাই ভাই হলে—বলিহে ফুলশয্যে—

পাশের দিক থেকে একটি বৃদ্ধা খুব খুব করে কাশতে লাগলো। সে কাশি আর থামে না। কাশির বহরে সে মুষড়িয়ে মুষড়িয়ে পড়ছিল।

একটু সাম্লাবার একজন তার হাত ধরে উঠে পড়লো। বলে—আর থাকতে হবে না, তোমায় ঘরে রেখে আসি চল। এই রোদ মাথায় কন্-কনে হাওয়া, আর কাশীর হুজুর শীত-কি ফুরো আমুনের মাঘে নয়? ঘরে ও কথা শুনবে না, কেউ শোনা চাই! ছেলে এখন ফেলে যেতে।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে বৃদ্ধা আমার পা বাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল! তার জন্য একটু সহানুভূতি বোধ করা, বা আমার দিকে ফিরে দেখা, কিছুই তার দরকার মনে হলো না। শুধু নিজের মনেই বল্লে—যা বলবে যাই! পোড়া চোখে কি আর নজর আছে।

জায়গাটা খালি হতেই এতক্ষণ যারা শঙ্কিতেছিল, তারা ছুটে এসেই ঝিল ভরে পা ছড়িয়ে সব জাঁকিয়ে বসে পড়লো।

কৌতুকটা তখন মাটিয়েছে—হরিনাথের বক্তা এসেছে! নিতাই-বৌর সকলকে ঠেলে ঠেলে প্রেম বিলোচ্ছেন! নবীনা চলছেন!

বন্ধু একবার একটু শুনে ডাক্তার-জননীর মুখ-ঘুরু-পুটি দলের মেয়েদের দিকে দৃষ্টি ফিরোলেন। তাঁর বোধ হয় তখনো মনের কোণ ঘেটে নি, বল্লেন—দেখ, আজ অধিক লোকে জমা হলে যাবে, কিন্তু সত্যিই,—খাবার মোক্ষটা আমার মোটেই নেই। আমি-এই সন্ধ্যেবেলা খালা উঠে কেলার-ঘাটে বাইকে যাই। ফিরে আসবার সময় ওই দিক থেকে একটি পোয়া দুধ নিয়ে আসি। আহ্নিক-পুজো সেরে দুখটুকু দিয়ে একটি বাটি চা, ব্যাস্! সেই আমার দিন-রোজের খোরাক। চাটুকু খেয়ে সারা-দিন লেখা-লেখা মুখে, কখকতা শুনে ব্যালাটি কাজিয়ে ফিরমুখ হয়ে, নিজের ঘরে দুটিনো বাটনা বেটে কে পাঁচ জন খাবে? দুটো চালে-ডালে এক সঙ্গে চড়িয়ে তারপরে খোটা দুই সকলকম আলু সিদ্ধ ফেলে! আর কি? ফেন গলে নামিয়ে, আলু দুটো না ঘেটে, একটু ঘি দিয়ে সপাসপ সিদ্ধ মাখিয়ে! এক বিয়ের পাপ চুকলো!

আমি তাঁর খাওয়ার ইতিবৃত্ত শুনে একটু বিস্মিত হয়ে বল্লুম—রোজ এই সামান্য খাওয়া খেয়ে থাকেন? আর কিছু না পারেন, শুধু দুধটুকু খালা জায়গা একটু নতুন করে খেয়ে রাতে দু-চারখানা লুচি খেলেও ত হয়!

বন্ধু বোধ হয় মনে মনে খুসি হয়ে উঠলেন। বল্লেন—তুমি মানুষ বড় ভাল। ঘর-কন্নট নেই। আমি একলি

পাড়াগাঁয়ে মানুষ বড় ভালবাসি। কি জান? এখানকার দুধি বাড়িয়ে যাতে দুধি-টুধি বড় পাই না, তল-বিটী খেয়েই থাকে। তোমায় তবে বলি—মনে আমার ভাবের ঘরে চুরি এসে চুপি চুপি বলছে—আমায় কে কিনি দিয়ে পাছ, সেদিন ঘরে তোর দিয়ে, তাই আদিয়ে আমি ঘরের দুধি কেউ খেয়ে ফেলি। কি তোমরো বল?

আমি হেসে বল্লুম—সে আপনি ভালই করেন। আমি ত সেই কথাই বলছি।

তিনি প্রসন্ন হয়ে ডাক্তার-জননীর দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন—ওরা সব খাই-খাই করে—কিই বা খেতে ওরা? তবে খাওয়ার পর তরি তোষ। আমার শ্বশুর বড় জমীদার ছিলেন, জানই ত? তার উপর তাঁদের বংশটা ছিল, তা—ঘি প্রসঙ্গ! এখন তত সর্বত্র দেখা যায় না। সব কি সমান! খশুর-শাশুড়ী, ছেলে-মেয়ে তা কি সব, যেন দুধে-আলতায় গোলা, জলছে! শ্বশুর যখন যারা যেতেন, বাড়ি ত আমাদের নবীন উপরেই, নিজেদের বাঁধান ঘাট, তাতে সকলে ধরাধরি করে বাড়িয়ে যখন ঘাটে আনলে, তখন কি আর তোমরো! তাঁকে একবার দেখবার জন্যে বাড়ি শুদ্ধ লোক ভেঙে পড়লো! ঘাটের চারদিক আলো করে শুয়ে আছে, যেন একখানি পুতুলের চাঁদ! আহা—সে কি রূ—প—কি রূ—প!

বন্ধু একটু হাসলেন, বোধ হয় পূর্বপত্নির উপরে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন, আমিও ধাক্কা পেয়ে কীর্তন শুনতে মন দিলুম।

কীর্তনীয়া গাইছেন, গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে শ্রীবাসের প্রাঙ্গণে উপস্থিত। শ্রীবাসের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত, ঘরে কান্নার রোল, শ্রীবাসের ভ্রূক্ষেপ নেই! অন্তিমের গৌরাঙ্গকে দেখছেন! আত্মবিস্মৃত ভাব! গৌরাঙ্গ বলেন—শ্রীবাস! তোমার বুকে কি কিছু আঘাত লাগছে? শ্রীবাস বলেন—না প্রভু! তুমি যখনসম—তুমি যেখানে উপস্থিত সেখানে কি কোন অমঙ্গল থাকতে পারে? গৌরাঙ্গ তখন কীর্তন সুরু করলেন। শ্রীবাস প্রেমানন্দে বিভোর—উল্লাসের সঙ্গে নৃত্য করছেন, বলছেন—গৌর হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! শ্রীবাসের মুখপুর অমনি উঠে বললো! হরি-নামে চতুর্দিক পূর্ণ হয়ে উঠলো!

হঠাৎ পাশ থেকে মেয়েদের অস্ফুট মৃদু চেঁচা-মেচি খোলদাস পেয়ে উঠলো! চেয়ে দেখি যে ভিনজন পা ছড়িয়ে বসেছিল—তাদের সঙ্গে দুটি নবাগতার জমকা মেয়ে গেছে!

নতুন মেয়েরা বলছিল—তোমরা পা সরিয়ে একটু সার দোস না বাছা! তা হলেই ত আমরা বসতে পাই! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি বল? আমরাও ত কীর্তন শুনবো বলেই এসেছি?

উপবিষ্টার দল থেকে একজন মুখ ফেরিয়ে বল্লে—কীর্তন শুনতে এসেছো ত মাথা ঘষে ঘষেছ একবারে! ঐ যারে মেয়ে পায় না? যত ছাসনা মেয়েছেলে এইখানে! সরে কোথায় বসবো শুনি? ও-দিকে বসলে কিছু দেখা যায়? না শোনা যায়?

নতুন দিতীয় মেয়েটি একটু রাগের সুরে বল্লে—বসবেই না-ই বা কেন? তোমার ত কিছু দেখা দরকার নয়? ঘুমুচ্ছ যেন না! মানুষ দুটো টাল দাঁড়িয়ে থাকবে—তবু একটু পা সরিয়ে বসতে না? আচ্ছা হিংসুটে মেয়েমানুষ ত!

এই কথার পরেই মুখ ঘুরলো! প্রথম দল গলা একটু উঁচু পর্দায় তুলে বল্লে—আ মলো! এ মাগী কেরে? মরে পরে কীর্তন করতে এল কেন! বলি, বাদমন্দ করতে আমিও জানি যে না কি? বাঁচুয় এই পা ছড়িয়ে বসে—আসছা কে নিতে পারে দিক্, গায়ে পড়ে গাল দিচ্ছেন, উনি আবার ঘর কথা শুনতে এসেছেন! আ—মুখে আগুন!

ফুলুল ব্যাপার বেগে উঠলো! আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম! একটি বছর চোদ্দো-পোনর বয়সের মেয়ে আমার পাশে বসেছিল, যার বাবা সিল্কী ও কাপড় পরবার ঢঙটা দেখে বোধ হল, সে কোন ঘরের মেয়ে! দুই হাতে কাপড় ধরে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

বন্ধু একবার মুখ ফিরিয়ে ব্যাপারটা দেখলেন, নিতান্ত উপেক্ষার ভাব—যেন এমন হয়েই থাকে।

ডাক্তার-জননীও সব দেখছিলেন। তিনি একজনের কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাসতে হাসতে আমায় বললেন—খুব অবাক লাগছে বুঝি? হবেই ত! নতুন এসেছেন! আমি এমন ঘোলখাল অনেক দেখেছি।

তিনি আর একটু সরে এসে বলতে লাগলেন—সেদিন জানি বলা হয়েছিল, বুঝেছেন? এই দিন চারেক আগে আমি এক জায়গায় রান্না করতে গেছি, পাকা ছিল মুর্গীয়াসনের উপরে! বেশ জমেছিল, ঘোল বাঙলা পেয়ের দিকে; তীমের আর মুর্গীয়াসনে লাফা-লাফানি লাগিয়ে যখন খুব আস্ফালন করছে, সেই সময় ঝোল থেকে টুপ করে তীমের মাথার একটি ডিম! আচমকা ডিম পেয়ে তীম বেচারার হতবুদ্ধি। তবু যা হোক সে আবার একটু হাত বুলিয়ে, এদিক ওদিক চেয়ে আবার আসর জমাবার সেই চেষ্টা করেছে, অমনি মাথার উপর আর একটা! এবারের চিকটা বেশ বড়! তখন ত আসরে খুব চেঁচামেচি গোলযোগ পড়ে গেল! কিছুক্ষণ হট্টগোলের পর আবার যখন সবাই পোলাও খাবার জন্য খুব জমবার যোগাড় করছে, তখন দেখা গেল, তীম একেবারে নেতিয়ে! মুইলো তখনি একজন ডাক্তার ডাকি! অনেক টানাটানি, সাধাসাধি, তীম কিন্তু আর কিছুতেই গজুলো হলো না! কি করেই বা যায় বলুন? ডাক্তার ডেকে ত আর মৈতুক প্রাণটা মানুষ ফিরে পাবে না!

গল্পটি বলে ডাক্তার-জননী হেসেই অস্থির! আমিও সে হাসিতে অবশ্য যোগ দিয়েছিলুম, ইতিমধ্যে বন্ধু আমায় টেনে নিয়ে একধারে। তাঁর দিকে কটাক্ষে চেয়ে গম্ভীরমুখে বললে—বড় দয় আমার গল্প!

তারপরই তাঁর সেই বুদবুদি বাবার কথাটা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেন—সেই যে তখন বলছিলুম, আমার পাগড়ী ও আমার পাঁচ বছর বয়সের সময় খুব গরীবের ঘর থেকে আমায় নিয়ে এলেন। আমার কথা বেমক্কা তা? একেবারে পাগলা, অথচ পকলুম ফিরে সেই ছেলের ঘরে! তারপর আমায় মানুষ করবার জন্যে সে কি পরিশ্রম। বাবার মুখে ফোটা যোগ আর বাগানো, দর বলা, তাকে মুখুর-ফুল ফোটে, সেখান বেশম দিয়ে যা আসা, সে কি খুব! তারপর খাওয়া—যেখানে যে কিছু হয়, তিন ঘুটো বিনটে জোগাড় বাবার সেরা থেকে আরম্ভ করে ঘর ঘর যেতো, তারপর কলমুল, খৈ, মনী, লক্ষেশ, বাবড়ী, ঘি, দুধ সে কত আর বোলবো? খাওয়ার আর সংখ্যা নেই! আমরা পরব বোটম! মাছ-মাংস খাওয়ার ত পাট নেই! তা ছাড়া সংসারে খাওয়া কত রকম হতে পারে—তাই বলি, খাওয়ার নাম শিখে গেছে আমার। হলে ডাক্তার-জননীর দিকে একটা কথা-বিনিময়ের দৃষ্টিপাত করে তিনি আবার বলতে লাগলেন, খাই খাই ত করে অনেকে, তবে লক্ষি কেউ পায় কজন? এখন রাজযোগ খাওয়া, এ কি মুখের কথা? এই মুক্তো বয়স পর্যন্ত, যতদিন পাগড়ী বেঁচে ছিলেন, ততদিন আমার খাওয়ার এই ব্যবস্থা!

বন্ধু একটু থেমে কীর্তনের দিকে মনোনিবেশ করলেন! কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। কীর্তনীয়া তখন গাইছেন, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নেবার জন্য যাচ্ছেন; মায়ার, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস প্রভৃতি তাঁকে নানা রকমে বুঝিয়ে ঘরে রাখবার চেষ্টা করছেন, আমি সেই দিকে একটুখানি ঝিঁকেই বন্ধুর কানের কাছে আবার অবতরণ করতে আরম্ভ করলুম।

—তা-যাই বল, আমার পাগড়ীর মত এমন পাগড়ী কিন্তু আর হতে হয় না। সেই আমার পাঁচ বছর বয়স থেকে এই অবধি, আর নিজের মেয়েত্যাগ পর্যন্ত, কি যাই করেছেন আমায়! নিজের মায়ের বুকি পেটের মেয়েকেও অমন ভালবাসতে পারে না। আমিও জেনেছি, শেষ পর্যন্ত প্রাণপাত করে তাঁর ভালা করেছি। না করে হয়? অমন হবে যে! এই বাড়িতেই তাঁকে নিয়ে পাঁচ বছর একা আমি—বুঝেছ? তখন আর ঘরকন্নার ঘর বলতে কিছুই নেই। মামলায় মামলায় একবারে সর্বস্বান্ত—এদিকে ছোট ছেলের পেটে অন্ন-জল! তা শেষ পর্যন্ত আমিই সব করলুম, মুখাগ্নি পর্যন্ত! তিনিই আমায় মুখাগ্নি করতে বলে গিয়েছিলেন কি না? ডাক্তারের সঙ্গে তর্কটা হয়ে গিয়ে আর তাঁর মুখও যেমন দেখি নি, তাঁর হাতের আগুনও বেন্ত্রি! কেন কি বল? তা আমার যা কাজ—সে আমি করেই করেছি! তবে তত

সবই তো তিনি! এক পাড়াটা বলে কথা, আর ঘরের কাছে, নিশ্চয়ই, সবই আমার চেনা চিনিই, তবে—ঐকে বিয়েছি তাঁরই কাছে—তাহলেও এই তখনকার পুজো আহ্নিক, এমন কি—জিভ্যা পর্যন্ত, সবই ত তাঁর কাছে শেখা।

জিভ্যা—কথাটা শুনে আমার বড় কৌতূহল হলো। কাছিতে এসে পর্যন্ত উঁহাকে বলবার সময়েও দুবারই ত ও-কথাটা শুনে আসছি কিন্তু আজ পর্যন্ত জিভ্যা যে কি—তার মানে আবিষ্কার করতে পারি নি।

বন্ধুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রথমটায় খানিক আমার দিকে চেয়ে রইলেন—বোধ হয় আমার মত অনভিজ্ঞলোকে এ তত্ত্ব বলা যায় কি না, তাই ভাবছিলেন, যা হোক তার পরই তিনি একটু এদিক ওদিক চেয়ে আমার কানে মুখ রেখে কিস্ কিস্ করে বল্লেন—জিভ্যা, কি তা জান না? ও নিবেদন পেয়ালের কাছে। মন একবার জিভ্যার ঘরে ঢুকে তখন আনের কাছে ব্যাঙো আজলেও আর তোমার বাইরের দিকে মন থাকবে না। বুঝেছ ত?

জিভ্যার রহস্য জেনে হলো। আমি বুঝেছি, স্বীকার করায় তখন তিনি খুসি হয়ে চোখমুখ ঘুরিয়ে বলতে লাগলেন নিখেছিলুম ত সবই। কিন্তু আমার কি কিছু হলো ছাই! তোমার কাছে সত্য কথাই বলছি, ও চোখ বুঁজে মনস্থির করতে বসলেই আমার প্রাণটা যেন কেমন ধড়ফড় করে ওঠে! তখনি চোখ চেয়ে উঠে পড়ি! নিত্যিই পুজো-আহ্নিকটা না করলে নয়, তাই ওটুকু করি, তা চেয়ে বেশি আমার দ্বারা এজন্মে আর হবে না! হবে কি করে? বসুনিটা ত দেখছো? ওটা এক রত্ন কামাই ইয়ার যো নেই!

বলে তিনি নিজেই খুব হাসতে লাগলেন, আমারও তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়া ও কথাবার্তা শুনে যেন কৌতুক মনে হচ্ছিল। আমিও হাসলুম।

কীর্তন যেন চলছে, আশ-পাশের ছেলেদের গলাগুলোও যেন জমে উঠেছে, ঘর-সংসারের কথা, জিনিসপত্রের দামের কথা, পরীর জামাকাপড় কথা ইত্যাদি মুখ-দুঃখের সব বিষয়ই আলোচনা হচ্ছিল, আমি এদিক ওদিক চেয়ে সব দেখছি, ইতিমধ্যে বন্ধুর সেই আগের মন্ত্রের পরিশিষ্ট আওড়াটা মোদ্দা মনে পড়ে গেল।

তিনি বল্লেন, সেই যাওয়া আসার গল্প করছিলুম না? তা বেশ! ও সবে বিশেষ কিছু হয় না, অল্প যে আমার দলা-মাত্রা, অত যে পরিষ্কারে হলো, ও কি আর হলো? বলে তিনি তাঁর হাতখানি আলোয়ানের ভিতর থেকে বার করে আমায় বল্লেন—দেখতো ত! এ যে একবারে শাদা হয়! এ আর কি হবে? তবে অত পাই ঘরে একটু বেশ লাল লাল, আর একটু কালচে আভা, এই পর্যন্ত—তাঁদের কাছে কি আমি দাঁড়াতে পারি? মোদ্দাকথা আমার কি হবার ছিল! তোমার কাছে আর কি মোলেমো সে কথা? বেশ ছিল, বেশই কি চলছিল! অমন যে বড় ঘরের ছেলে—তা কখনো তার পানে কি একটু উঁচু নজর ছিল? সময় পড়লেও তাঁর মাকে একটা অসমান দিতে পারতো না।

বন্ধু একটু থামলেন, তাঁর হাসিকথা মুখখানি তখন বড় করুণ মনে হলো। কি একটু ভেবে নিয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেন, আমি তো তাঁর পায়ের যুগ্যিও ছিলুম না, তবু আমার আদর কত! কখনো যদি পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বলতেন, তাঁর সেই জোছনার মত ধবধবে পায়ের উপর আমার এই কাল পেত্নীর মত কালো হাত রেখে রেখে আমার নিজেরই ঘেন্না করতো। আমি তাড়াতাড়ি হাত লুকিয়ে তাঁর পায়ে হাত বুলাতুম—বলতুম—(ঈষৎ হাসিমুখে) মালো! আমার কি পেত্নীর মত কালো বিশ্রিরি হাত, তোমার পায়ে এ হাত আমি দেব করতো না। তিনি অমনি তখনি (লজ্জা মুখে টেনে টেনে) আমার মুখ চেপে বলতেন—ছি—ছি—ও কথা কি বলতে আছে? আমার ত ভাই কখনো ও-কথা মনে আসে না!

বন্ধু একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—সেই একদিন কপাল পুড়লো। অমন যে দেবতার মত সোয়ামী—তাঁকে যখন হারালুম, বুক ফাটা যন্ত্রণা আর ধরাসনে মেরে উঠে নি! তবু আমার মরণ হলো না। আমার ভাইকি-জামাই

করছে, তিনি নিজে ভক্ত ছিলেন, বেশ ব্যাস করে তিনি বৈষ্ণবধর্মের চরণে লীন হয়ে গেছেন। যা-তা করে তাঁর শোক করতে নেই, করলে পাপ হয়! তাই তনে তনে শেষ বুদ্ধি খেটে উঠে বসলুম। মনে মনে, আজিত ব এক দিন সেখানেই যাব। এ কাড়াকাড়ি ছুনিয়ের বই ন নয়। পালাবে যাব, এ সবও ত বাইরার চৌহদ্দির নয়—এ যে চিরকালের, তবে কিছু কেন শোক করে তাকে কষ্ট দিই! ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ভাড়াটের সন্ধানটান পরাটান করে শেষে এই বাড়ীতে এসে বসেছি। তবে যদি এর আগের বোঝাম, বৃন্দাবনে যাব না করে এখানে এলুম কেন? তা শেন, ও সব বৈষ্ণবী-ফুলো আমাদের নেই। যে বয়েসে, সেই বিশ্বনাথ বাবের তখনে যাই ত নয়! আমার ভাইটি-আমাই বলে, হিরির আজ্ঞে আছা, কোন কেন নেই! এতে যে ভেব-জান করে সে ভক্ত নয়—সে অবিশ্বাসী—তাই বিশ্বনাথের চরণে আমার নিয়ে পড়ে আছি। যে দিন আমার দিন ফুরোবে, তাঁর নাম করতে করতে চলে যাব!

বন্ধু বিস্মিত নীরব রইলেন। আজিত নিস্তব্ধ ভাবে তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তিকে সমুজ্জল মুখখানির দিকে চেয়ে রইলুম। মনটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে ভরে উঠলো।

তখন কীর্তন চলছিল—গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করবেন—দ্বিপ্রহর—পূর্ণ নিশার রাতে বেরবার সবাইকে নিয়ে কীর্তনানন্দে মেতেছেন, মহা সংকীর্তন জমে উঠেছে। অনেক রাত যায় দেখতে দেখতে বন্ধু হঠাৎ খোকাবের সংকল্প করে আমায় একটা মেলা দিতে বললেন—বেশ! কীর্তনের নামও জমে, তবে যাত্রা থিয়েটারে যেমন রাত বেশ বেড়েটড়ে যায়! ঐ নামটা আমার বড় ভাল লাগে! এই বেশির একটা আমার 'খোলা খোলনী' সেজে যা নাচলে—ফুরুবার!

বন্ধুর কথায় কি মনে পড়ায় আমায় বলেন—তুমি ত অনেকদিন ধরে, 'আলিবাবা' থিয়েটার দেখছ?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

তিনি তখন ধীরে ধীরে আমাটি গায়ে দিতে দিতে বন্ধুকে বললেন—মেলা আর কুড়ির নামটা কেমন, তা বলো! ঐ নাচ দেখবার জন্যে আমি এই শরতে তিনটি শো টাকা—বুঝেছ ত? যতদিন ধরে বলেছ, আমি ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা পেকেছি তিনটি বিয়েছি! ডাইনো বলতো—পিসীমা! এ কি রোজার বাজির টাকা যেন হয়ে যাবে, আমায় দিয়ে দাও না? যাবার এর টাকা উঠিয়ে নেওয়া—তা যাই বল যাদু! এর এর নাচ দেখেছি, কিন্তু মেলা আর কুড়ি যেমন নাচে, এমন নাচ কোথাও কিছু দেখলুম না।

আমি একমনে নাচের গল্প শুনছি—হঠাৎ শিয়র থেকে ফুলের মত নরম হাতে কে আমার জড়িয়ে ধরলে। শিয়র ফিরে দেখি, বছর দুই বয়সের একটি ছোট মেয়ে দু'হাতে আমার গলাটা ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে আমায় দেখছে! পরে একটি গোলাপী রঙের ফ্রক, মাথায় লম্বা কালো চুলে ছোট ঝলমলি টায়রা, চোখদুটি ডাগর ও কৌতূহলে ভরা! পুতুলের মত সুন্দর মেয়েটিকে আমি কোলে নিতে গেলুম, সে এলো না; শুধু সন্ত্রস্ত মুখে আমায় দেখতে লাগলো।

ইতিমধ্যে একটি তরুণী এসে তাকে কোলে তুলে নিলে। একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে আমায় বলে—ছেলেটা বড় দুষ্টু! এতক্ষণ বেশ ঘুমোচ্ছিল, জেগে উঠে খালি জ্বালাতন করে বেড়াচ্ছে।

তরুণী কিন্তু তার মার কোলে চাপা থাকলো না। সে সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে সব দেখে শুনে বেড়াচ্ছিল। এত আলো, এত লোকজন, এই সব গান-বাজনা! পরে এ সব কি চারদিকে ছড়িয়ে তবে সন্ধান নিতে হবে না?

খানিক পরেই একজন ঝাড়ুদারনী আওয়াজে চেঁচিয়ে উঠলো—ও মা! এ আবার ছেলে গো! দেখ-দেখি, এই পোষবাসের ঝিকে যাবের কাপড়খানা একবারে ভিজিয়ে দিলে! আমি মুচ্ছোযাদুর, এখন কি করি? এখন ছেলে নিয়ে লোকে রাস্তে বেরোয়? কটি ছেলের মায়ের মান পোষবার এত সখ কেন? আমি যে এখন যদি চক্ চক্ করে বেঁপে! আবার স্নান যা হোক!

আশ-পাশের মেয়েরা চেঁচামেচি শুনে যে যার কাজ, আলোয়ান ফেলে এত জমে গেছিল! তরুণী মাকে,

সন্ধ্যার মুখির দিকে সবারই দু'চার চড় বসিয়ে দিলে। মুখি গোলমাল দেখে তার ছোট ছোলাবার ঝোলাটা ফেলছিল, চড় খেয়ে সে তার ঘরে ঠেঁয়াতে লাগলো।

তখন পুরুষদের দিক থেকে 'ছেলে থামাও!' 'ছেলে থামাও!' 'দুধ!' 'দুধ!' ইত্যাদি—আর মেয়েদের মধ্যে থেকে ঝোলাও ছাপা হচ্ছে, ঝোলাও বা ঝোল-গলায় অনেক রকম মন্তব্য উঠে বেশ খানিকটা গোলমাল বেধে উঠলো।

ডাক্তার-জননী দুলে দুলে হাসতে লাগলেন। ছেলেটি মুখে তখন চাপা দিলে। বন্ধু একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—এর চেয়ে যে ছুটো চাকুর-বেহারার নাম শুনবো, সে এরের জ্বালায় হবার যো নেই। ছিঃ!

কিছুক্ষণ পরে গোলমাল থামল। তখন দেখা গেল, কীর্তনীয়া গাইয়ের—বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রিতা—নিমাই উঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন—নিমাইয়ের চোখে জল! তিনি বল্লেন—তোমায় শুধু দুটী দিয়েই এনেছিলুম, দুটী দিয়েই যেতুম! আজকের ঘুম ভাঙলে তোমার এতদিনের দুঃখ অনেক হয়ে দাঁড়াবে জীবন বহন করবে—যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে ততক্ষণই শান্তি। কীর্তনীয়া নিমাইয়ের উক্তি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইলেন—'ঘুমি জাগিলে আমায় পাওয়া হবে না—ঘুমায়ে থাক!'

সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে, অনেকের চোখে জল এসেছে। এই সময় আমার পিছন থেকে একজন একটু ঠেলা দিয়েই আমি বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালুম। একটি মেয়ে থান-পরা আধাবয়সী স্ত্রীলোক—মলায়, হাতে ভক্তমালের মালা—তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে! তাঁর বাঁ-হাতে এক তাড়া বই ছিল, ডান হাতে একখানা বই আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন—মাখী-কল্যাণ—মাখী সঙ্কিয়ানন্দের শিষ্যা খিরিবালা দেবী মেয়েদের মাঝনা পথের উপদেশ দিয়ে লিখেছেন—তার আনা যায়—নেবেন?

আমি শুধু 'না' বলে মুখ ফিরিয়ে নিলুম। সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা বেজে গেল, কীর্তন আরম্ভ হয়ে আসছে, তবু আরেকটাও মন দিয়ে শুনতে পেলুম না। বিরক্তি ও অস্বস্তিতে মন ভরে উঠছিল।

মেয়েমানুষের পথে ঘেরে বড় ঘরে—আরেকজন বলিয়াছি, যায়েও! এখানে কি দোকান খুলেছে, না খেলা হচ্ছে? কেবল ঘুমাতে এসে খেয়া-খেয়া আর ঝোলার পড়ি—কি সব লিখিয়ে যে?

তার পর অনেক গান শুনে মনে—এ কীর্তনে গান হয়—বৈষ্ণবাচারীতে আজকাল মুক্তাবলম্বন করছে—সেও যেন গান! সেদিন মানভঞ্জন গানটি যা গাইলে, চমৎকার! মনে মনে মেয়ে নিজের মনেই গুন গুন করতে লাগলেন।

আমার পাশ থেকে একজন খুব চাপা-স্বরে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—দুটী ঘুম যেতে পারে দেখছি! সেই যে সন্ধ্যে থেকে বক্-বক্ করতে সুরু করেছে, একটী বার বন্ধ হল! আপনার আর কিছু খোলা হল না?

আমি যেমন বিরক্তির ভাবে থাকলুম।

বন্ধু দু'একবার ঘাড় নেড়ে বল্লেন—আঃ! গান-টান আর মনে আসে না! ঘুমাও খেয়ে একবারে! আগে কতদিন গান, মেয়েদের গান, মানভঞ্জন এসব আমার মুখস্থ ছিল। বাড়ীতে তখন রোজই আসর, গান, কেতন এসব একটা না একটা লেগেই থাকত তা! সে সব এক দিনই গেছে! যাক্ এ পালাটা কতদূর হল?

তিনি একবার কীর্তন শুনতে মনোনিবেশ করলেন। নিমাই চলে গেছেন, রাত্রি-শেষে বিষ্ণুপ্রিয়া জেগে উঠেছেন, কীর্তনীয়া গাইছেন:—

"জাগিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আগিয়া উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত,
প্রভু না দেখিয়া, চমকি উঠিয়া
চিত্রে করে করাঘাত।"

তাঁর সঙ্গীরা সকলে মৃদুস্বরে গাইছে—তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ ব্যাখ্যা করছেন—পালঙ্কের উপর প্রভুর পায়ের নূপুর ও গলার হার পড়ে ছিল—বিষ্ণুপ্রিয়া নূপুর তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু মুখ ফেটে যেতেও তাঁর মুখ ফোটবার উপায় নেই! তিনি নিস্পন্দে কাঁদছেন। সে কি মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা! মনে হচ্ছে, তাঁর এ দুঃখটা

আজার চলচ্চে যেন মুক্তাক্ষরে—বাবার আর বইয়ে পাচ্ছে না, শুধু হয়ে তাকিয়ে। আকাশে চন্দ্র, তারা তার হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে! পথের জল কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে উঠছে।

প্রভুর হাত ধুয়ে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া আবার বললেন। কোন দিন—আর কোন দিন কি তিনি ফিরে আসবেন? বিষ্ণুপ্রিয়া অন্ধকারে কাতরভাবে 'আমি এ সব দেখিয়া মরিব বুঝিয়া—আর না পাইব ফিরে'—

আলো-অন্ধ লোক চিত্রার্পিতের মত শুনছে, বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃদু বিলাপ হয়ে সকলের মনে তাঁর প্রিয়-বিরহের মর্মন্তুদ ব্যথা জাগিয়ে তুলেছে—অনেকে চোখের জল ফেলছে—কীর্তনীয়ার ভাবাবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে, কোঠার খুঁটে চোখ মুছে মুখ ঘুরে বসা পরিষ্যার অন্ধে তিনি আমার মাইছেন—তখন মৃদু হাসে আমায় বলেন—তুমি বাসীখণ্ড শুনেছ? তাতে নেই যে ফেলোর গল্প আছে, সেটা জানো! আমি ফেলোর কথা—

আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে বলব—আপনি কীর্তন শুনবেন না? বেশ গাইছে এখানটা! শুনুন না একটু!

তিনি মুকুলিয়ানো চলে একটু হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন—ও-সব আমার ঢের শোনা আছে। আমার ভাইজি-জামাই ওর চেয়ে ভালো গাইতে পারে।

তাঁর হয় ত অনেক শোনা আছে, কিন্তু আমার যে কিছু শোনা নেই, শুধু শোনবার আগ্রহেই বাসীর এই পদ্য বোঝা পদি ছেড়ে দিতের মাঝে একটা পদ এসেছি—সে বিষয়ে কোন মনোযোগ না দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, যা বেশ! সেই ফেলোর কি হলফটি! সেই কথাই বলছিলুম। শুন মহেন—ফেলো আমি হাজার বছরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো, তুমি আমায় দেখা করতে পারবে? ফেলো বলে—হাঁ শুনবেন! আমার সাধন থাকলে আমি আপনার দেখা ছাড়বো না। আজকের ত শুনব প্রাচিত্তি, আর ফেলোর দেখা আজই হলো, সে কি এক মজা! তা বেশ, আমার যাদু, একটা খুব ভাল আছে—আমি ফিরে এসে কথকতা করতে পারি—সেটা আমি এখনই শুনবো, সেই তোমার কাছে (আমার মুখের কাছে হাত ঘুরিয়ে) তোমরা এখানে হবে—হ!

আমার আর কীর্তন শোনা হল না—প্রভু আপন মনেই বলতে লাগলেন—এই শুক্লেন-ঘাটে আমার জানা-শোনা একটি নদিনী আছেন, বড় সাধক। এখন তিনি যাবে এখানে পদার্পণ, তা আমায় বলেন—যা! আমি এলো পরে যাবি—তোমাকে ত রেখে পারি না, তা তুমি সেখানে যা কথা-টথা শুনবে আমায় এসে শুনিয়ে যেও। আমি কথকের মুখে শুনে শুনে গোটা বাসীখণ্ড তাঁকে শুনিয়ে এসেছি। যদি ভক্তি থাকে, তবে দুটো কথা শুনলে মনটা ভাল থাকবে। আর লোকের উপকার করবার ভিন্ন ত আমার আসিনা বল?

তবে একটু থেমে বলেন—তা তোমার ত সব কথাই বলেছি—আমার যাদু পেটে-মুখে কথা নেই! সরলা বলিও থাকে ত পারি দিই, তবে সেটা আর বেশি হয়ে ওঠে না, আমার ত আর ছেলে পুলে হয় নি! শুধুমের বিষয় থেকে আমার বরঞ্চাই পাই। তা সেও বড় কম নয়। কিন্তু হাতে আমার কিছু থাকে না। যাদের বাড়ির সব পুরুষে পুরুষেই সন্ন্যাস! আমা যে বড় গরিব মেয়ে! তা ছাড়া আমার অনেক বরুপত্তর আছে। এই যেমন আমার বোষ্টমি-জামাই বোস হয়ে এখানে হাওয়া খেতে এলো, সঙ্গে লোকজন অনেক! আমার এখানেই ত তিনটি মাস হইলো! খরচটা বোঝ, আমাই দুটুক! একটু এদিক ওদিক হলে ত চলবে না!

বলে তিনি নিজের মনেই একটু হেসে অন্যান—তা থাক্, সে কথা আমি কখনো ভাবিনি, বুঝলে? টাকা নিয়ে কেউ আসেও নি—নিয়েও যাবে না, ফিরে যেমন যাবো যেন? খরচটা চলে যেলেই হল। আমার যাদুটী মনে যেলেন, যোগাব কখনো অভাব হবে না। তখন শুধু পরম শুরু তিনি, তাঁর কথা তো মিথ্যে হবার নয়! দিন আমার যেটেই যাবে।

হঠাৎ একটা হো-হো-রব ও সোরগোল উঠলো,—চেয়ে দেখি—কীর্তনীয়া বসে পড়েছেন। পুরুষেরা ও মেয়েরা সব এক সঙ্গে উঠে পড়ছে।

বন্ধু যত থাকিবে ভেবে ভেবে বলেন—কথা ! কেমন শেষ হয়ে গেল এর মধ্যেই ?

* * * *

কীর্ত্তন ত শেষ হলো—তার পরেই চারিদিকে বিষম চেঁচামেচি ও গোলমাল ! সকলেই আগে যাবার জন্য ব্যস্ত ! বন্ধু আমায় কিছু না বলেই সেই ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিশে গেলেন। অনেক ঘরে চেঁচামেচি করে খবরের কাগজ খুঁজে দেখি, সেই সময় আবার তাঁর গলা শোনা গেল, তিনি যাচ্ছেন বলছিলেন—কোথা দিবসে-রোমান্সের যাচ্ছ ? তবে আমাকেও এই অন্ধকার গলিটা হাতড়ে যেতে হবে ভেবে নিলুম। একটু পরেই ওরে বাপ—বাবা !

ক্লিওপেট্রার মৃত্যু *

শ্রীযোগিন্দ্রলাল বসুমজুমদার—কলিকাতা।

পাত্র ও পাত্রী

মিসরের রাণী ক্লিওপেট্রা ; তাঁহার সহচরীদ্বয়— চারমিয়ন ও ইরস ; ক্লিওপেট্রার অনুচর সৈন্যাধ্যক্ষ সেনানায়ক ডলাবেলা ; এবং প্রহরী প্রভৃতি।

[পূর্ব্বাভাষ—রোমসম্রাট ও ত্রিবিধের সৈন্যদের অধিনেতা আন্টনি যখন একটি বিষয়ভোগ করিতে আরম্ভ করিল, তখনকার অর্থ অনাবশ্যক রমণী ও অতীব রূপবতী ক্লিওপেট্রার আলোচনা করা হইল। কিন্তু সৌন্দর্য্য ও যৌবনই চিরকাল স্থির নয় ; পরিবর্ত্তনে সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে তাহা কিন্তু কখন দেখা যায় নাই। অনন্তযৌবনী ক্লিওপেট্রা সৌন্দর্য্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া যে আসিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতার মধ্যে আসিয়া মরণ দূরে। ধনে-ধিরে আসিয়াছে। এই ভোগের পরিণতি কিরূপ তাহাই বিশ্লেষণ করিবার জন্য ক্লিওপেট্রা সৌন্দর্য্যের মধ্য হইতে আন্টনির অধিকার করিবার জন্য সুদূরপ্রসারিত আকাশ পরিত্যাগ করিয়া আলেকজান্দ্রিয়ার আসিয়াছে। সীজার এইজন্য কিছু ভাবিয়া তাহাকে আলেকজান্দ্রিয়ার না করেন এ জন্য সে আলেকজান্দ্রিয়ার ও মিসরদেশের আন্টনির অধিকার করিয়া নিজের করিয়াছে।

মৃত্যু—সেকেন্দ্রিয়া—প্রাসাদ-সংলগ্ন উচ্চ অন্তঃপুর। ক্লিওপেট্রা, চারমিয়ন ও ইরস।

ক্লিও। শুনিলি ত' তোরা ! আমারে ভুলাতে চায়
রোমরাজ্য দিয়ে—আপনার মান যাতে
না যায় আপনি ! দেখ্ দেখি, চারমিয়ন !
[চুপি চুপি কথা

ইরস। আর কেন, রাণী ! ফুরাল সুখের দিন—
আসে যামিনী তমসিনী।

ক্লিও। যা লো ইরা করি—
বলিয়া রেখেছি আমি, সব ঠিক আছে,
বিলম্ব না হয়।

চার। এখনি চলিনু, দেবি !—
[ডলাবেলার প্রবেশ]

ডলা। রাণী কই ?

চার। দেখিছ না—সম্মুখে তোমার ?
[প্রস্থান

ক্লিও। ডলাবেলা ?

ডলা। দেবি ! করেছিনু প্রতিশ্রুতি
আজা পালিবারে,—সে যে ধর্ম্মবিধি মম
শিরোধার্য্য মোর ! এবে এই নিবেদন
করি তব পায়ে। সীজার লিখিয়া পেরে

---

* Shakespeareএর Antony and Cleopatra নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য হইতে।

ভবিষ্যৎ অভিযানে। যাবেন তাঁহারা—
সর্ব অঙ্গে পাইবেন আপনারে দেখা
পুরুষ, আজি হ'তে তৃতীয় দিবসে।
এ সংবাদ যা' করিবে বহন এখনি!—
পাঠাই আদেশ, দেবি! পত্রবাহক এবে।

ক্রিও। বড় ধীর! বহিলাম বসি।

ডেলা। চির দাস
আমি তব, আমারে বিদায় দেহ রাণী!
এখনি ফিরিতে হবে সীজার-সকাশে।

ক্রিও। যাও বীর, সঙ্গে যাইবার।

[ডেলাবেলার প্রস্থান

কি ভাবনা
ভাবিস্ ঈরস! বিপদের সঙ্গ মোরা—
নিয়ে যাবে দেখাইতে রাজধানী মোরে।
বড় বিশ্রী যাদুবের ছল, ক্রীতদাস—
কবর্য বলেন সাথি, অপাপ্তি অন্তে,
তাহের কাঁটামো পরে তুলিবেক ধরি'
আমাদের দুইজনে—সে সব মুখের
অনেক আগেই-গড়ে পাসরোধ হবে!

ঈরস। রক্ষা কর, রক্ষা কর, ওগো দেবগণ!

ক্রিও। সে যে নিশ্চিত, ঈরস!—বড় দুর্ভিনীত
দুই নাগরিক—উহাদে যাহারে যায়
আরাধনা জানি, বড় মূর্খ প্রাণ করি
হরিতে পাষাণী পান—মুখরা আমাদেরি
দুরোদরছাদন! নিরক্ষর নাটোরার
মুখে মুখে প্রহসন করিবে রচনা—
যেন পুরী রোমেরাজ প্রমোদ-কাহিনী,
আমি অভিনয় হ'বে মূর্খ-বিনোদন!
আসিতেছে পশ্চিমে হয়ে, দুরাগত আঁখি,
মরণ যাদব সাথিয়ে বিশ্বেশ্বরী—
টাইবারি মুখিত-তটে, রোমাইবে ঘটি
নষ্ট নষ্টিবর!

ঈরস। কোথা যাব!

ক্রিও। এ যে প্রশ্ন, সুনিশ্চিত!—নাহিক সংশয়।

ঈরস। দেখিব না এই চক্ষে সে দশা তোমার,
তার আগে নিজ হাতে ফেলিব উপাড়ি
এ দুই নয়ন, দেবি!—নয়ে যোর আগে।
সেই ভালো! আয়, মোরা এখনি করিয়া
বধ করি সীজারের ক্রুরপথা হরে।

[চারচিত্রনের পুনঃ প্রবেশ]

আয় চারচিত্রন! তোরা দুই সখী মিলে
সাজাইয়া দিবি মোরে রজন-দুহিতে,
রাজরাজেশ্বরী বেশে। আজি পুনরায়,
সাজাবে তরুণী মোর তরঙ্গিণী-তুলে,
নিজ-হাতে নীল বারি বিকাশিয়া যবে
আঁটনি-সমরে। যা যা, দুই যা ঈরস্!
আর কেন, চারচিত্রন!—বিলম্বে কি ফল?
এই তোরে শেষ আজ, এই শেষ দুটী,—
সাধা ছিনিয়াছ আজন্ একেলা বসি'
বাঁধিয়াছি তোর! আর নহি নিয়ে আর
আমার দুখুট-বলি, গরবোদ্ধিরাজ,
আর হেত আড়াল।

[কেলেপ কোলাহল

ও কি শব্দ হয়?

[জনৈক প্রহরীর-প্রবেশ]

প্রহরী। যখন আসিছে এক মূর্খ গ্রাম্যবাসী,
বলিছে না মানো,—আনিয়াছে মুড়ি করি'
ফলক-ডালী।

নিয়ে আয়, দেখি তারে।

[প্রহরীর প্রস্থান

মুড়িয়ে সে ফল নয়—মুড়ি আনিয়াছে!
কে বুঝিবে কারে দিয়ে কত উপকার!
আর আমি নারী নই—প্রতিজ্ঞা অটল,
কোন-মন বাঁধিয়াছি কঠিন পাষাণে!
বিষ্ণু নবরূপধারী চলন চরিত্র
করিবে না এই চিত্তে আধিপত্য আর।

[প্রহরীর পুনঃ-প্রবেশ]

প্রহরী। যেন এই আসিয়াছি রাজে।

ত্রিও। যাও যেন.
তুই যা বাহিরে।

[প্রহরীর প্রস্থান

কি আছে কপালে তোর?—
নীলবরবিহারিণী যাবে বৃন্দাবনী?
স্বর্গধামে হবে প্রাণ মিলা যাদবার?

গ্রামবাসী। যাই ত' নিয়ে আসায়: তুই কিন্তু মেয়েমানুষির পরতনেও যাচি পারবা না—নাড়াচাড়া এর ত' নির্জন যায়া যাবা, তাহিন মোচি তুমতি পাইবা না। অ্যাকবার যদি কেমড়ে যায় ত' অমন্ত কি অমেছ—আর বাঁচবা না।

ত্রিও। কেউ অমেছে, তুই চোখে দেখেছিস্?

গ্রামবাসী। দেখ ভাগ্লায়! তু যদি অমনো, তবে মেয়েলোকিরি সাথায় করেলো! এই কালই এক্ষ্ণ তোর উল্টেলো। বড় ভালো ছিল যাগীডা! যা এক্ষ্ণ, নিয়ে কত্তা কইত যো। মেয়েমানুষির ওই বড় দোষ। তা' ভালো কত্তা হয়, ত' নিয়ে কইলি যা? সে এই পোষাডার গুণির কত্তা তা কইতি লেগেলো!—বলে, কি বল্লা! যাত্তা আমি মেরে ওইছে—অ্যানো লেগেক মারি লেগেছে। তা, মেরে পোক্ষার দর কত্তা কি বিশেষ কিছি আছে? ওর আমা বাপ বিলিও বাঁচব নেই: কেমন না? এ পোষা বড় মজার পোকো!

ত্রিও। আচ্ছা, তুই এখন যা।

গ্রামবাসী। পোষার হাউস তোমার ভালো করিই রেখে যাবো।

[মৃদু গমনোদ্যত ভঙ্গি।

ত্রিও। তুই এখন যা।

গ্রামবাসী। আর ভাগ্যাগো—ভর তা কাম ও তা' করবেই কিন্তু।

ত্রিও। আচ্ছা, আচ্ছা,—তুই এখন যা।

গ্রামবাসী। আর ভাগ্যাগো—ভার আর হাতি ওরি দিও না যাবো। ও পরিমি বড় খাচড়া!

ত্রিও। তাই হবে, তোর ভাবনা নেই—তুই যা।

গ্রামবাসী। যে আজ্ঞে। ওরি কিন্তু খাবি দিও না—ওরি খাবালোও না, আর অমন ঘরি ঢ্যালানোও তাই?

ত্রিও। আমায় যাবে?

গ্রামবাসী। তুই আমন ধারুলা! আমি গো খানি, মেয়েমানুষির পরতনেও যাচি পারে না। ও জিনিষ ভাবনামার খানা নয়, ওরি পরতান হাতি করি পেকিয়ে না রেখে। কিন্তুক্ তাই বল আপুনি, মেয়েমানুষির বিয়ে অমনীর মাচা অবস্থামারেই খ্যাচিম করি হাকে না—অমনা ওরি পড়ে ত' পাচলা ওই খাঁচটুকির ভাওয়াল নেই ওরি নাগে!

ত্রিও। তুই এখন যা বল্লি।

গ্রামবাসী। এক্ষে এই যাবাং। পোষার হাউস তোমার ভালো করেই রেখে যাবো।

[প্রস্থান

[রাজবেশ ও মুকুট হস্তে ইবসের পুনঃ-প্রবেশ]

ত্রিও। এসেছিস্ রাজবেশ!—যে লো পরাইবে,
প্রাণে বড় ভাসিতেছে ইবসের সাধ!
বিশ্বের রাজাধানু এ অবনে আর
দুসিব না নাই। আয় আয়, নেরে কেশ্!
ওই শোন্, মনে হয়, অ্যাকনী আসিছে—
উঠিয়া বসেছে বীর!—বাখানিছে কত
মোর বীরপণা, হাসে মুখ খল খল
সীজারের আখ্যোয়ার দেখি, আসে সে যে
এত আশা ভালো নয়, দেবতা সহে না!
যাও—যাই, যাযী! ওই রাজে অধিকার
ভাবিব আটুই আমি মরণে ভিনিয়া।

আমি আর যাব আমি,—তুমি যেই তব
দিব বিসর্জন। এই যে, হয়েছে সাজা?
এইবার অবসর পেব আপনার
নিধি আর মোর,—বিদায়, বিদায়, সখী!
স্নেহময়ী চারুমিতা! ঈশ্বর! বিদায়!
উদ্যত ছুরি, ঈষৎ পড়ল ও ঝুঁকে।
একি! পড়ে গেল!—ছিল কি অন্তরে মোর
এত কাপুরুষ!—প্রাণ গেল যে ছাড়ি'
এতই সহজে! তবে কি মোহ ক্ষুদ্র-শেল
শেল নয়, প্রণয়ীর প্রণয়-ঈক্ষণ!—
মোহ বাধা, তবু তার পরশ মধুর!
এ যে নিঃসঙ্গে আঘাত। পলক ফেলিতে
দেখি পলাইয়া, আমারে অমর জনে—
এ জীবন কিছু নয়, নাহি প্রয়োজন
ধরিবারে কোন কথা বিদায়-বেলায়?

চারু। হে আকাশ! চালো বারি ঝরঝরি' অবিরাম—
অজোরে বরুক অশ্রু দেবতার চোখে!

ক্রিও। একি লজ্জা!—আমারে ফেলিয়া গেল পিছে!
যদি তারে আসে দেখে প্রেমিক আর্টনী,
লাজিবে তাহারি আগে প্রথম চুম্বন—
আমার সে স্বর্গসুধা তুলিবে ঈশ্বর!
[একটা দর্প যেন হাসে অলক্ষিত
তবে আর আলাতুক যব! ছিন্ন কর্
এই ধনুক, ভোর এই তীক্ষ্ণ বজ্রাঘাতে
তুচ্ছ জীবন-প্রতি,—তুচ্ছ বিষয়!
তুলে ওই! কে-বা দেখ করে'! যদি বিধি
মৃত্যু না ঘটায় মোরে, তবে এইক্ষণে
শুনিবারে মুখে মোর—নীরব দাড়িয়ে,
নীরব পলক, তার কিছু বুঝি নাই!

চারু। একদা পূর্ণিমা রাতে!

ক্রিও। আহা, চুপ চুপ!
দেখিস্ না ঝুঁকে মোর অন্তরের দিক!—
আমি যাদী, আমারে সে পাঠায়েছে মুখ
গুপ্ত দান করি'!

চারু। দেখ মুখ ফেরে গেল!

ক্রিও। একি মুখ! মুখমুখ! চঞ্চল-চরণ!
আহা মো আর্টনী!—আয়, তবে দুইও আয়
[সঙ্গে একটা দর্প ধরিতে পারিল
আরও ধরতর—
[অন্তরের উদ্যত পলক ও ঝুঁকে।

চারু। তবে ধরার মরণে?

যাক্, দেখ!—হ'ল পাখি, বিদায়! বিদায়!
তবে ফুরা! পঙ্ক বহু, আজ ক্রোড়ে মোর
ধরণীর অতুলনা মানব-দুহিতা!
মুছে' যাক্ ধীরে ধীরে অশ্রু-বাতায়নে
পদ্ম-রবিনিভা; প্রভাতের রবিচ্ছবি
আর না উঠিবে ওই মহিমা-আনন
উষার আঁকিতে।—মুকুট যে ধরা হ'ল,
ঠিক করে' দিই, পরে যাবাই বারিটি।

[দুইজন প্রহরীর প্রবেশ]

১ প্র। রাণী কই?

চারু। আমারো ধীরে কথা কও।

১ প্র। সৌভাগ্যের মুখ—

চারু। দেখা হ'য়ে গেছে তার।
[একটি দর্প যেন ফুটিল

আয়, আয়, দেরা কেন্! আসর হয়েছে!

১ প্র। কে তোমরা দীর্ঘ এস! স্থান ভাল নয়,—
রাজারে বিষেছে কীটি!

২ প্র। এই যায় দেখা
একেবারে অনাবেলা, দীর্ঘ তাও তাঁরে।

১ প্র। একি দেখি, চারুমিতা! একি ভাল হ'ল!

চারু। খুব ভালো! কথা যার ভুবন-বিজিত
রাজকুলে, এই তাঁর উপযুক্ত কাজ।
হায় মোর সৈনিক!—

[মৃত

আমি, ...

[ভদ্রাবেলার প্রবেশ]

ভদ্রা। কি সংবাদ বেহাইন?

২ স্ত্রী। সব মরে গেছে!

ভদ্রা। সীতার! আমরা সব অভাগী বটে। যে রাজ্য দুঃসাহস বিষাদিতে এত বেটা, ভাই হ'ল শেষে!

বেলখো। সরে' যাও, সরে' যাও, আসেন সীতার!

[অনুচরবর্গের সহিত সীতারের প্রবেশ]

ভদ্রা। যে রাজন্! লঙ্কা আজ তব অনুযায়ী, যাহা ভক্ত—তাই হ'ল।

সীতার। বড় ধ'রপণা করিল অহিয়ে! আমার কৌশল কেহ করেছিল নারী, তাই রাবীর রাজন রাখিয়াছে নিজ হাত।—মৃত্যু হ'ল ভিলে! ভক্ত ভাই?

ভদ্রা। বল দেখি, সর্বনেশ অনে কে.ছিল হেথায়?

১ স্ত্রী। নিরক্ষর গ্রামবাসী এনেছিল দুগন্ধ হরণী—বুড়ি এই পড়ে' আছে।

সীতার। বুঝিয়াছি, বিষ ছিল সাথে।

১ স্ত্রী। মহারাজ! এই বিষু আগে বেঁচেছিল চারদিন, বাজারে বসিতেছিল তথা; দেখিনু, মুহূর্তখানি পরাইছে ঘিরে দুয়া রাক্ষিনীর—বক্ষ যাবে ধরণরি, হঠাৎ পড়িয়া গেল!

সীতার। অপূর্ণ মরণ! বিষ যদি পান করে, প্রমাণ তাহার স্ফীত অঙ্গ, বিকৃত বরন, এ দেহ সুঠাম!

দেহ দেখেছে রূপের ঠাম, বসিবারে আসেন আপনী!

ভদ্রা। এই যে রয়েছে মুখে ফীন ফেন-রেখা, কেমন করম এ কি?—বাহুতেও তাই!

১ স্ত্রী। এ যে রাজ আশ্চিকের,—যেন রেখা বুড়ি-জলে পারার উপর রয়েছে লাগায় ঠিক—দেখিয়াছি তব এমনি লালের রাগ বহুরূপের যার নীলবর্ণ-ছুরে।

সীতার। তাই হবে, বসিয়াছে তাহারি বন্ধনে। তবিয়াছি বেহাবার রাজদ্রোহ-সুখে—বৃদ্ধার সরল পথ! যত আসে, নিত্য নব সন্ধান তাহার করেছিল অন্তরাল বিপদ-ঈশ্বরী। রাবীর পালন-বাণি বহি অহে যাও দেখা হ'তে, আর এই রমণী দু'জনে। সবের অন্ত্যেষ্টী পানে ধরি' দিব আর অহিয় বরন; এ ধরায় আর কোথা রহিবে না আর কোনো সমাধি তখন এ দেহ মুছনে। দেহ অপূর্ণ রহিবে যাদের তারণে আজ, তাদেরো মানসে জনমে বিস্ময়;—যেমন পৌরব আজে, অন্তরিকে অন্তেষ্টিক বলবাহিনী! যত দৈত্য যোর করিবে প্রমান-ভাষা বিষম-ভয়ীর, তাদেরও ধাবে সব রাজধানী রোষে। ভদ্রাবেলা, দেখো যেন এ কাজ সমাধা হয় যথাসময়োচিতে।

[সকলের প্রস্থান।

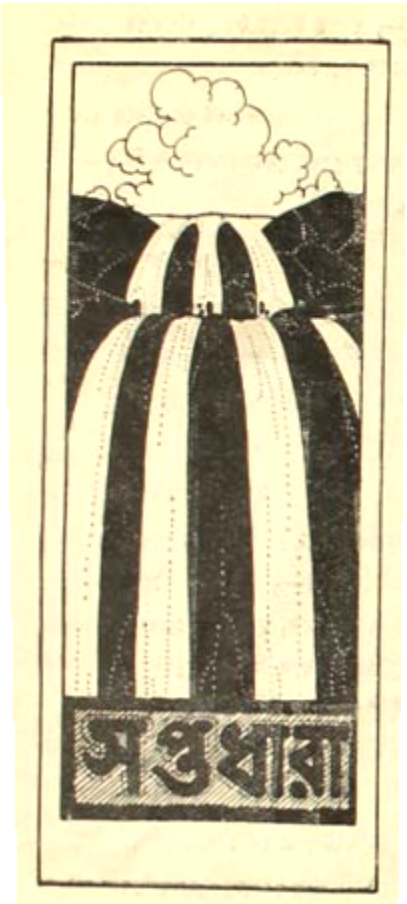
সপ্তধারা

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible] তারি সহচরী। দুষ্ট অরিন্দম হৈবে

তরবারী।

[illegible] বিদায় হইয়া [illegible]
[illegible] হইল [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] হইল [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]

কন্যা হিসাবী তব আমি নিবেদিনী। তাহে স্থান তব

অরি ঘরিণী।

[illegible] [illegible] [illegible] [

গুরুর দশা

শ্রীবরেন্দ্রচন্দ্র রায়—কাশী

১

গুরুভোজনের বিষয় ফলের কথা পাছকার বলিতে কোনই দ্বিধা করেন নাই। তাহা, ইহার ফল ভোগ করিতে হয় সকলকেই, কাহারও এখানে রেহাই নাই। পারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষার বেলা যাঁহারা এতই তৎপর, মানসিক স্বাস্থ্যের বেলায় তাঁহারাই কেন যে এমন বে-পরোয়া, তাহা ভাবিবার বিষয়। এককের অথবা দুটি ছাড়া আর একজনের থাকা যদি ভাল হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার উপকার হয় সে ভোর করি ও-বিষয়ে চুপ করিয়া থাকিতেই ভালবাসে। এমন কি চুপ না করিয়া ও-বিষয়ে বিপরীত ভাবে মুখর হইয়া উঠিতেও দেখা যায়। গুরুভোজন সম্বন্ধে আমাদের পাছকারমহাশয় তেমনি অনুকূল মুখরতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার ফলে, একজনের মানসিক ব্যাধি এবং দুর্বলতা বৃদ্ধির ফলে, আর একজনের পুষ্ট থাকে, মনে, সম্পদে অর্থাৎ লক্ষ্মী-শ্রীতে ভরিয়া উঠিতে থাকে।

গুরুভোজনের দিকে যেমন রোগীর ঝোঁকটাই বেশি, তেমনি গুরুজনের দিকেও আমাদের হিন্দু সন্তানদের একটা অস্বাভাবিক রকমের ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুরু প্রতি বিষম লোভের মনস্তত্ত্বটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

মানুষের মনে কোনো একটা সংস্কার গড়িয়া উঠে দুইটি কারণে। অন্তরের একটা সংস্কারের দিকে প্রবলতা থাকা চাই আর সেই সংস্কারটিকে জাগাইয়া এবং বাঁচাইয়া রাখিবার বাহিরের দিক হইতে একটা চেষ্টাও চাই। আমাদের অন্তরে এই গুরু-প্রবলতা রহিয়াছে কি না, যদি থাকে তবে তাহার স্বরূপ কি?

২

অন্তরাল হইতে শিশুকে আমরা যেমনি ডাকা দিয়া আসিতে থাকি। সে আমাকে পাইয়া, ধরিয়া ফেলিয়া, ছাড়িতে, বলিতে গিয়াছে ইহা আমাদের সহ্য হয় না। অতিরিক্ত স্নেহ শিশুর অসহায় ভাবের চেষ্টা করিতে থাকে। তেমনি স্নেহে স্নেহে আমরা করিয়া দিয়া আমরা-জনটাকে অত্যন্তের অতিপাশে জড়িত করিয়া তবে ছাড়ি, কিন্তু এই সহজ সত্য কথাটাকে স্বীকার আমরা করিয়া এড়িয়ে। যে যেমন করিয়া তবু শিশু কোল ছাড়িয়া ধরণীর উপরই আপনার বিশ্বাসের স্থান করে, আর আত্মবিশ্বাসের অমৃত পানে করিয়া তাহার বড় হইবার শক্তি আসে। যারা ঠেলিয়া তাদের শক্তির বিকশিত হইতে থাকে এই স্নেহের স্নেহে।

তার পর ছোট বেলা হইতেই অনেক স্নেহেও এই লালনের লালসিক স্নেহ শিশু। সর্বনাশ বড় হয় করে না। শিশু আপনা-আপনি হোঁচট খাইতে চায়, সিঁড়ি বাহিয়া উঠে প্রণাম করিতে তাহার কৌতূহলের আর অন্ত নাই। স্নেহের স্নেহ আসিয়া শিশুর এই বিকাশের প্রয়াসকে নিষ্ফল করিতে চায়। ছুতো লয় আসিয়া শিশুর হাতে পায়ে কাল্পনিক এবং সেই ভয়ই ঘুমেরও সুখল পরাইয়া দেয়।

আমার বৈশেষ আসে মন-বিকাশের এক আকাঙ্ক্ষা প্রেরণা লইয়া। এই মন-মরা শিশুর দলও আমার কৌতূহলের প্রেরণায় বাহিরে যাত্রা করিতে চায়। এক নূতন স্বাধীনতা তাহাদের অন্তরে জন্ম-কামনা করে, কিন্তু আমার অভিভাবক প্রবীণ মন সেই বিকাশের পথ

আঙুলিয়া লাফাইয়া থাকে। নবীন ভাব, নবীন চিন্তা, নবীন উদ্যম সব ব্যর্থ হইয়া যায়।

অভিজ্ঞতার প্রবীণেরাই জানে যে, জীবনের যাহা কিছু নবীন প্রকাশ তাহা শুধু তাহাদের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে, বালকদের দ্বারা তাহা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং প্রবীণের একমাত্র জোরের জোর, নবীন না পথ হারাইয়া ফেলে। তাহাদের পথ হারিলেই যে নবীন পথ হারাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তবুও প্রবীণ প্রথম ভাবে নবীনকে পুরানো পথে পুরানো ঘাটে না ফেলিয়া চলিতে পারেন না; ইহাই হইল আদু ব্যথা।

এদিকে বিশ্বকালে যাহাদের বাকি-খাজনা কেবলি বর্ধিত হইয়া আসিয়াছে, যাহাদের ঘাটে ঘাটে নূতন নূতন চৌকি নজর-চৌকির ঘর তুলাইয়া আছে, সে তো চোখ বুজিলেই হয় পার। সে চোখ না-বুজিয়া যে-কারণে হাতে ধরিয়া, যে-কোনোও চলিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচে। এমনি করিয়া আমাদের পরিবর্তনের শিক্ষা সুদূর ভবে চলিতে থাকে

কিন্তু যে-আমারও উপর নির্ভর করিলে ঠিক নির্ভরযোগ্য কিছু কাটানো যায় না তো। অন্তর বলিতে যাহা এটা ঠিক না, ঠিক না। তাই এই যে-কোনো ব্যক্তিটিকে একেবারে 'ভগবান্ বলে' করিবার অনেক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের লোকেরা বড়ই ধার্মিক; ইহ-সংসারের জন্য চিন্তা তত নাই, পরলোক সম্বন্ধে যত প্রকারের দুর্ভাবনা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। দুর্বল বলিয়া আমাদের সাহস যত বেশি, পরলোকের চিন্তাও আমাদের তেমনি। চক্ষু যে দুর্বলদের এখানে উপায়ের তাহাদের আর অস্বাভাবিক কি আছে! গুরু-ভগবান্ বলিলেন—তয় নাই, গো—বৎসের চক্ষু বুজিয়া আমার পায় মাথা ঘুষাইয়া পড়িয়া থাক, তোমার সব বোঝা আমার, নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সেবা কর।

গুরু পথের আধ্যাত্মিক যাত্রা যাহির হইয়া গেল, তখনও যখন করিয়া প্রমাণ করিলেন সত্যের সাক্ষী এবং এম, এ-রা যে গুরু হইয়াছেন ভগবান্। তাহার পর মিশনারিরা ইহাও বলিল, অন্ধ গুরু, সুতরাং অন্ধ যে ভগবান্ তাহাতে আর সেকেলের সন্দেহের স্থান রহিল না। আরো শাসন-বাণী প্রচারিত হইয়া গেল, 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।' কোনো ভরসের সাহস করিয়াছে কি বলিয়াছে বাপ-মায়েরা! যেটি যদি সেটি তাহাদের না করিয়া চল, তুমি অন্ধে তোমার অন্ধত্ব ঘুচিয়া-কথা হইয়া যাইবে।

গুরু-ভগবান্ কি করিতে পারেন তাহার অন্ধ প্রমাণ বয়সের বিশ্বাসে, সেই জন্য গুরু কি-ভাবের তাহার সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই নিষ্প্রয়োজন বড় একটা নাই। কি-ভাবের তাহা বুঝিতে পারার মত আত্মবিশ্বাসও নাই বলিয়াই তো কি-করিবে পারেন সে সম্বন্ধে বিশ্বাস এত অবাধ হইয়া উঠিতে পারে। আর আত্মবিশ্বাস না হারাইতে পারিলে, অমন দয়া-দাক্ষি অর্থলাভও কিছুতেই হইতে পারে না। আন্ধুর যাইতে হইলে তাহার জন্য বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন হয়; কিন্তু আত্মবিশ্বাস হারাইয়া যদি দিগ্‌ভ্রান্তির হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে তো একেবারে অনায়াসেই যত-ইচ্ছা নরকাভিমুখে যাত্রা চলিতে পারে! সুতরাং আত্মবিশ্বাস হারানোর দুবিয়া দুবিয়া বৎসরা গুরুতর হইয়া উঠিতে কালবিলম্ব করেন না। আন্ধুর যাওয়ার সঙ্গে না হয় দিগ্‌ভ্রান্তির ভাগ সঙ্গে মিটাইয়া লইতে কতি নাই, কিন্তু বৎসরা তো এ কথাটি বুঝিতে পারেন না যে, ও-ভাবে সত্যকার ক্ষুধা মিটাইবার ভারটি সমাধা করা গুরুতর ব্যাপার। তাই দুর্বলেরা শেষ কালে না-বলিয়া পথ পায় না। তবে বলিবার বেলা ইহারা মনে করে যে, মার্গির ভয়ে চাপিয়া বসা হইল। এটা সান্ত্বনা বটে।

৪

গুরুরা একটা বিশেষ জন্ত বটে, কিন্তু বর্ষাটাও এক রকমের বিশেষ গুরুরা, যাহা গুরু-ভগবান্ আশ্রিত জন্তু

বলিয়া প্রচার করিলেন। আত্মাকে তার, আপনার স্বরূপে প্রত্যক্ষ কর, এই ছিল এই দেশেরই সাধনার মূল রীতি, কিন্তু আপনাকে ভক্ত বলিয়া জানে এই অপূর্ণ অহমাসনে প্রতিষ্ঠা করিলেন গুরু-ভগবান্। ভক্ত হইবার সাধনায় কিছু সময় লাগিত, কারণ এই সাধনার শক্তি নিজের অন্তরে সঞ্চয় করিতে হয় না, আত্মশক্তিকে বর্জনের দ্বারা ভক্তের নির্ভরতায় হয়। পড়াইয়া যাইবার গতি অর্জন করিতে হয় এতদিন নিশ্চেষ্টতার দ্বারা।

ইহাতে আমাদের মনে কম-আরামের সঞ্চারিত করিয়াছে এই কথাটিই আমরা বলি। আমাদের দেশের গুরু-ভগবানের সম্বন্ধে যে এই কথাটি আরো বেশি সত্য, সেই কথা বলিবার কথা নয়। চতুর পথপ্রদর্শক এই কথাটি জোর-গলায় বলিয়া চলিয়াছেন যে, বিদ্যার্থীর শিক্ষাই দেশের এখন সবচেয়ে দরকার। চতুর জানে যে, এই জাতির সত্যকার লক্ষ্যে পৌঁছাইবার নিজের ভবিষ্যতের পক্ষে ভয় শুধু এরে।

ইউরোপ এই দেশে যন্ত্রি-যাত্রা এবং বিচার-ব্যবস্থার বাহন লইয়া আসিয়াছে। ইহাই তো চিরকাল মানুষের অন্তরতম বাণী। জড়তা হইতে প্রাণে, অন্ধকার হইতে প্রকাশে, নির্দ্বিত্ব হইতে বিশ্বাসে, পরতন্ত্রতা হইতে স্ব-তন্ত্রতায় অভিব্যক্তিই তো এই সৃষ্টির অন্তরতম ব্যাপার। মানবাত্মা চিরকাল ইহার উল্টা পথে চলিয়াছে। তাই প্রতি মানুষের অন্তরে যে ভগবান্ বিশেষ সত্তায় সত্তা হইয়া আছেন তাঁহাকে বলির করিয়া গুরু-ভগবান্ মানুষকে লইয়া চলিয়াছেন। যে-সব মানুষের যোগ্যতর দোষা ছিল, যাহারা এক একটি বীর-শিষ্যের মত উঠে আপনাকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিল, তাহারা মাটিতে মুখ লুটাইয়া পড়িয়া, এক হইয়া মাটিতে মিলাইয়া গেল। মাটি উর্বর হইল কিন্তু প্রাণের কথা রহিল সুপ্ত; তার পর শিষ্যানুগ্রহযোগ্য উর্বরা মাটির ভালবেসে আত্মাহুতি সাধন করিয়া চলিলেন।

৫

গুরু-ভগবানের এই যে মারণ-অস্ত্র, ইহার সাধনা আজ দেশে নানা রূপে চলিয়াছে।

যেখানে মানুষ কিছু জানে না, বুঝে না, সেখানে সে বড়ই দুর্বল। কি করিলে মানুষ যে ভগবান্ হইয়া যায় তাহাকে জানা নাই, অথচ ভগবানের পায়ে সব ভার ফেলিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। ঠিক এমনি সন্ধি স্থলে গুরু-ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু গুরু-ভগবান্ যে ভগবান্ এই প্রতিষ্ঠার করিবার সাধনা আছে। এই সাধনাটির নাম ভেদী-সাধনা।

এই ভেদী-সাধনার অনেক রূপ আজ দেশে বিরাজ করিতেছে। ভেদী-সাধনার অনেকটি রূপ আজ প্রকাশ করিব বিচার করিয়াছি। এই ভেদী-বাহির উদ্দেশ্য হইতেছে সর্বপ্রথম তাক্ লাগাইয়া দেওয়া—কোনো একটা ব্যাপারে। তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিলেই ভাবণ-যন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইল. তেমনভাবে বিস্মিত না করিতে পারিলে ভাবণ-যন্ত্রের ক্রিয়া হয় না। এক বার যদি সে কোনো রকমে বিস্মিত হইল, তার পর যে আমিই ভগবান্ তাহা বুঝাইতে কতক্ষণ লাগে! গুরুকে তখন যাহা বলি তখন সে তো তাহাই করিবে- কর্তা তো আমি, সে তো তখন কল মাত্র।

৬

যাহারা নিজের সাধারণ ভাবে বংশানুক্রমিক পেশা হিসাবে এই ভগবান্ হইবার পেশা করিয়া আসিতেছে তাহাদের কথা বেশি বলিতে চাহি না। তাহার কারণ, এই ছোটো পেশাদারেরা ঠিক সচেতন ভগবান্ নয়। তাহারা ও তাহাদের শিষ্যেরা একটা অভ্যাস হিসাবে এই কাজটি করিয়া চলিয়াছে। গুরু মরিলে এক বার দুইবার আসেন, কলস ভোলার ঠিক পরটাতেই। দু'একদিন থাকিয়া দু'চারিটা নব উপদেশ দিয়া ও ভোজন-দক্ষিণা নিয়া তিনি চলিয়া যান, আর পশ্চাতে রহত এক-আধ টুকরা অন্ন শিষ্যের খানে ফেলিয়া যান। মরার মরার জানাজানি হয় তাহাতে কেউ কাহারো কম করে না।

যেখানে কবি হইতেছে সেইখানকার নীলার কথাই বলি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুর পাশ দিয়াও যাবার সময় পাশ্চাত্য-বিদ্যার প্রতি কোনোরূপ শ্রদ্ধা দেখা যায় না, বরং বিদি আরো বেশি করিয়া নানা রকমের দৌরাত্ম্য আর অসুস্থ সংস্কারের ভক্ত হইয়া উঠিতে থাকেন, তাঁহার প্রতি সাধারণ লোকের ভক্তি একটা শ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। তাহার কারণ, সাধারণ লোকের মনে, তাহাদের নিজেদের এই সব দৌরাত্ম্য এবং কুসংস্কারের জন্য নিজেদের ওপর একটা অশ্রদ্ধা এবং অবিশ্বাস রহিয়াছে। তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি নাই, সুতরাং কি করিবে, সংসারের মোহ কাটাইতে পারে না বলিয়া তাহারা জানে। কিন্তু হঠাৎ যখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা এত বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়াও ওই সবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে থাকে, তখন তাহাতে সাধারণ লোকেরা ভরসা করে, ভাবে, ওই লোকটি তাহাদিগকে অন্ধকার সমুদ্র হইতে মুক্তি দেবে। তাহারা মনে মনে তখন বলে, তারা হইলে পরে ওই ঘড়ি এবং টিকটিকি দোকা কিনিতে হয়, আর আমাদের ওই মাথিয়া-চলার ব্যারামটা বড় কম নয়—হুঁ! এই বলিয়া তাহারা আপনার কোন্ ভয়-দৌরবকে ফিরিয়া পায় আর তাহারা ও-সব মনে না তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া আপনাদের ঘাড়টাকে সেই নীচ হইতে অনেকখানি ওপরে টানিয়া তুলিয়া আনে। ভরসা আর এক পাক জড়াইয়া বসে।

এই যে অনসমাজের অন্ধতা পাইটি, এটি যদি ভাঙিয়া যায় আর একখানি বিদ্যার সঙ্গে যদি পাশ্চাত্য-সমাজের কুসংস্কার একখানি ভঙ্গ করিতে পারেন আর সেই সঙ্গে যদি দেশ প্রকৃতির সম্বন্ধে যথার্থভাবে কথা বলিতে শুরু করেন, তাহা হইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইনি শুরু-ভগবান্ হইয়া বসিয়াছেন।

এই শ্রেণীর শুরু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট প্রসাদ পাইয়া থাকেন এবং হিন্দু সমাজের মেরু স্বরূপ হইয়া বিরাজ করেন। শুরু, শিষ্যের দৃষ্টিতে ভগবান্ হইয়া উঠেন, কিন্তু তা-বলিয়া শুরুর শুরুত্ব প্রয়োজনগুলি কেমনের হইবে? শিষ্যের অজ্ঞতার উপরেই গুরু, আরো যে সর্বপ্রকার পতন ও প্রয়োজনের মূল কারণ তাহা বুঝাইবার কে? তাঁহার খোঁজা হয় না। তাই তাঁহার শিষ্যের প্রয়োজন হয়, মূলধনী শিষ্যের মেরুদণ্ড যে অনেকখানি তাহাকে খাঁড়া করিতে হয়। বিধবা শিষ্যাদের তবেই বেশি করিয়া সংপুরুষের সংসর্গ বর্জন করিবার পালন চলিতে থাকে, তাহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার আনুগত্যও তবেই বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিষ্যেরা ইহাকে ভক্তির অপরিসীম কৃপা বলিয়া মনে করে। যাহা হউক হয়, তখনও তাহারা ভিক্ষাকে সেবার মত আদায় করিয়া লয়, যে অন্তরঙ্গ করে সেই আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিয়া ধন্য হইয়া যায়, এই চতুরের চাতুরীর প্রসাদে। তার পর একদিন আসে—কিন্তু দুর্ভাগ্যের এমনি অন্ধ যে, তখনো ওই বিদ্যা আসর ছাড়িয়া উঠিয়া যায় না, তাই তখন তাহা এই বলিয়া সান্ত্বনা পায় যে ভাল মানুষকে সংসারে নানা নিন্দাই সহন করিতে হয়।

পাশের কেহো নিয়া এই শুরু একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া বাখিয়াছেন। শুরুর আসেন যত ইহারা সূল-সন্ধ্যা করে, জিহ্বা-জপ করে, তার পর আফিঙটা ধরিয়াছে কি করিতেছে, সমাজের কোনো সংস্কারের কোথাও প্রয়োজন আছে কি নাই, সেই সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনযাপন করিতে থাকে। তারা ভাবে, পরলোকের ইনসিওর্যান্সটা তারা যেন পাকা করিয়া লইয়াছে, সুতরাং কেন যাকগে না এই দুনিয়া, তাহাতে তাহাদের কি আর হইবে!

ছোটবেলায় বেদের তাবাগা দেখিয়াছি। সকলের সামনে বসিয়া বেদে তাহার খাপিয়াতে ফুঁ দেখাইয়া গাইয়া তাহুকরীয় হাড়খানা মোঁয়াইয়া 'আয় আয়' বলিয়া অনুচ্চ ধ্বনি করিত আর কোথা হইতে হাতের মুঠায় একটা সাপ আসিয়া আবির্ভূত হইত, ইহা করিয়া মুখ দেখাইত, মুখে বিষই নাই। কি যে মন্ত্র পড়িত আর মুখ হইতে কত রঙ করিয়া এক সাপি চক্রকে বলার টানা করিয়া পড়িত। তার পরদেশে তাবাগা দেখাইয়া

মুখ-তরা হাসির টাকার থলির বদলে হাত পাতিয়া লওয়া ভিক্ষা চাহিত। সেই ছোট বেলার ব্যাপারটা যে নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিয়াছি অনেকদিন, তাহার ও লোকটা একটা মায়ার বেশে, আর সে সাজটি যেন দেখাইতেছে বলিয়া খীকার করিয়া বসিত।

কিন্তু কবি বলিয়াছেন তুমি তার ক্ষুদ্র নহ, ক্ষুদ্র তাহা নয়। কি আশ্চর্য সত্য কথাটাই কবি বলিয়া ফেলিয়াছেন। যেন কি জানিত যে তাহার ওই বাহিরটার মধ্যে অন্তরাত্মা যৌবন বিকৃতি হইয়াছে আর আমরাই কি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ওই বেশে কত বড় লোক! সে-কথা বুঝিতে আরো যেন যে-দিন অনুত্তানন্দের আবির্ভাব হইল বিজ্ঞানের 'অন্তঃপুর' হইতে। অনুত্তানন্দ লোক নন, তিনি ভগবান, মানব, তার উপর পুরী হইয়াও সন্ন্যাসী। সুতরাং তিনি যেদিন দেখাইতে লাগিলেন যে আকাশের নীলিমা হইতে মাটি পর্যন্ত তৈরী হয়, আলোকের কণা হইতে তিন লক্ষ টাকার হীরা বাহির হয়, এবং তাহার মেহের লোহকূপ হইতে বড় বড় দর দামী পাথর বাহির হয়, তখন তাহা যে কত বড় 'লোভের ব্যাপার তাহা বুঝিতে এক নিমেষও লাগিল না। আর তিনি যে সূক্ষ্ম শরীরে যখন-তখন এখান হইতে বিজয়ে চলিয়া যান তাহাও বুঝিতে কোনো ক্লেশ হইল না। কারণ যেদিন রাতে বিজয়ে যান সেদিন তাঁহার ঘরে ভিতর হইতে তালা বন্ধ থাকে এবং সকালে যখন বাহির হইয়া আসেন তখন তাঁহার হাতে বিজয়ের পত্র থাকে। অথচ ফলপতি এত করিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া সিন্ধুকে বন্ধ হইয়াও তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটি রাতের ভরে যেন আর পারেন না। ব্যবসা করিতে গিয়া লোকটা ভগবান্ হওয়ায় পর্যটাকে বন্ধ করিয়া দিল। ব্যবসায় এতটুকু ফেরা না করিয়াও যে একটা বৃহৎ ব্যবসা চালান যায় তাহা সে কোনো দিনই না বোঝে হয়।

এই অনুত্তানন্দেরা কি করিয়াছেন?

৮

বড় বড় বিজ্ঞানেরা অনুত্তানন্দের কাছে গিয়া ধ' হইয়া গেছেন। তাঁরা অনুত্তানন্দের সঙ্গে তর্ক তুলে না, তাঁহার কথার সন্দেহ তুলে না। বেশ প্রশ্ন করিলে তিনি মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলেন ও কি তোমাদের বিজ্ঞানের কর্ম বাপু! আমি তোমাদের বিদ্যার ধার ধারি না, তবে এ বিদ্যা তোমাদের ওই বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করিতে পারিবে না, ঠিক জানিয়ো। তার পর তিনি এই বিদ্যা যাহাতে আমার তাহাদের প্রচার হয় তাহার চেষ্টার কথা বলেন; বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার সুরে কহেন। বিজ্ঞানেরা লোভ ও ঈর্ষার দ্বারা অনুত্তানন্দকে বাধা করিতে লাগিয়া যান আর সেই বাধার দ্বারা তাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য এবং ফলপতি হইতে বহুমূল্য সব যন্ত্র-পাতি আনাইবার জন্য বাধার চিত্তরথে অর্থ ঢালিয়া দিতে থাকেন। যদিন যেদিন হইবে সেদিন ওই সব যন্ত্রের চলার পথ চাঁদ। হয়ে-আসনে উঠিয়া আসিবেই, এ বিশ্বাস তাঁহাদের আছে।

ওদিকে অনুত্তানন্দের মঠ বড় আশ্রম নিয়মা এবং পুরী, কাশী এবং বৃন্দাবনে তৈরী হইতে থাকে। ভগবানের সেবা করিয়া যাহারা চরিতার্থ হন, গুরুদেবও নিজের জামা-কাপড়ে উজ্জ্বল পরাইয়া, ছাত্রাবলীর নবনীত সেবায় প্রস্তুত হইয়া উঠিতে থাকেন—বিজ্ঞানেরা অনুত্তানন্দের জ্যোতিষের দৃষ্টির জ্যোতিঃ দেখিতে পায়। বিজ্ঞানেরা তাঁহার বিদ্যার আর তল পায় না। সুতরাং তাঁহার জীবনী লিখিতে বসিয়া যায়।

এমনি করিয়া অনুত্তানন্দেরা আশ্রমের অদ্ভুত কর্মীদের অনবরত তাড়িয়াই একদিন যোর তরি লোভাতুরের বিজ্ঞানমন্দির প্রাঙ্গণের কাছে যাইয়া হইয়া দাঁড়ান; তখন তাঁহার অসবাস্ত কীর্তিই তাঁহাকে চিত্তরথে ধরান্ করিয়া তাড়িয়া যায়। মূর্তি প্রতিষ্ঠা, পূজা ইত্যাদি চলিতে থাকে নিত্যকাল। ভগবানুদের এই সব লক্ষ্য কেনই বা থাকে, কেনই বা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা কে জানে!

আর একজন ভগবান্ আকাশ পরিক্রমির পদরা লইয়া এই দেশের নানাস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ইহারা প্রত্যেকেই বাস্তবের। দুজনের সামনে ঘোর-বর্ণনার কথা বলিতে পারিলেই দুজন নড় হইয়া পড়ে, ওজস্বিনিজস্ব শিষ্যমণ্ডলীর যদি এক সঙ্গে ঘণ্টা দশেক কথা বলা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে উহাদের মধ্যে যেমন একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্পষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠিবে। ইহারা পুরুষ হইয়া নারীর মতই অত্যন্ত বেশি বিষয়প্রবণ। এই ভগবানেরা এই দর দিয়া এবং দিয়া লইয়া এক অপূর্ব লীলার সূত্রপাত করিয়াছেন।

এই লীলানন্দেরা হিপ্নটিজমের অদ্ভুত ব্যাপারের আমাদের দেশে চালি হওয়ার ব্যাপার করিয়া চলিয়াছেন। লীলানন্দ বলেন আমি ভগবান্। এবার কলিযুগে আর কোনো কোনো রূপ রাখিবনা; যে যে-ভাবে আমাকে চাহিবি, পাইবে সেই রূপেই। কৃপা করিয়া এবারে আর কোনো তপস্যারই প্রয়োজন রাখিব না। আমাকে যে স্থান করিবে অনায়াসে সে আমাকে পাইবে। এইরূপ শক্তিহীন দুর্বল বিশ্বাসের বল এতটা শুনিয়াই খসিয়া যায়। বিনা সাধনায় সিদ্ধির মত লোভীর পক্ষে লোভনীয় আর কি আছে!

লীলানন্দের রোমশক্তির বলে যাহা বলিয়া দিয়া থাকিতে পারে। তাহারা দু দিন তিন দিনের সাধনায় এক একজন কি যে হইয়া যায় তাহাতে আশ্চর্য লাগে। কেহ পলকে ঘরে বেসরি গুরু-ভগবান্‌কে দেখিতে পায় আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদে, কেহ বহুদূরে থাকিয়া তাঁহার স্পর্শ পায়, কেহ ঘুমাইবে দিয়া তাঁহাকেই স্বপ্নের মধ্যে পায়। কেহ বাহিরাবে, কেহ সমাধিতে ইত্যাদি নানা ভাবে তাঁহাকে পাইতে থাকে। গুরু-ভগবানের আশ্চর্য বিভূতির পরিচয় পাইয়া লোকেরা অবাক্ হইয়া যায়। গুরু-ভগবানের আশ্চর্য কৃপায় তাহারা বেকলেরও ভিতর তাহারা আরো ঘোরাও রাজবন্দী শক্তি কেমন একটা বড়াচড়া করিতে থাকে।

ফলে, লীলানন্দের আসন পক্কিতে ভরিয়া যায়; লীলানন্দের চালিসাসে লীলাবতী যোগিতারা বিরাজ করেন। সকলেই জানাবিই: উঁহাদের পায়েই কতগুলি উঁহাদের-পারা বিরাজ করিয়া আছে বেকুবের মত, তখনো ঠাকুরের প্রেমলীলা দেখিয়া আহা-হা করে, তখনো কাঁদে। কেন যে আহা-হা করে, কেন যে কাঁদে তাহা যে জানে!

সাধারণ কোনো সামাজিক মানুষের আশে পাশে তাহার অজ্ঞাত আসবার দু-চারিটি লক্ষণ যদি আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের ঘর-বেষ্টের নানা রকম বিশ্লেষণের আর অন্ত থাকে না; আমাদের বৈঠকী মজলিসে আমাদের চোখে-মুখের ইঙ্গিতে এর কথাই আমরা বলিতে চাই, বলি। এই আমরাই যখন লীলানন্দের প্রভাবলীলা দেখি, তখন একিসে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। তাহার কারণ, লীলানন্দ যাহা করেন তাহা তো সাধারণ মানুষের কর্ম নহে; স্বয়ং ভগবান তাঁহাদের আধারে নামিয়া বিহার করেন। আমাদের মাত্র দুটি চক্ষু আপনার ইন্দ্রিয়শক্তির দিয়া তাঁহাদের রাসলীলাকে কতটা করিয়া দেখে? ইন্দ্রলীলা কি সহজ কথা নাকি!

লীলানন্দের কেহ আসার ওই ঘোর করিয়া সব-কথার মধ্যে। সকলের সম্মুখেই লীলানন্দ লীলাময়ীকে বুকে টানিয়া লন। আমরা অবাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি—আর দুই হাতকে পাশন করিতে করিতে ফুরাইয়া যাই এটা ঘোরের অধি ঈশ্বরের কথা, বেশের আহার কথা বেমন করিয়া ফোটে নাই। লীলানন্দের নিকট নানা দূর দেশ হইতে অগণিত ভক্তের ব্যাকুল পত্র আসে, তাহারা যে যেখানে বসিয়া বসিয়া এই ভগবানকে আপন আপন ভাবানুযায়ী পাইতেছে—তিনি যে তাহাদের নিকট মূলপরীরে বিরাজ করিতেছেন এরূপ তাহাকে লেখা যায়। গুরু-ভগবান্ এই সব পত্র তাঁহাদের ছাপ-দেওয়া বাসন্তী লেফাফে সকলকে, আর বড় বড় পণ্ডিতেরা মুগ্ধ হইয়া নিজ ভগবানের পায়ে লুটাইয়া পড়ে। তবে যারা ভগবান্‌কে এমন সহজে সেই দূর দেশেও পায় তাহারাই কেন যে আবার এত সহজে মরে, তাহার কথা জানিবার অবসর তাহাদের হয় না।

এই লীলানন্দ, প্রেমানন্দ, ভগবানন্দের এই আশ্চর্য কলার উৎপাতে বহু সংসার অকাল হইয়া গেল, সংসার-

যখন ছিল বলিয়া স্নেহ-মমতার সাথে লইয়া যাইতেছে তো আসা যায়। ঠাকুর মাথের সঙ্গে বলিয়া দিয়া নানা ছলের ছলকে কথা বলেন. আমরা ঠাকুরের কথা কি বুঝি! দেখিতে পাই, কথায় বলে পিত্যেসের ফল ফল দেহে বিজোস করিয়া যায়। চোখে-মুখে এক আশ্চর্য ভাবের খেলা। স্বামী স্ত্রীকে ঠাকুরের চরণে দান করিয়া বৈরাগী হইয়া যায়, স্ত্রীও স্বামীকে অনেক সময় চিনিতে পারে না। দুই লোকে বলে বিশ্বনাথের, উভয়ের মনে গুরুকরণ হইলে কি লাভের সম্ভাব আর তাহার ভালমন্দ থাকে! সব ভাসিয়া যায়!

আবার মাঝে মাঝে হাসপাতালে উচ্চাঙ্গ অবস্থায়, মুহূর্তাধারে অন্তরঙ্গতা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যারা শোনে, দুর্ভাগিনীদের কথা শুনিয়া শিহরিয়া ওঠে। কিন্তু সে-সব কথায় আমাদের ভুক্তি যেন টলে না, এই সব আনন্দময়ের লাবণী আমাদের অবসান ঘটে না, ভক্তিমতীদের আজও আসনারও শেষ হয় না।

কিছু পরিমাণ শাস্ত্র বাক্যের ভেজী, কিছু ব্যাখিত, কিছু বিশ্বনাথের, কিছু চালাকী, আর অবাস্তব ভোর-বিশ্বাসের ভরসাতে নিজের অসাধারণ শক্তির নানা ছলের বাহিনী বলিতে পারা, সেই সঙ্গে একখানি ছলা করিয়া চলার ভাব,—এই সব মিলাইয়া ভগবান্। আজকাল সমাজ এই ভগবানের পূজায় লাগিয়াছে।

পূজারত বাহিনীতে পাই গুরু একরূপ আর আর পাই তাঁহার আর এক রূপ। যোগা হইতে মানুষ যোগায় আসিয়াছে তার একখানি অভিনব আলেখ্য! মনুষ্যত্বের অধিষ্ঠাত্রী, অন্যায়ের বিচারক, অন্যায়ের ক্ষমাকারক, সমাজ ও সংসারের কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ, এক একটী বিশ্বাসভক্তির মানুষ ছিলেন সমাজের গুরু। আর আজ বিলাসী, ভোগলোলুপ অবতার, কামের অভিনব পূজারী এই গুরু-ভগবান্। বিশ্বনাথের জন্য গুরু-যোগের কইয়া গাছের তর্ক উৎপাদন করে, পরমাচার্য আচার্যী ছিলেন এই নদীর যেখাইয়া মাঝিদাবকে আধার দিয়া চলা করে। সকলে এই ধারা হইতে সরিয়া পলাইয়াছে।

মানুষের সহজ বিচার-বুদ্ধিটা একেবারে মেটেলে হইয়া গেছে! পাছ-পাথরের পূজা করিতে করিতে বুদ্ধির এমন দুর্গতি হইবে না তো কি হইবে আর! মানুষকে ভগবান বলিতে ইহাদের বাধিবে কেন!

যারা সত্য নয় তাহাকে সত্য বলিয়া পূজা করিলে তাহার শাস্তি ভোগ করিতেই হয়। মানুষ যত বড়ই হোক, যত মহৎই হোক, যত বড় কল্যাণকারীই হোক, তাহাকে তো ভগবান্ বলিয়া চালানো সমীচীন নয়। কি জানি সমাজের কোন্ মহাপুরুষের খাতিরে এই অসত্যকেই আমরা স্থাপন করিলাম সর্বত্র। পুরি পরমগুরু হইলেন, পিতামাতা পরমগুরু হইলেন, তাহার উপর গুরুঠাকুর একেবারে সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেন। তাহাতেই কল আর ভোগ করিতেছি সর্বত্র।

মানুষের পূজা করিতে করিতে মনুষ্যত্বের লোপ পাইল আমাদের। পিতামাতার গুরুত্বের মহিমা এবং তাহার চাপ রহিল, কিন্তু পিতামাতাকে দেবতে উন্নীত করিবার সাধনা রহিল না; গুরু ঠাকুরের ভগবত্তার পরম-জারি চলিল সমানেই, কিন্তু গুরু আপনাকে মানবত-সত্তার তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন যেন!

যাই যাহাকে দেবতা বলিয়া, ঠাকুর বলিয়া পূজা করিতে লাগিলাম সে দিন দিনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমের নিজ সোপানে নামিয়া আসিতে লাগিল আর পূজারীরাও চলিল সেই সঙ্গে। তাই দেখে আজ দেবতাও নাই, মানুষও নাই, রহ্ পূজার বাঁটি যেমনি রহিল। এই গুরু পূজার মোহের কথা মনে পড়ে—আর আশ্চর্য হইয়া যাই। 'গুরুদেব' না বলিতে পারিলে যেন আমাদের শান্তিই আসে না মনে। তাই যাঁহার মধ্যে আমরা একটু কিছু বড় দেখিতে পাই তাঁহাকেই গুরুদেব বলিয়া না ডাকিতে পারিলে আমাদের সবটা ভক্তিই যেন ব্যর্থ হইল বলিয়া মনে করি। যে-সমাজে এই গুরু-ব্যবসার প্রতি কথায়ার

থাকা যাই, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখিতে পাই 'ভগবান' তৈরী হইয়া গেছে। আমাদের পুরাকালে ভগবান তৈরী হইয়াছে।

মানুষ সর্বদাই রহস্যের এবং বিরাটের সন্ধানী। আপনার অন্তরদেশকে সে মুক্ত করিয়া অসীম করিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, তাই সে যেখানে তাহার প্রকাশ দেখে সেখানে আপনাকে নিবেদন করে। তাহারই নাম পূজা। কিন্তু পূজা আর পূজার যে এক বস্তু নয়। সে যাই হোক, আমাদের দেশে কেন, মানব সমাজে সব দেশেই কোনো না কোনো ভাবে এই সন্ধান এক বিচিত্র রূপ ধরিয়া বসে আর তাহাতেই মানুষের পতন হয়। আদর্শকে বাস্তবের মধ্যে টানিয়া ধরিবার প্রয়াস মানুষকে একদিন মিথ্যার দাস্যে টানিয়া লইয়া আসে।

মানুষের মধ্যে কল্যাণ দেবতার ভাবও জোতিঃ ফুটিয়া উঠে। পিতা কোথাও পরম দেবতারি, মাতা কোথাও মহীয়সী দেবী, রাজা কোথাও মহামহিমান্বিত, প্রভাব সর্বজনমান্যকারী, পতি কোথাও আদর্শ পুরুষ, গুরু কোথাও মহাপুরীতে মহান্—এমনি কে অস্বীকার করিবে! কিন্তু ইহার সঙ্গে যে-শাস্ত্রকার জোর গলায় করিলেন যে পতিমাত্রই পরম দেবতা, পিতামাত্রই সাক্ষাৎ হর-গৌরী, রাজামাত্রই স্বয়ং বিষ্ণু আর গুরুমাত্রই একেবারে ভগবান-যোনমন্ত্রী, অজ্ঞানান্ধকার নাশন ভগবান্, সেই শাস্ত্রকারকে মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কি বলিতে পারি। জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে নানাভাবে শাসনে রাখিবার বিচিত্র ব্যবস্থা হয়ত ইহার মধ্যে ছিল কিন্তু সত্য সেদিন ধর্ষিত হইল। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে সত্য সম্বন্ধ তাহা সেদিন মিথ্যা আদর্শের জোরে আচ্ছন্ন হইল। সেদিন হইতে মানুষের সত্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিঘ্নিত হইল; কারণ, মানুষের কাছে মানুষ মানুষ হইতে পারে না।

যাহা বৃহৎ তাহার পূজা করিয়া, তাহার জন্য সাধনা করিয়াই মানুষ বড় হইয়া থাকে। পাথরকে ভগবান্ বলিলেই ভগবান্ পাথর হইয়া যায় না, এই সোজা সত্যটা এতদিনেও বর্ণপোচর হইল না আমাদের। ভগবান্‌কে মানুষ করিলে মানুষ ভগবান্ হয় না এটা কত আমাদের বুঝিতে বাকী রহে! তাহে আবার ভক্ত দিয়া চলিবার ভগবান্ চাই, অথচ মানুষকে ভগবান্ না করিলে ভগবান্ এখন কথায় কথায় কোথায় পাওয়া যায়!

আমাদের এই গুরুর কথা কাটিবে কেমন করিয়া তাহাই ভাবি! দেশে দেশে এই গুরুবাদকে বাদ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল মানুষ, আর আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে বজ্জাতরাজ আর পূর্ণাবতারের সংখ্যা কেবলি বাড়িয়া চলিল! সমস্বরে স্বাধীনতা এবং সমষ্টিগত স্বতন্ত্রতার বাণী প্রচারিত হইতেছে আর আমাদের ঘরে ঘরে কেবলি পরতন্ত্রতার জোড় আওয়াজ চলিতেছে!...

একটা জাতিকে-জাতি যদি অত্যন্ত দুর্বল এবং জীবনীশক্তিহীন না হইয়া পড়ে, তখনো গুরুবাদ এমন প্রবল হইতে পারে না। একদল ভণ্ডের প্রভাব কখনো এতখানি বাড়িতে পারে না। মানুষ মাটিতে ভর দিয়া বাঁচে না, তাহার সত্যকার শক্তি তাহার নিজের পায়ে, এই কথাটি এমন করিয়া মানুষ ভুলিতেই পারে না, যদি না তাহার শক্তি একেবারেই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই আত্মহীন অবসন্নতাগ্রস্ত জাতি কি করিলে শক্তির পথ পা দিবে তাহা যে জানে!—ইতি শ্রীগুরু!

বৈষম্য

উপন্যাস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ভাগলপুর

মানুষের জীবনের খুব অল্প অংশই তাহার জ্ঞানের অধিগম্য; বাকি অনেকখানি বুদ্ধির অগোচরে থাকিয়া যায়—রহস্যময়! বোধ করি, ইহাতেই বিধাতা অদৃষ্ট করিয়া থাকেন।

অ-দৃষ্ট কথাটির অর্থ কিন্তু সহজ: পরম মূল-মূলাধারের সৃষ্টীসূত্র সংসারের পর্যন্ত-তন্তুর ছবের অন্তরালে নিহিত থাকিয়া ইহা জন্মে মানুষের মনে, একটি অনির্বচনীয় নিগূঢ় অর্থ-সম্পদ্ দান করিয়াছে। মানুষের নিজস্ব, জন্মের পূর্বেই যা কি ছিল এবং মৃত্যুর পরেই যা কি হইবে চিরদিনই অবিজ্ঞাত থাকিয়া গেল!

দার্শনিকগণ কালে-কালে বহু তত্ত্ব আলোচনা করিয়া ইহাই নানা রস-সম্ভোগ করিয়া চুকিয়াছেন: কিন্তু তবে,—'তুমি যে তিমিরে—তুমি সে তিমিরে!'

বর্তমানে শুধু এই কথাটুকু বলিয়া রাখা যাইবে,—মানুষের ভাষা-কবির জ্ঞান-সাম্রাজ্যের মধ্যে অদৃষ্ট-দেবী তাঁহার চির-রহস্যের ঘূর্ণ যবনিকা বিস্তার করিয়া নির্বাক দাক্ষিণ্যে বসিয়া আছেন! সেখানে মানুষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ-প্রতিহত; বুদ্ধি নত-মস্তকে মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া! এবং চিত্ত ঘর বিদায় দুই হস্তে তুলিয়া নতি করিয়া বলে:—

হে অগোচর,

যিনি বলেন, আমি তোমাকে জানিতে পারি নাই, তিনি তোমাকে জানিয়াছেন। আর যিনি বলেন, আমি তোমাকে জানিয়াছি, তিনি তোমাকে জানেন না!

তুমি সত্যস্বরূপী বিজ্ঞানের নিকট অবিজ্ঞাত এবং অসত্যস্বরূপী অবিজ্ঞানের নিকট বিজ্ঞাত!

* *

ইয়াম্ রামলাল মুখোপাধ্যায় কি কারণে অবস্থাপন্ন, মূল-মর্মে পরীয়ান্ দুইটি কালে তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছিল তাহা রামলাল জানে না, তাহার পিতা-মাতারও জানা ছিল না এবং এই বিষয়ে অন্য-কেহও যে কিছু বলিতে পারে, এমনও মনে হয় না।

অপর দিকে, অতিবড়ির কৌলীন্য-মর্যাদাহীন অন্যান্য বংশে ঠিক এমনিতে, একই সময়ে যেন যে সকল বাড়ি রামের দাঁওয়াল মাতার কোলে আসিয়াছিল এবং কেনই বা সে রামলালের স্থানে মুন্নুস্বামের ঘরে জন্মিল না—তাহা কেহই নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে না!

একদল বলিবে, জন্মান্তরের সুকৃতি-দুষ্কৃতি, আর কেহ বা কপালে হাত দিয়া বলিবে—অদৃষ্ট!

শুনিতে পাই, জন্মের পর দুইদিনের রাত্রে বিধাতা-পুরুষ সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়া আঁতুরের কপালে ভাগ্য-লিপি লিখিয়া দিয়া যান। তাহা হইলে বলিতে হয় যে এই অন্তর রাত্রটি বিধাতার অবোধ অদৃষ্ট-লিপিরেও অতিক্রম করিয়া চলে!

মুন্নুস্বামের যখন দাঁওয়াল পরগণার হওলুদের কর্তা যৌবন-প্রকাশ করিল! মানুষের যৌবনের বলিতে যাহা-কিছু বুঝায়, বোধ করি, তাহার কিছুরই অভাব তাঁহার ছিল না। বাড়ি-ঘর, টাকা-কড়ি, ধান-চাষী, জমা-জমী, মান-ইজ্জৎ! তুলনা করিতে গেলে তুলোও হাড়িয়া দেবরাজের পদে লইতে হয়।

সেই বাড়ির লালন একটি পর্ব-তুলিতে সহজ বাড়ি এবং তাহার স্ত্রী সুখী—মুন্নুসের চাকুরি করিয়া দিনাতি-পাত করিত। দারিদ্র্যের দুর্দিনে মনের জন্য যন্ত্রণাও যথেষ্ট নিষ্ঠুর!

রাজবাড়ীর অতুল ঐশ্বর্য্যের জোরে সোনাখালিবাসী মাত্রই হইয়া দাঁড়াইল আর মহলের কাহিনী পাইবার জন্য চক্ষে দেখিয়া জবানবন্দি করিলেন, তাহার যথাযথ বিবৃতি করিতে লেখক অক্ষম!

মুহুরীরাম এক-এ পাশ করিলেও বিদ্যাটি জাহির করিবার সুযোগটুকু ত্যাগ করিলেন না। যাহার উপর উকিল মোক্তার সর্ব্বদাই বিষয়ের চেকের মত উজর হইয়া থাকিত। তুলিতে পারা যায়, কোন কোর্টের মাথার সোনালি ঈগলের ন্যায়ের মত নীল-ঘোর টীকি দেখিয়া তিনি ঠাট্টা দিয়া তাহাকে পুরিয়া ফেলার মতলব করিয়া দিবার জন্য বড় সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরোকার চাপে পড়িয়া অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সন্ধ্যা-আহ্নিকের গুরুভার ঝোলাটি কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিতে হয়; তিনি কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। এই গুরু তাঁহার কাছে অল্প সময়ের জন্য অলিখনে লোকে তুলিতে পারিত। তাঁহার ছাত্র-জীবনে বিভিন্ন অবসর উপায়ে তিনি গুরু-চক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কাহিনী বলিতে বলিতে তিনি ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন—যে জোড়া-বেড়াজির বিদ্যা, অনবরত কিংবা বিরক্তিকর কথা তাঁহার এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিচয় না।

দীর্ঘ বক্তৃতার পরে মাঝে মাঝে মনে হইত বাড়ী, —বিষয় আত্ম-প্রসাদ হয় না ত? কিন্তু তখনি —সমাজের আর্থ্যাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া মনে করিতেন, সমাজে প্রচার এবং প্রকাশ করিতে এটুকু বিজ্ঞাপন ত' অনিবার্য্য। সে দোষ হইতে কোন্ মহাপুরুষই বা বঞ্চিত? মহাজনের পূর্ব্বপিতার অনুসরণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে—আজ পর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই ত' আর বাদ যান নাই!

সাহেবের অবসর করিতে কোন্ কেরানী না লালায়িত? কিন্তু তিনি? ছকে-কলে-কৌশলে একদিন কথা-কথা করিয়া আসিতেছেন এবং আসছে দেখাইবেন যে ফ্রেঞ্চ-প্রভুদের অবর্ত্তমান না করিলে—ঘর বসি থাকিলে, রাজরাজড়ার হজাত সম্ভবপর!

স্বামীর এবম্বিধ কর্ম্মব্যস্ততায় পত্নী অন্নপূর্ণার জীবন কিঞ্চিৎ বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সদা-সর্ব্বদা নিজেকে সুস্থ-সবিধ রাখিবার প্রয়োজনে তিনি বিলম্বে স্নানাহার করিতেন; কিন্তু মুহুরীরামের সঙ্গের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা করিয়া লইয়াছিল, বেলা ১টার মধ্যে দুইটার সময় অন্নপূর্ণা অন্তঃপুরের পথ-ঘাট করিয়া আসনপিঁড়ে গ্রহণ করিতেন।

অন্নপূর্ণার এই শুচি ধর্ম্মের আক্রমণ হইতে স্বয়ং কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া চাইল পর্য্যন্ত কাহারো রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না। অধিকন্তু সমাজের নিকটে স্বামী আসবাব্ পত্র দ্বারা। বলিয়া তাঁহার খ্যাতি করিয়াছিল এবং সেই-গতি-মোতাবেক যাবতীয় মোকদ্দমা পরিবর্জ্জন করিয়া মুন্সিপ-কাছারি লাভ করিয়াছিল।

এই লইয়া কর্ত্তার সহিত গৃহিণীর একটা স্থায়ী মনোমালিন্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল সত্য। কিন্তু বাহির-সভায় বলিয়া মুহুরীরামের স্ত্রীর স্বামিকে ভক্তির ভালে, বিশ্বাসে ভগবতী স্বামী সেবা-সর্ব্বস্ব করিতেন! আহারে লক্ষ্মী—এইরো আধা-নারীর আদর্শ! সেদিক হইতে অন্নপূর্ণা ইহা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া আসিতেন—এই যেবস্তুর পুরুষ-সিংহটি শুধু পত্নী-প্রেমেই—সংসারে সুখ করিতে একটুও দিধা বোধ করেন না!

কিন্তু সত্য খুব গোপন উভয়ের মনেই অবস্থিতি করিয়া দীর্ঘ দিন। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবিধরূপ ভাবিয়া দিয়া পার্থক্যের অবতারণা হয় তো হইয়াই থাকিত। কিন্তু নাম এবং যশ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা সতর্কতা লইয়া তাঁহাদের সাধনার প্রচেষ্টা, উপরের দিক হইতে, সেটিকে যথাসম্ভব মধুর মেরামত করিয়া রাখিয়া, বাহিরের লোকের বিস্ময় উৎপাদনই করিত—তাহারা বলিত এই দম্পতীর পরস্পরের মিলটি সর্ব্বজনের অনুকরণীয়!

অন্নপূর্ণার আর একটী ব্যাপারে অলক্ষ্যে মুহুরীরাম তাঁহার প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই অসন্তুষ্টির প্রকাশ না থাকিলেও অন্নপূর্ণা তাহা ভাল করিয়াই

وأن الله يبعث من في القبور

আসিতেন। কিন্তু তাহার প্রতিবাদের ব্যবস্থা একমাত্র বিধাতা পুরুষের হাতে, তিনি কি করিবেন?

অবশেষে বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটির পর একটি করিয়া তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া নগদানের ভবিষ্যৎটি একান্ত ভারাক্রান্ত করিয়াই তুলিয়াছিল। তাই রামলালের আনন্দের চতুর্দিক লঘু করিয়া আনন্দময় করিয়া তুলিল।

তখন অন্তরবর্তীকে বাটিয়া উহা বাদ দেওয়া হইল। শিক্ষা-সমাপনের পাওনাটা সবটি—যাহার লাভ তাঁহার অন্তরে এতদিন পাকের চাপা ছিল,—আজ হরোধ খুলিয়া দুই হাত তুলিয়া বাহিরে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল; চাই কিনিতে বোতল, চাই মেথিলেড্ ফুল। এতদিন যেখানে-যাহা, যত-কিছু বিলাসিতা মেথিয়াছিলেন তাহারা শিশীলিকার মত সারি বাঁধিয়া বাহিরে আসিতে লাগিল। মুরুব্বীরা মুহিষীর ব্যাপার দেখিয়া হাসিলেন, সময় সময় বকও দিয়া বলিতেন, দেখ্‌চি, এবারে একেবারে খেপে উঠ্‌বে। কিন্তু 'ছোরা বাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী!'

অন্তরবর্তীর নিজের কাটি ছিল বেশ কর্সা, এবং রামলাল তাহার অনেকখানি পাইয়াছিল। পরে সেই রং কালো হইয়া যায় তাই সে আর যৌবনের মুখ দেখিতে পাইল না। তাহাতে এক প্রকার আন্দাজ এই দাঁড়াইল যে, আকাশের এক কোণে মেঘ দেখা দিলে—সে হাঁচিয়া কাশিয়া সব ঘাবাইয়া বসিত। কাজেই বৃষ্টিসহ পবনের নিজের আহার সোল-পাল নবম মেঘটির উপর ফ্রান্সেসের আয়া কাশিয়া বসিয়া রহিল।

তিনি সমাজের যেমন খুশী হইতেন তখন লোকে বলিত যে রামলালকে দেখিয়া সাহেবের ছেলে বলিয়া ভুল হয়। সে কথা স্মরিয়া অন্তরবর্তী মনে-মনে খুশীর ঝোল করিয়া চুমুক-চিত্তে বলিতেন, বুঝি দাদা-ঠাকুরের, বুঝি কারও ঐশ্বর্যের কামনা অপূর্ণ রাখ না!

এমনি করিয়া রামলালের বৈশব কাটিতেছিল। সাহেব-মহলের সহিত মৌলাকাতের কথা কিছু লপন করিয়া বলা যায় না। পরন্তু তাহাকে দেখিলে রামলালের ছেলে বলিয়া চিনিবার কোন উপায় ছিল না। মেথিলেড্ ফুলের অন্তর মহিমা ঘোষণা করিয়া তাহার গাল খুবানি অতিরিক্ত মাখিয়া উঠিয়া চোখ খুটিতে বেহদম করিয়া একদম চোখ-চৈনা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে কথা আপাততঃ মুলিব রাখা যাক্।

৩

সন্ধ্যবেলা মাঠে, হজুরের আর মাসাজে পাঠাইয়া দিয়া, মক্কা চরাইয়া, ঘোড়ার ঘাস পাতা-পাতা বাদ "বাছিয়া"—অর্থাৎ সকল রকম আগাছা এবং ঘুসোঘা ঘাস করিয়া মালে আসাই, কি নাকে কিনে টাকা "ঘুসোঘা" পাইব। নিজের মুখ-কষের প্রতি কিছিয়া চাহিবার সময় তখনও তাহার ছিল না।

সুখীর অন্তর তখন, খাঁচায় হাতু দিয়া, মন চাহিয়া, তখন হইতে আসামি সংগ্রহ করিয়া—বিদ্যুৎ-গতিতে ঘরের সকল কাজ শেষ করিয়া রাখি সময় সে চরকার সুতা কাটিত। তাহার খরখারি ছিল চক্ষু-তারে চক্ষু-তারে—বাটিতে সিঁদুরটুকু পরিলে তুলিয়া ধরা যায়।

সকলের অন্তর সন্ধ্যার-চুকের কোথায় যেন একটু দোষ থাকিল। সহসন অন্তরাল-ঘর পরিষ্কার না পাইয়া মধ্যে মধ্যে ফেলিয়া উঠিত, সুখী, নিজের খাটিয়াও যেন তাহাই মনের মত করিয়া, করিয়া উঠিতে পারিত না।

সহসন যে একেবারে কিছু বুঝিত না তাহাও নহে, সময়ে সময়ে গোপনে আসিয়া সুখীর সাহায্যও করিত, কিন্তু হজুর তাহাকে বিষম বাধাই হইতেন, বিশেষ করিয়া মাসুখানী! তিনি বলিতেন, মক্কা-বাছুরের যত হয় না, ঘোড়া, ঘাসের অভাবে ঘোড়া হইয়া যেন। অত লোক রাখ।

চাকুরি যাইলে কি হইবে ভাবিতে বসিলে সহসন ঘরে আসিয়া আহারের বেরি দেখিয়া অগ্নি মূর্তি ধারণ করিয়া সিঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া বাণি পাড়িত। সুখী বুঝিয়া উঠিয়া বলিত, তুই আমাকে বক্-খুনী হয় বল্, কিন্তু.....সে আর বলিতে পারিত না, তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুখী বুঝিয়াছিল যে বিনু আর না বাঁচিলেই নয়। কিন্তু তাহা বাঁচে কোন্ পথ দিয়া?

এতদিনে বিনুরেই তাহার চক্ষে আর ঘুম আসে না। খাঁচার-ভাবনা ভাবার ছলে হাস্য-হাসি করিতে লাগিল। পাশে লছমনের মাকে হাকিতেছে। বাছা আমার নিদ্রায় অভিভূত! এমনি করিয়া শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিতে না আসিতে সে তাহার মাকে স্বপ্ন দেখিল। মার মৃত্যুর পর এই প্রথম দেখা! মাথার শিয়রে মা দাঁড়াইয়া মিষ্টি মিষ্টি হাসিতেছে। সুখী বলিল, আমায় দুঃখ দেখে হাসিস্ কেন মা?—মা অমৃত হাসে; বলে, দুঃখ নেই সুখী,—দুঃখ নেই রে,—তোর বাছা সব দুঃখ দূর করবে,—সুখী বলিল, সে মা, আর ভাঁটার উপর দুধের ছিটে দিলে,—এই পোকাটা কি বাঁচবে? না খেয়ে যে মরি!—মা হাসিতে হাসিতে হাত ধার আঙুল দিয়া মরের কোণে কি দেখাইয়া দেয়। কি মা? কি দেখাস্? ঐ হাসে, আর জলে—ওঁকারে ফেলে রাখিস্নি, সুখী। ওটা কি?—বলিয়া চক্ষু চাহিতেই স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সুখী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের সেই কোণে দেখে—শুকনো পাতার ঝাঁই। হাসিয়া বলিল, পাতা খুঁজিয়ে কি মানুষের দিন চলে!

দিনের আলোকে পাতাগুলা সরাইতে সরাইতে সে দেখিল তাহার তলায় বড় অনেক, বড় অনেকের পড়িয়া আছে তাহার চরকাখানি।

হঠাৎ তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, মনে-মনে বলিল,—তোর মত কি আমি হতে জানি না? তবুও তার মনে বড় ভয় হইল,—তাইতো, বাছাকে নিয়েওতো সুতো কাটা চলে!

আবার তাহার খরখানি চিরাগের চকচকে শুভ্র-তরঙ্গিত মুখর হইয়া উঠিল। সেই একটানা সুরের সঙ্গে নিজের ভাঙা গলা মিলাইয়া সে পলের পর পল ভরিয়া থাকিত!

একদিন ছিল—যেদিন সেই শুভ্র ঘরের ধৌত ফ্রেমে ফটিক সূর্যের আলোকে উজলা মায়ের সঙ্গে কোন্ বিশ্বরূপ প্রেমের অন্বেষণে যেন ঘুরিয়া মরিত! আর আজ? ছেঁড়া-কাঁথার স্তূপের মধ্যে কালো দুটি আঙুল চক্ষুর উজান-বিলাসের মৃদু আন্দোলনে সে যেন অনেকই মধ্যেই হারিয়া ফিরিয়া তাহার ঘরের একটিকে মাত্রাটুকু ভুলিত।

মার ঘাবাইবার উপায় নাই; তাহা হইলে বাছা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বেন বলিবে, মা, মা, তারপর কি বল্ মা?

এমনি করিয়া পৃথিবীর উপর দুঃখের আঁচল টানিয়া—মায়ের বক্ষ-পেশির পাশ করিয়া অনার্য-দয়ার বস্ত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারো হাসিতে অন্ধকার কুঁড়ে আলো হইয়া উঠিত,—তাহার কালো মায়ের বুকখানি সুখে ভুলিয়ে থাকিত!

বেলা-বাড়িতে করিয়া রায়েরা যখন তাহার খন্ খন্ নয়া পয়সা লইয়া হাসা যাইতে যাইত বাহির হইত—তখন তাহার পা দুইটি—খোকা-খুকুর আঁচা! আর বক্ষের দুই পাশের চায়াছি কাঁসার ঘট—তাহার উজান বহিত, কুল্ কুল্ করিয়া বাজিতে থাকিত!

তখনকী জোতদারের বাগান হইতে তাহা দেখিয়া বলাই কহে বলিতেন, ছোট লোকের ছেলেরা—মায়ো! কত ঐশ্বর্যের পক্ষ হয় দেখো! এর মধ্যে চৌদ্দটা ছুটে বেরাচ্ছে; খোকাবাবু আর ওটা ত,' বলতে নেই, একদিনেই ভরোচ্ছে!

আদিক মুসলমি বাধিয়া মুখুজ্জারা হাসিয়া বলিতেন, তার ওপর ও-বেটীরা। আমার শাঁকচুন্নি কি না! —অনেকটা বাঘের মাসি। বাবা বাহিরে থেকে বিনু মাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা মা, ওরা যে বাঘের, ঘরে মরমার লেজ হয়নি কেন?

তখনকী উচ্চহাস্য করিয়া বলিতেন, সত্ সত্, দুঃখনি আমারে, তোর যেমন কথা! তাই বলে কি ওরা সত্যি বাঘের, যে লেজ হবে না?

কিন্তু অনেক বেলা পর্যন্ত মায়া মাখাইত; মায়া সত্যি বাঘের নয়, যারা ছিনে খাচ্ছে,—তারা তবে কি?

যাহারা মানুষকে অসুরের মত বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন—তাঁহারাও একদিন, এ জাতিকে লইয়া এমনি দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিলেন। বোধ করি বহু বিচারের পর স্থির হয়—এই জাতি অভিশপ্ত,—ইহারা অনার্য, অবার্য, ঈশ্বর-পরিত্যক্ত!

ক্রমশঃ

ফুলের ঘা

শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া

দিয়েছে সে আছি ভবে—কথা ক'বে না,
কেন সে বালতী ঢালা ছড়েদি কেন,
এত নই ভোলো বল্ ?
ফুলে সেই পরিমল,
তোমে খালি আছে জল,
তোমে তবে না,
দিয়েছে সে আছি ভবে—কথা ক'বে না।

খোঁপা খুলে কেলো ফুলে ভার কি সাজে ?
পায়ে ব্যথা আলতা কি আজকে সাজে ?
কাজল আয়নায়
আজ তোর আয়নায় ?
যাবা দিন অভাবে,
সাজবে যাবে ;
খোঁপা খুলে কেলো ফুলে ভার কি সাজে ?

বিঁধুর পায় দুখ কেলনা দিয়ে,
তবে কেন এত ফুল আমারে দিয়ে,
দিয়ে ফুলে দিলা তোমে
যা যাবে আমারে ও যে,
কাঁদি আভিমানে তোমে
বিজনে দিয়ে,
বিঁধুর পায় দুখ কেলনা দিয়ে !

প্রতিশোধ কেলো তাবি মনে মনে লো !
আর কথা কহিব না তার সনে লো !
প্রিয়তম প্রাণনাথ,
সে সখি মনের সাথ,
ফুলে যাই ব্যথা, তার
মরমে লো !
প্রতিশোধ কেলো তাবি মনে মনে লো !

খুঁজি বাটি নিয়ে ভবে খিটখিটি যে।
কেন চলি খালি পায়ে ছিঁড়ে পিপিয়ে ?
কেন তারে প্রতি ভাজে,
যখন বিদেশে যাজে,
দিবিরাজ তিথি ব্যাজে
তার দিয়ে যে ?
খঁজিরাটি নিয়ে ঘরে খিটখিটি যে।

যাবি কেন এলো খোঁপা ? টিপ পরি না ?
কেন তার মনুমিকে ফোটে ঘরি না ?
কেন চুলী অত ভোরে
সকালে অমন কোরে ?
বল্ সখি বল্ মোরে
কেন ঘরি না ?
যাবি কেন এলো খোঁপা ? টিপ পরি না ?

অ-মুকের পিরোমণি—কিছু না বোজে।
কেবলি আমার সাথে ঝগড়া খোঁজে।
লজ্জা-মান-ভয়-হীন,
সখি সে লো ঘা মতিন।
একটি ভবে চিরদিন
কাটালো ও যে।
অ-মুকের পিরোমণি—কিছু না বোজে !

যাদু জানে সে সুন্দরী যাদু জানে লো !
যা ভেবে আমারে কিরে মুখে টানে লো !
পায়ে ভোর যাব ভরে
লাজ ভয় পাখা করে,
যাবশ ভরিয়ে পরে
নাচি গানে লো !
যাদু জানে সে সুন্দরী যাদু জানে লো !

তাই আমি ভাব করি তারে সাজিয়ে,
চলে ঘরিয়া তার ভয় ভাঙিয়া !
এবার মীরবে রব,
কথা কোনো নাহি কব,
দিন যাবা, যাবা সব
বুক বাঁধিয়া !
ফরিব না আর ভাব তারে সাধিয়া !

অক্ষয়কীর্ত্তি বাঙ্গালীর

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড

এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—এলাহাবাদ

যুক্ত-প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীদের গৌরবজনক এবং বিস্ময়জনক অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান প্রেসের" কথা না লিখিলে, সমগ্র ভারতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কাহিনী অতি অল্পই বলা হইবে।

জগতে অনেক প্রতিষ্ঠানস্থাপক আছেন যে ঔদ্যোগিক, অথবা ঔদ্যোগ, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, প্রবল কর্ম্মশক্তি ও প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াও যাবজ্জীবন-ব্যাপী অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, জীবনের সকল বিষয়-ব্যাপারে যাঁহার বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেন, এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের জীবন আলোচনা করিলে তাহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। নৈশবে পিতৃহীন হইয়া তাঁহাকে যেরূপ প্রতিকূল-অবস্থা-পরম্পরার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার চিরন্তন প্রতিভার আলোক এবং ঔদ্যোগিকতার বহ্নি না থাকিলে তিনি জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিতে পারিতেন না। একটা বিরাট অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া উঠে না। তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে হয়—তাহার জন্য স্থির লক্ষ্য, ধীর বুদ্ধি, মনের বল এবং প্রণালীবদ্ধ ধৈর্য্যশীল সাধনার প্রয়োজন। তিনি এইরূপ সাধনার চিরন্তন বিধানই আপনাকে গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। তাই অতি অল্প মূলধনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া আজ এত বড় অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সে আজ বহুবৎসরের কথা—তাঁহার পিতা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালীগ্রামনিবাসী স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কমিসেরিয়েট বিভাগে কর্ম্ম লইয়া যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের নানা স্থানে প্রবাস-বাস-সূত্রে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যখন বারাণসীতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চিন্তামণিবাবু ভূমিষ্ঠ হয়েন। পরে মাধববাবু অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় পেন্সন লইয়া আসিয়া বালীতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ১৮৭৪ সালে এলাহাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ফিরিল না। ১৮৭৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তখন চিন্তামণিবাবুর বয়স মাত্র ১২ বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চিন্তামণিবাবু এলাহাবাদে আগমন করেন। পিতা অর্থ সঞ্চয় উপার্জ্জন করিলেও প্রবাসে থাকায় সঞ্চয়ের হইয়া পুত্রের জন্য কিছু রাখিয়া যান নাই। চিন্তামণি-বাবুর মনস্বিনী জননী মেসে না থাকিয়া প্রবাসে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াও পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিতে কৃতসঙ্কল্প হন। জননীর মনের বল এবং কর্ম্মশক্তি ছিল অসাধারণ। পুত্রও বাল্যকাল হইতে জননীর এই অসাধারণ মানসিক বল, উদ্যমশীলতা-সূত্রেই প্রাপ্ত হন। তিনি সংসারের তাৎকালীন অবস্থা অনুভব করিয়া প্রয়োজনের তাড়নায়ে অল্পবয়স্ক বয়সের অনেক স্থান

ডিরেক্টর জেনেরল অফিসার—স্যার জন এলিয়ট কে.সি.আই.ই.

যায় যখনই খুশি ডাকিয়া তাহাকে কাজের কথা বলা হয় এবং সকল অফিস হইতে এসিস্টাণ্ট ডাকবাবুরা প্রবেশ করেন। তিনি এখানে হিসাবপত্র তাকিয়ের এবং অন্যান্য অফিসের বড় বড় সাহেবরা দরখাস্তের তাড়া পুরিয়া পুরিয়া রেখিয়া আসিতেন। মুহূরীদের কি কি কাজে হয়, কোন্ কাজ কি ভাবে হয়, কোন্ ফাইল কি ভাবে চালাইতে হয় ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়টি তিনি অতিশয় মনোযোগের সহিত লক্ষ করিতেন; তাঁহার সতেজী মস্তিষ্কের পরিচয়ে সকলে এইরূপ পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ করাতে বিস্মিত হইতেন না। যদিও এখানে আসা দিয়াই তাঁহার বেতন ৩০৲ টাকা হয়, তথাপি তাঁহার কাজ এমন বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং এক-জনের পক্ষে একের বেশী কাজ হইয়া উঠে। তিনি এ কথা জানাইলে, তাঁহার স্থানে পর পর পাঁচ জন লোককে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। পাইওনিয়ার অফিসে ৭ বৎসর কর্ম করিবার পর তিনি "রেলওয়ে বোর্ড সার্কিলের" অফিসে প্রবেশ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে তিনি অতি জটিল হিসাব পাঠ করিয়া এবং অভিজ্ঞতার নিকট শিখিতে পারিবেন যে, মূলধন খাতে কর্ম পাইলে তাঁহাকে কিরূপ হিসাব দেখা পাইতে হয় আই। এখানে তিনি সাহেবের হুকুমের পরিবর্তন এবং এই নূতন স্থান তাহার আগেই ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহার আত্মীয় বাবু উমেশচন্দ্র বোসের বিশেষ আগ্রহে তিনি মিটিয়োরোলজিক্যাল অফিসে (meteorological Office) কর্ম-প্রার্থী হন। এই সময় মিষ্টার ইলিয়ট পরে স্যার জন ইলিয়ট) তিনি পূর্ব কলিকাতা ভেলিগেশনী মহলের ডিরেক্টর এবং সেই হিসাবে মিটিয়োরোলজিক্যাল রিপোর্টস্ অব ইণ্ডিয়া (Sir John Elliot, Director of meteorological Reports of India) ছিলেন, তিনিই সেই সময় এখানকার কর্তা ছিলেন। তিনি এই অত্যধিক কার্যবিজ্ঞির বিষয় যাহা-কিছু বলা হইয়াছে তাহার সত্যতা প্রমাণ করিয়া পরে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য তাহার মুক্তির হয়। অনেকে বলিয়াছিলেন, "১৯ বৎসরের মাহিনা রেজিষ্ট্রারী করেও ছাড়লে", কিন্তু তিনি বন্ধু-বান্ধবদের যারা তাঁহাদের সে ধারণা অচিরেই দূর করিয়া সকলেরই প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। ইলিয়ট সাহেব একদিন তাঁহাকে একটি অতি জটিল হিসাব-সম্বলিত বিবরণী (Statement) প্রস্তুত করিতে দেন এবং তাহা খুব জরুরি (Urgent) বলিয়া সময় কম

কেলিয়া রাখিয়া প্রথমেই তাহাকে হাত দিতে বলেন। কাজটি যেমন জটিল ও ধৈর্যসাপেক্ষ ছিল, তাহাতে সাহেব মনে করিয়াছিলেন, উহা প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ তিন চার বছর লাগিবে। কিন্তু গৌরমূর্তি ভিন্নপ্রকৃতি একাগ্রচিত্ত বঙ্গী চিত্রকরিবার্ তাহা অনেক কষ্টের সহিত সমাপ্ত করিয়া এবং কাজটি পরিপাটি ও নিখুঁত করিয়া ইলিয়ট সাহেবের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার প্রতি এই অসাধারণ পণ্ডিতের প্রগাঢ়তর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ হয়, এবং তিনি সেই হইতে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া নিজ কোষাগার হইতে অমূল্য গ্রন্থরাজী পাঠ করিবার অধিকার দেন এবং স্বয়ং প্রতিদিন একঘণ্টা করিয়া উক্ত গ্রন্থের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে তিনি সাহেবের নিকট অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা (Meteorology) সম্বন্ধে অনেকানেক প্রণালী ও সূত্রাদি (Practical method, formulæ &c.) আয়ত্ত করিয়া উপকরণে কাজ করিবার মত শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইলিয়ট সাহেবের সঙ্গে তিনি এস, এ, রিল হিসাবে রহিয়া আসিলেন, তিনি তাঁহার বেতন ভার্কের ব্যবস্থা ও মহাশয়কে খুব রহিয়া তাৎকালীন বিভাগীয় কর্তা সার জন্ ইলিয়টের নিকট তাঁহার বেতন বৃদ্ধির জন্য লিখিয়া পাঠান। তিনি তাঁর চার্কের মোকাবিলা প্রসঙ্গে লিখিয়া দেন "চিত্রকর সাহেবের সঙ্গে হইতে তাঁহার বেতন বাড়ে নাই।" ইলিয়ট সাহেব উত্তরে বলেন, "Thompson had nothing to do with him. Credit is due to me for my selection of Chintamoni Babu." অর্থাৎ তাঁহার সহিত টমসন্ সাহেবের সম্পর্ক নাই, চিন্তামণি বাবুকে নির্বাচন করার বাহাদুরী যা বক্তব্য প্রশংসা এজন্য আমারই প্রাপ্য।" যাহা হউক, চার্কি করিবার কালে অল্প বয়সেই প্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় বেতন বৃদ্ধির বোধহয়ান এবং বহুপদক বিশেষ আদর ও প্রশংসা পাইয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহার বিদ্যাবিষয়ক কৌতুহলিকের বিশেষত্ব। বর্তমান প্রবন্ধে অদ্য তাঁহার বহু-কথিত ইণ্ডিয়ান প্রেসই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বলা বাহুল্য, বাণীমন্দিরটি আজলোকাধারটা মুদ্রণের চার্কি-কীর্তনের উক্ত ইতিহাস তাঁহার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই। তিনি এখানে কর্ম করিতে করিতেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এবং সময় এলো পাইওনিয়র পত্রে এক বেজিস্টার্ড এসটি ক্রাউন হ্যাণ্ড্ প্রেস (Crown Hand Press) বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার জন্য পত্র লেখেন এবং উক্ত প্রেস টাইপ প্রভৃতি পাচশত টাকায় ক্রয় করেন। এই পুরাতন যন্ত্র এবং পুরাতন অক্ষর লইয়া সমস্ত দিন অফিসের পরিশ্রমের পর সুযোগ মত কর্ম করিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত টাইপের ঘর সেজে, টাইপ ধোয়া এবং টাইপের পাশে টাইপ সাজাইয়া মশোক্তি প্রভৃতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই আত্মশিক্ষার সময় খুব খুব কাজ আসিতে আরম্ভ হইলে, তিনি এক দিকে যেমন বহুতে তৎপোত, প্রুফ সংশোধন, পুনঃ সংশোধন ও মুদ্রণাদি করিতে থাকেন, অন্যদিকে তেমনি মুদ্রাযন্ত্র ও যন্ত্র-পরিচালনাদি বিষয়ক প্রয়াদি ক্রমাগত আলোচনা করেন। এইরূপে তিনি অর্দ্ধরাত্রি, কখনও বা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ও ছাপার কাজ অভ্যাস করিতেন এবং অবশেষে কাজ স্থাপিত শেষ করিতেন। ১৮৮৯ অব্দে তাঁহার স্বাধীনতার "দি ইণ্ডিয়ান প্রেস" এই নামে রেজিষ্ট্রী হয়।

অবশেষে নূতন নূতন অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উৎসাহও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন মুদ্রণ যন্ত্র এবং অধিক অক্ষরাদি সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। একদিন এক ভদ্রলোক তাঁহার প্রেসটি এক হাজার চার শত টাকায় ক্রয় করিতে চাহিলে তিনি অমিতে তাহা ঐ টাকায় বিক্রয় করিয়া জন্ ব্রিণিংসন্ কোম্পানীর নিকট একটি ছাপা যন্ত্র প্রেস চাহিয়া পাঠান। প্রতিভাবান্ মুদ্রণী ব্যক্তিগণ সুযোগ বঞ্চিত হইতে দেখা যায়। ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ-প্রাপ্তির আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহা হইতে তাঁহার দিব্যদৃষ্টিজনতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাত হইতে তাঁহার অর্ডারী প্রেস তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, ইতিমধ্যে গবর্মেণ্ট প্রেস হইতে অনেক

ছাপিবার অর্ডার পান। প্রেস নাই অথচ অতবড় একটা কাজ আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সঙ্কল্প স্থির—"একাজ যখনই হোক হইবে না।" কথায় বলে, প্রবল ইচ্ছা থাকিলে উপায়ও হইয়া যায়। প্রেস নাই অথচ কাগজটি এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাঁহার ছাপাখানার সঙ্গতও নষ্ট না হয়, এবং যথাসময়ে কাজটিও সুসম্পন্ন হয়। তিনি সমস্ত চিত্ত নিয়োগ করিয়া "মাটার" উৎপাদন করিয়া ফেলিলেন, এবং দুইখানি বিলাতের মজুরের মজা দেখিয়া তাহার মধ্যে "অস্পোজিং মাটার" রাখিয়া হাসিয়া হাসিয়া ছাপিতে লাগিলেন। অবশ্যেষের অর্ডারী কাগজের পর পর যখন কাট-কাগজের মধ্য দিয়া মধ্যে মুদ্রণযন্ত্রে ছাপিয়া বাহির হইতে লাগিল এবং হাতে-গড়া ছাপা দুখানি যে পর পর টাকার বিলাতী যন্ত্রের সমানই কার্য করিল তাহাতে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। আনন্দের এক প্রান্তে লোকলোচনের অগোচরে এই যে ক্ষুদ্র ব্যাপারটি একদিন সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা জগতের মুদ্রাযন্ত্রের ও প্রেস শিল্পীবর্গের জীবন-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনই করিয়া রাখিবার কথা।

কিছুদিন পরেই বিলাত হইতে যন্ত্র ও মাল প্রেসে আসিয়া পৌঁছিলে তিনি প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইলেন। কয়েকদিন পরে অফিসে বিজ্ঞপনের (reduction) হুকোর আসন্ন তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া অবসর কর্তাগণের বাহাল রাখিয়া নিজের অবসরগ্রহণের প্রস্তাব করেন। এবং এই বয়সে হঠাৎ এক চতুর্থাংশ মাত্র পেন্সনে দূরে ছিটিয়া বীর স্বাধীনের উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। কিন্তু মূলধনের অভাবে এবং অসময়ে গৃহীত পেন্সনে এতদিকে প্রেসের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার চিন্তা, অতঃপর দূরে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্বভার চাপিয়া পড়িয়া তাঁহার মানসিক উদ্যম ও প্রচেষ্টা কি পরিমাণ দুর্বল করিয়াছিল, এবং এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে কতটা উদ্যম, কিরূপ ধৈর্য এবং কতখানি মানসিক বলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণের বুঝিবার সাধ্য নাই। বুঝিবার অবসর পরিবর্তে আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে উৎসাহিলাষ মাত্র সম্বল করিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় এরূপ অবস্থায় পড়ে পরিবর্তে কেহই সাহসী হয় না। অজানা-অচেনা লোক যাহার প্রবল বন্ধুবান্ধব, সমর্থ মুরুব্বী, অসাধারণ মেধা এবং অধ্যবসায়-বলে বাজারটিকে নিজ দিক দিয়া অন্ততঃ বছর কয়েক সময়ের মধ্যে যাবতীয় বিঘ্ন ও বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কারণেই যখন ক্ষুদ্র পুরাতন একটি হাতপ্রেস (hand press) পুরাতন টাইপের কয়েকগুলি লাইন, অকেজোগোছের কৌশল এবং অতি সামান্য সাজসরঞ্জাম লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার মনের অনেকটি বিশ্বেষের ভয় সংশয়ের মধ্যে ছোট করিয়া সাধারণে বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার ফলে, কাগজের প্রসার যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বিভাগ আধুনিক উৎকর্ষ সহকারে উন্নতরূপ প্রসারিত গঠিতে থাকে এবং ইণ্ডিয়ান প্রেস বিবিধ বিভাগে বিস্তার লাভ করিয়া অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হয়। এই প্রতিষ্ঠির মূল কারণ ছিল প্রতিষ্ঠাতার পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর মুদ্রাকর হইবার আকাঙ্ক্ষা, নব নব উৎকর্ষের পরিকল্পনা, প্রত্যেক কার্যটি নিখুঁতভাবে সুষম করিয়া তুলিবার আগ্রহ, তাঁহার মাতৃভাষা, সমর ও বিজ্ঞানবিষয় এবং নিখুঁত মুদ্রাঙ্কন। উপরন্তু, শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং যাবতীয় সাধুতাই তাঁহার মূলমন্ত্র। গ্রাহকের স্বার্থরক্ষার কার্য সম্পাদন করিয়া বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন এবং এমনও ঘটনা ঘটিয়াছে যে যাহা তাঁহার নিজের মনের মত হয় নাই, অথবা প্রতিশ্রুতির সামান্য অনুযায়ী হইয়াছে, তাহা প্রকৃত কর্তব্যবোধে করিতে তিনি পুনর্মুদ্রিত ও সুসম্পাদিত করাইয়া দিয়াছেন। নিখুঁত মুদ্রাঙ্কনের আগ্রহে তাঁহার একবার প্রবল ছিল যে প্রুফসীটের অন্য সামান্য একটি ভুলও তাঁহার চোখ দুটি এড়াইতে পারিত না, এবং ভোর রাত্রির ভুল প্রাহকের নজরে না পড়িলেও তাঁহার চোখে পড়িলেই একটি ভুলের জন্য রাশি রাশি কাগজ নষ্ট করিয়া আবার তাহা ছাপাইয়া দিতেন।

ঠাহার অজ্ঞাতসারে "ইণ্ডিয়ান প্রেস" হইতে ছাপার ভুল ভুলে ভরিয়া কোন প্রবন্ধ বাহির হইবে তাহা তিনি দেখিতে পাইবেন না। কোন গ্রাহক তাঁহার নামে অবহার করিয়া ব্যবসায়ে তাঁহার হিতৈষিতার সাধুতা হইতে সামান্য বিচ্যুতিরও অনুযোগ করিবার অবসর পান নাই। এবং তিনি অনেক সময় ন্যায্য অর্থ অনায়াসে অবিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্যমের জন্য অবমত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার এইরূপ অনন্যসাধারণ প্রবাবলী তাঁহাকে

৫ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

এখানে একমাত্রসম্বল, উদ্যোগী, প্রতিভাবান এবং আদর্শ ব্যবসায়ীতে গঠিত করিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে আলিয়া অনেকেই তাঁহার সাধুতার আকৃষ্ট এবং তাঁহার সৎপরামর্শে উপকৃত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের পুরাতন বাড়ীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় একটি বড় বাসা ভাড়া করিয়া কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করা হয়। এবং কাজের সুবিধার জন্য উপযোগী আরও কয়েকটি বড় ছাপার ও অন্যান্য মেশিনের প্রয়োজন হয়। এখানে বলা যাইতে পারে যে, যাই ছাপিবার জন্য এলাহাবাদে "ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এরূপ যন্ত্র পরিচালনার বিষয়তা সম্বন্ধে লোকের যে একটা পুরাতন সংস্কার ছিল তাহা তিনিই দূর করেন। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলেই সাময়িক মুদ্রাঙ্কণের অধিকাংশ তাঁহার উপরেই গ্রহণ করিতে থাকেন এবং এখনো মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতিসাধন ও মুদ্রাঙ্কন শিল্পের আদর্শ উচ্চ করিবার আনুষঙ্গিক বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি ও তাঁহোদিগকে কার্য্যকরী পরামর্শ দান করেন। এই নূতন যন্ত্রগুলির প্রবেশই ঘনাইয়ে তিন সপ্তাহ মাত্র সময় লাগিয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে তাহা এলাহাবাদ এলাহাবাদ ফিটারের (Fitter) সাহায্যেই কাজ হইতে দেখিয়া তাঁহার উৎসাহের বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য বেড় বড় লোকের এবং অন্যান্য স্থানের প্রয়োজন হইলে, ১৯০৯ সালে একটি সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রালয়ের উপযোগী আদর্শ ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সমস্ত প্রেস স্থানান্তরিত করা হয়। এই নূতন ভবনে আসিয়া ঘোষ মহাশয় তাহাতে মুদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহাতে সলিত করার সুযোগ করনা করেন। তাহার ফলে, পাষাণফলক হইতে মুদ্রিত বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্র (Chromo-lithography) যাহা ভারতে ব্যবসায় হিসাবে তখন অজ্ঞাতপ্রায় ছিল, তাহার প্রবর্ত্তন করেন। এই বিদ্যায় দেশীয় যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এতদ্ভিন্ন বিশেষজ্ঞ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে এই কার্য্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি আনাইয়া অনেক অর্থব্যয় মুদ্রাঙ্কণে ছবি ছাপিবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই বিভাগে যে সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়াও যেসের ছেলেদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য তাহার সিদ্ধ হয় নাই, কারণ যে সকল যুবককে তিনি উক্ত যুবক অর্থব্যয় শিল্পীর শিক্ষানবীশ রাখিয়াছিলেন, অনেকেই বেশীদূরের ভাবীর জন্য তাঁহাদের একজনও চাকরী হইতে পারেন নাই। যাহা হউক এই বিভাগ হইতে কলিকাতা আটস্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রপ্রকাশ বাবুর্ণী, নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার প্রবর্ত্তক আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবং চিত্রকলানুশীলন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র এই নূতন প্রণালীতে মুদ্রিত হইয়া কলাভবনে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে এবং ভারতীয় প্রদর্শনী সমূহে কয়েকটি স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছে। এখনও সেগুলি ভারতে কোলোটিপো-ছাপার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইংরেজী ভিন্ন ইউ, কাগজ ও বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য এবং স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশই ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রধান কার্য্যালয়। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া এখান হইতে বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। "ভারতবর্ষ" এই প্রেস হইতে প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক, যাহার মুদ্রাঙ্কন দেখিয়া অনেক খ্যাতনামা লেখক এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন "বাঙ্গলা দেশের বাহিরে এরূপ সুন্দর ছাপা বাঙ্গলা পুস্তক ঘোর কলি এই প্রথম বাহির হইল।" স্বনামপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় লিখিয়াছিলেন "প্রয়াগে বসিয়া অনেকগুলি সুন্দর ছাপা ও সুন্দর বাঁধা বাঙ্গালা পুস্তক বাহির হইতে পারে অনেকের এরূপ ধারণা ছিল না। এই পুস্তক তাহার সাক্ষ্যদান করিল। এমন সুন্দর ছাপা বাঁধা বাঙ্গালা ছাপাখানার গৌরবের বস্তু। পরমুখে প্রশংসা করিলেও তৃপ্তি হয় না।"

বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের অধিকতর সুবিধার জন্য কলিকাতার বন্ধু এবং গ্রন্থকারের সাহায্যার্থে ঘোষ মহাশয় "দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস" নামে কলিকাতায় একটি

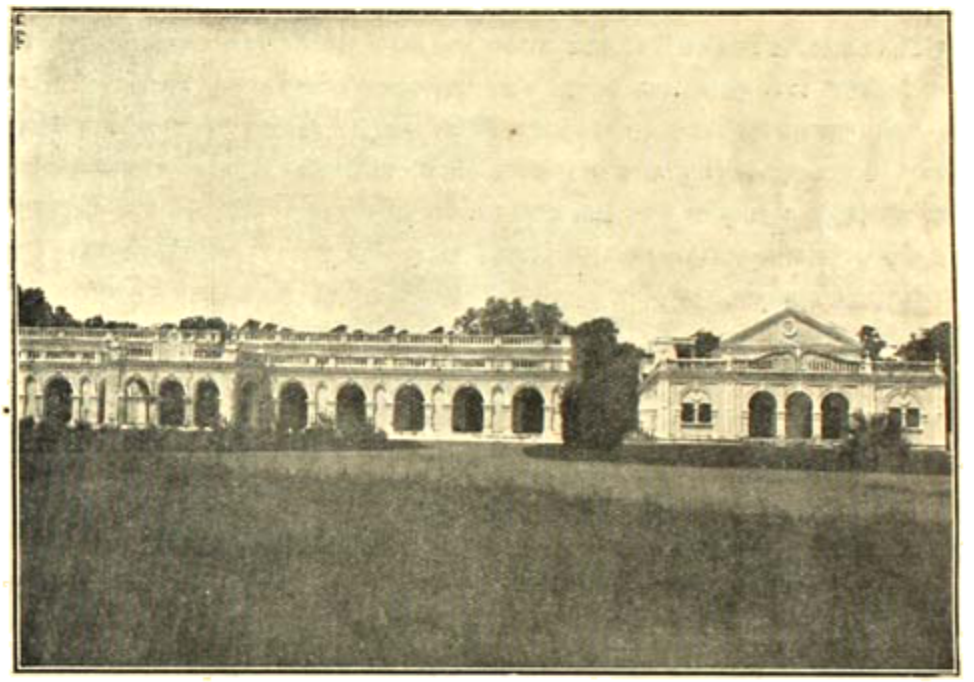

ইণ্ডিয়ান প্রেসের পুরাতন অট্টালিকা—এই সে পরিচিত মোড়, এলাহাবাদ।

প্রকাশ্য কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা গ্রন্থের অনেকেই বিশেষতঃ ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ প্রকাশক বলিয়া জানেন। এই বিভাগ হইতে প্রকাশিত কবিবরের গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ (Edition-de-luxe) উক্ত প্রকাশিত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ বলিয়া প্রশংসিত এবং সাধারণে স্বীকৃত হইয়াছে। বহু অর্থব্যয়ে প্রকাশিত "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" ও এই প্রেসের অক্ষয় কীর্ত্তি উদ্যোগী প্রকাশকার্য্য।

বাঙালার স্বনামপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র প্রথম কয়েক বৎসরের সংখ্যাগুলির মুদ্রণ দেখা যাহার চক্ষু এবং চিত্তকে তৃপ্ত করে নাই তাহা জানি না। সন ১৩০৮ সালের বৈশাখে সেই অনিন্দ্য মুদ্রণ ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাঙালা মুদ্রাঙ্কনের সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা। তদবিধ্যাত ইংরেজী পত্রিকা "The modern Review"-ও এখান হইতেই প্রথম বাহির হইয়াছিল। এ প্রেসের অনেক-গুলি সুবিখ্যাত ইংরেজী সাময়িক পত্রও অনতি প্রথম আলোক দেখিবার জন্য ইণ্ডিয়ান প্রেসের নিকট ঋণী।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের অক্লান্ত কীর্ত্তি হিন্দী সচিত্র মাসিক পত্রিকা "সরস্বতী" ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন জন্মলাভ করে, তখন হিন্দী সাহিত্যজগতে এরূপ কাগজই ছিল না। "সরস্বতী" তাহাতে মুদ্রাঙ্কণ আনয়ন করিল। তাহার আদিতে আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিবার জন্য প্রেস এ পর্য্যন্ত অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহার গল্প-লেখকেরা, চিত্র-সম্বন্ধে, লেখকদিগের আধুনিক হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে গবেষণা ও সাময়িক বিষয়বৈচিত্র্য প্রভৃতি সমস্ত "সরস্বতী" বর্ত্তমান হিন্দী সাময়িক পত্রাদির পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছে। বলিতে কি, প্রেসের এই মুদ্রণযন্ত্রখানি আরম্ভ না হইলে, ইহার উন্নতি যে সম্পূর্ণ ভাবেই নিষ্ফল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, "সরস্বতী"র চিত্তর বিহাই আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের চলনরীতি গঠিয়া উঠিয়াছে এবং পরবর্ত্তী যাবতীয় হিন্দী সাময়িক পত্রাদি সরস্বতীরই আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহারই উদ্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে।

হিন্দীর উন্নতি এবং হিন্দী সাহিত্যপ্রচারের জন্য ইণ্ডিয়ান প্রেস যাহা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তজ্জন্য প্রবর্ত্তক মহাশয় সমগ্র হিন্দী-সমাজের যে কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। লক্ষ্ণৌএর সমাজ-প্রসিদ্ধ "নবল কিশোর প্রেস" উর্দ্দু সাহিত্য প্রচারের জন্য যাহা করিয়াছেন, ইণ্ডিয়ান প্রেস হিন্দীর জন্য তাহা অপেক্ষা কিছু কম করেন নাই। এখান হইতে অনেক হিন্দী গ্রন্থও বহু বার করিয়া প্রকাশ হইয়াছে। চিত্তাকর্ষক আবরণ, সুন্দর বাঁধাই, উৎকৃষ্ট মুদ্রণ রীতি, নিখুঁত মুদ্রাঙ্কন এবং পরিমিত মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য হইয়াছে। এই সকল বিশেষত্বে এখানকার হিন্দী পুস্তকগুলি যে দেশীয় গ্রন্থ-প্রকাশের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। উহাদের প্রকাশনীয় গোচর সংবাদের মধ্যে তুলসীদাসকৃত রামায়ণ এবং রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম তালিকের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরম আদৃত এবং বহুল পঠিত।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের বাল্যকাল হইতেই অধ্যবসায়ের অভিনয় প্রকাশ। সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রকাশিত যাবতীয় মুদ্রাঙ্কণ ও মুদ্রণ শিল্প-বিষয়ক ইংরেজীতে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ক্রমাগত অধ্যয়ন এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রুফ পাঠ করিতে করিতে বহুদিন হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা জন্মিয়াছিল। তাহার উপর প্রুফের উন্নতির সহিত কাজের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির উপর অধিকতর চাপ পড়িতে থাকে। কাজেই এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমে দৃষ্টি যে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে, চিকিৎসকগণ তাহার পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন। তিনি অগত্যা ১৯১৮ সালে তাঁহাদের পরামর্শে অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময় হইতে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু হরিপদ ঘোষকে প্রেসের কার্য্য শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। মুদ্রক করিক-কর্ত্তা উপরোক্তগণের সহিত হাতে-কলমে কাজ করিয়া এবং পিতার নির্দ্দেশক্রমে তিনি উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া আসিয়া মুদ্রণ শিল্পের প্রত্যেক বিভাগেই খুব বড় সকল কার্য্যে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই খুব এইরূপ সময়ে পিতার বহিল হস্ত স্বরূপ এবং কারবারের অধিতীয় সহায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। অতঃপর এই দুর্ঘটনার সময়কার দুঃখ দুর্দ্দি উদারপ্রকৃতি সুযোগ্য অধ্যক্ষ সমস্ত কারবারের তাঁহার সহকারী ও কর্ম্মচারিবৃন্দের চিত্ত জয় করিয়া সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশোচ্ছেদ এবং উৎসাহের পরিসীমা ছিল না।

স্বর্গীয় বাবু হরিদাস ঘোষ

কৃতসূত্র মহাশয়—ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ

কিন্তু হঠাৎ বেরিবেরি রোগে ১৯২০ অব্দে অকালমৃত্যু আসিয়া এই উৎসাহশীল যুবকের সকল উদ্যম আশা ও উদ্যম জীবনসহিত অবসান করিয়া দিল। এই শোকাঘা অসুখীর অতি নৈরাশ্যের নিস্তার উপর মুদ্রিতের ন্যায় পতিত হইল, এবং শুধু তাহাই নহে, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথমে পত্নী, পরে ছোট পুত্র এবং শেষে ছোট কন্যাকে হারাইয়া ঘোষ মহাশয় সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িলেন। তাঁহার বেহ্যদিন যে অত্যাঘাতে দুর্ঘটনা তখনও অবশিষ্ট ছিল এবং যাহার জন্য তিনি চিকিৎসা করাইতেছিলেন, তাহার কথাও চিন্তাকুল এই শুভ আঘাত হইল করিয়া লইল।

সাহে অত্যাকুলচিত্ত বহুদর্শী ঘোষ মহাশয় এইরূপ বিপদের বিরোধে দুর্বলতা ও চঞ্চলতা হইলে পর, একমাত্র সময়ই তাঁহার এই সাংঘাতিক অবসাদ দূরে ঘোষ প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়, এবং তিনি তাঁহার অবশিষ্টজন দুঃখ সহকারীকে লইয়া পুনরায় নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করেন।

এই সময় তাঁহার বিলাত পুত্র এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসের বর্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রবিন্দ্রনাথ ঘোষ কারাগার ঘোষ দেন। ঘোষ মহাশয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা হইলেও প্রকৃত পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতার গুণে সকল কার্য আয়ত্ত করিয়া লয়েন। এলাহাবাদ বিদ্যা অবলম্বে অর্থাৎ বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের জ্ঞান এখনে তাঁহার বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রেস উন্নতির পথেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যবসায়-জগতের চিরস্থায়ীর ঘনের ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতরাজধানী কলিকাতা এলাহাবাদের সাক্ষাৎসিত হওয়ায় ইণ্ডিয়ান প্রেসকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এখানকার শ্রমিকবৃন্দ একযোগে অতিরিক্ত বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়া বসিল, তাহা ও বৃদ্ধিপ্রবণ-মূলনীতিবিহীন এবং দুরদৃষ্টি-সম্পন্ন ঘোষ মহাশয় তাহাদের সেই অন্যায় ও অসঙ্গত দাবী গ্রাহ্য করিবার কোনই উপায় না দেখিয়া দৃঢ়চিত্তে অস্বীকার করেন। তিনি এই বর্ধমান দাবী পূরণের জন্য ভবিষ্যৎ অসুবিধার মধ্য মধ্য পুনরাবর্তনের হেতু স্বরূপ হইতে পারে অনুভব করিয়া প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে কৃতসংকল্প হন। এবং শ্রমিকসঙ্ঘের হঠাৎ ধর্মঘটের ফলে কার্যের ক্ষতি ও ব্যবসায়ে অতি হইতে না পারে সেজন্য ১৯২১ অব্দের খুব আগে ব্যারাকপুরে একটি শাখা প্রেস স্থাপিত করেন। এই সময় এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত ও সম্প্রদায়বাস ফলে অবস্থার বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের পরিবর্তে ইণ্ডিয়ান প্রেসের অট্টালিকা-সমূহ এবং বিস্তীর্ণ ভূমিও উহার-নির্মিত অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রস্তাব অতি সত্বর কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত স্থির হইয়া যাওয়ায় ইণ্ডিয়ান প্রেসের সমক্ষে এক অভিনব দুর্যোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। অবশ্য, যদিই বৃদ্ধি বৃহত্তরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন সমর্পিত হইলে পূর্ণ প্রেস ভবনও এই ব্যবসায়ের ব্যবহার উপযোগী হইতে পারে বলিয়া থাকে। প্রেসের ভবনগুলি তখন অনেকটা ভাড়া খাটাইয়া বাকিয়া যদিই সমর্থের সার্কের সন্নিহিত সুবিধাজনক জমীর স্থানের প্রশস্ত চতুষ্পার্শ্বের নিজস্ব-মূল্যে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে প্রেস-বাড়ীর নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়।' এই সূত্রে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ঘোষ মহাশয়ের বুদ্ধি-শক্তি যাহা দৈবক্রম হইয়াই প্রথম ছিল, তাহা এখনে বিশেষ ভাবেই কাজে লাগিল। দূরদৃষ্টি সম্পর্কিত ব্যবহারের তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও মানসিক বল যে অটুট আছে, এই সময় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তির সহিত তাঁহার মুক্তবুদ্ধি ও আধুনিক সমস্যার যন্ত্র-দর্শন এবং নিত্যনূতন ও ব্যবহারিক এই উন্নতবিধ জ্ঞানের সমাবেশ থাকায় সকল কার্য হইতে সম্পূর্ণ অবসর লইলেও তিনি প্রেস-বাড়ীর সমস্ত স্থান (Plan) আপনার মনের মত করিয়া তাহা প্রস্তুত করান এবং নির্মাণ কার্য যখন চলিতে থাকে তখন, তাঁর শক্তির সাহায্যে সেই স্থানের অভ্যন্তরী প্রত্যেক সুবন্দোবস্ত বিষয়, এমন কি এই বিশাল অট্টালিকার প্রতি অঙ্গি-সন্ধির কথা স্বয়ং বসিয়া তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য অধিকার প্রকৃতিকে আধুনিক উন্নত আদর্শের আলোয় নির্মাণোপযোগী অন্যান্য উপদেশ দিতে থাকেন।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের বর্তমান বৃহৎ অট্টালিকা তাহারই ফল।

এই নবনির্মিত প্রেসের জন্য ইলাহাবাদ এবং অন্যান্য স্থানের একদল বিশেষজ্ঞ কারিগর তাঁহাদের দ্বারা সর্বাপেক্ষা সুন্দর কার্যোপযোগী আধুনিকতম উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির আমদানী করা হয় এবং কর্মচারীদের পরিদর্শনকল্পে (inspection) তাহাদিগকে ইলাহাবাদে যাতায়াত করিতে হয়। বলা বাহুল্য, মুদ্রাঙ্কনবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আবশ্যক, বর্তমানের যাহা শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি, ইণ্ডিয়ান প্রেসে একণে তাহারই সমাবেশ হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার পরিচালনার ভার প্রবিবাসী মহাশয় কর্তৃক সংস্থাপিত ট্রাষ্ট ফণ্ড (Trust Fund) হইতে নির্বাহিত হইবার ব্যবস্থা করা আছে। এই হাসপাতালে প্রেসের কর্মচারিবৃন্দের পক্ষে যেরূপ সুচিকিৎসকের অকপট সাহায্য পাইবার সুবিধা হইয়াছে, তদ্রূপ বাহিরের অন্যান্য মহলাস্থ এখানে সর্বপ্রকার-চিকিৎসার্থে নিয়ত আসিতে চিকিৎসিত হইতেছে।

একণে ইণ্ডিয়ান প্রেসের নানা কার্য-বিভাগের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের নবনির্মিত অট্টালিকা—৮ নং পার্শ্ব হইতে, এলাহাবাদ

১৮৯৯ সালের ছাপার কল হইতে যত পরিমাণ কাজ আসিত তাহার দ্বিগুণ বর্তমান কল হইতে প্রায় তাহার দ্বিগুণ কাজ পাওয়া যাইতেছে। পাঁচ শত অধিক প্রেসের কাজ বিভক্ত আছে।

প্রেসের ভূতপূর্ব ম্যানেজার পরলোকগত বাবু হরিপদ ঘোষ, যিনি অপরিমেয় অধ্যবসায়গুণে তাঁহার সময়ের অগ্রণী হইয়াছেন এবং শত শত লোক এবং অন্যান্য বন্ধু ও পরিচিতজনের জন্যে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থে **স্বর্গীয় পণ্ডিত হরিপদ ভট্টাচার্য্য** নামে একটী স্বতন্ত্র যোষিপ্যাথিক চিকিৎসার প্রেস-বাড়ীর পূর্ব প্রান্তে

মুদ্রণকার্য-বিভাগ—এই বিভাগের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ আধুনিক। এখানে পুস্তক-মুদ্রণ, বর্ণ-মুদ্রণ (Colour printing), সূক্ষ্মশিল্প (Fine Arts), পাষাণ-লেখ ও চিত্রমুদ্রণ (Lithography), অফসেট্-মুদ্রণ (Offset printing), মাসচিত্র-মুদ্রণ প্রভৃতি। কয়েকখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসগৃহে এই সকল কার্যের প্রত্যেকটা সৃষ্টি করা হইয়াছে। এখানকার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল যন্ত্রই বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা চালিত হইতেছে। প্রেসে প্রচুর আলো ও বাতাস সংস্থাপন করা হইয়াছে। একণে প্রেস-বাড়ীর অধীনেই একটী বিদ্যুদাগার (Power

House) নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এবং কতকগুলি সম্পত্তি ক্রীত নূতন এই বিভাগ ও তৎপর হইতে পাওয়া আসিয়া পৌঁছিবে।

অবস্থা এই চিত্রে।—শ্রীযুক্ত হরিসাধন বোস।

অফসেট্-মুদ্রণ-বিভাগ—ভারতের আর কোনও প্রেসে এই বিভাগ খোলা হইয়াছে বিনা জানি না। সম্ভবতঃ ভারতে ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। মাদুরীর বহুই কলকাতে নির্মিত এবং উচ্চশ্রেণীর অক্ষরের। ভারতে পরিচালনার জন্য এবং এখানকার দেশীয় কর্মীদের শিক্ষা দিবার জন্য একজন সুদক্ষ সুইস্ মুদ্রাকর (Swiss printer) নিযুক্ত আছেন। এই যন্ত্রে প্রায় প্রায় ৩০ রীম ওজন কাটিন আকারের কাগজ ছাপিয়া আনিয়া করিয়া দিতেছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং ইহার ছাপাও উৎকৃষ্ট।

লিথো বিভাগ—এই বিভাগও সুপরিচালিত। এখানে পাষাণ-ফলক হইতে নানা বর্ণে রঞ্জিত আলেখ্য-চিত্র-কার্য্য এখানকার অভিজ্ঞ ও অভি সুদক্ষভাবে সম্পাদিত হইতেছে।

ফটো এন্গ্রেভিং বিভাগ—এই বিভাগের ব্যবহার্য্য এখন আধুনিকতম যন্ত্রপাতি নাই

যাহা ইণ্ডিয়ান প্রেসে সম্প্রতি হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানটি ভিন্ন ভারতের আর কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। অসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে। এখানে সমস্ত হইতে এলাহিবাদ তখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর যত রকমের কাজ যে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সঙ্গে এক দিকে যেমন সহায়ক যন্ত্র (the auxiliary) বিভাগ, ফোরম্যান ও ষ্টাম্পটিঙ্গিং বিভাগাদি (Die-stamping and Copper plate Engraving Departments) রহিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি ব্লকোৎকীর্ণ (Etching), আলোকচিত্র পরিস্ফুটন (Plate developing) এবং আলোক চিত্র গ্রহণ (Operating rooms) প্রভৃতির কক্ষগুলি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিন্যস্ত ও রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল কার্য্য বিভাগের উপযোগী সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির

কেরানী মহাশয়—শ্রীযুক্ত হরিসাধন বোস।

উপকরণ ব্যবসায়ের স্থানীয় প্রয়োজন প্রভৃতি উদ্ভাবন হইতে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য কতকগুলি ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার-গৃহ (Under ground Cellars) বিভাগ করিয়াছে।

যে অবস্থায় মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য এই প্রেসের অন্তরূপ বিশেষত্ব। তাহার গৌরবার্থে যে স্থানটীকে ভ্যান্ডাইক বিভাগ (Vandyking Department) উপ-বিভাগ স্থাপন করা হইয়াছে তাহা এই স্থানের সাফল্যপ্রতিষ্ঠার মূল কারণের অন্যতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নকল প্রস্তুত কার্য্য যাহাতে নিপুণতার সহিত পরিচালিত হয়, তজ্জন্য হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া লোক-জন তৈয়ার করিয়া লওয়াও হইতেছে।

প্রাঁপ্রাইট বিভাগ—হরফীখানার কার্য্য কিরূপ বিশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্নরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। হাতের কাজ প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। কাসের ছাঁচা, ঢেলাই, ঘোঁচাই, কাটাকাট করা, পুরুষের ঘলাই ও তার। লাগাইবার পূর্ব্বে পৃষ্ঠাঙ্কণের আবরণ প্রস্তুত করা প্রভৃতি সব রকমের কাজই না হইতেছে, কিন্তু সবই কিল কিল করে অবলীলাক্রমে হইয়া যাইতেছে। যন্ত্রগুলি তাহার তত্ত্বাবধান সব করিতেছে।

ইহা ছাড়া আর যে সকল কার্য্যের জন্য অন্যান্য বিভাগ বিদ্যমান আছে তাহার সকলগুলির একত্র সমাবেশ আর ইণ্ডিয়ান প্রেসেরই বিশেষত্ব, যথাঃ লাইনো টাইপ (Linotype), টাইপ ফাউণ্ডরী (Type Foundry), ক্যালেণ্ডার মানুফাক্চারীং (Calendar Manufacturing), বহু প্রকার ও প্রকাশ, বাদ্যিত্রাবন্ধ, আলেখ্য চিত্রণ এবং মাসিক পত্র সম্পাদন ও প্রচার বিভাগগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের সমস্ত কার্য্যের পরিচালক ইহার ম্যানেজার এবং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রিকেশব ঘোষ ও তাঁহার এই বিপুল দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য পরিচালনায় কর্ত্তব্য-পালনের সহকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়—জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রিপ্রসন্ন ঘোষ এবং আর্টসেক্সন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রিনারায়ন ঘোষ।

১৯১০ সালে ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার অংশীদার এবং ডিরেক্টর প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের পুত্রগণ।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের "পরিচালনা" ও "বিজ্ঞাপন" ("Planning" and "Advertising") নামে আরও দুইটি বিশেষ বিভাগ আছে। প্রথমটীর কর্ত্তব্য—সর্ব্বদা নব নব উন্নতি বিধানের জন্য প্রতি কার্য্যের সম্ভাব্য উৎকর্ষ পরিবর্দ্ধন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কার্য্যোপযোগী ভাবে সুব্যবস্থাবিধান। এই পরিচালনা বিভাগ অন্যান্য সকলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণের প্রয়োজন সাধক কোন্ অভিনব কার্য্য এখানে প্রবর্ত্তিত হইল, অথবা অন্যান্যের কোন্ কার্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করা হইল, তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত রাখিবার জন্য বিজ্ঞাপন বিভাগ সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

বলা বাহুল্য যে ভক্তকবীন্দ্রের এই সদ্য প্রস্তুত প্রেসের চিত্তাকর্ষক সহায় এবং ব্যবসায়ের কূটনীতি বিষয়ে সহিত যুক্ত থাকায় ইণ্ডিয়ান প্রেস আজ স্থানীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ব্যবসায়ের বিস্তার, আয় ও প্রতিপত্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার

ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রিনারায়ণ ঘোষ।

সম্পাদিত কার্য্যের বৈশিষ্ট্য এবং উৎকর্ষ দর্শন করিয়া পাশ্চাত্য প্রেসের মুদ্রণব্যবসায়িগণও মুগ্ধ হইয়াছেন এবং আমেরিকা ইংলণ্ডের অধিক মুদ্রাঙ্কণক্ষম এদেশের প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য ও শিল্প-চিত্রিমের বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। দুরাশা আশা করি, বাহুল্য উল্লেখ করিয়াও যিনি এমনই আশার মূর্ত্তি, মূর্ত্তি ও সকল কর্ম্মশক্তি থাকিতে একমাত্র দুর্বলশক্তি হীন হওয়ায় স্বীয় অসাধারণ সাফল্যের কলঙ্কস্বরূপ ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্ত্তৃত্বের ভার করিয়া দুরূহ থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণের এই কর্ম্ম-সংস্থা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দানে ফলিবে।

আশ্বিনের ব্যথা

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী

১

পশ্চিমের জোরো এক গ্রামে বাংলো ধরণের ছোট একখানি বাড়ী। একান্ত নিভৃত এই স্থান। বাংলোতে বাস করে, একটি বৃদ্ধ দম্পতী। তৃপ্তির অবসর উদ্ধারে যেন তাদের অন্তরে চিরস্থায়ী বসন্তের সৃষ্টি করে রেখেছে।

লেখা ছিল তরুণী ও সুন্দরী। স্বামী অমলেন্দু লেখাদেরই হাইস্কুলের শেক্ষ-মাষ্টার। অমল লেখাকে বিয়ে করবার কিছুদিন পরেই চাকরী নিয়ে এই সুদূর পশ্চিমে এসেছে। কৈশোর থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হট্টগোলে কাটিয়ে এই নিঃসঙ্গতা, এই নির্জনতা যাকে মাঝে অমলের কেমন যেন অসহনীয় হ'য়ে উঠত। কিন্তু এই লেখার তবুই সে পরিপূর্ণ ভাবে সেটা বোঝবার অবসর পেত না। স্বামীর তৃপ্তি, তার সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, ঐ বিদেশী মেয়েটি যে কি অপূর্ব ভাবে তার জীবনে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে গিয়েছিল—তাদের প্রত্যেক ছোট-খাট অভাব-বোধ দূর করবার অসীম চেষ্টা ও আগ্রহ লেখার চোখে-মুখে ফুটে উঠ্‌তে যখনই সে দেখেছে, সে সময় তার কালো আনন্দ-উজ্জ্বল টানা চোখ দুটির দিকে চেয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে—বুঝি তার একটানা জীবন-স্রোতে এই নানা রঙ বঙ সমস্যাগুলি অজানা রোমের রাজকন্যার চোখের জলে ভেজে আসা সোনার গল্প।

২

পাহাড়ী তখনও যায় নি। পশ্চিমের উত্তপ্ত বায়ু তখন কেন তখনও মাটির বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সূর্যের পড়ন্ত রশ্মি তীব্র ও উজ্জ্বল।

অমল এইমাত্র স্কুল থেকে ফিরেছে। তার সমস্ত মুখখানার ওপর অবসাদের ঘন ছায়া। লেখা এ-সময়টি বারান্দাতে বেতেই একখানি চেয়ারে বসে পড়ে, নয় তো একটা কিছু খেলাই নিয়ে যায় থাকে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে সামনের পথটির শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত দেখে নিয়ে কাজে মন দেবার চেষ্টা করে। সমস্ত সন্ধে রাতের কাজ করতেই বা এগোয়, চোখের কাজ কিন্তু বন্ধই থেকে যায়। তার পর ঐ দূরে একটি পরিচিত পদধ্বনি আসার! লেখা খেলাঘরের সাজান বাড়াবাড়ি ফেলে, বইগুলো এক পাশে রাখে।

অমলকে আজ বিশেষ ক্লেশ আরও একটু বেশী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সেই সঙ্গে লেখার চোখ থেকে এটুকুও এড়ালো না যে, স্বামীর মুখখানা একটু যেন বিবর্ণও। ছোট্টো সাদনের চেয়ারের ওপর দু'জনে বসে—বুঝলে, এবার পুজোয় কোথাও নড়বার উপায় নেই!

এখখানা হাত-পাখা নিয়ে লেখা বাতাস করছিল। স্বামীর কথায় বিস্মিত হয়ে লেখা বল্লে—কেন?

পুজোর ছুটি এখানে মাত্র চারদিন—অমল উত্তর দিলে।

লেখার দু'টি চোখে পলা ছুটে উঠ্‌ল। সে ধীরে ধীরে বল্লে—তা না হয় দুটি দিন-বন্ধক নিলেই।

সে চেষ্টা কি আমরা করিনি লেখা,—অমল খুব নীচু স্বরে পুজোর ছিতে ফুলের ফুলুরে ফুলুরে ফুলে—ফুলের কর্তারা অমল, ছেলেদের পরীক্ষা কাছে আসছে, এ সময় ছুটি তাঁরা দিতে পারেন না।

তরুণীর অমল ফুলের সোহাগ ছেড়ে, একখানি কাগজ পরে নিয়েছে। লেখা সামনের একখানি বেতের মোড়াতে বিসু খাবার, এক গেলাস জল ও এক পেয়ালা চা এনে সামনের একটি বেতের টি-পয়ের ওপর রেখে বল্লে—তা আর কি হবে! তা বলে তুমি মন খারাপ করতে পাবে না।

অমলের বেলা—ছুটুর মাসতুতো একখানি শান্ত পল্লী। সে গ্রামের পোয়ালার দুধ চুমুক দিয়ে দিয়ে খেয়ে কি আরাম! বাঁধ-দিয়ের অমলা বছরটি তার কাছে তখন প্রিয় হ'য়েও প্রিয়! বন-বীথিকার বাঁধা ছায়া-শীতল খেয়া-টানা পথ, ছোট নিরুপদ্রব একটি নদী, সামান্য মাটির ঘুঁয়ে, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের একটা বিপুল টান সে সারা বেহ-মন দিয়ে অনুভব করতে লাগল।

আর লেখা? মাসীর পরশ কি তীব্র হ'য়ে ওই অল্প বয়সখানাকে পীড়িত করে তোলে নি? তার মা যে তার পথ চেয়ে এখন থেকেই আছেন! এই পরশও মা তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছেন, মা, তুমি মা এলে আমার এই পূজোর আনন্দ হবে মাটি।

দু'টি অল্প-বয়সীর বিভিন্ন চিন্তার মাঝ সন্ধ্যার ঝিম মাসীমাকে ভারী করে তুল। অমল মনে ভাবল—না, না, এ হ'তেই পারে না, লেখা আমি মাসীই, মার চাকরী আমি ছেড়ে দেব।

লেখা পশ্চিম-দুটীতে মাসীর দিকে চেয়ে বলল—না, সেটা ভাল হবে না। তার মনে পড়ল, আজ কতদিন কত চেষ্টার পর, মাসী এই কাজটুকু জোগাড় করতে পেরেছে। এই চাকরীর জীবনের কত নিষ্ঠুর-রাতে উপবাসে মুখ শুঁজে সে দুইই করেছে, কত দৌড়ভরা আকাশ-তলায়, সহরে-সহরে সে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু মরীচিকার ছলনার মতো এই চাকরী তাকে ছলনা করেই এসেছে এতদিন। সেই পরম প্রাপ্তির বস্তুটি যদিই বা ভগবান্ এতদিনে হাতে তুলে দিয়েছেন—

লেখা মনে ভাবল—কি-ই বা এমন, পরশের ছুটি তো এখানকার অনেকদিন, তখনই নয় যাবো।

অনাবিল অন্তরটুকুর পবিত্রতা অমলের অপরিজ্ঞাত ছিল না, সে একটি নিশ্বাস ফেলে বলে—হ্যাঁ, তা নয় হোলো, কিন্তু তোমায় যে যা পাঠালেই নয়। এখুনি তোমার মাকে চিঠি লিখ নি। আমার যে নড়বার উপায়টুকুও নেই।

সন্ধ্যা তখন গাঢ় অন্ধকারের বুকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে।

অমল ছুটি পায় নি। লেখার মাসীর বাড়ী থেকেও কেউ তাকে নিতে আসে নি। তোমার অন্তরে ভালোর একটি ছোট পাড়া-পাঁ, আর তোমার কত না সুখকরী অজানা অচেনা এই নয়। এক মানুষ আর এক মানুষের পরিচয় খোঁজার করে না।

লেখার পিসী একবার পূজোর পাঠাবে ছেলেকে পেটী পিঠিয়ে পাঠালেন। তা ছাড়া মাসীমা পূজো। কিন্তু মায়ের অন্তর তো কোনো বাধা মানতে রাজি নয়। তিনি স্বামীর কাছে অতি দীনা প্রার্থীর মত কতন মিনতি জানিয়েছিলেন—মেয়েকে আনবার। তাঁর সমস্ত পূজো যে ব্যর্থতায় ভরে উঠবে—লেখা যদি না আসে। আর এই যে পূজো—সমস্ত মায়ের ভরে—সকল মেয়ের এই যে চির-সনাতন মিলন—এ নিয়মই যদি উল্টে যায় আজ—তবে সেই হিমালয়ের মেয়ে মা মেনকাদেবী যে কেমন পথ তাকিয়ে চোখের জলে অন্ধ হ'য়ে যেতে হ'বে।

অমলবাবু বলেন—কিন্তু দুধোরকে পাঠালে এখানে চলবে কি করে? তুমি বরং দু'কোটা চোখের জল ফেলে আমায় বুঝিয়ে দিলে যে, মেয়েকে আনা চাই। বুঝতেও রাজি আছি বড়!

অবলা ভুবনমোহিনী নীরবে চোখের জল মুছে পূজো-বাড়ীর কাজ সুরু করলেন।

বিউলীর ফুলের মত প্রভাতের আকাশ-বাতাসকে বাতাস করে তুলেছে! লেখাদের বাড়ীর চারপাশের বেড়ালের ওপর ও বাড়িতে যাদের প্রায় ফুলগুলো ঝরে ঝরতে বরণ করলেও, অঞ্জলে সংযোজিত করবার পক্ষি তখনও তারা হারায় নি। যা, ঐ শুভ্র ঝরাফুল ফুলগুলি যেন আরো উজ্জ্বল হ'য়ে সমস্ত প্রকৃতির অন্তর মাঝকে জয়ী করবার অসীম চেষ্টায় নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছিল।

লেখা বারান্দায় বসে—অমল তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি! সে জোরেই আসা করে—কেউ না কেউ তাকে নিতে

আজুবেই। এবার স্বামি-প্রেমে মজিয়া এই বর্ষীয়সী মহিলাও আজ যেন মায়ের মেয়ের অকল-মোহে আজার মেলার জন্য যে অবলম্বন হুটোছুটি করছে। বন্ধ ঘরের বীজ আকাশ, শিউলীর গন্ধ, মায়ের চিরপরিচিত দৃষ্টিটিতে যে আজ কিসে রয়েছে—মেয়ের শাসনে—তাই আর এক-বিন্দুর অধাই কোথাও অন্যত্র যেন একটু অপূর্বতা মাখা ছুলে দর্শকদের জন্য তাকে মাখা দিয়েছে।

তবুও মেয়া দু'একবার অমনকে বলেছিল—কিন্তু বৃদ্ধি এই পাড়াল-পুরীতে থাকবে কি করে—আমিনয়···

'যাবো না' কথাটি তার অন্তরের কথা নয়, তবুও সে জিজ্ঞাস্ নয়-দুটি ভুলে যেন তার প্রিয় পরিচয়ের কথায় আনেকার ছিল। অন্য সবে মেয়া ভাবছিল—ঠিক পুজো হয়ে গেলেই সে ছুটে আসবে—তার কথা ভাববে না।

৫

সন্ধ্যা: সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর বুকের ওপর আপনার শক্তির বাহু-দুই মেলেছিল। বাংলোর সামনে ছোট একটুখানি খোলা জায়গা। চারপাশে অনেকটি ফুলের গাছ। মেয়া বোজই জায়গাটি পরিষ্কার করে,—পশ্চিমের প্রবল ঝঞ্ঝায় কদম্বগাছের বাকির বুক মেখার মাঝের দিকের ফল-বিকাশে ছিন্ন হ'য়ে পড়ে।

সেই জায়গাটিতে মেয়া বিকেলে দু'খানি চেয়ার পাতা থাকত—সামনে ছোট একটি টি-পয়। মেয়েই মেয়া ও অমল দুটিতে মুখোমুখী হ'য়ে গল্প করে।

আজ সন্ধ্যা হ'য়ে আসলেও সে কিছুই করে নি। সমস্ত বিকেলটা তার কেবল দূরের দিকে তাকিয়ে কেটেছে। ঘড়িতে চং চং করে দু'টা বাজলেই তার চমক ভাঙলো। মেয়া তাড়াতাড়ি চুলের খোপাটা জড়িয়ে মাথার ওপর তুলে সন্ধ্যার আসন অভিথি দৃষ্টি মেলে, মনে পড়ে গেল আজ সে কিছুই করে নি। তাড়াতাড়ি চেয়ার দু'খানা বের করে বাইরে পেতে দিলে।

অমল এসেই মেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার মাথাটা নেমে নিজের বুকের মধ্যেই মহুর্তে করলে! স্নায়ুবিহ্বল কণ্ঠে সে ডাকল—মেয়া·····

মেয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল—তুমি বস—চা নিয়ে আসি।

মমতাময়ী একটু প্রিয়তমার দিকে তাকিয়ে অমলের বুক থেকে একটা ভারী নিশ্বাস ওর মাথাকে ঘিরিয়ে গেল।

বাইরে ঘড়ি প্রহর ঘোষণা ক'রেছে। মায়েদের পুজো-বাড়ীতে আজ আনন্দ যেন লাল চেলীর কাপড় পরে নাচছে। আগমনীর বিচিত্র সুরের প্লাবনে বাংলার আকাশ-বাতাস দুর্গাদেবীর মতো এমিয়ে পড়েছে। বাংলার মনও আজ এমনি মোহে মূর্ছাহিত। গ্রামে সমারোহের বিপুল ধারা! মোহনের মেয়ে এসেছে—সঙ্গে একপাল ছেলে-মেয়ে। হুটোপাটি, ঠেলাঠেলি, লাফালাফি চলছে। বৃদ্ধা গিন্নি কন্যাকে বুকে চেপে, ছেলে-মেয়েগুলোর হাতে খাবার তুলে দিয়ে, মেয়েকে অবসর দিলেন। মুখুজ্জেদের বড় বৌয়ের মেয়ে নেই—কিন্তু সবাকে সে মেয়ের মতোই বুকে করে মানুষ করেছে। গ্রামে ঢুকেই সবা প্রথম বড়-মাকে প্রণাম করতে এল। বড়-বৌ ছুটে ছোট পুতিটির মতোই তাকে বুকে চেপে একটুকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিসের মাতৃ-হৃদয়ের কাঁদা-ভাল যেন এই গ্রামের বুক বেয়ে বইতে লাগল।

মায়েদের বাড়ীতে বোধনের উৎসব চলেছে। ভাগ্য-বান্ মানু তার বিপুল মহড়ানি অন্তোলিত করে পুজো-বাড়ীর চারদিক উজ্জ্বলময় করছেন। গৃহিণী এক হাতে চোখের জল মুছে, অন্য হাতে পুজোর আয়োজন করছেন। প্রতিমার মুখখানির দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝি ভাবছিলেন—মা মেয়েকার কোলে ফিরে পার্থিবীর এই আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ—আর মেয়া·····মায়ের কোলে ফিরতে না পেরে মেয়ার মুখখানি কত না মলিন—সে যেন তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি যেরের মা হ'য়ে যেমন করে এ আনন্দ উপভোগ করছেন!

তিনি যেন তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—চিরবালের নিয়ম হয়ত এমনি করেই যাবে। মেয়া আজুবেই! অমল নিশ্চয় ছুটি পাবে।

বাড়ীর দুয়োরে এমখানি গাড়ী এসে থামল। গাড়ীর মোহনের মেয়ে কাল আজুবে পারে নি, আজ সকালে এই গাড়ীতে এসেছে। সে অমনি মায়ের প্রতিমা ফেলে ওর বাড়ী যাবে।

মায়ের বাড়ীর সামনে গাড়ীখানা থামতেই ভুবন-মোহিনী—মেয়া, এসি মা! বলে পাগলিনীর মত ছুটে মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর মুখে-মাথায় চুমন করতে লাগলেন।

গ্রাম-ভিখারীর মতনই ভিড়ে আকাশে আগমনী-গানকে যেন আরও সার্থক ক'রে তুলে। প্রতিমার মুখ তখন বিশ্ব উজ্জ্বল হ'য়ে চল-চল করছে।

গান ও স্বর লিপি

কথা—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

অবসর

মিশ্র ঠৈরবী—একতালা

ভাঙাও তোমার খেলা ।
নিয়ে সকল সাধী-সাথরা
চিরজীবন ধরি চাওয়া,
আজকে যদি তোর ভুলেছি
তুমিই পলাবে কি ?
দুই চোখে যে ঘুমায় না মোর তোমার স্বপন আলো
লক্ষ কোটি নয়ন দিলে ভ'রে যে মোর আলো,
মোহন-বেলা স্বপ্ন দিয়া
চ'লেছিলে পথ ভুলিয়া
থামুক সে খেলা হয়ো আজি
চরণ-তলে ফেলি ।
ধ্রু ভাঙাও তোমার খেলা ।

০	১	+	৩		১		
মজা মা -া ।	পদা পা পা ।	মা পা -া ।	-া পজা ধুপা		পদা পধর্সা পা ।		
ভা ঙা ও	তো মা র	খে লা ।	০ ০		তো মা র		
+	৩						
মা পা -া ।	-া -া -া ।						
খে লা ।	০ ০ ০						
মা পধা -া	মা পা -া ।	পর্সা পর্সা -া	র্সর্সা র্সা -া	পা র্সর্রা র্জ্ঞা ।	র্সর্সা র্সর্রা পা ।		
নি য়ে ।	স ব স	খী রা ।	সাথ রা ।	চি র	জী ব ন		
তো র ব	হে ছি ।	ম ০ ত	বি মা ।	চ' লে	ছি ল ।		
		[-া]					
পর্সা র্সা পর্সা	ধপা পা-ধমা ।।						
ধ রি	চাও য়া ।						
প থ ভু	লি য়া ।						
পা -া র্জ্ঞা	র্সা র্সা -া ।	পর্সা র্সা পর্সা	পধা পা মজা ।	মা পধা পর্সা			
আ জ যে	ব লি ।	তো মা র	খে লা ।	আ মি ।	ভু ল ে		
থা মু ক	সে খে লা	যা । ও	আ মি ।	চ র ণ			
মধা জ্ঞা পধা ।	মধা মজ্ঞা রসা ।	II II					
যে লি ।	। । ।						
ঠে লি ।	। । ।						
পা -া ধা ।	মা পা -া ।	মজ্ঞরা মজ্ঞা -া			পধা পপা -া ।		
ভু ই তো	যে যে ।	ভু লা ব			ন সে ব		
পধমা পা -া ।	। । । ।						
আ মো ।	। । ।						
পা -া র্সা ।	র্সধা র্সা -া ।	পধা র্সধা -া		মধা মজ্ঞা মজ্ঞা			
ন । ক	খো টি ।	ন ব ন		হ' ত ।			
পধমা পা ।	। । । ।						
তা মো ।	। । ।						

অন্ধকূপের অন্ধকারে

উপন্যাস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়—কলিকাতা

প্রথম

ঝিম-ঝিমের আগে কলকাতায় ঝিম্-ঝুমরাতের লক্ষণ শুরু হয়েছে।

রাত দুপুর। পথে জনপ্রাণী নেই —না মাতালও যাচ্ছে, না পথের চোর, না খুনও চোখিয়ার!

ফোর্টউইলিয়মের একটা রাস্তায় আবার গ্যাসের আলো স্থায়ী জ্বলছে না, নিশ্চয় কেউ নিবিয়ে দিয়ে গেছে।

সী অন্ধকার,—নিঝুম, নিরালা, নিরুপদ্রব! যার দু'চ অণুতে আজ যেন মাখানো রয়েছে সাহস বিভীষিকা —তার চিত্তে চোখ তুলে তাকালেও চোখে যেন অন্ধ হয়ে যায়, তার ভিতরে এক পা অগ্রসর হ'লেও নিজের অস্তিত্ব যেন সত্তি থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়!

এমন কি নিস্তব্ধ আজ চতুর্দিক! মৃত্যুর মতন জমাট, মৃত্যুর মতন ভয়াবহ, সে স্তব্ধতা!..... আচমকা সেই অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে এল আর্তনাদ এক ভীষণ..... .....তার পরেই জেগে উঠল এক অস্ফুট আর্তনাদ!..... ছটাং চমকে মনে হয়, স্তব্ধতা আর যেন চুপ ক'রে থাকতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে ক্রন্দন-ভরে বিলাপ করছে!...

আবার সেই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ!.....কিন্তু কে কাদের কাছে, কেন সে কাঁদে, এ-সব কথা ভাববার মতন মানুষ সেই আর সেখানে আজিকে নেই।

অন্ধকারে কে যেন পায়ে-পায়ে অগ্রসর হচ্ছে না? পায়ের শব্দ একবার আসছে, একবার যাচ্ছে। কে সে—মৃত্যুর দূত, না, বিপদ পথিক?

পথের পাশে অন্ধকারকে খানিকটা ক'রে ঘিরিয়ে আছে একখানা লোহালা বাড়ী। সে বাড়ীখানার আসলে কি-রকম তা বুঝবার যো নেই, তবে তার অস্তিত্ব জানা যাচ্ছে, এইমাত্র!

সেই বাড়ীখানার সামনে এসে পদশব্দ আবার থামল। একটু পরে দরজার উপরে ঘোরে ঘোরে করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। কিন্তু তার উত্তরে বাড়ীর ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার করাঘাতের শব্দ—এবারে আরো উচ্চে, কিন্তু বাড়ীর লোক তবু নিরুত্তর।

অতি ধীরে ধীরে ফুটল কে বললে, "বাড়ীতে কে আছেন, আমাকে দয়া করুন!"

ঝিম-চাওয়ার এমনি ডাকাডাকির পরে, খোড়লার একটা জানলা বা দরজা খোলার শব্দ হ'ল। তারপর ভীষণ মোটা গলার আওয়াজে শোনা গেল—"কে রে?"

নীচে থেকে যে দরজায় করাঘাত করছিল, ঝিমিয়ানো আবার শুরু করে সে বললে, "দরজাটা দয়া ক'রে খুলে দিন।"

—"না, না, দরজা-টরজা খোলা হবে না, এখান থেকে বিদেয় হ'।"

—"দোহাই, আমি ডাকাত নই, গুণ্ডারা আমাকে তাড়িয়েছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, দয়া ক'রে—"

—"তবুও হবে, আর অমনিই হবে, এখান থেকে পথ দেখ বাবা, পথ দেখ! তারা তোকে তো এখানে পাঠায় নি, যারা পাঠিয়েছে তো এখানে ডেকে, তাদের কাছে যা!"

—"আমি আর এক পা চলতে পারছি না দোহাই, দরজা না খুললে আমি মারা পড়ব!"

আসল নয়। ইহা ঘটনার পরিচয়পত্র মাত্র। এই সমস্ত উপন্যাসগুলির যা মূল্য তাহাদের নয়। কিন্তু এগুলি যে অসংখ্য সংখ্যায় এই উপন্যাসের বিবর্তনের একটি ইতিহাসে এক সময়ে সমস্তটুকুই ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহাদের তালিকা (Daniel Deronda) আমরা উপন্যাসটির শেষাংশে পাই। তালিকার ইহাদের পরিচয়ের সহিত এক বিশেষ ইহার বর্ণিতের আছে, কিন্তু তাহার কম আকর্ষণের নয়। সে ভোজের আসরে আমন্ত্রিতবর্গের; সমস্ত সমাবেশটা সে আসরী, এবং সে আসরে আমরাও উপস্থিত এক দৃষ্টিতে বিশ্বী সুন্দরীদের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মধুর মাদকের আবেশে বসিয়া আছি। এই তালিকার নাম বীরত্ব। বীরত্ব তালিকার ভোজ পড়িয়া, আমরা তালিকার মূর্তিতে পাই যে, সে বীরত্বে অবসান। মুইবেন বিভিন্ন কাহিনীগুলি আমরা তালিকা তালিকা করিয়া ইহাদের আমরা বিশেষত বিশেষত উপন্যাসিকের ভাবে যে আমিত্ব পরিচয় দেয় সে ইহাদের নয়, আমাদের নয় এক বিশেষী পরিচয়ের। ইহার আর বিশেষত ভোজ আমরা পরিচয় না। তাহার এই একটি আলোচনা উহার উপন্যাসের আলোচনার বিশেষ ভাবে একটি আমরা আমরা আমরা তালিকা যে তালিকার তালিকার উপন্যাসিকের আমরা আমরা পড়িয়া পরিচয় হইবে।

তালিকাগুলির ভোজ ভোজ আমরা উপন্যাস আমরা আলোচনা করিয়া হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। উদাহরণ Resurrection আমরা উপন্যাসের আমরা পরিচয়ের পরিচয় তালিকাগুলির 'বিচার' আমরা আমরা পড়িয়া যাই। ইহাতেও তিনি তালিকার ভোজিয়াদের আমরা ভোজন তালিকাটির একজন আমরা তালিকাগুলির, একজন আমরা আমরা তিনি বিচারক আমরা আমরা, আমরা উপন্যাসে একজনের আমরা আমরা ও আমাদের ভোজন আমাদের তাহা আমরা আমরা—তালিকাগুলির আমরা আমাদের এই তিনি পরিচয় আমরা। উদাহরণ উপন্যাসের আমাদের আমরা তিনিদের মূর্তির পরিচয় আমরা আমরা আমরা তালিকাগুলির আমরা আমরা, তাহা আমরা আমরা আমর

চিত্রণ—শ্রীসমরজিৎ কর, ইন্ডিয়ান ফোটো সিন্ডিকেট, কলেজ-স্কোয়ার—কলিকাতা।
মুদ্রণসজ্জা—শ্রীকমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ১৩৬ আহীরীটোলা স্ট্রীট—কলিকাতা।

—"আমাই পড় আর যেতেই থাকো, তোমা তবুও কিছুতেই বুঝবে না! আজ রাত্তিরেই এখানে লুকিয়ে থাকা বিপজ্জনক, আমার তোমাকে ছেড়ে এসে ফাঁসাতে পড়ি আর কি—যাও, যাও, চলে যাও এখান থেকে!"

—"ঘনাই!"

আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। যার জন্যে আলোচনার পর পথিক ছদ্মবেশ ধরে চুপ করলে।

এবার সন্তর্পণে খুব আস্তে আস্তে নীচের দরজার একটা কপাট খুলে গেল, তারপর হারিকেনের লণ্ঠন হাতে ক'রে একটি নারী-মূর্তি অত্যন্ত সন্তর্পণে সেখানে এসে দাঁড়াল।

লণ্ঠনের আলোতে স্ত্রীলোকটি লক্ষ্যে দেখলে, তার সামনেই রাস্তার উপরে একটি মৃত দেহ হাত দুটো ছড়িয়ে শুয়ে আছে, তার মুখ আর মাথা-কাপড় রক্তে একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে!

চোখে আলো পড়তেই যুবক চমকে মুখ তুলে চাইলে; তারপর সে কি বলবার উপক্রম করতেই স্ত্রীলোকটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিতে বললে—চুপ!

যুবকের বিস্ফারিত মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল!

স্ত্রীলোকটি হাতছানি দিয়ে তাকে ভিতরে আসতে বললে।

যুবক অনেক কষ্টে ব্যথা-ব্যথা হেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর মাতালের মত টলতে টলতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকল,—তাকে দেখলেই বোঝা যায়, রক্তপাতে তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে।

স্ত্রীলোকটি নীচুস্বরে আবার দরজা বন্ধ করলে। তারপর এক হাতে লণ্ঠন, আর এক হাতে যুবকের হাত ধ'রে চুপি চুপি বললে, "আসুন।"

কয়েক পা অগ্রসর হয়েই সে যুবককে নিয়ে পাশের একটি ঘরের ভিতরে ঢুকল। তারপর দরজা বন্ধ ক'রে চুপি চুপি বললে, "আপনি চুপ ক'রে বসুন, আগে আপনার তোয়ার সেরে নেবি!"

ঘরে কোথাও যুবকের মাথার,—সেখানে গভীর এক ক্ষত এবং তাহাতে তখনো রক্ত ঝরছে।

স্ত্রীলোকটি তখনি তার ক্ষত মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলে। তারপর তার জামা ছাড়িয়ে তাকে একখানি পরিষ্কার কাপড় দিলে, বস্ত্র-পরিবর্তনের জন্যে।

সে যতক্ষণ তার সেবা করছিল, যুবক কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। যুবক দেখলে, মেয়েটির বয়স হবে বোধ কি পঞ্চাশের, তবু উজ্জ্বল শ্যাম, মুখখানি যৌবনের চাঁচা সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল করছে। তাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে ভদ্র পরিবারের মেয়ে, কিন্তু এমন জায়গায় সে এল কেমন ক'রে, মেয়েটিই বুবকের কাছে রহস্যময় ব'লে মনে হ'তে লাগল। যখন এ বাড়ীখানি মটেকোঠা, আর তোয়া-বাথানের এ-রকম দশ বাড়ীতে যে তোয়ে জাতীয় জীব বাস করে, যুবকের কাছে তাতে অজানা ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটি যে পতিতা নয়, তার যুবক হৃদয়ের বিশ্বাস তখনই যেন সে কথা স্পষ্ট ভাষে প্রকাশ ক'রে দিয়েছিল।

এতক্ষণ পরে মেয়েটি আবার কথা কইলে। বললে, "কে আপনাকে এমন ক'রে মারলে?"

যুবক বললে, "জানিনা। বাথোম থেকে বাড়ী ফিরছিলুম, তোয়াদের বাড়ীর কাছে অন্ধকারে কে যে আমার মাথায় লাঠি মারলে, কিছুই বুঝতে পারলুম না। তারপর জ্ঞান হয়ে যতক্ষণ যে রাস্তায় প'ড়েছিলুম, তাও বলতে পারি না। আমার পকেটের টাকাকড়ি কিছুই যাবার কি, যেমন যা তেমনিই আছে মনে হচ্ছে।"

মেয়েটি বললে, "আপনি আর আর বেশী কথা কইবেন না। রাতে আর আর লোকও বেরিয়ে আর নেই, কাল সকালে বাড়ীতে যাবেন।"

যুবক কৃতজ্ঞ স্বরে বললে, "তুমিই আজ আমার প্রাণ বাঁচালে। এ উপকার আমি জীবনে ভুলব না!"

মেয়েটি বললে, "ও-সব কথা এখন থাক্, আপনি শুয়ে পড়ুন, আমি খাবার জল তুলিগে যাই।"

—"এখানে তোমার আর কেউ আছেন?"

—"যা অনেক দিন আগে স্বর্গে গেছেন, মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"

—"তোমার নাম কি?"

—"উষা। নিন্, শুয়ে পড়ুন।"—এই ব'লে উষা হারিকেনের আলোটার সিখে হাত বাড়াল।

তার হাতের দিকে চোখ পড়তেই যুবক চমকে উঠল। মনের ভিতরে একটা গভীর সন্দেহ নিয়ে সে বললে, "তোমার হাতে ওটা কিসের উল্কি? দেখি, ওটা দেখাও!"

উষা তার বিপরীত হাতখানি যুবকের দিকে বাড়িয়ে দিলে। যুবক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

না,—আর কোনই সন্দেহ নেই! যুবক মনে মনে বললে, এ তারই হাতঘড়ি—যে লোকের মস্তকের পশ্চাতে যারা আছে, তার উপরে যোয়া করেছে তারই নামের আদ্য অক্ষর!

—ক্রমশঃ

তোমারই হিয়াখানি

স্বরলেখ—কাজী

আবেশ-বিভোলা অতীতের রাতগুলি
তখন বীণার তুলেছি সহজ তান,
জোছনা নিশীথে সুদূর হইতে ভাসিয়া এসেছে উদাস বাঁশীর তান।
দূর হতে তার বাঁশীটি-খানি লয়ে
হিয়ার তন্ত্রে কি মন্ত্র গেছে গাহা,
বিভোরি বিভোরি বিরোল বিবশ হয়ে
তুলিয়াছি তারা মৃদু ঝঙ্কার-গাহা।
অয়ি-মধুর তুমি নাই বেন বাঁশী—
"তোমার—তোমার—তোমারি এ হিয়াখানি।"

মলয় পবনে আসন্ন ঊষা মৃদু
ঘরিয়া এনেছে অনুরাগ সংগোপ,
নীড়ে বসি পাখী গাহিবারে সুমধুর
আমারে দুয়ের মুখর আধ সাধ।
মৃদু কোরাকুর অলি গুঞ্জন গানে
মৃদু কাননে জেগেছে মৃদু আশা,
লাল দুয়ে দুয়ের সে মাঝারে
শুনেছি কোমল আবেগের মৃদু ভাষা।
অয়ি মধুর তুমি নাই বেন বাঁশী—
"তোমার—তোমার—তোমারি এ হিয়াখানি।"

বিরহ নিশীথে সুদূর পথের পানে
অনিমেষ চোখে চাহে মুগ্ধ-চখ,
তত তপনীর তারা-মুখর তানে
তার মূর্ছনা ভাসিয়াছে অনিবার,
দূরত পরশ ঘনায় তন-প্রাণে
তোমারেই করে তার-বাঁশীটির ধ্বনি,
তুলেছি উদাস অতল সন্ধানে
বিরহ-কণ্ঠে মধুল আগমনী।
অয়ি-মধুর তুমি নাই বেন বাঁশী—
"তোমার—তোমার—তোমারি এ হিয়াখানি।"

পাষাণ-বক্ষ বিদারিয়া ঝরঝর
ঝরিবারে তুলেছি নির্ঝর জল-লোল,
সিন্ধুর প্রেমে পাগলিনী তরতর
ধাইবারে সেই বহু সুদূর-রোল;
দূর সাগর গভীর গরজনে
দেখেছি পড়িতে বেলাভূমে আছাড়িয়া,
তুলেছি তখন মূর্ছার তরঙ্গে
বিজনী তটের হৃদিরে প্রথম ছিয়া।
অয়ি-মধুর তুমি নাই বেন বাঁশী—
"তোমার—তোমার—তোমারি এ হিয়াখানি।"

শিশু-কণ্ঠের তরলীর আধ তানে
তখন আনি' ঈষলয় মৃদু ভাষ,
শুক-মুখের তীর্ণের আধ-গানে
পরমাণে আনি' ভরে' দেছ মৃদু-ঘ্রাণ;
যা' কিছু তথায় নির্মল মধু-তান
সব ভুলে যেন আনি এ অনিয় করে,
ফিরে যুক এই যে আহ্বান,
যেন মধুমিয়া মুখনে কি আছ আছে।
অয়ি-মধুর চির সাধক বাঁশী—
"তোমার—তোমার—তোমারই হিয়াখানি।"

ভারতীয় শিল্প-কলার জন্ম

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

আত্মাভিমানী-দৃষ্টির অধীন আত্মসম্মান (দৃষ্টি-অধীন selfhood) অবশ্যই একটি বড় বন্ধন হোক না কেন, তিনি সেটাকে ও ছাড়তে রাজি নন; তিনি একেবারে মুক্ত নিজ-অস্তিত্ব চান তাঁর। কিন্তু-তবু তিনি, তাঁর কাছে সেটুকু অসম্পূর্ণ। সেজন্যে তাঁর উপায়।

তিনি একটা বিরাট পরাধীন মূর্তি ধারণ করেন। সাগরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই রূপান্তর সম্বন্ধে তিনি বলছেন—

.....তখন আমি,
সেজন্য তার লবণাক্ত ফেন-মাখানো ঢেউ আমি;
সেই-তরঙ্গেরই বক্ষে দুলতে থাকি যেমন করে
যায় সে তোমার দিকে। আমার মনের বাঁধন হলো।

কিন্তু কেন? মধুর আনন্দের একটি তিক্ত-তীব্র আস্বাদও তাঁর কাছে ধরা দেয় এই বলে তিনি প্রার্থনা করেছেন—

সমুদ্রের বেদনার সাথে
তোমার হৃদয়ের সুর,
তরঙ্গ-ভঙ্গের দুঃখ যার
দুঃখে ভরেছে দুর।
তোমার প্রেমের মধু যদি
করে আমায় দুঃখ,
তাহলে তখন বলি যেন
বুঝি সে আমার।

এই যেন আত্মাভিমানী দৃষ্টির সামান্য সংকোচ। আমার আত্মসম্মান নষ্ট না হোক প্রেমাস্পদের নিকটে কি তার চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা। সাগরের সঙ্গে মিলন তাঁর কাম্যছিল। সেজন্য তিনি দুঃখ সহ্য করেছেন। সাগরের সঙ্গে মিলনে তাঁর যে সুখ আকাঙ্ক্ষা ছিল তা তাঁর কাছে 'আমার আমার আমার' রূপে উদ্ভূত হয়ে ফুটেছিল। তারপর সাগরের সঙ্গে তাঁর যে অখণ্ড মিলনের অনুভব তাতে আমার আর তার যে কোন ভেদ আমাদের কল্পনাতে পর্যন্ত রেখাপাত করে নি। এমনকি তাঁর কাছে তাঁর নিজের অস্তিত্বের কোন বিশেষত্ব ছিল না। সে সেখানে তখন ও আমার তখন সমস্ত পূর্ণতা অনন্তের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে, এমনকি নিজেকেও না হারিয়ে সেখানে মুক্ত হয়েছে।

• অধিক সময় আমি—তা। মনস্ তিনি আমার। তার মধ্যে একটা অপূর্ণ সেতুর ভিত্তি পাকে পূর্ণতাকে যে সেতুর দ্বারা হবে সেতু সেই।

Oh, expand thyself! Move swiftly!
Be a cloud that shoots lightning and
sheds a flood of rain!
Let the ocean sue for thy storms as
a beggar.
Let it complain of the straitness of
thy skirts.
Let it deem itself less than a wave
And glide along at thy feet!
(Asrar Khudi)

পূর্ণতার সঙ্গে নিজের যেন সবটা মেলানোর আকুল আগ্রহ। যাঁর যা থাকলে আমার সেই আমার আ-আমার মুক্ত নিজে নিজের সমস্তটা হারাবেন। আমার প্রেমের যেখানে যেটুকু অপূর্ণতা সেটুকু পূর্ণ করতে হবে। অপূর্ণ আমার আমাকে আমার মধ্যে রেখে এ হয় না। কিন্তু এ যদি আমার নিজের নেওয়া নেওয়া! আত্মসম্মান এ অপূর্ণতার জন্য। এই আত্মসম্মান ও আত্মাভিমানকে আমি একসঙ্গে আত্মাভিমানী-দৃষ্টির মূল বলি।

আত্মসম্মান কি? আত্মাভিমান আমার কি? নিজের অস্তিত্বকে নিজের যেমন আ-আমার মুক্ত ও পূর্ণতার যেমনই আমার। যেমন নিজের যা আমাদৃষ্টি যা ওর ওর এর উপরে যেটা আমার। "আমাকে যেই আমি"—নিজেকে আমি ঈশ্বরের কৃপায় যেই আ-আমি হয়ে আমাদের আমি। অস্তিত্ব নিয়েই টানা। প্রেমের আমার নিজের পূর্ণতা ও আমাদের নিজে নিজে। আমার আমি আমাদের প্রেম নিজের যেটা আমি ওকে ওকে আমার আমি হয়। কিন্তু আমার! আমার যে প্রেমাস্পদকে নিজের আমি আমি আমাদের আমি হয়ে নিজের আমি আমি আমি আমি। আমাদের আমাদের আমি আমি আমি আমি—আমার আমাদের আমি আমাদের আমি আমি ও আমাদের আমি আমি। কিন্তু আমি নিজে আমি আমি। আমাদের আমাদের আমিদের নিজেদের নিজের আমি আমাদের আমি আমি আমি। আমাদের আমি আমি আমি আমি

—এখানে আর একটা ভাবনার আছে হয়ে। আমরা এ আলোচনা নিয়েছি আমরা কবি ; সিদ্ধান্তটা সেজন্যে এই ভেবেই আমাদের অনুসন্ধিৎসা কেন আমরা শেষ করে।

শিলার-ই-লিপি—আমি কেন অভিনিবি—এ ভাবনা আছে, এখানে আছে। আমাদের এই ভাবনা আমি আমরা নেবো। আমাদের সঙ্গে এর কিছু আলোচনা আছে।

আমরা এখানে আমাদের-দৃষ্টির ইতিহাস পরিচয় নিয়েছি। এর আগে যে আমাদিগের ভাব আমরা ইংলিশের একটি (৪১) ভাবনা এর আলোচনাটি এখানে পাই। সেখানে 'আমরা' নিয়ে—নিয়েছে আমরা।

কিন্তু আমরা আলোচনার আগে আমরা একটা কথা আমাদের।—এটি কেন ? আমাদের আগে এর আমরা আলোচনা। এতে কি আমাদের আমাদের পাবে না ? আমাদের আলোচনা আমাদের আমি না, আমাদের আমাদিগের নয়। আমি আমার কিছু কথা আমাদের আগে আমি যে আমাদের-দৃষ্টির আগে আমি আমাদের এখানে আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের। এর আমাদের আমাদের আমাদের আমাদের

কোন কোন ভাষা এমন বিষয় ও ভাবের লেখিকা। কবির ব্যক্তিত্বের অনুভবের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তারা কবিতার আড়ালে নিজের এই লেখিকা সত্তাকে কিছুই না ব্যক্ত করে। লেখিকার 'বিষয়' কি লেখক,' কবিতা 'এইরকম' কি লেখক' এসব আলোচনা অনুপযুক্ত। আমাদের বিশ্বসাহিত্যের 'সাফো'র কথা লেখিকার কথা কিংবদন্তীর মত বিশ্বাসের যোগ্য। কিন্তু অনুবাদের পর কবিতাদের 'বিষয়' কি লেখক' এসবের উপর নির্ভর করে 'সাফো'র লেখিকা সত্তা কবিতার মধ্যে আমরা কতটা পাই। 'হেলেনা' ও 'ব্রহ্মবাদিনী' আমাদের কাছে দুটি কবি আধুনিক আমাদের এই দুই মহাকাব্যের যে লেখিকা। দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তাদের আমরা পাই। কিন্তু এই দুইজনই আমাদের যে লেখিকা-ব্যক্তিত্বের অনুভবকে কবির ভাষা কবিতার পরিবেশটাই মনকে আচ্ছন্ন করে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন লেখা কবিতার ভাষা লেখার ও বিশেষভাবে কবিতার ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা। উদাহরণ 'মেঘ মল্লার' গানের অনুবাদ কবিতাটি। মূলভাষা কবি লক্ষ্মেশ্বরের যে অংশ তাদের দুটির ভাষা কবি কবিতার ভাষা এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—

নৈঋতকাননে নবিত্রি নিশি কাজল কলি রে।
ঘনঘোরি দেখরে যে যে মুকুলায় আজ;
পলাশ কবিতা যাই মরমে লাগ রে;
মরিল আমে ভরল লাজ বিরিহি তেজ রে

এইরূপ বিশ্বাসের বিষয় ভাষার কবিতাটির কবির Leonora নামের একটি ভাষায় কাব্যের নাম কবিতা হয়। কবি ভালবাসিতে পারে এই পরীক্ষা William and Helen নাম নিয়ে একটি ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কবিতার আমরা দেখি যে কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যের ভাষার পুরোপুরি এক অনুভবকে পুরোপুরি ধরিতে পারে নাই। এক ভাষার বিশেষত্বের যে মেই পুরোপুরি পার্থ অন্যভাষায় আনয়ন করা যায়না কিন্তু মূলের কোন্ত কবিতা। কবির ভাষে কবি, ভাব ভেব, ভাব ভাব, ভাব ভাবের, কবিতার কবিতা; কিন্তু পুরোটা একটি অন্যরূপ কবিতা হয়, এমন কি ভাবের মূল পরিণত ভাব কবিতা ভেদ কবিতাটিও হয়। ভাবের কবিতাদের অনুবাদটি একটি বিশিষ্ট ভাবের একটি কবিতা ভাবের ভাবের ভাবের

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর মুখপত্র

[সচিত্র মাসিক পত্রিকা]

দ্বিতীয় বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৩, [দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক— শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, বার-এ্যাট্-ল.
ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

সহ-সম্পাদক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

মন্ত্রণা-পরিষদ

শ্রীসরলা দেবী বি-এ, অধ্যক্ষ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ, ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পি-এইচ্-ডি,
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর,
ডাঃ শ্রীমেঘনাথ সাহা ডি-এস্-সি, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

পরিচালক
প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী
উত্তরা অফিস, লক্ষ্ণৌ।

কলিকাতা অফিস
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲] [প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা

উত্তরার সূচি

কার্তিক, ১৩৫০

সম্পাদক :—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীরামানন্দকমল মুখোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক :—শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী

লেখ সূচি

বড়দা বনাম ছড়দা—শ্রীমালা দেবী

ছন্দ (গল্প)—শ্রীবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার জীবনীর ভাষ্য—যামকৃষ্ণানী বহু ১১৮

লাক্ষাগারে মূলুক—শ্রীঅনিলকুমার ভাদুড়ী ১২৪

অন্ধকার (কবিতা)—শ্রীবাণিলাল রায় ১৩৬

অজন্তা (গল্প)—শ্রীঅভিজাকুমার সেনগুপ্ত ১৩৮

আমোদ-আহ্লাদে—অমলাদেবী ১৪৬

তুমি ও আমি (কবিতা)—কীটদেব ১৪৯

প্রবাসী-বাঙালী :—

(১) দেশবন্ধুর অভিলাষ—শ্রীশৈলেশনাথ বিশী ১৪০

(২) প্রবাসী-বাঙালী ও এ-দেশবাসী—
শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন ১৫১

(৩) বিহারে দুর্গোৎসব—শ্রীবাসিনীকান্ত সোম ১৫৬

নিদান (গল্প)—শ্রীনিতাইবিনী দেবী ১৫৮

সমবায় :—

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোগের কবিতা
শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন ১৬৬

সঙ্গীত ও সমাজ—শ্রীবিজেন্দ্রনাথ সাহানা ১৬৯

বৈষম্য (উপন্যাস)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৭৯

রোমান্স (কবিতা)—শ্রীজ্যোতিরলাল মজুমদার ১৭৯

ভ্রমণ :—

(১) যাত্রা-পথে ভাষার কথকিতা—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮১

(২) বন্দের বাহিরে নবা-বন্দীয় কলাশিল্পী—শ্রীঅনিল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬

(৩) যাত্রাপথে ও ঘরোয়া—ডাক্তার শ্রীবেদেবনাথ সেন-গুপ্ত ১৮৭

ঠিকানার দুর্ঘটনা (গল্প)—শ্রীকল্পনীপ্রসন্ন গুপ্ত ১৯৮

অন্ধকূপের অন্ধকারে (উপন্যাস)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ২০১

আমরণী :—শ্রীবাসিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

(ক) সাইমেরীর উপকারিতা বৃদ্ধির উপায় ২২৬

(খ) ডাবরবরং ও জলাশয় ২২৯

(গ) এদের কেই ২৩০

দুইটোনা (কবিতা)—শ্রীবতীন্দ্রমোহন বাগচী ২৩১

'উত্তরা' বনাম প্রতিবাদ—শ্রী— ২৩৪

চিত্র-সূচি

বড়দা (রঙিন)—শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ বর্মা সূচনায়

অমর প্রাসাদ—অমৃতসর ১১৬

অমরের অপেক্ষা প্রতীক্ষায় ১১৭

সদুতা উদ্যানে ১২৯

সাঞ্চেরীয়ারের জৈন-মন্দিরের প্রবেশ-মূর্তি ১৩১

অমরের অমর-বিয়োগাদি মন্দির ১৩৩

হাওয়া মহল—অমৃতসর ১৩৫

কাশীরে বিজয়ার দৃশ্য :—

(১) জল-সমাধীর পথাশ্রমে যাই

(২) সখা-সঙ্গে প্রতিমা-বিসর্জন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কার্যের সুবিধার জন্য এখন হইতে "উত্তরা কার্যালয়" ৪৬এ৮ কেদারপুরা, কাশীধামে—এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হইল। এখন হইতে চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন, টাকাকড়ি, তেজ সমস্ত উক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য। লেখকদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি 'উত্তরা'-সম্পাদক সঙ্ঘে—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

—কর্মকর্তা, উত্তরা।

উত্তর।

[illegible]

দ্বিতীয় বর্ষ কার্ত্তিক ১৩৩৩ দ্বিতীয় সংখ্যা

বড়তা বনাম জড়তা

শ্রীসরলা দেবী—কলিকাতা

যেন্টর ভাগ লোকের বড়তা জড়তাতেই চাপা পড়ে যায়। যতক্ষণ ঘরে ঢুকে ঘরে থাকে, আপনাতে আপনি জড়তরত, নিজের ঘরকন্না খাওয়া-পরা নিয়ে-থৈমিত্তিকেই সন্তুষ্ট। যেমনি আর দশটা জায়গায় যোরে, দশটা লোকের সঙ্গে মেলে-মেশে—অমনি বাড়া যায়, জড়তা ভাইতে আরম্ভ হয়।

ঘরের থেকে বাইরে বেরোলে একটা কিছু করার তাড়না আসে। সে করার তাড়নাটা আর কিছু নয়—নিজের ভিতর যে করণগুলো সম্ভাবনা আছে তাকে ফুটিয়ে তোলা। তাড়নাটা কখন বা বাইরের থেকে, কখন ভিতর থেকে হয়। বাইরের তাড়নায় প্রায়ই সাধের চেয়ে সাধ্যে কম পড়ে যায়। খানিকটা ওঠার চেষ্টা করেই আবার বসে পড়তে হয়। ভিতরের তাড়না নিজ-সাধ্য ঠেলে অতিক্রম করে একটা কিছু করে তোলার জন্য শক্তি বর্দ্ধিত করতে করতে সার্থকতার পথে অগ্রসর করে।

ভারতবর্ষের বড়তাও এতদিন জড়তায় চাপা পড়েছিল। দেশবিদেশ বিচরণে মন বাড়া পেয়েছে—এখন সে উঠছে। প্রথম প্রথম বাইরে থেকে তাড়া এসেছিল, বিদেশী মিশনরীরা আমাদের দুয়োরে এসে আগাতে গিয়েছিলেন, আমরা নিজেরা যেতে চাইনি। তখন ফলও সামান্য হয়েছিল। এখন ভিতর থেকে তাড়া এসেছে, কেননা নিজেরাই বেরিয়েছি, দেখেছি শুনেছি অনেক। এখন নিজের ভিতর থেকে সার্থক হবার যা কিছু দেখে উঠেছে,—আর শুধু গা-ঢোলা দেওয়া নয়, ঘুম ভাঙা-ভাঙা নয়। এবার ভারত উঠে বসেছে—নিজের ভিতরকার বড়তাকে বাইরে ফুটিয়ে তুলতে হবে—কাব্যে-সঙ্গীতে, শিল্পে-সাহিত্যে, জীবনে-কর্ম্মে, ভাবে-কর্ম্মে

আমি আমাকে দেখতে পেয়েছি বড়র মধ্যে, কিন্তু ফোটাতে হবে নিজের ভিতর দিয়ে। আজ দেশ-দেশান্তে ভারত নিজেকে দেখছে—তাই জড়তা কাটিয়ে নিজের ভিতর থেকে বড়তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

জন্ম

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

রাজপ্রাসাদের শোষণ বঞ্চে ছোষ-মন্ত্রির বিদ্যা স্বপ্নেও স্থান পায় নাই। মাটির হাঁড়ির মধ্যে একটা শব্দ বাহির আসিয়া প্রতীপসানি বিরাইয়া যেত। ছিপ-মাসার একটি মূল বাজারে উঁচিয়া বিদ্যা ছিপ-আসন মাটির স্পর্শ পাইত।

প্রভাতে রাজাধিরাজের একটি বিশেষই আবৃত্তি হইয়া থাকিয়া যাবে। সকল চক্ষু তাহার কাহাকে যেন খুঁজিয়া বেড়ায়। দীর্ঘ অমল দিবস রাজের পর, উপরাসে কাটে। রাজ-মন্ত্রিদের মুখ-চুনে তাহার বিদ্যা-মন্ত্রের গভীর ছাপ মুদ্রে। তাহার পরে বিশে শৈশবের মত পুরুষ-খেলার মূর্তি। অপরাহ্ণে রাজক-মন্ত্রিকাপ মাঠে খেলিয়া বেড়ায়। সে যেন তাহার মুখে বহুদূরের পরিচিত সুর কুসে। বিড়াল্যায়ী তাহার কাছে খেলিয়া জিজ্ঞাসা করে, তোমার সে, সে কোথায়? প্রতি সন্ধ্যায় সে মন্ত্রিতের জন্য অপেক্ষা করে। প্রতি রাত্রি তাহার অভিমান-কান্নায় চক্ষু শুকতারার মত জল-জল করিতে থাকে। শুকতারা মিলিয়া যেত। আজ ভোরের বাতাসের সহিত তাহার অঙ্গে অঙ্গে এ কি পুলক মাখিয়া দেওয়াইতেছে!

অন্তরায় উঁকিয়েছে রাজপুর। দেশনায়ক বহু-মন্ত্রণা করিয়া বন্দী। পাঁচ তাঁহার দেশ, ভোরের জ্যোতি তাহার ভাল। তিনি কর ভোগে আসিবেন। ভরিয়া হইল রাজধানীতে বিদেশ ভাকনা শুরু হইয়াছে। রাজপুরের তাহার সংবাদ পৌঁছিয়াছে। দূরে রাজপথ হইতে রাজার অশ্বের ঝংকার শুনা যেত। উহার অবয়বসহ বিশ্বটে আসিতেছে, অতি নিকটে, কি ভয়াবহ অর্থপূর্ণী ভোগোহন! এক-নিশাস রাতে লইয়া যে একজন রাজা-মৃত্যুর যান খুলিল। রাজপ্রাসাদে দেশনায়কের মৃত্যুর তখন এলাইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতার অন্তোৎসবে দেশময় শোক-সভা হইল।

নগরে গভীরতা। রাজপথ নির্জন। দূরে দূরে জনতার রোল উঠিতেছে। অন্তরায় তখন মুহূর্ত পুরুষে কোলে লইয়া মাতা প্রায় উন্মিতেছেন। রাজপথের সুচিভেদ অন্ধকার ভেদ করিয়া যে প্রতীপহরে বীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। দূরে দূরে সকলেই শিহরিয়া উঠিল। রাজে ঘোষণা করিয়া যে জানিল, 'মুক্তির আসান'। মাতৃ-কোলে শিশুটির জীবন তখন অনন্তায় হইয়াছে।

নির্জন প্রাসাদে রাজপথ অন্তরায়কে আহ্বান করিল। রাজীর করুণ বিলাপ ধ্বনিয়া নিশাচর পাখী ককণ স্বরে চীৎকার করিল। অদূরে মন্ত্রিদের শেষ আরতির বাজনার সহিত মিশিয়া তারা অন্তরায়কে আরও অন্যমনস্ক, নির্জন করিল। উষ্ণ ভোরের কণার হইতে

একটি উষা আকাশের বুকে তাঁর আলোকস্নানটি বুলিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে এ-পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

সহরের বস্তিতে বিয়ন হইয়াছে। অন্ধকারী পরিবারে একখানির ছন্দা অনশনে কাটাইয়াছে। শিশুরা কাঁদিয়াছে। স্ত্রী পুরুষকে অনশ বলিয়া গালি দিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে। সন্ধ্যায় আসিয়া খবর দিল, মজুরী বাড়িল, কাজে চল। আনন্দে আহ্লাদে ঘুমাইলো খুব ভোর চলিল। তাড়িখানার পাশের গলিতে যাহারা রাত্রে দলে দলে দাঁড়াইয়া থাকে। মানুষের অনন্ত ক্ষেত্রা তাহাদিগকে আশিপথে বিদিয়া সমস্ত রাত্রি উৎসব করিবে।

এমনিই দৈনন্দিন দিনের পর দিন পরিশ্রম করিয়া তাহারা সমস্যার মীমাংসা পায় নাই। গভীর রাত্রে পথের অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় তাহার মনে হইল, সমাধান মিলিয়াছে। পথাবাসে করিয়া তৎক্ষণাৎ সে আশ্রয়-বসন লইয়া বসিল। কি আশ্চর্য! সবই কি তাহার উত্তর মস্তিষ্কের খেলা! সমাধান কোথায়? প্রত্যুষে কাজের প্রারম্ভেই দৈনন্দিন অতি সহজে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ফেলিল।

নিরাশ-তাপিত বিরি-প্রবেশে ক্ষুধা মরা নাহিয়াছে। উপরওয়ার নির্জন প্রাণে দেখার বলের দিন বিরিয় আজি ফুটিয়াছে। কাঠুরিয়ারা দলে দলে আসিল। আশ্রমে মন পুরিল। বুলিবার ঠাকুরের আশ্রমে দেখার গাছগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হইল। বনের কলাবলি বোঝাই করিয়া কাঠুরিয়ারা অনশনে ফিরিয়া গেল। ঈশ, বনস, প্রাণের সব আশায় বয়া আসিল। কিন্তু বুলিবারায় দেখবার মন আসিল না। অনন্ত: কুমারের মেঘ হইতে অনন্তা আশা অন্তরাত্ম পথে উঁকিয়া আসিয়া দেখিল, এখানে এবার বীজ বোনা হইবে না। আকাশচারী দেবতাদের পরিবর্তে উলো মানের মন ফোনা হইতে আসিল! পঞ্জাব-প্রান্তে ইন্দ্র বুলাদেশ তখন আমন্দে প্রভাত-সূর্যের কিরণে জল-মল করিতেছে। তাবাল মানবগণ এক সাথে গুরু লইয়া উপস্থিত হইল। কি ভিক্ষাটন! এমন সজল-নীল খুশ, এমন পরাণ ফেন ইহারা ক্রয় করিতে চাহে। খুশন যোড়শি-বেলায় কুমুদন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইহলীলা সংবরণ করিল।

সমবয়সের মাটি কঠিন, শুষ্ক, রুক্ষিম। বর্ষা বাড়িপাতে কৃষ-উদ্যোগিত হয়ার নাই। অবসর হইতে অন্ধের মাঝে অনেকটা অবাপাতা উঁড়িয়া আসিয়া মাটিতে আস্তর লাভ করিল। অতীত যৌবনের মৃত মিলনগুলিকে পাইয়া মাটির মাঝির অন্তর হইতে গভীর দোকোচ্ছ্বাস উঠিল, 'মানুষ, তুমি ফিরে যেয়ো। হায়, আমার কি করিলে!' মাটির নিষ্ফল বেদনা আকাশের অন্তরালে ওমরিয়া উঠিল। বিবিবিকে ঠাণ্ডা কম্পন তুলিল। বিরাজ অভিমানে তাহার আরোগ্যিতিকে, সমুদ্রমন্থনে লেলিহান জলরা বিস্তার করিল। বৃষ্টিকণে অনন্তা মরম, হায় তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনলীলা নাশ করিল। জলদল আবার উঠিল। আবার 'মরম' বলিল। মাঠে মাঠে মানুষ আবার তাহার ফেরা-বেচা সুরু করিল। মৃদু তাহার প্রতিবিম্বের সুখ-দুঃখে ফলোদয় হইয়া উঠিল। কিন্তু আশিত বন্ধী সেই তাজা মরাটার খোঁজ খুঁজিয়া পাহে নাই। মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষুধায় সে শিহরিয়া, কাঁপিয়া উঠে। তখন কুমারের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ফোলপাড় উপস্থিত হয়, মৃদা মাটির মানুষ আবার মৃত্তিকে বিলায়।

আমার অতীত জীবন

রাসসুন্দরী দেবী—সাগরদাঁড়ি

"বধূ বিদুষকোঽয়ং তথা করোমি।"

পাঠকগণ যাঁহারা জনুসুন্দর গল্পের অমর জীবনকাহিনী পড়িয়াছেন, তাঁহারা উক্ত কবিবরের জোষ্ঠতাত দত্তবাবু জয়নারায়ণ দত্ত-চৌধুরীর কথা অবশ্য মনে রাখিয়াছেন; কারণ, তিনিই সাগরদাঁড়ির দত্ত-বংশের সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠাতা-কারী। তিনিই আমার শিতামহ দেব। তাঁহার প্রথমা পত্নী যশিদা বয়স পঞ্চাশ হইলে, দ্বিতীয়বার যে পত্নী গ্রহণ করেন, সেই পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র, আমার পিতৃদেব ৺ জানকীনাথ দত্ত-চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

আমাদের কপোতাক্ষ জেলার খ্রীধরপুর গ্রামের জমিদার ৺রামধনী বসু আমার মাতামহ দেব। আমার জননী শ্রীমতীসুন্দরী পাঠকগণ দেবী তাঁহার আটটি সন্তানের মধ্যে সপ্তমবিধা।

অতি বাল্যকালে (তখনকার প্রথামত) আমার মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ হয়। বিবাহকালে পিতৃদেবের বয়স বাঁশার, মাতৃদেবীর বয়স পাঁচ বৎসর।

আমার মাতার চারিটি মাত্র সন্তান হয়। দুইটী পুত্র, দুইটী কন্যা। প্রথম, জগদম্বোহন দত্ত-চৌধুরী, দ্বিতীয়, প্রসন্নমোহন দত্ত-চৌধুরী, তৃতীয় মনোমোহিনী, চতুর্থ আমি—রাসসুন্দরী সর্বকনিষ্ঠা।

আমার বয়স চারি বৎসর পূর্ণে আমার সহোদরা কলেরা রোগে মারা যান। কন্যা বিয়োগে মা কন্যা শোকাতুরা হন। সেই জন্য আমার জন্মাবধী ঠাকুরাণী এবং দুই বিধবা মাতৃস্বসা, আমার মনের সুখের জন্য একটি কন্যা হইবার জন্য ঠাকুর দেবতাকে অনেক "মানসিক" করেন।

১৮৭১ সালে ১৩ই মাঘ রাত্রিকালে, মাতুলালয় শ্রীধরপুর এ অভাগিনীর জন্ম হয়। দেবতার কৃপায় সেই কন্যা জন্ম লওয়ায় আমার পিতামহ, এই বিবেচনায় আত্মীয়গণ যাহাতে আমাকে আদর করেন এবং "মেয়েটিকে উপরে" ও আমার আদর-যত্ন হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর মেয়ের অদৃষ্টে ইহা ঘটিয়া থাকে।

আমার ভূমিষ্ঠ সংবাদ দূর হইলে আমার জন্ম দেবতার পূজা ও ৺ব্রতিষ্ঠাকুরের পূজা দেওয়া হইয়াছিল। শিশুকালে আমাকে "অভিমানিনী" বলিয়াই লোকে আমার নামকরণ হইয়াছিল।

আমি মায়ের নিকটে বড় থাকিতে পারিতাম না; বাবার কাছে থাকিতেই ভালবাসিতাম।

ছেলে ভুলানো শক্তি আমার খুব বেশী ছিল। নানা ছড়া গান গাহিয়া, গল্প বলিয়া, খেলা শিখাইয়া, সোণা পাখীদের খেলা দেখাইয়া আত্মীয়দিগকে একান্ত বশীভূত করিতাম। "আমাদিগকে" দেখিবার জন্য, পাড়ার এবং গ্রামের অনেক শিশুই বাবার কাছে আসিয়া থাকিত।

যখন আমার জ্ঞানের উন্মেষ হইল তখনই আমি দেখিলাম, আমার বাবা—আমার অধিষ্ঠাত্রিকা মাতা ঠাকুরাণীর ও জ্ঞানস্থানীয়দের লইয়াই নিমগ্নমান থাকেন। বৈষয়িক কার্য প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে ভাব-কার্যের সীমা পাছে অতিক্রম হয়, এই আশঙ্কায় তখন যদিও বাবা বিষয়-কার্যের প্রতি উদাসীন হইতেন। তখন কর্তাঠাকুরদিগের প্রতি বৈষয়িক সমস্ত কার্যের ভার দিয়া তিনি জ্ঞান-কার্যালোচনায় নিরত থাকিতেন। ইহার ফলে বাবার অনেক ভূ-সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল। অবিলম্বে আমার ভাবুকতাপূর্ণ বৃদ্ধিবলে, আমার মাতুল মহাশয়দিগের আনুকূল্যে সেই সম্পত্তি আবার উদ্ধার করা হয়।

যাহা হউক, আমি অতি বাল্যকাল হইতে আমার

মাতা-পিতাকে দাদার পুরুষ-প্রকৃতি অথবা পুরাণের শিব-পার্বতীর মতই দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাবা পুরুষ-পাঠ, পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনা, শিবপূজা, পুরুষমহিলাদিগের বিরুদ্ধে পুরাণ পাঠ, বালিকাদিগকে সদুপদেশ দান এবং বিদ্বানদের সহিত ক্রীড়া এই সব করিতেন। আর মা ভাণ্ডারঘরটিকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্ব-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, পূজার উপকরণ তোলা, দামোদরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, গৃহধর্মে অসাধারণ নৈপুণ্য, এই সব করিতেন। বাবা মা দুজনেরই অসাধারণ স্নেহ বড়ই প্রবল দেখিয়াছি।

প্রায় প্রতিদিন বিকালে বাবা পুরুষমহিলাদিগকে পুরাণ শুনাইতেন, বালিকাদিগকে সদুপদেশ দিতেন। বাবা বলিতেন, "মিথ্যা কথা বলিও না, পরের জিনিস চুরি করিও না, কলহ করিও না, কখনও মুখরা হইও না"—ইত্যাদি। আমি সকলের ছোট; সকল কথার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু কথাগুলি আমার খুব ভাল লাগিত।

আমাদের বাহিরের বাগানে একটী বড় বকুল গাছ ছিল। আমি সকাল বেলায় সাথীদের সহিত মিলিয়া ফুল কুড়াইতে যাইতাম। একদিন আমাকে ফেলিয়া সাথীরা আগে গিয়াছিল, আমি আসিবার সময়ে দেখি, গাছে এক সিপাহীর পুত্র। তাহা দেখিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে, সময় উপর দিয়া অন্য পথে বাড়ী আসিলাম। আসিয়াই কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাকে বলিলাম, "মা! আজ আমি ফুলের জন্য গিয়াছিলাম!" মা আমার চোখের জল মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া ফুলের (সেখানে যা)?" আমি বলিতে পারিলাম, "আপনি ঐখের ফুলের গাছে যাওয়া করিয়াছেন, আমিও ফুলের যাই না; আজ তাহার উপরে একটা গরু ছিল বলিয়া ফুল নিয়া আসিয়াছি।"

"ফুলের" বিষয়ে মার অভিজ্ঞতা দেখিয়া মাতা কি ভাবিলেন জানি না; আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা, ভাল পথে যাওয়া-আসা করিও।" মাতা সেই দিন হইতে আমাকে লেখা-পড়া শিখাইতে মনোযোগ করিলেন।

আমি মাতার কাছে, আমার দ্বিতীয় মাতার পাশে বসে এবং আমার এক দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম। ঐবার আমার শেষ হইলেই দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হইবে।

দ্বিতীয় ভাগের মুক্তাফল পৌঁছ মুখস্থ হইবে বলিয়া মাতা আমার শ্রদ্ধেয় মাতার করিয়া কথা কহিতেন। মুক্তাফল পড়া শেষ হইলে আমাদের বাড়ির বাহিরে বালিকা বিদ্যালয় হইতে আসিল। আমি দ্বিতীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কথামালা লইয়া পড়িতে ভুলে চলিলাম। আমার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ দুই মাসের ভুলে শেষ হইয়াছিল—এজন্য মেজোঠাকুরমার মাতা কিছুই বলিলেন না।

বিদ্যালয়ে যাইবার সময়ে মাতার আদেশ হয় ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপায় আমি খুব শীঘ্র শিখিতে লাগিলাম। কিন্তু হাতের লেখার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতাম না। পণ্ডিত মহাশয় আমার পাঠের বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়াই হউক, আর মাতার আদরে মেয়ে বলিয়াই হউক, আমার লেখার জন্য বা অন্য কোন কারণে আমাকে কোন দিন কঠোর শাসন করিতেন না।

এই সময়ে আমি ঘরে বসিয়া মাতার পুস্তক সকল অর্থাৎ কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্র, রত্ন-পার্বতী-মঙ্গল প্রভৃতি পড়িতাম আর পুরুষদিগের অনুকরণে, বাবা, মা, দাদা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের উদ্দেশে কবিতা পত্র লিখিতাম। সেই সকল পত্র সাথীদিগকে পড়িয়া শুনাইতাম; সে লেখা এত অশুদ্ধ, যে অন্য কেহ তাহা পড়িতে পারিত না।

আমার মাতা স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তখন তিনি আমাদের মাতুলালয়ের একটিমাত্র কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন এবং মাতুল মহাশয়দিগের নিকট হইতে ভবিষ্যতী ভাষা-জ্ঞান শিক্ষা করিতেন। তিনি সেখান হইতেও আমার মাতৃভাষার লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি আমার মাতৃভাষাতে নীতি-শিক্ষা, সুশিক্ষার উপাখ্যান, গৃহকথা, কুলবধূ-চরিত, ঈশ্বর প্রতি উপদেশ প্রভৃতি পুস্তক পাঠাইয়া দিতেন। আমার জ্যেষ্ঠ মাতৃভাষা ও অন্যান্য সহযোগীরা সেই সকল পুস্তক পাঠ

করিতেন। বিদ্যার সময়ে আমাদের অন্তঃপুরে বিলক্ষণ বিভীষিকার সঞ্চার হইত। আমার দিদিমা মাতৃভাষায় বাক্‌-যোগিনীর ভাবিতেন ছিলেন। উক্ত পরিচয়ের যথা বচনা দেখিয়া তাঁহাকে সত্য সত্য রচনা করিতেন। এই সব দেখিয়া আমারও "রচনা" করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত। কিন্তু উঁহারা কি বলিতেন, এই লজ্জা ও সঙ্কোচে সে ইচ্ছা আমি প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

আমার মনে হয়, একদিন আমার এক মাসীমাকে লিখা একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "আমাকে আমার কাছে দে, আমি তোকে খাম লিখিয়া দিব।" আমি তাহা দিলাম না, অতি বিজ্ঞের মতো সেই খাতা এবং দোয়াত কলম লইয়া তাহার সাহায্যে করিলাম "লাইব্রেরীর উপাখ্যান।" গল্পোপন্যাসের "অনুকরণ" নামগুলি শুনিয়াই "লাইব্রেরী" নাম আমার মাথায় আসিয়াছিল। কিন্তু সে লাইব্রেরী "পুস্তকে" কি লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার আর মনে নাই। খেলা হইতে খেলে যে সব উপকথা শুনিয়াছি, তাহারই এক "সংস্করণ" করিয়াছিলাম। তাহা হইতে সেই লাইব্রেরীই আমার প্রথম রচনা। মনে হয়, তাহা গদ্য। তাহার পর আমি পদ্য রচনার প্রবৃত্ত হইলাম। বাড়ীর লোকে শুনিতে পাইলে আমাকে টাট্টা বিদ্রূপ করিবেন, আমিও রচনা করিতেছি, এরূপ আশঙ্কা কখনো শুনিলে তাহারা কি বলিবে, এই সব ভয়ে একটা গোপন করিয়াম। তখন আমার বয়স সাত বৎসরের অধিক নহে। সে সব রচনার অবশ্য মাথা-মুণ্ড কিছুই ছিল।

আমি গান শুনিতে বড় ভালবাসিতাম। গান শুনিতে শুনিতে আমার মন এত আকৃষ্ট হইত যে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। উপকথা শুনিতেও আমি ঐ রকম ভালবাসিতাম। যাহা আমাকে উপকথাচ্ছলে রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শিখা দিতেন। যাহার কথকতা যোগিন্দ মামা, পুরাতন কৃষ্ণা মুখুয্যে, মা এবং আরও অনেকে খাঁটি উপকথা বলিতেন। আমি উহা অত্যন্তরূপে শুনিতাম। তখন আমার মন বড় সরস ছিল, তাহাতে কোন বিষয় শুনিলে আমার হৃদয়ে তাহার ছাপ পড়িত। বাড়ীর কাহারও কোন অসুখ হইলে আমি আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার শুশ্রূষা করিতাম; তাহার পুরাতন কৃষ্ণা আমার মুখপানে চাহিয়া বোল আনি উহার ভার আমাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইত।—কেন না মানুষের সাংসারে সবচেয়ে কাহিকে আমার লজ্জা করিত এইরূপ প্রবৃত্তি বশতঃ উপকথার "লোক" কিম্বা কোন বিষয় শুনিলেও আমার প্রাণ বড় আকুল হইত। অভিমন্যুর মৃত্যু-কথা শুনিয়া, রাজপুত্রের সিন্ধুবনে রাক্ষসে খাইল শুনিয়া, অথবা "চাঁদ-সা"কে গরল জলে গোড়াইল শুনিয়া আমি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতাম; অনেক পর্য্যন্ত মনে মনে সেই বেদনা অনুভব করিতাম। সেই জন্য যাহা বিশেষ করিয়াছিলেন, যেন কেহ আমাকে ঐ রকম "দিয়োনাক" উপাখ্যান না শুনায়।

আকাশে মেঘোদয় হইলে আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। আমি জানিতাম, উপকথায় যাহাদের কথা শুনি, সেই সব লোক এখন স্বর্গে গিয়া ঐ মেঘের ভিতরে ঘর-বাড়ী করিয়া আছেন। কোন মেঘ দেখিয়া ভাবিতাম, ঐ নীলমণি রাজার বাড়ী—উহার মধ্যে কন্যা, প্রতীহার প্রভৃতি আছেন; কোনও মেঘ দেখিয়া ভাবিতাম, উহা শিবিরাজের বাড়ী—উহার মধ্যে দেবতা উহাকে খেলনা দিতেছেন; কোনও মেঘে, রাজা বিক্রমাদিত্য বসিয়া সভায় বসিয়া আছেন, এই সব কল্পনা করিতাম। আমার এই কল্পনা সাথীদিগকে বলিতাম, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। আমিও সত্য বলিয়া ভাবিতাম।

এই সময়ে অর্থাৎ আমার যখন যখন আট বৎসর তখন আমার স্মরণশক্তি প্রখর হইয়াছিল। পড়াশুনা, ভাগবত, মহাভারত, শিশুবোধ ব্যাকরণ, এই সকল পাঠ্য গ্রন্থ অতি সহজে আমার মুখস্থ হইয়া যাইত। ইহাতে তখনও ভাল ছিল না।

আমি তাহার জ্যেঠামহাশয় বলিয়া উপকথা রচনা করিয়া গাহিয়া শিখিতাম। সেই খেলা দুই একজন বালক দেখিয়াছিল, আমাকে বলিয়াছিল, "ইহা তখনও তোমার

হলো না"—আমার বড় রাগ হইল, আমি ইহার পরে পড়া বন্ধ অর্থাৎ উপরকথা যাহা লিখিবার, তাহাকেও দেখাইবার না, মাকেও জানিতে দিলাম না। একদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া দেখিলাম মায়ের হাতে আমার পড়ের খাতা। আমি লজ্জা, সংকোচ, আরও কি জানি কি "অদ্ভুত" ভাবে হেঁট হইয়া গেলাম—আমার কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু মা বড় স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! এ সকল কার রচনা?" আমি মায়ের আদেশে মিথ্যাকথা বলিতে না, অথচ ভয়ে ভয়ে হইয়া বলিলাম, "আমার রচনা মা!" মা বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমাকে বুকে টানিয়া লইয়া খুব আদর করিলেন। মা বিশ্বাস করিলেন, আমাকে ঠকান যায় না, ইহাতে আমি বাঁচিলাম।

যে খাতার জন্য আমার বুকের ভিতরে এমন মারামারি হইতেছিল, তাহার ভিতর রচনার দুইটি ছত্র মাত্র আমার এখন মনে আছে, তাহা এই :—

> মাঘ মাস গেল ভাই ফাল্গুন আসিল,
> উপরের পত্রে সব রচনা লিখিল।

গত রচনাতে একটি নমুনা দিয়াছি, "এক রাজ-কন্যার বাগানে এক খাঁচা পাখী আছিলাছিল, তাহার কথা হইতে রাজ-কন্যা একটি পাখী ধরিয়াছিলেন; তাহার গায়ের রং লাল, মমুহ, বসুমে আর কালো। এমন সুন্দর পাখী কেহ কখনও দেখে নাই; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটি বাদুড়!"

এই রচনা দেখিয়া আমার আত্মীয়াগণ হাসিয়া পরস্পরকে দিখাইয়াছিলেন, আমি তখনও অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম; সৌন্দর্য্যের যে উপমা "বাদুড়" হওয়া যে এত হাসিবার কথা তাহা আমি ঘোটেই বুঝি নাই, তখন "বাদুড়" আমি তখন ঘোটেই দেখি নাই।

যাহা হউক আমার পত্র রচনা দেখিয়া মাতা বলিলেন—"মা! তোমার পত্র বেশ হইয়াছে। এখন হইতে প্রত্যহ যাহা নূতন দেখিবে, তাহাই একটি পত্র লিখিয়া আমাকে দিবে"—আমি বড়ই উৎসাহ পাইলাম।

ইহার দুই একদিন পরে মাতার দৈনিকখরচের খোলা খাতের উপরে দেখাইয়া আমার তৎকালোচিত বুদ্ধির হিসাবে এক নূতন সুত্র বেলিলাম। সে কবিতাটি এই :—

আমাদের এক প্রতিবেশিনী "সখী বেলিনী"র মাথায় কিসের একটী ফোস্কা ছিল, লোকে তাহাকে "সখীর কুয়া" বলিত। তখন শ্রীমতীকাল, সে ফোস্কার জল শুকাইয়া সেখানে একটু কুঁজ মত হইয়াছিল, একটী কাকী তাহা খাইতেছে দেখিয়া সখী সে কাকীকে খুব গালি দিতেছিল। কিন্তু কাকী তাহাতে বিন্দুমাত্র মনোযোগ করিল না দেখিয়া ছোট একখানি লাঠি দিয়া তাহাকে তাড়াইতে লাগিল। ঐ প্রকার দেখিয়া আমার মুখে এমনি যোগাইল। আমি ঘরের ভিতরে গিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাতা! আজ কথার কুয়াকে কি বলিতে হয়?" মাতা বলিলেন, "কূপ বলিতে হয়।" তখন আমি হাতে আসিয়া কবিতা লিখিলাম।

> "জল শুকাইয়া কূপ হয়ে গেছে যাই
> কাকীতে খেতেছে তাহে জল তাই তাই;
> আসিয়া সখী বেলিনী মারে বাঁটা পাটী,
> মোর মনে হয় মাতা, তার মাথ ফাটি।"

এই কবিতা মাতার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া আমি দৌড়িয়া পলাইলাম। একদিন শুনিলাম, মাতা তাঁহার বন্ধুদিগের কাছে বলিতেছেন, "আমার ছেলেটির উপরে মা সরস্বতী কৃপা করিবেন এমন ভরসা হইতেছে; আমার ছেলে এই বয়সেই কবিতা রচনা করিতে শিখিতেছে।" তাঁহারা কেহ কেহ বলিলেন, "আপনাদের ঘরে তো মা সরস্বতীর কৃপা আছে আছে হইয়া থাকে।" *

মাতা পিতামহ হইতেই আমাকে গীতমুক্তাবলিকে গান করিতে শিখা দিতেন এবং বিদ্যালয়ে কথা করিতে

* উদাহরণ স্বরূপ নমুনার অন্তর্গত গীতে কবিতাটির উদাহরণ আমার এক প্রতিবেশীর পরিবারের বর্ণনা দিয়াছি। আমাদের ঘরে আমার ছেলে ছেলে কবিতা-পরিচালনার ছিলেন। আমার পিতৃদেব মুর্খাক্ষর, বিদ্বান, ধর্ম্ম-কর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। (অভিধান) আমার আশ্রয়ে কবিতা-পটি যে উদাহরণ আমার দিয়াছে।

বলিতেন। সেজন্য বাবা, বৌঠা, বৃদ্ধ ও বিদ্যুৎবিদকে দেখিলে আমি যথোপযুক্ত ভাবাবেগের উদ্রেক করিতাম। সেবার যখন অভ্যাস হইল, তখন আর "বাবার আশীর্বাদ" বলিয়া এবং ; ঠাকুরী বা বিদ্যুৎ দেখিলে আমার জন্য সহানুভূতি-পূর্ণ হইত। তাহাদের জন্য মনে মনে পরমা, কাপড়, চাউল প্রভৃতি প্রার্থনা করিতাম ; আমার মা চিরদিনই দান করিতে মুক্তহস্তা ; আমাদের [illegible] সেই সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।

আত্মীয়দিগের অবাধিক যত্ন আদর পাইয়া আমার স্বভাবে একটুখানি দোষ জন্মিয়াছিল। আমি একটু বে আবোধ হইয়াছিলাম, প্রায় বলিলেই চলে। পূর্ব হইতে, সেজন্য আমি বড় "একগুঁয়ে" হইয়াছিলাম ; যাহা বলিতাম, তাহা করিয়া ছাড়িতাম। প্রায় সকল বিষয়ে ঐ রকম ছিলাম। সহজে কেহ আমাকে কখন শাসন করিতেন না। কদাচিৎ আমার ব্যবহারে অধৈর্য হইয়া মা এক একটু কড়া কথা বলিতেন, কিন্তু বাবার কাছে আমার সাতখুন মাপ ; আমার সেই বিরক্তিকর আবদারের বাবার কাছে খুব আদরের জিনিষ বোধ হইত। সেই জন্য কেহ আমাকে একটু বকুনি বা তিরস্কার করিলে আমার বড়ই অভিমান হইত। • আরও দোষ ছিল, আমি "ঘোরালোভাবে" পালিয়া বলিয়া লোক-ব্যবহার বুঝিতাম না—আমার আবশ্যক বুদ্ধির অভাব ছিল। সেজন্য কত দুষ্ট লোক আমাকে ভাঁওতি দিয়া আমার খেলনা চুরি করিত, কত রকম চাতুরী করিয়া আমার জিনিষ করিত, আমি কিছুই বুঝিতাম না, পরে মা কর্তৃক তাহাদিগকে ধমকিতে বলিতাম। আরও এক দোষ ছিল, আমি মুহূর্তে কিছুই বুঝিতাম না—বিশ্বিতাম না ; আমার মা, মাতৃভাষায়, শিশুশিক্ষা, বি, চরকা প্রভৃতি যেরূপ ধীরে ধীরে আমাকে এক একটি জিনিষ বুঝাইয়া দিতেন, সেরূপ আমাকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই। আমিও সেজন্য কাহাকে কখনও বুঝাইতে চেষ্টা করি নাই। এক শ্রীশিবের চরণে ভিন্ন আর কোনও কাজে মনিবার আসিতাম না।

আমার দাদা প্রবাসে থাকিতেন, তাহা বলিয়াছি। এক মাত্র অঞ্জলা বলিয়া তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন বটে, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধিক আদরে আমার "সবজান্তা ভাব হইল" বলিয়া অনেক সময় আমাকে বিশেষ শাসন করিতেন। তাঁরা বাড়ী আসিলে আমি "চোরের" মত হইয়া থাকিতাম। সকলের চেয়ে তাঁহাকে বেশী ভয় করিতাম।

আমার পিতামহ সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঁচ-ছয় মাইল দূরবর্তী কিসানগঞ্জনিবাসী। সেখানকার বড় মহাশয়েরা বন, মাল, বিদ্যাবত্তা এবং লোকহিতৈষণার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার এক পিতৃব্যের দুইটি কন্যা ঐ বড় মহাশয়দিগের গৃহে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। আমার সেই পিতৃব্যের কনিষ্ঠা কন্যার কার্যোপলক্ষে একদিন আমার সেই পিতৃব্য[illegible] বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজনকে দেখিয়া আমার মাতৃদেবী, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, নিজ আত্মীয়া করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। তখন সেই সূত্রের ধরিয়া আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন।

এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া হিতাকাঙ্ক্ষী প্রায়ুক্ত অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব এই বিবাহ যাহাতে [illegible] হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] ইচ্ছার প্রতিকূলে মানুষে কি করিতে পারে? আমার মাতা-পিতা, ভ্রাতৃবর্গ, মাতুল প্রভৃতি আত্মীয়দিগের নিকটবর্তিনীরে, বাবা তাঁহার জ্যেষ্ঠের কন্যাকে মহাসমারোহে পূর্বক, ১৮৭৯ সালে ঐ মাস আসিয়ে, সেই অনোদীত গ্রামের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

"বিবাহ" অর্থে হিন্দু-সমাজের ব্যক্তিবিশেষের এক অত্যন্ত-পূর্ব ভবিষ্যৎ-বাক্যে ঘোষণা করা হইয়া থাকে। সেখানে বর তাহার ভাগ্যে সুখের সম্ভাবনা, না দুঃখের অসম্ভাবনা উপস্থিত হইয়া থাকে! ভবভূতির ভাষাকে সমস্ত বলিয়াছেন, আমি যে মাতা-পিতার সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের স্নেহ ও সুবিবেচনার সহিত বলিয়াছেন, আর আমার মাতা এবং আত্মীয়-বন্ধু যাহারা আমার সেই বিবাহের অত্র আমার স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সদাশয়তাকেও সহিত বলিয়াছেন। মাতা আমাকে সেই বালিকা বয়সে যাহার হাতে দিয়াছিলেন তিনি যাদিক, ভবভূতি, সংযত, সুধীল ও ভবিষ্যবান।—আমার মনে হয় আমি কোন প্রকারেই তাঁহার যোগ্য পাত্রী ছিলাম না!—তার পরে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু হইবার অনুকূল বয়সের ছিল আমাকে যদি কোন ঈর্ষ্যাচারী, অসহিষ্ণু, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়িতাম, তাহা হইলে আমার দুঃখের সীমা থাকিত না।

মাতা বিবাহের ফলে আমি তাঁহার স্নেহের মর্ম বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। তখন, বাবু, আমোদ-আহ্লাদের মত তাঁহাকে মেহ, দয়া ও শুভাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সহজপ্রাপ্য বলিয়া আমি তাঁহার বিশেষত্ব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার প্রতি আমার মাতা-পিতার একান্ত আদর ও যত্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতাম; তাঁহাকে খুব সমঝ করিতাম, বিদ্যালয়ের শিক্ষকে ছাত্রী যেমন বিনীতা, আমিও তাঁহার কাছে সেইরূপ বিনীতা থাকিতাম। আমি যে কবিতা রচনা করিতে পারি, এ কথা আমাকে তাঁহার কর্ণ-গোচর না হয়, সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতাম। তিনি উহা জানিলে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইব, ইহাই আমার ধারণা ছিল।

বিবাহের সময়ে চারি পাঁচ দিন শ্বশুরালয়ে গিয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, মাতা প্রভৃতি নূতন আত্মীয়দিগের স্নেহই আদর পাইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। তখনও আমার লেখাপড়া চলিতেছিল। বাবার বৈঠকখানার বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাকে পড়াইয়া যাইতেন। আমি যাহা বলিতে পণ্ডিতেই সেই বিষয়ই অগ্রসর চলিয়া যেতেন; অন্য কোন বিষয়ের কাছে আমাকে আর পড়িতে দিতেন না। তখন আমি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতাম।

যেদিন বয়স বছরে পড়িয়াই অর্থাৎ বারো বছরে উত্তীর্ণ হইয়া যায় আমাকে দ্বিতীয় বার শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল। আমার এক-ঠাকুরমী এবং অভিভাবিকা অন্য কারো সেখানে যাওয়া নাই, সেই জন্য তা আকুল হইয়াছিলেন। মার আকুলতা দেখিয়া ঐ সকল দোষ পরিহার করিব—অন্তত আমার শ্বশুর বাড়ীতে কেহই আমার ঐ-সকল দোষের পরিচয় পাইবেন না ইহা আমি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম।

আমার শ্বশুরালয়ে গিয়া দেখি, তাঁহারা বৃহৎ পরিবার। তাঁহাদের বাটীর মধ্যে একটি ছোটখাট বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। একজন অতি সচ্চরিত্র আত্মীয় শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ীর এবং পাড়ার প্রায়বয়স্কা মেয়েরা সেখানে পড়া-শুনা করিত। তাহার মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিতাও ছিলেন। আমার শ্বশুর শ্বশুর পত্নী-বিয়োগ প্রভৃতি এক শোকবিহ্বলতার কারণে একান্ত অসাবধানী ছিলেন। • তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় আমার শ্বশুর পরিবারে, শ্বশুর পরিবার অপেক্ষা মৃদু-শিক্ষা বিশেষরূপে হইয়াছিল। মেয়েদের মধ্যে পরিচ্ছদের উন্নতি দেখিয়া ছিলাম। বিলাতী মহিলাদিগকে বিদ্যালয়গুলিতে আনিয়া মেয়েদিগকে দেখাই বিধান হইত। আমি দেখিলাম আমার প্রাচীনা শাশুড়ীরাও চশমা চোখে দিয়া মহাভারত, রামায়ণাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। বাড়ীতে মাইনর স্কুল, সোসাইটি ছিল। এ-সব আমার সেই মেয়েগুলা শ্বশুর ঠাকুরের ঘর ও চোখ হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম দেখানটা আমার ভাল লাগিত না। আমার পিতার সেই স্নেহ-ভবন—সেখানে আমার শুধু মাতা-পিতার প্রাণ-ভরা স্নেহ, মাতা ও ভ্রাতৃ-ভগ্নিদিগের যত্ন-আদর, পরিচারিকাদিগের প্রীতি, সকলেরই আত্মীয়তা-পরিপূর্ণ আবাস, সেই সুখে ফিরিয়া যাইবেই ইচ্ছা যাইত।

• শ্বশুরবিয়োগ পর। তিনি বৃদ্ধই বয়সিছিলেন।

তার পরে সেখানে অনেক লোক ছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃতিও নানা রকম। আমাকে "অদ্ভুত জীব" দেখিয়া অর্থাৎ আত্ম-গোপন করিতে অক্ষম, ছলনা-চাতুরীতে অনভ্যস্ত এবং মুখ-চোরা অপদার্থ, এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া অনেকে হাস্য-বিদ্রূপ এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল আমি বলিয়া নহি, বহু-মুখের অনেক বাণিজ্য মাত্রেই এইরূপে "বাদর" হইতে হয়।

যাহা হউক ক্রমে ক্রমে আমাকে বিনীতা ও আজ্ঞাবর্ত্তিনী দেখিয়া গুরুজনেরা আমার প্রতি সদয় হইলেন। আর আমার তখনকার সরলতা ও কবিত্ব মিশ্রিত অকৃত্রিমতা দেখিয়া নবলতা প্রকৃতি সমবয়স্কারা আমাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন। এখানে আমি এক-গুঁয়েমী ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলকে প্রসন্ন করিতে এবং মুখচোরা মিটিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার জ্যেষ্ঠা যাহা শিল্প জানে সুনিপুণা, তাঁহার নিকটে সেলাই শিখিলাম।

তখন পণ্ডিতেরা কলিকাতায় থাকিতেন। ছুটিতে বাটী আসিয়া আমার মেজদাদিদের নিকটে আমার কবিতা রচনার কথা শুনিলেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ এক একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। তিনি যে আমার পরম সুহৃদ, পত্র বাড়ীতে আসিয়া তাহাই আমার বিশ্বাস হইল। অতএব তাঁহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে আমি সময়ে সময়ে অল্প-স্বল্প দিনের বেলায় এক একটি পদ্য লিখিয়া তাঁহাকে "উপহার" দিতাম। এই কাজ খুব গোপনে করিতে হইত। কারণ, তখনকার দিনে এরূপ কাজ বড়ই "লজ্জার," বড়ই "অসভ্যতার" এবং বড়ই "বিরক্তির" বিষয় হইত। যাহা হউক পণ্ডিত মহাশয় বড়ই আনন্দিত হইতেন এবং পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত উহা পাঠ করিতেন। বন্ধুরা সেই কবিতার সুখ্যাতি করিতেন, কিন্তু আমি পাছে সুখ্যাতি শুনিয়া অহঙ্কৃতা হইয়া উঠি, এ-জন্য তাঁহারা সতর্ক হইতেন। পরবর্ত্তী তিনি আমার নিকটে—যিনি আমাদের বন্ধ-মহিলা-কুলের শীর্ষস্থানীয়া সেই "স্বর্ণকুমারী" "ছিন্ন-মুকুল" রচয়িত্রী, সুকবি প্রসন্নময়ী দেবী প্রকৃতি বিদুষী মহিলাদের আদর্শ রচনা শক্তি আমার সম্মুখে ধারণ করিতেন। আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে তাঁহার মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত, কিন্তু তিনি সময় ও সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার নিজের পাঠ্যাবস্থা, সেজন্য অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায়ই থাকিতেন, যে সময়ে বাটী আসিতেন, তখন গুরুজনদিগের শাসনে, লজ্জায় অনুরোধে দিনের বেলায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত না। রাত্রি ১২টা কি ১টার সময়ে যখন শয়ন-গৃহে যাইতাম, তখন আমি পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি আমার অসুস্থতার আশঙ্কায় নিষেধ করিতেন; সেই জন্য তাঁহার কাছে আমার লেখাপড়া হইত না।

—আমাদীবারে সমাপ্য।

রাজওয়াড়ার মুলুক

(জয়পুর)

শ্রীঅনিলকুমার চন্দনবাস—লক্ষ্ণৌ

পূর্ব-প্রকাশিতের পর

এক এক রাজার আমলে এক একটি বিষয়ে বিশেষ উন্নতি বা অবনতি হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

মহারাজা সওয়াই জয় সিং (দ্বিতীয়) অম্বর-প্রাসাদ ও অম্বর রাজধানী ছেড়ে দিয়ে ১৭২৮ সালে পাহাড়ের নীচে এই সহর পত্তন করেন। তারপর তাঁর আমলেই জ্যোতিষ যন্ত্র-মন্দির অর্থাৎ পরিঘ-যন্ত্র, চৌল, যামমন্দির প্রভৃতি বস্তুগুলি বৈজ্ঞানিকের অনুরাগে অনুপ্রাণিত হয়।

চিত্রকলার সময় চতুর্থ বা সিংহ (দ্বিতীয়) আমলেই হয়। রাজপুত কলমের যা কিছু উৎকর্ষের জন্য ইনিই দায়ী। তাঁর আমলে তাঁরা, তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের life-size portrait গোড়িখানাতে রাখা আছে। সেগুলির অঙ্কনশৈলী-প্রণালী একেবারে বিদেশী ধরণের। flat wash তাঁরা অথচ রাজার চেহারা profile outline ও shading এ করে মোর contrast দিয়ে আশ্চর্য ফুটিয়ে তুলেছে। আকবরের ইউরোপের futurism যে contrast-এর আরা ছবি তোলার বাহাদুরী অন্বেষণ-প্রকার experiment করে দেখাচ্ছেন, ঠিক সেই ভিনিসটাই অনুভব সাহস ও সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—শত শত বৎসর পূর্বে রাজপুত শিল্পীরা। এই ছবিগুলিতে যে সব অবয়ব আঁকা আছে সে গুলিকে 'ভাবের ছাঁচে' বলা। অর্থাৎ যেন ঠুক ঠুক ক'রে ছাপিয়ে যাচ্ছে একই-ধরণের এঁটে দেওয়া। সাধারণ মোগল বা অন্য কোন মুঘী চিত্র এবং প্রণালীতে আঁকা দেখতে পাওয়া যায় না। জয় সিং (দ্বিতীয়) আমলে গোড়িখানার চিত্র সংখ্যা খুব বেশী বেড়েছিল। বিভিন্নরঙের পাথর, কাগজের উপর একরঙা রাজনীলার ছবি প্রভৃতি তাঁরই আমলের তাঁরই আমল আঁকা।

এ যুগে একমাত্র রামসিং রাজারই কীর্তির কথা শুনতে পাওয়া যায়। শোনা যায়, তিনি বালকালে এবং পরে লন্ডন এডওয়ার্ডের যৌবরাজ্য কালে যখন রাজ্য পরিদর্শনে এসে কলকাতায় আসেন তখন রামসিং কলিকাতা নগরীতে বেড়াতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি যে যে আশ্চর্য বস্তু Museum, Gas আলো প্রভৃতি দেখেন, সেই সবগুলি তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। জয়পুরের Gas-work, Waterwork তাঁর আমলের কীর্তি। স্কুলে রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সহরটিতে জলসরবরাহ এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তিনি লোকের সে ভুল প্রথম ভাঙান। এ ছাড়া Museum এবং Art school স্থাপন ক'রে দেশের শিল্পকলার এক নতুন দিক খুলে দেন। রামবিলাস বাগান তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি এখানে একটি ছোটখাট চিড়িয়াখানাও খুলেছিলেন। Museumটি Col. Sir S Jacob, R.A Indo Saracanic styleএ design করেন এবং ১৮৮৬ সালে তৈরী হয়। এই Museumএ অসংখ্য ছবির দু খানি নকল দেখানে আঁকা হচ্ছে। তা ছাড়া রঙ্গনাথের চিত্র অনেকটি বড় ক'রে দেখানে আঁকা আছে। নতুন নতুন শিখার সুযোগ এই বিভিন্নিয়ায় আছে। শিল্প বিভাগের স্থাপনা ক'রে ভারতবর্ষের নানান স্থান থেকে ভাল ভাল মূর্তি ও কারিগর সংগ্রহ ক'রে তাদের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তা ছাড়া যে যে বিদেশ শিল্পগুলি তাঁর রাজ্য থেকে লোপ পেয়ে বসেছিল তারও পুনরুদ্ধার করেন। যেমন pottery, lacquer-work ইত্যাদি। জয়পুরের শিল্পের আজ প্রভৃতির উন্নতি এই Art Schoolএর জন্যই সাধিত হয়েছিল। রাজার Art

৩৫ পৃষ্ঠা

School থেকে বাঙ্গালী কারীগর এসে জয়পুরে এই আর্ট বিদ্যের ভাবে প্রথমে খেলায়। লাহোর থেকে কারীগর এসে লোহার উপর রূপার ভাবের কাজ প্রভৃতি প্রথমে খেলায়। সেই সব কারখানের শিল্পেরা এখনও শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তাঁদের প্রায় সকলেরই বয়স এখন ৬০এর উপর। এই সব শিল্পের শিল্পেরা এখন সকলে মোকান ক'রে Curio-dealers দের সঙ্গে পুরিবীর শিল্প-প্রদর্শন প্রভৃতি করেন British Empire এর কারখানের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা না হ'লে কখনও শিল্পকলা বাড়তে পারে না—এ কথা সত্য।

জয়পুর আর্ট স্কুলের কৈফ কথা উপস্থিত হেডমিস্ট্রেস এসে, যখন সেখানের দিকে আমার মন না দিয়ে কারখানার শিল্পীরা নিজেদের উন্নতিপূর্তি করবার জন্যে বিদ্যালয়টিকে "আসর" বা Curio shop ক'রে তুলেছিলেন। আমার হাতে ঠিক এই অবস্থায় খুলটি এসেছিল। যাবতীয় জন্য সব শিক্ষকরা যাতে, তার বদলে ১০টি বিভিন্ন শাখায় ১০টি

জয়পুর প্রাসাদ—জয়পুর।

Exhibitionএ জয়পুরের কারীগরীর বিদ্যের নাম যে বেরিয়েছে তার খোরাক যোগাচ্ছে এই Art School। শিল্পবিদ্যালয়ে শিল্প শেখা হয় না এরূপ কথা অনেকে ব'লে থাকেন কিন্তু আমার মনে হয় এ কথার সত্য নির্ণয়ের করা শক্ত। কেন না যাওয়ার আমাদের চোখের সামনেই দেখেছি Art Schoolএর একজন অধ্যাপী Principalএর যাবাই এটি বড় চিত্রকলার ভেঙ্গে যাওয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ Art Schoolএ ছাত্র তারা (তার তাদের নিজেদের ছেলে বা আত্মীয়দের) শিক্ষা দিচ্ছে। সমস্ত সময় show-roomএ বিক্রির যোগাই তাদের কাজ। আমাকে এই show-room দেখানো প্রথমতঃ বড় কষ্টকর বিদ্যের বোধ হয়েছিল। তারপর তখন ১০০ ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আমার করতে হয়েছিল। স্কুলের বিদ্যাবতী প্রভৃতি সবই আমার নতুন ক'রে তৈরী ক'রে—এর জন্যদের জন্যে নতুন ক'রে স্কুলে হয়েছিল। যারা-বিদ্যে যে কত দেখেছি

তার ইচ্ছা নেই। অর্থনিতির অভাবে সব মাদ্রাসা হওয়ার পর্যন্ত করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর-ইচ্ছায় সব ঠিক সময় এসে গেল। কত বাধির যে দুর্ঘটনার হাত থেকে তা অন্তর্যামীই জানেন। "যোকাবাকি" এই নতুন একটা শব্দ আমি এই কাব্যোপলক্ষে সেখানে প্রথম শুনেছিলুম। বাংলা দেশে এসে "যোকাবাকি" শব্দ শুনতে পাইনি। তার কাছে বিদায় নেবার সময় তাদের মুখেও শুনিনি। বাদশাহ আই স্কুলের আরো পরিচালনার ভার ইউরোপীয় সিনিয়রের অধীন বিশুদ্ধ বাঙালীর কর্তৃত্বে নিয়মের বাঙ্কন থেকে এসে তার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে খুব খাতির করেছিলেন। বলেছিলেন "আপ্ বহুৎ তকলিফ কিয়া হ্যায়—বিলাতসে মেরা হিঁয়াকা কিছু আর দেখতে আয়া।" রাজা তাঁর সম্বৃদ্ধি করবার জন্যে তাঁকে "বাক্সির" অর্থাৎ Dist. Magt. Coll. করে দেবেছিলেন, কিন্তু এই school-এর কোনোরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা থেকে সে যত্ন কাজে যেতে তিনি রাজি হন নি। তিনি যেন রাজদরবারের উচ্চ পুঁথি হয়ে না থেকে তাঁর বাসাবাড়ীতে ছোট করবার

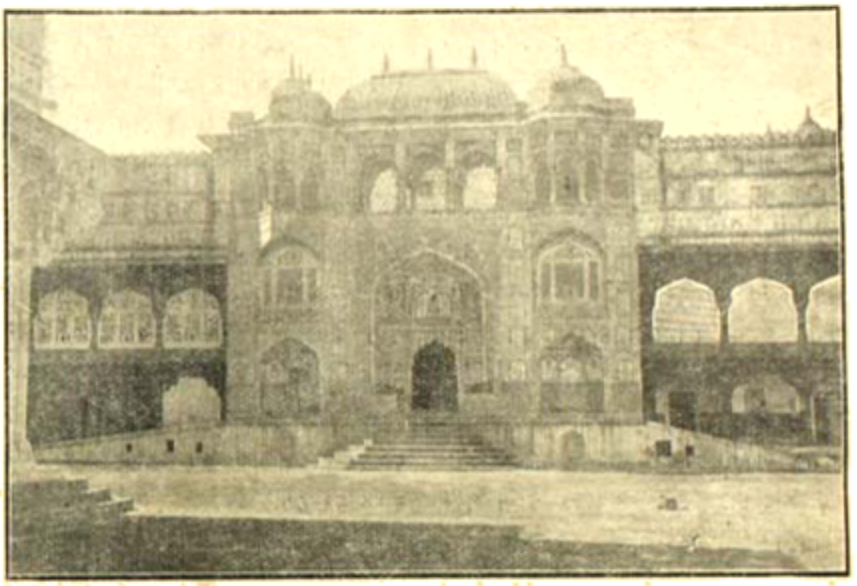

আগ্রার আগ্রা কলেজ।

করেছিলেন। তাঁরা রাজদরবারের সাধারণ স্থানের বাস্তবিক দেখে খুব আশ্চর্যান্বিত হতেন এবং তারই উন্নতির পরিচয় চেষ্টা করতেন কিন্তু পরবর্তী রাজা মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে যে কোনো কোনোরূপে অধ্যক্ষ বিমুক্ত ক'রে বিদ্যালয়ের কাজ চালাতে আরম্ভ করায় এই অবস্থাটা ঘটেছিল। তাঁরা শিক্ষার বিষয়টা না জেনে শিক্ষকদের নিজি ক'রে রাজের সম্পদ্ বৃদ্ধির দ্বারা রাজাকে খুশী করতেন। অনেকে রাজা মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে কখন যান তখন সেখানে কোনো সাহেবের মত অর্থ সংগ্রহ করেছিল। দেশের এর-এর অবস্থাটি যে কতদূর হয়েছিল তা বোঝবার কথা দুঃখের বিষয় সে রাজার ছিল না।

রাজা রাধাপিএর আমলেই (মহারাজা কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রচার হয়। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ে সে দেশের লোক একেবারেই উদাসীন। কলেজ ও স্কুলে বিনাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করেন, কিন্তু কেউই সে সুযোগ গ্রহণ করতে চায় না। তারা দেশের অনেকে পড়তে যেতে চায় না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে দেশ থেকে বিদেশে চ'লে যায় তবু পড়াশুনা অধ্যয়ন যাদেরি করে যা। ব্রহ্মবাদী ভাষা সেখানে উচ্চ ও বিদ্বি আয়ত্তমান স্থান থেকে চ'লে এসেছে।

যাদবিদ্যি কলেজ প্রতিষ্ঠা হ'বে প্রথমে যাদবিদ্যের মুখোপাধ্যায়কে অধ্যক্ষে আনেন তার অধ্যক্ষ ক'রে। তিনি বিদ্যালয়ে যার'ত বৃদ্ধির ধারা থেকে প্রথম শ্রেণীর পদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর বিষয়ে নানান প্রবাদ প্রচলিত আছে। অধ্যাপনা এবিষ্ঠা থেকে রাজা তাঁর উপর খুশী হ'য়ে এবং তৎপর তাঁকে উচ্চপদ দেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ থেকে একেবারে তিনি রাজমন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। বাংলা দেশের সঙ্গে অধ্যুরের সম্পর্ক এই প্রথম হয় নি। এর বহুপূর্বে অধ্যুর নগর প্রতিষ্ঠার সময়ই অভিজাতের প্রধান অমাত্য পরিষদ বিদ্যের কাঠামোটাই বাঙালীদের অনুসরণ। অধ্যুর নগরের নকশাটি পাত্র হিসাবে ঠিক দেওয়া সম্ভব। তা তিনিই তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন। অধ্যুর নগরের আবিষ্কের সঙ্গে সঙ্গেই এই বাঙালী পরিবারের আবিষ্ক করা হয়। এঁর কার্যের নিদর্শন স্বরূপ 'বিদ্যাবতি সরস্বতী' এখনও বর্তমান আছে। তাঁর বাসভবন নগরের নানান স্থানের মন্দিরের পৌরোহিত্য করেন। তাঁরা এখনো রয়েছেন—যাদের এক অক্ষরও জানেন না বা বোঝেন না। এমন বাঙালীর সংখ্যা অল্প নয় প্রায় চার শত। অধ্যুরের কালী পূজো তাঁদেরই ছিলেন। তাঁকে যাদবিদ্য প্রথমে অধ্যুর আনেন। তাঁর বাঙালী শাক্ত পূজারীও আসেন, তাঁরাই সঙ্গে। এখন তাঁরা যে বাঙালী তা' বোঝাবারই আর সম্ভব নয়।

রাজধানীর একটি বিশেষ বিষয় বড় ভাল লাগে। নগরের যে সময়ে যে কাজে অথবা ঠিক তদুপযোগী অঙ্গের পোষাক নগরবাসীদের পরতে হয়, তাছাড়া রাজাও ঠিক সেইরূপ সাজ ক'রে থাকেন। যেমন, বর্ষার নগরের অনেক স্থানে বিশেষ একটি ঘূর্ণে সবাই লম্বা পায়জামা লম্বা জোব্বা পরে নগরে ভ্রমণ। রাজারও পোষাক, পায়জামা লম্বা, তাছাড়া আলখাল্লা, কিরীট পরনা সবই উপযুক্ত লম্বা পায়ায় গঠিত থাকে। শরৎ পূর্ণিমার নগরের ঘরে ঘরে সাদা ধবধবে পোষাক পরে। সবাই যেন বর (বা-বাপ থাকলে পায়জামা লম্বা পরা প্রথা নয়) পরবেন, যারা বৌদ্ধ মন্দিরে পূজিত হবেন। কালী নগরে—কালীপূজার রাত্রে মেলাদি ক'রে হয়—তখন সব কাল পোষাক, রাজার নীলার পরনা ও নীল পোষাক। শ্রমবিরা নগরবাসী (রাজার অঙ্গ-বিশেষ) সবাই লাল বা কমলা পোষাক পরবেন; রাজাও কমলা পোষাক আর মস্তকে চুনির মুকুটকে পূর্ণিত হবেন। এইরূপ সাজ-পোষাকের প্রথাটিতে বিশেষভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর মধ্যে 'খোবিখানা' অভিধান করেন। তাঁরও এইরূপ সব বিভিন্ন এবং সব রঙীন পোষাক যথাসময়ে যথাযথ রীতি অনুসারে ক'রে আসছে। খোবিখানা 'আরত ঠাকুর' ব'লে সকলের বিশ্বাস এবং বারা দেশ থেকে লোকে অধ্যুরে খোবিখানা কর্ম করতে আসেন। রাজা নিজেকে খোবিখানার কেতাদার ব'লে থাকেন এবং তাঁর বাস-পোষাকের বাতি এইরূপ লেখা আছে। খোবিখানাই রাজা এবং রাজা তাঁর কেতাদার অনুসারে রাজা চালান এই ভাব। এক দিকে অধ্যুরের শক্তির উপাসনা চলছে—মহিষাদি বলি চলছে; আবার আর এক দিকে খোবিখানার নিরামিষ ভোগও চলছে—এমন অপূর্ব সমন্বয়ের মত একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এরবলি বন্ধ হওয়ার পর থেকে নাকি অধ্যা দেবী এদিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন এইরূপ প্রবাদ চলিত আছে।

অধ্যুরে লোকে যখন বেড়াতে বা দীর্ঘ করতে যান তখন রাজপ্রাসাদ, 'খোবিখানা' অধ্যক্ষ ও অধ্যাপনী, চন্দ্রবদন, রাজপ্রাসাদ ও আবাসন, বলরাম বিল্ডিং, রাজা মহল এইগুলি বিশেষ ক'রে দেখে থাকেন। নগরের পূর্বদিকে ও উত্তর দিকটি উঁচু পাহাড়ে ঘেরা। এই পাহাড়ের পূর্বভাগে নগরের, উত্তর-পূর্ব কোণে অধ্যুর আর ঠিক উত্তরে নগরকে ঘেরা অবস্থিত। এই ঘেরা থেকে বিস্তারের ঘোল ধারা হয়।

খোবিখানাকে দৃশ্যমান থেকে অধ্যুর-নগর-প্রতিষ্ঠাতা অবধি প্রথম অধ্যুরে আসেন। খোবিখানা ছাড়া নগরদেবীর বাড়ি আছে; আরো নীচে একটি রাজার

যোগাযোগ ওলন্দেজির জন্যে খাল-বাঁধার হুড় আছে। কোনো কোনো উৎসবে রাজা 'রাবেয়ের' সাথে বাইরে নিয়ে যেখানে খান ও উৎসব লক্ষ্য ক'রে থাকেন। এই বাঁধার ওপরের ছাদটা একটি হুদ প্রাসাদের লক্ষ্য আছে—সেটিকে 'রাজকাটোরা' বলে। এটিতে হুদের জল খুব ভর থাকে, বর্ষায় ক'রে ওঠে। কক্ষগুলি সুবীক্ষণে সেখানে বিভিন্ন আওয়াজের ব্যবস্থা আছে।

অন্যের প্রাসাদের বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কেন সেইসব ছবি-লেখা দেখা যায়। অন্যের দেখবার বাকী আছে কেবল নীলমহলের ভবনে তৈরী নিজ ভাব ছেড়ে অনেক ভাল ক'রে আমাদের মনে হয়। আমার দেখা অন্যের অন্য প্রাসাদ আমার কাছে সৌন্দর্য হিসাবে খুব বেশী ভাল লেগেছিল, বিশেষতঃ বর্ষার যখন প্রাসাদের নীচের হ্রদটি ক'রে ওঠে যখন তার বুকে খেয়ে প্রাসাদটির ছায়া প'ড়ে বড়ই মনোরম দেখায়। পাহাড়ের মাথায় এবং পাহাড় দিয়ে ঘেরা থাকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই সুন্দর। একটি প্রাচীন কেল্লার

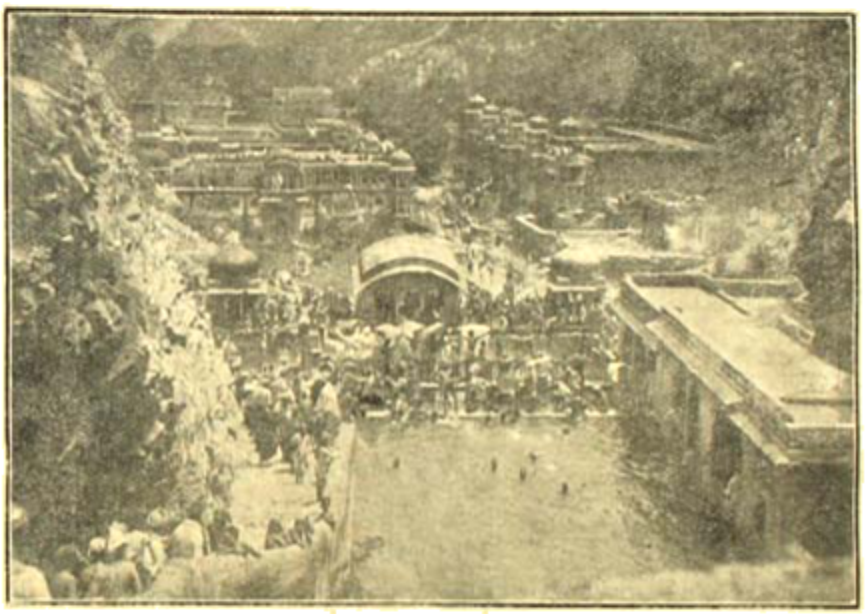

আগ্রা কেল্লা।

না, রাজধানী ইতিহাস-পাঠক বা স্থাপত্যবিশারদেরই এর কথা জানেন। মোগলদের আর সবকার মুখের একটি প্রচলিত প্রবাদ শুনা গেল যে পূর্বে বাকি চল্লিশটি সমস্ত থামগুলি খাল পাথরের তৈরী ছিল। আউরাঙ্গজীব অন্যের সিংহাসনে এসে তাঁর দাদাদের এসব উৎকৃষ্ট সবকার-মুখ দেখে হিসাবে জলে যান এবং হুকুম দেন যে তাঁর সবকার-মুখে যখন দাদা পাথর সেই তখন এখানের কাজে পারবে না। তাই প্রাচীর ভয়ে থাকা সাদাপাথরগুলি পলাস্তারা ক'রে দেকে ফেলিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন এখনও অন্যপ্রাসাদের আগো উঁচু পাথরে আছে। সৌধের বাকি গুপ্ত ধন বিস্তর আছে। যাত্রার রাজাজিদের আসে চোখ ধেধে সবকারকেরা তাঁকে নিয়ে যায় এবং তিনি যে সময় যা' নিয়ে আসেন সেই টুকুই তাঁর প্রাপ্য হয়—বাকি সবই তাঁর আত্মীয় স্বজনের হাতে আবহমান কাল ধেকে রক্ষাবেক্ষণের ভার দেওয়া আছে। তাদের তখনও অপব্যবহার করে না—'যক্ষির ধন' আগলায়। অন্যের সাথার পাশে একটি ছুরুৎ হুদ চোখে পড়ে। তার চারপাশে পাথরে ঘেরা আর ঘরিয়াগানে প্রাচীন রাজাদের

সোজা আঙুল প্রভৃতি দেখা যায়। ঘরের যখন জল ঢ'রে ওঠে তখন অবশেষ পাহাড়ের উপর থেকে ছবি হয়ে যায় দেখায়। প্রাসাদের গায়ে একটি ঘরোয়ের প্রাচীন মন্দির আছে—আধাখোড়া পাথরের কাজ-করা, মূর্তিচিত্রও আছে। অবশের সর্বপ্রাচীন গৃহে ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় সেই প্রাচীন ভিটাতেই রাজটীকা পরবার রেওয়াজ আছে। অবশপ্রাসাদের ঘরোয়ের মধ্যে কোনো কোনো ঘরের দৃশ্যাবলি মধুর। প্রকৃতির বাস্তবিক প্রাকৃতিক দৃশ্য যেখানের গায়ে আঁকা আছে। দৃশ্যের মধ্যে কিন্তিচিত্র আঁকার প্রথা অন্যত্র খুবই প্রচলিত। ঘরের ঘরে-ঘাটে বেরুলেই এইরূপ কিন্তিচিত্র প্রায়ই চোখে পড়ে। বেশীর ভাগ ফুল-লতা-পত্রাদির ছবি। আমি যেখানে কখনও এরা ঠাকুর আঁকে না। সেটাকে অন্তর বড় বড় তালির ফুল বা হাতী ঘোড়া সওয়ার এঁকে ভরিয়ে দেয়। প্রকাণ্ড প্রাচীর জুড়ে আঁকা এরূপ অন্তরালের বিষয়। এ থেকে বোঝা যায় আটের চর্চাটা এদের এখানে খুব হয়ে আসিয়েছিল। রাজপ্রাসাদে যেমন অন্তর ঘরের 'ঘুমঘর' প্রভৃতি এক একটি ঘর আছে, তেমনি বৃহদ্বেরও ঠিক তার নকলে ছোট ঘরের 'ঘুমঘর' আছে। এই ঘুমঘরের দেওয়ালেই সাধারণতঃ ছবি আঁকা থাকে। প্রাচীন গৃহের বাড়ীতে অনেক সময় খুব ভাল 'ফ্রেস্কো' আঁকা ছবিও সময় সময় দেখতে পাওয়া যায়। ঘুমের উপর আঁকা ছবির ছবি রাতে উজ্জ্বল ক'রে পালিশ করা থাকে খুবই সুন্দর। এখন অবশ্য এই বিশেষ আটটি লোপ পেতে বসেছে। অন্তর আটে ঘুমে এর চর্চা খুবরায় হওয়া প্রয়োজন। আমি থাকতে তেমন করেছিলুম কিন্তু অন্তরপক্ষ বাধা দেওয়ায় সে প্রস্তাব ঘুমে রাখতে হয়েছিল।

অন্তর অবশেষের প্রতিনিধি Sir S. Jacob এই বিষয়ের বহুল প্রচার করেছিলেন। তিনি যে রাজকের যোধপুর রাজপ্রাসাদের অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কেতাব বহু পরিশ্রমে তুলেছিলেন তার অনেক অন্তরের রাজপ্রা ও কিন্তিচিত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এই কারণে তাঁর অন্তরবর্তী বহু সময় তাঁহাকে লোকের কাছে তিনি বড়বাড়ের গায়ে। Hazell সাহেবের কলকাতা আর্ট স্কুলে অন্তরের এই বিশেষ প্রণালীতে কিন্তিচিত্র আঁকার প্রথা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই তাঁর এ শিক্ষা গ্রহণ করেনি। অন্তরের কারীগরেরা পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়া হয়েছিলেন।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'বড় ও ছোটরানী' এইরূপ একটি Fresco painting তিনি নিয়ে এইরূপ কিন্তি চিত্র কিছু এঁকেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা কেহই এটা শেখেনি।

কলকাতা অবশ্যটি একটি সুন্দর ঘরোয়ার অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দে যখন রাজা কোনো সাধু এই পাহাড়-ঘেরা নির্জন অবশ্যর ঘরে তপস্যা করেছিলেন। সেই থেকে এখানে প্রতি বৎসর মেলা হয়। এই অবশ্যর চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা, তারই নীচে নেমে গিয়ে একস্থানে একটা স্বাভাবিক জল-কুণ্ডকে পাথর দিয়ে বাঁধান দেখতে পাওয়া যায়। আর তারই নীচে একটি অন্তর,—সেটির মুখটিকে খোদাইকরি ক'রে বাঁধান। তার নীচে একটি ছোট বাঁধান চৌবাচ্চা—সেই মুখ থেকে জল তারও নীচে নির্মিত ঘরে নেমে গেছে। সেখানেও ঘাট বাঁধান একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা সৃষ্টি হয়েছে। জল প্রতিনিয়ত—গ্রীষ্ম-বর্ষা সকল সময়েই পড়ছে। এই দশ-বারোটি ঘরের ঘাটগুলি বালানের মত চাকা পাথরের তৈরী। তারই যেখানের গায়ে ফুললতার ছবি আঁকা আছে। যাত্রিরা যাই নিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় ফুল লতাপাতার ছাপ তৈরের তাঁরা কেড়ে নিয়ে যেতেন—একটা তাঁরে নীচে প'ড়ে কেড়ে গেছে আর পাথরের জল এসে যেন ধরা প'ড়ে আছে—এইরূপ রহস্যের ছবির অনেক দেখতে পাওয়া যায়। ছবিগুলি বিশেষ অভিনব আমাদের 'কলম' ব'লে মনে হয়। অন্তর একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—আর কিছুদিন পরে এর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। কলকাতা বিষয়টিই একটি খুব বড় বিষয়

প্রাচীন মন্দির আছে, তার খানেক রামায়ণের ও কৃষ্ণলীলার চিত্র আঁকা আছে দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রগুলি খুব উঁচু দরের না হ'লেও বেশ প্রাচীন এবং ভাল ব'লেই মনে হয়। অমরের পথে কতকগুলি প্রাচীন রাজাদের সমাধি-মন্দির 'ছত্রিতে' এইরূপ প্রাচীন ভিত্তি-চিত্রের ভাল নমুনা কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

অমরসর পরে মোগল আমলের ভিত্তি-চিত্রের নমুনা ফতেপুর সিক্রি ছাড়া জয়পুরে ও রাজপুতানায় এখানে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। জয়পুরের কলম অবশ্য ফতেপুরের 'কলম' থেকে ভিন্ন। এ হিসাবে এই চিত্রগুলি কর্তৃপক্ষ যদি রক্ষা না করেন তা হলে শিল্প-ইতিহাসের একটি অধ্যায় লুপ্ত হ'য়ে যাবে বিশ্বাস।

সমাধি-মন্দিরের এক প্রথা এখানে আছে। কি রাজা, কি অমাত্য শ্মশানে যাবার পর সেই আত্মার একটি মঠ বা মন্দির স্থাপনা ক'রে থাকেন। অন্যান্য যা তাঁর পরিবারের 'কাল' হ'লে রাজা তার ধরন ধারণেও কিছু বদল ক'রে থাকেন। অমর সময় থাকার যা বাড়ীর ভূমি অপেক্ষা তাঁর প্রিয় পাত্র বা পাত্রীর সমাধি-মন্দির খুব বড়ো ক'রে, লক্ষ টাকা খরচ ক'রে তৈরী হয়। অমরের প্রাচীন ভূমিগুলিতে তার নাম-ধাম লেখা না থাকায় কোন্‌টি যে কার সমাধি তা আর কেহই নির্ণয় করতে পারে না। পুরোনো Painting-এ যেমন নাম থাকে না, পুরোনো ভূমিগুলিতেও সেইরূপ। বাঙ্গালীদের বিশেষ শ্মশানে দুটি বিরাট ভূমি লক্ষ টাকা খরচ ক'রে রাজা ক'রে দিয়েছেন। তাঁর দু'জন প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্যের উপর। একজন মন্ত্রীর সত্যচরণ সেন এবং অপরটি মন্ত্রীর কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গালী মাত্রেই এ-দুটি মন্দির দেখে গৌরব বোধ করবে।

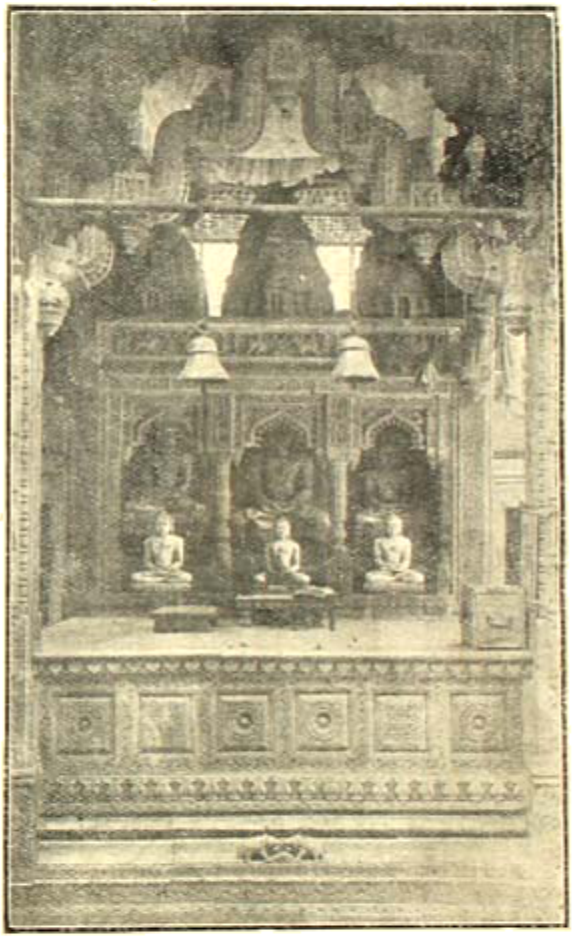

জয়পুরের জৈন-মন্দিরের কলম মূর্তি।

যার জয়পুর শহরের সিভিলের বাসের ও কেল্লার কারীগরী ছাড়াও ছোটো অন্যান্য কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো বিশেষ কাজের বিশেষত্ব আছে। যেমন নাগে-

নীয়ের আমলের উপর মন্দির স্থাপনার কাজ। আর বিকানীরের কাজের যেমনই। নাগেনীয়ার জয়পুর শহর থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। সেটি একটি বহু প্রাচীন নগর। এখানকার জৈন-মন্দিরটি প্রায় হাজার বৎসরের পুরাতন। নগরটি এখন জনহীন। জৈনদের বিশেষ মেলায় সেখানে লোকের ভীড় হয়। মন্দিরটির দেয়ালে যে সব খোদাই মূর্তি প্রভৃতি আছে সেগুলি খুবই সুন্দর। শিল্প-কলার উৎকর্ষেরই পরিচয় দেয়। কাঠের ব্লক তৈরী ক'রে রানের ছাঁচের উপর ছিট পাড়

প্রভৃতি ছোপায়। নিকটবর্তী একটি নদীর জলে এমন কিছু কেমিকাল আছে যে, তাতে ছোপালেই রঙ পাকা হয়ে যায়। বহুদের বিশেষ কোনো লক্ষ্য এই কাজে ছোপ পাকা হয়, সুতরাং জলের রঙ এবংবাই বহুদে ব্যবহার করে। এ ছাড়া হাতের তৈরী কাগজও সাধেবীয়ানে তৈরী হয়। কারখানায় এই কাগজই বেশানে হয়।

জয়পুরী শিল্পদের কাজগুলির মোগাইয়ের ব্যাপারটা খুব বেশী আছে। অবশ্য মুরাদাবাদী কাজের ট্রিক ঐ একইরকম ব্যাপারটা দেখতে পাওয়া যায়। মুরাদাবাদ থেকেই খুব সম্ভব জয়পুর এই মোগাইয়ের কাজ শিখে এসেছে। সূক্ষ্ম 'বহুরী' নক্সাগুলোকে মোচড়গুলি আতশ কাচের (magnifying glass) নিচে দেখতে হয়। সেগুলি যে কিরকম ভাবে হাতে ক'রে প্রত্যেকটি মোগাই করতে দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। অনেকে বোধে বসে বসে মোগাই করতে করতে অন্ধও হয়ে যায় শুনেছি। কাচের উপর লাখার কাজেরও বিশেষ ব্যাপারটা আছে। পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি রঙ আয়াসোড়া কাচের ডিমিনিষের উপর চাপিয়ে দেয়, এবং একটি রঙ উপর থেকে ঘুরি দিয়ে তুলে তুলে নীচের রঙটি বার ক'রে দেয়, এবং তাদের বিভিন্ন রঙের প্রকৃতি বানান কৌশলও ও লক্ষ্যপাত্রের নক্সা তোলে। অনেক ছবির ভাগাগুলি প্রায় এইরকম লাখার ধরনের কাজের তৈরী ক'রে থাকে।

জয়পুরী মিনার কাজ খুব প্রসিদ্ধ। এই মিনা দু-প্রকারের হয়। এক হল শিরোমের উপর ঢালা মিনা—অর্থাৎ লাখার ক তৈরী ক'রে মোগাই অংশটি জয়ে রেখে তার এক প্রকারের পাকা মিনা—যেটা সোনা-রূপার উপর হয়। সেটি ধাতির ঢালে। ঘর ঘর মোগাই করা নক্সার জয়ে উত্তাপের সাহায্যে বসিয়ে দেয়। জয়পুরের গরমের নীচের দিকটা এইরকম মিনার কাজ করার প্রধা এখানে প্রচলিত আছে। আজকাল মিনা করলে সোনা কিছু মোগাই করাতে হয় পড়ে ব'লে সাধারণে করাতে চায় না—তা ছাড়া out of fashion হয়ে পড়েছে। School of Arts এবিষয় শিক্ষা দেবার জন্যে একজন খুব প্রাচীন কারীগর নিযুক্ত আছেন। দুঃখের বিষয় তাঁর খুব শিষ্যসম্পদ না হলে তাঁর অবর্তমানে কাজটি দেখবার কেউ নেই। আমাদের দেশের অনেক-কিছু এইরকম না দেখবার ফলে যে চিরকালের মত লুপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জয়পুরের শিল্পে মাটীর বাসনেরও খুবই প্রতিষ্ঠি আছে। এই শিল্পকলা জয়পুরে শিল্পী থেকে অনিয় প্রথমে আনেন। সেই সব শিল্পীদের বংশ অনেক দেশে ছিটেছিল, তার পর বিদ্যালয় অভিনন্দনে (?) সব বংশ ধ্বংস হ'য়ে গেছে—কেবলমাত্র আই খুনে যে দুজ দেখান তিনি এবং তাঁর ছেলে ধরে রেখেছেন। ইউরোপে এই চিনামাটীর আবহ, সাধারণ উপর নীল রঙের এবং নানান রকম ফুলের নক্সা করে। হাজার হাজার টাকার বাসন সারা পৃথিবীর চারদিকে প্রতিবৎসর চালান যায়। School of art ছাড়া এরূপ বাসন আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাসনগুলির দোষ এই যে একটাই হাতে লেগে ব'লে তল বাসনে থাকে না—উল্টে যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা তৈরী করলে উহাতি থাকে। যায় সন্দেহ নেই।

লোহার উপর সোনারূপার কাজ আমাদের প্রায় উঠে গেছে। এর তিন প্রকারের কারীগরী আছে, যথা "তাইনিং"—লোহার উপর খোদাই ক'রে নক্সা এঁকে তার জয়ে সরু তার বসিয়ে দেয়া। 'জাবনিং'—অর্থাৎ খুব বেশী গভীর ক'রে খোদাই ক'রে তাতে মোটা তারের বা সোনার তার বসিয়ে এবং চেপে বসান। আর "মোকুত"—অর্থাৎ কেবল লোহার উপর চৌখুপি ক'রে ছেনি দিয়ে কেটে নিয়ে লোহার সঙ্গে তারের খুব মিষ্টি জমাট বা সোনার তার ঠিক ঠিক বসান। এই সব কারুগুলির ব্যবহার যোগ্য আসবাব ছিল, এখন এগুলি বাহুল্যের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকমের সূক্ষ্ম সাধারণ ব্যবহার-যোগ্য না হলে সে জিনিসের জয়ে হয় না। যদি কেউ এই সব কারুকার্যগুলিকে তৈরীদির ব্যবহার্য সামগ্রীর ভিতর বাস্ করাতে পারেন ও এই আর্টের পুনর্জীবন লাভ ঘটতে পারে। যেমন লোহার মোকতের কাজ করা, paper weight,

বেয়ারা, কারেন্টার প্রভৃতি। কেবল লৌহীন বাসন তৈরী হলে এদেরকার দিনে কেহই বড় খোঁজ হিসাবে ঘরে সাজিয়ে রাখতে চায় না। আই খুলে এ বিষয়ে মন দেবার ব্যবস্থা হওয়া ভাল।

এখানকার লোহেরা বেশীর ভাগ তৈরী বর্ণাবলম্বী —তৈরী মন্দির অনেক আছে। একটী তৈরী মন্দিরের দেওয়ালে নানা রকম মূর্ত্তি কাঁচ আঁটা ছবি দেখেছিলুম, সেটী একটী এখানকার বিশেষ আই। অনেকটা stained glass-এর মত—যদিও ঠিক সে ভাবে তৈরী নয়। অবশ্যপ্রাসাদের এইরূপ রঙ্গিনকাঁচের ছবি ছাদের উপর sky light-এর আকারে তাকায়া আছে।

এখানে মুসলমান খুব কম কিন্তু যারা আছে তারা হিন্দুদের সঙ্গে খুবই মিশে মিশে থাকে। এমন কি, এক সঙ্গে আহার করতেও এঁরা দ্বিধা করেন না। রাজওয়াড়ার মুলুকে এইরূপ একটী আমি আছে অনেক জায়গায় দেখা করেছি। রাজপুত যারা তারা হিন্দু। তাদের মেয়েরা সুডৌল দুষ্টী এবং চোখে লম্বাই কাজল এমন ক'রে টেনে পরে যে চোখটা যেন টানা ব'লে মনে হয়। প্রাচীন মোগল ছবি আর রাজপুত ছবি দেখলে এই চোখের টান থেকে অনেক সময় বলা যায় কোন্‌টি রাজপুত, কোন্‌টি মোগল। আমার অফিসে একটী 'খবরবিশি' ছিলেন। চোখে কাজল প'রে চোখ পাকালে আর আচকান প'রে ছড়ি-হাতে আদব-কায়দাদুরস্ত ধরণ দেখায় করলেন তখন মনে হ'ত পাই আঁকা একটি লোক যেন জ্যান্ত হয়ে এসেছে। হাঁটা পা বাড়ান সবটাই আড়ষ্ট গড়ের মত। মোগল আমলের ধরণারী প্রথা মত এই অফিসকর্মের কায়দা সেখানে চলছে।

খবরবিশি একটী অদ্ভুত জীব। প্রত্যেক বড় বড় অফিসারের পিছনে এই ১৫৲ টাকা বেতনের একটী ক'রে লোক পাবার থাকে, এরা C. I. D.র মত। অফিসার কিরকম কি কাজ করছে বা দুষ্ট করছে এই সব তিনি রাজ সরকারে গিয়ে report ক'রে থাকেন। তাতে খুব মিথ্যে বড় বাড়ন ক'রে অনেক কিছু কাগোদ্ধার অফিসারেরা করতে পারেন এবং ক'রেও থাকেন কিন্তু এপ্রথাটী প্রাচীনকাল থেকে আছে ব'লে এঁরা এটী তুলে দিতে চান না।

অবশ্যে অবশিষ্টাংশটী বর্ণিত।

এখানকার মেয়েরা খুব দুষ্টী ব'লে কথাবার্তা হয় না। অবশ্যেরা, অর্থাৎ যেরা এঁদের বিদ্যা মুলুকের একটী প্রধান অঙ্গ। তাছাড়া তাদের বিবাহ। অর্থাৎ পারিলে যেখানে সেখানে ইচ্ছা দিয়ে বসবেন, তাতে কোনো বাধা নেই। রাজ দর্শনের জন্যে ছাদের আনাচে কানাচে

পর ছাদগুলি মেরেরা ধ'রে যায়। সেগুলির ছাদ কিন্তু আর মেরা যায় না—বৃষ্টির জলধারা গড়িয়ে পড়ে যায়। এখন অবশ্য ছাদ আর কোথাও দেখা যায় কি না জানি না। এখানকার বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় বৎসরই জীব-জন্তুর খাওয়ানোর একটি বিশেষ প্রথা আছে। ছোট বেলা ছাদের উপর ছাদ ক'রে (ছাদেই ছাদের ব্যবস্থা) তিন থাকের লাল ঘুরে ঘুরে যাওয়ায়। তাছাড়া উপরের যাওয়ার একটা প্রধান পথ। প্রত্যেকের বাড়ীতে পাওয়া যায়। বাড়ীর ছোট ছোট ছাদ-গুলোর উপর থেকে পাওয়া যাওয়ার প্রথা আছে। ঘাঁকে ঘাঁকে পায়রা মধুর কৌয়ারব উপর এখানে সেখানে বিচিত্রে যায় ঘরে ঘরে ব্যবস্থা আছে। সে দৃশ্য ভারি সুন্দর। দূর পাখী মধুর প্রকৃতি যারা ঘাটে পাখী মেরা চলাচে তেমন না—সবে সময় চারু দিয়ে তাড়িয়ে পথ ক'রে তবে পাখী চালায়। ছুছুন্দরগুলোও ঘাটে মেরে মরে না—তারা যেন বাজার আইন জানে যে তাদের চালা দিলে লোকে বিশেষ সাজা পায়। জীব জন্তু বা পাখী মারলে বিশেষ সাজা পেতে হয়। দুঃখের বিষয়, জীব-জন্তুর প্রতি যেমন সচিত্তন আছে—মানুষের প্রতি তত্তটা যদি থাকতো তা হলের অনাথ ভেব বেশী সাহিত হ'ত ব'লে বিশ্বাস হয়। ছয় পালের ভয় নিজের সন্তোষ পেতে পারছে না আর তিনি কাজ-চিন্তকে বাঁচাতে পারছে বিভিন্ন ঘরনের এ দৃশ্য সেখানে দুর্লভ নয়।

অমৃতসরের লোকে ব্যবসায় লক্ষ্য যেন ছাড়ে কিন্তু তাদের মেরের সাজুর সোনার এত বেশী পাগ যে সহজে সোনাও মেতে চায় না। পাশের প্রাচীন ঘিরিয়ে সোনার যায় বি এমন লোক সেখানে বিরল আছে। অফিসারদের মধ্যেও এমন অনেককে দেখেছি। দুঃখের দুঃখদুক্ত হওয়ার লক্ষ্য তাঁদের ভিতর বর্তমান আছে। রাজবাড়ীর কাজ ছাড়া হলে রামুইকরা আর সেদিন রামুই তৈরী করতে পান না—যদি বাবার ওপরে যোগাড় হয় এই এক আশ্চর্য লোক সেখানে প্রচলিত আছে। উপরি উপরি তিন চার জনের ছুটা-দিন একদিনে হ'লে তিন চার দিনই সোনাদে খাবার তৈরী করা বন্ধ হয়ে যায়—বাসী পচা খাবার সবলকে দিয়ে ফেলে হয়!

অমৃতসরের প্রাচীন উদ্যানগুলি দেখবার মতন। সেগুলির গড়না-কৌশলও খুব আশ্চর্য্য। অমৃতে দুই তিনটি সেইরূপ উদ্যান আছে—যদিও তত্ত্বাবধানের অভাবে সে শ্রী আর নেই। জলের উপর লাল পাথরের "দিলখোসা" উদ্যানটি এবং একটি বাগা প্রকার জ্যামিতিক নক্সায় মেরাটী করা প্রাচীন "মোহনবাগি" উদ্যান উদ্যান-শিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শন স্বরূপে এখনও বর্তমান আছে। এখন মেরে লাই মেরাটে গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে গিয়ে থাকের তখনকার দিনে উদ্যানের মধ্যে থাকের নীচে তলখানা (বাড়ীর নীচে ঠাণ্ডা ঘর) তৈরী ক'রেই রাজারাজড়ারা থাকতেন। তাই বাগানের শোভা এবং রচনা কৌশলের এত উৎকর্ষও তাদের আমলে হয়েছিল। আজকাল সাহেবী ভাবধার রাজারা শৈলবিহারে যাত্র থাকায় উদ্যান-শোভা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। "মোহাগ-মন্দির", "সুখনিবাস" প্রভৃতি অমৃতের প্রাসাদগুলিতে পাথরের জালির কাজের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখা যায়। মোহাগ-মন্দিরের জালের ফাঁক দিয়ে রাণীরা পূর্ণে রাজকার্য্য দেখতে পেতেন। অথর প্রাসাদের অধিকাংশে উইলি বানসিং করেছিলেন এবং বর্তমান প্রথর ও বিতীয় তার উপর আরো কতকগুলি রাজ তার অংশ জুড়ে তার শোভা বিগুণ বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

রাজপুতানায় বড় একটা জলাশয় দেখতে পাওয়া যায় না। মরুভূমির দেশে জলাশয় দেখতে পাওয়া একটা পরম লাভ ব'লে মনে হয়। শহর থেকে ৩ মাইল দূরে একটি শুকনো নদীতে বাঁধ বেঁধে বর্ষার জল আটক ক'রে জলাশয় রচনা করা হয়েছে। সেটি একটি দর্শনীয় ব্যাপারের মধ্যেই। আমরা যখন তখন তাঁর Boat house থেকে নৌকো নিয়ে বার বেরুতুম। সেই বাঁধের কাছে অনেকগুলি প্রকাণ্ড ইঁদারা খনন ক'রে সেই জল pump ক'রে একটা পাহাড়ের মাথায় জল-ঘর তৈরী ক'রে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে সমস্ত শহরে পাইপের সাহায্যে জল সরবরাহ

করবার ব্যবস্থা হয়েছে। পথের থেকে দূরে একটি পার্ক আছে—তাতে হস্তি-দন্তের আর কিংখাপের গদি দিয়ে গদি আঁটা ক'রে রাখা হয়েছে। যখন লাট বেলাট আসেন কিংবা রাজার বিবাহ করবার সময় হয় তখন সেখানে নিয়ে গিয়ে বিবাহ ক'রে থাকেন। বাঘ-ভল্লুক সেখানে কিছু কম নেই—পথের আশে পাশে বাঘ এসে গরু বাছুর নিয়ে যায় এমন প্রায়ই শোনা যায়। কখনও কখনও লোকেরা প্রাণ হারায়। অন্য রাজার কোনো বাঘ, সেখানে নেই।

বেলওয়ে কোম্পানীর এবং অন্যান্য সব রাজ্যের প্রভুত্ব অতি ক'রে তিনি তবে গাড়ীতে চড়েছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ওদেশের লোকেরা এটাতে রাজার গৌরব করবারই বিষয় বেছেছিল—এর স্বাধীনতার পরিচয় বোধহয় পায়নি। রাজভক্তি এত বেশী—রাজার অত্যাচারও তাদের চোখে পড়ে না,এটা একটা খুব বড় দুর্বলতাই বলতে হবে!

রাজপুতের পৌরাণিকের কথা এখন উপকথার পরিণত হয়েছে। এখনকার রাজপুত জাতির মধ্যে যদি কোনো প্রকৃতি অবশিষ্ট থাকে তবে তার পরিচয়

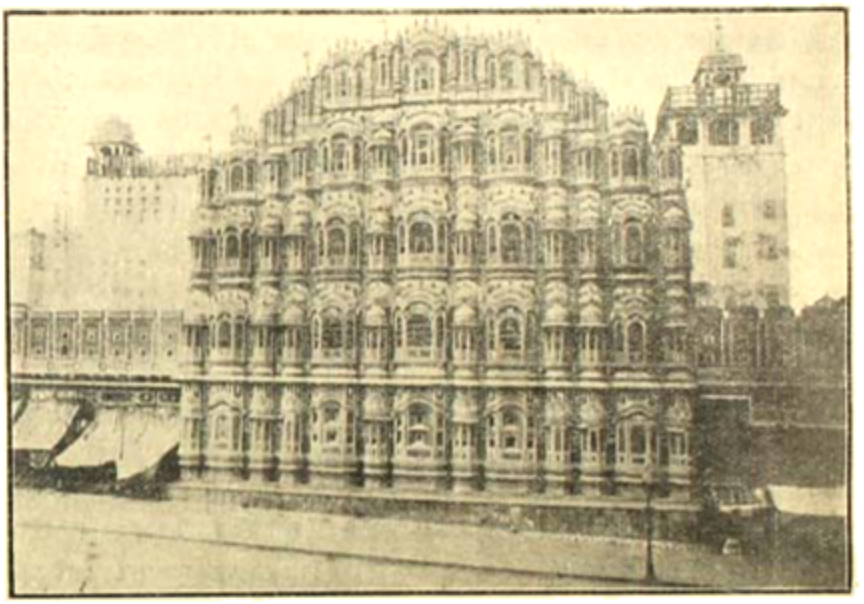

হাওয়া মহল—জয়পুর।

রাজার নিজের যান বেশ না থাকলেও রেলপথটা তাঁরই একচেটে। তার জন্যে তিনি কর পান। তাঁর নিজের Special Train আছে এবং খাস টেলিগ্রাফ আছে। শুনতে পাই, এবারে রাজা মহোদয় নাকি ঘোষণা করেছেন, তাঁর যাবার Programme হিসাবে সব গাড়ীর চলাচল স্থির করা হ'ক। রাজা টেলিগ্রাম দিয়ে ঠিক সেই সময় এক মুর্গিকে ব'লে রাখলেন আর গাড়ীতে চড়লেন না বা গাড়ী ছাড়তেও দিলেন না। অমনি "গাড়ী হামরা ছাড় না হোয় গাড়ীকা ছায়?" অবশেষে অত বড় রেলী ক'রে বিদায় পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ পাশ্চাত্যের পরিচয় চেহারাও দোষ পেয়ে বসেছে। যেমে পুরুষ মোড়ায় চড়া, টাই চড়ায় বেলায় এখনও থাকে বটে কিন্তু সেরূপ সম্মানের ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান নেই বললেই হয়।

ভারতবর্ষের অন্য প্রাচীনরা রক্ষা ক'রে চলে আসছে এখন রাজা আজকাল কম দেখা যায়। প্রায় সব রাজধানীই ইউরোপীয় হাল ফ্যাসানের চালচলনের এবং বাসভবন প্রভৃতির মডেল হয়েছে। জয়পুর যে তার ব্যতিক্রম রক্ষা

ক'রে চলছে এটা খুব সৌভাগ্যেরই বিষয়। কেবল বিপদ হয়তো যদি এই দেশ আর্থিক-চাপে পড়ে তা'হলে যে ভারতবর্ষের জন্য একটা সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হ'তে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের অন্য দেশকে (বিশেষ ক'রে জার্মানীকে) বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিকে যতই অগ্রসর হোক না কেন, আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদে তাদের নিজেদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। জার্মানীরও সেইজন্য আঁট্‌সাঁট-পাৎলুনীধারী পোষাক এবং মেয়েদের ঘুরন্ত ওড়না পরা বাদ দিয়ে আহার বিহার যা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে তাই আছে—একটুও পরিবর্ত্তন হয়নি। কেবল যার দরকার তারা এই আচারে ও ব্যবহারে থাকলে তাদের আর কোনো ক্ষতি নেই—কিন্তু তার উপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষাদীক্ষার প্রসারলাভ যদি না ঘটে তা'হলে কোনো দেশই যে বড় হতে পারে না এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই নেই। এই সব দিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রয়েছে—অর্থবলের কথা নয়—কেবল যদি একটু বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা দ্বারা খুব ভবিষ্যতের পথ নির্দ্দেশ করা এঁরা ক'রে তুলতে পারেন—তা হ'লেই তো অন্যদের মধ্যে তাঁদের এক একটি রাজ্য আদর্শ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

অনুবাদ বিধি ফেরেন এবং কিছুদিন সেখানে থেকেছেন তাঁর কাছেই তার মধ্যে চিরকাল যে থেকে যাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সোনালী রঙের পাখীটি এবং তার রঙিন অধিবাসীদের সবারই ছবিগুলি আমার মনে সোনালী-স্বপ্নের মত চিরদিন জাগরূক থাকবে।

অনুবাদের সঙ্গে আরও একটি স্মৃতি আমার বুকে চিরকাল থাকবে—যাকে আমি সেখানে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে এসেছি।

অন্ধকার

শ্রীকালিদাস রায়—কলিকাতা

এস এস অন্ধকার,—এস ঘিরে অনিবারণ,
এস এস সর্ব্বসর্ব-বৈচিত্র্যের বিশ্লিষ্ট মরণ।
এস এস অন্যাচার এস মম পরাণ অরণ,
এস পরাণীয় স্নেহ, ঘুমাইয়া লোচন-যুগল।
এস ভবানীর ছল, বরাভয়ে স্থির আলিঙ্গন,
হে অনন্ত, চিরিতরা আমারে বুকভরা ধন।
আমারে মেলিয়া দেয় প্রকৃতির ছবীল অধর,
হে স্থির নীরব এস, চিত্ত মম সচকিত তাতর।

বিশ্বকথা ঘুমী যাবে হায় হায় কোথা অতল?
ঘুমায় বৈচিত্র্য-ঘোরে ঘুম ঘুমে হারাই কেবল।
হারাই ষোলোকলাকে ভূলোকের যোলক-মাঁয়ায়,
আলোর ছলনা-লীলা অন্ধকারে কেবল ঠাঁহায়,
প্রতিক্ষণ অন্ধকূপ প্রতিবিম্বে মুক্ত করে তায়,
সত্য যায় নিজ সত্তা তোমাদাঝে অরূপে গোপন।
তর্ক-বুদ্ধি-কোলাহলে পরাসক্ত হ'য়ে বিক্ষিপ্ত,
তোমারি আলোকস্নানা হয়েছেন মনোঅগোচর।

আলোক গহনে নিত্য আবাহন এসেছ সন্ধান,
অন্ধকার, তুমি তারে ঘোর কেশে কর আলয়ন।

জ্যোতির্বিন্দুতে যবে দৃষ্টি যায় হায় নমিত হওয়া,
নিখিলোকে সর্বত্রেতে নমিল যে নিচুর পরশ,
সর্ব দৃষ্টি সর্ব চেষ্টা আনো তুমি একত্র লাগাতি
নিখাস চিত্তের নিকে সর্ব নিজ কেন্দ্রীভূত করি'।
ক্ষণে ক্ষণে মনু নিয়ে নিজস্থল ওকে যতবার,
ইন্দ্রিয়বলন-নয় আকুলোবে ভক্ত ভর' যায়।

ওর আবির্ভাবে ঘটে এই শুদ্ধ নিখ হবে যায়,
দিব্য-লোক মনমাঝে সহে কোটি রবি চন্দ্র তারা
হয়ে অনুদ্ভাসিত ভায়, মহানের নীহারিকা হ'তে,
বয়ন্ত বিশ্বভূমি উদ্ভাসিবে আলোকের স্রোতে,
অন্তরে জ্যোতি এ যে অনাবৃতে ভুবনে ভবন,
নিরাটের পরমনে অ-সাবত ভূমের মরণ।

আলোকের মর্মবিদ্ধ অন্তরাল লুকায় যে তব,
নিয়ে আলোকের মাঝে খুঁজে তায় পার্থিব নয়ন।
এ বিশের মকভূমে আলোকের মৃগতৃষ্ণিকায়,
সত্য খুঁজি আজ যেন মর্মর্ম তপ্ত বালুকায়,
চিত্তে যার নিত্য সত্য, ধন্য যার প্রতিদিন-ক্ষণ,
বস্তুপুঞ্জে নিত্যে খুঁজি হাতে সবে ধরণ মলিন।
মহাসত্য নাহি মিলে মানবের মোহাবের তলে,
নিলে তারা অন্তরাল ধরিবারে নারবের তলে।
মৃত্যুপুত তমসায় যত তরি মেলে দৃষ্টি মম
চিত্তেরে জ্বালাবে তুলে' আত্মিকের অগ্নিহোত্র সম।
মৃত্যিতল হ'তে তুমি চারিদিকে হও' আবরণ,
অমৃতো হারা'ও সব বাহিরের বস্তু-মোহিনম।
জ্যোতির সমান মোর মন আত্মা তোমার উল্লাস,
তোমার তমসা-নীরে মোর চিত্ত স্বর্গ-সরসম।
অন্তর দেউল মেরা পূরণের ধূপ-ধূম সম,
উর্ধ্বে তারাতে যত দুঃখ-স্বর্গে নিবেদনোদম।
অনিত্যের দীপাবিতা নিভাইয়া এস মুছে মোর,
অমাণীর মন্দিরের পরশ লয় তব চিত্ত মোর।
জ্ঞানরূপে নিত্য তরি' শুদ্ধতার জ্ঞানময়ী-তানে
তোমা অভিসার বন্ধু, নিয়ে যাও মোলমুক্ত পানে।

কে তবে রাত্রকী মোরা, কেবা বহে নিত্যের মোহ?
অন্তরাত্মা পাশ, অজ্ঞানতা, অক্ষরের মোহ?
তাই যদি হবে তুমি, এ বিশের স্বামী যোগিজন,
মনাত্মে ছলার ছলে কেন তোমা করেছে বরণ?
ধন তরি নার্গরিক নারকেরা দুস্তর তরিতে
তোমারে বরিল কেন নাম ক'রে নরক মুদিয়া?
কেমনে সতীর স্বর্গে ছলনা তোমা 'পাতারী' নাম?
কেমনে 'ছুবান' নব তোমা মাঝে নমিল নির্বাণ?
বিশ্বলোকেশ্বরা বন্ধু, সর্ব মহাশক্তির উদ্ভব
তোমারি অনাদ্য ভবে, শুদ্ধ তব আত্মগৌরব।

এস তবে, ত্যজিয়া তরি' নব দৃষ্টি খুলিলাম,
তুমি দিবা নমিব না এ মনাত্মে মনুর নাকাৎ।
হারাবে নিত্যের ছলনা পরমে হ'ব না পরিত,
পরমের আইনতে অনাবার্ত হবে আলোকিত।

অচল টাকা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কলিকাতা

মা বলত—বরাটে, বাপ বলত—আলটপ্‌কা।

রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে খেলা। একজন বলে—কি রে নরু, লজঞ্চ ছেড়ে দিলে যে?

নরুর উত্তর দেয়—লাটেকেট্ যাবে না।

একজন বলে—তোমার বাপ ঘুমুবে? তারপর একটা ঘন্টির মাথা ঘুরোয়।

নরেন শুধু বলে—বাড়ি।

—কিসের খোঁজে? চাকুরির?

আর একজন বলে—প্রিয়ার?

বন্ধুরা হাসে। হাসুক!

বাপ বলত—যে যত অমানুষ! বুড়ো বাপ-মাকে এক মুঠো যে খাওয়াতে পারে না সে থাকে কেন বেঁচে? ধাক্কা-মারা যে!

মা বলত—খাসুকে এক ঢ্যালা চুন্ যেন মুখের মধ্যে গুঁজে দিই বি?

বাপের মার, মা'র পিতৃকুল। সকালবেলা উঠলেই একটি ছেলে বাপের কাছে সাড়ম্বর পড়তে আসে, দুটিটে টাকা দেয়। সমস্ত সংসারের সেই আয়।

ছোট ছোট ভাই বোনগুলি এখনো খেতে পায় কি পায় না! তিন বছরে তিনটি মারা গেছে।

—কি রে, তোমার চলছে?

—এই, একরকম।

আর কোনো প্রশ্ন করবার আগেই নরেন, ছিটকে পড়ে—অন্য দিকে। পকেটে যদি কুলকুলে একটা পয়সা থাকে, অনেকগুলি বিড়ি কেনে। কোনো বন্ধুর কাছে হাত পেতে কাশে-ঢঙে যদি দশটা টাকা ধার পায়, তখুনি নিজের পাজামার অর্ডার দেয়, রোজ রাতে সেই সুখে যায়—কোনো বন্ধু ছুটে গেলে খাওয়ায়ও। সিনেমেটের টিকিট, নিজের জন্যে, একেলার তিনি পর্যন্ত। তারপর আবার চলা সুরু হয় খালি পেটে—খালি পকেটে। বেলেঘাটা থেকে মাঝেমাঝে,—বেলেঘাটা থেকে শিবপুর।

রাত বারোটায় বাড়ী ফিরে কোনো কোনোদিন চেয়ে—ভাত কৈ?

মা বলে—ভাত নেই।

বাপ মুখ বিঁচিয়ে ওঠে পাশের ঘর থেকে—ঘিলুবার বেলায় তাগিদ আছে। দুটো খোয়াবার, বেরো বেরো, আতাকুঁড়।

ছেলে বেরোয় না। কলতলা থেকে হাতে মুখ মুছে দেয়ালের বিছিটা ঘষিয়ে শুয়ে পড়ে। যতক্ষণ বিছিটা জলে, ঘর থেকে—ঘেসে-ঘেসেই।

চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে টাকার স্বপ্ন—

যেন প্রকাণ্ড ঢোল বিক্রি ও। কারাবে আওয়াজে চিৎপুরের বন হাঁসে ঘেন্নে রাস্তায় বিরাজে। ও নিজেই যেন পরিবেশন করছে—গোলাও মাংস, কত কি! যে যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে—কাপড়, নগদ টাকা, ঘোড়া ঘরে বাবু বাবু,—কেউ কেউটা জুতো আমা, এইকি পর্যন্ত।

কিবা প্রকাণ্ড একটা ইন্দ্রপাত্তাল। দলে দলে লোক এসে ওর তাল থেকে ভুর নিয়ে নিচ্ছে। যে যাচ্ছে সেই লোভ উঠছে। যেদিকে আর লোভ নেই—সব সোনার, হীরা মুক্তোর গাঁথা, ঝিম্ ঝিম্ করে' আলো সবাই। যেদিকে যত যাচ্ছে।

আর বাপ যাচ্ছে শুধু নয় আর, চলেছে দুর্গা পুজো। ঠাকুর, অমাবিক। মা বিধুমুখী দুর্গা—কল্যাণী মূর্তিমতী। ছোট ছোট ভাইবোনগুলি যেন পরমেশ্বর পোকামাকড়। সোনার ঘর ঘর,—প্রকাণ্ড ইমারত। গাড়ী বারান্দায় ঝিমাচ্ছে ঘোড়া।

আরো অনেক কথা ভাববার আগেই বিছিটা নিবে যায়। পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে।

নিজের বাড়িতেও যে কি সম্মান পদে পদে বাড়ী ফেরা—নরেনের বুঝতে দেরি নি। তবু দেখিল এল।

বাপ বল্লেন—ঐ ঘরে যা, বৌমা আমা বদলে নে।

ছেলে অবাক্ হয়ে তাকাল। ব্যাপার কি বলে?

পাশের ঘরে এসে দেখে মা ঘোমটা খুলে আলুথালু বাঁধছে। এক কোণে জড়িয়ে পাশের বাড়ীর নতুন বৌ-টি। গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানা মাথা নিচু আর। মেন একটু হাসছে। নরেন চোখদুটো একবার কচলে নিলে—স্বপ্ন দেখছে বুঝি!

মা বল্লেন—আলনার ওপর থেকে ঐ ধরণের কাপড়টা পর্ বউ—। কাপড়টা এগিয়ে যাও ত' মা, বাবু!

মেয়েটির নাম তাহলে বউ হ'লো! নরেন ভাবল—নীলিমা বুঝি! আশ্বিনের বিকেলে নীলাকাশ যেন তার দুই চোখে।

মা কাপড়টা নরেনের হাতে দিলে। ওদের বাড়ি গিয়ে এসে বল্লে—এস, বৌটা এঁকে দিই।

অথচ এই মেয়েটির সঙ্গে যখনি আলনার কাছে দেখা হয়েছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নীল তারকিটির ওপর সতর্ক ঘোমটাটি টেনে আত্মরক্ষা করেছে। আলনাটা যখন করে' দিয়েছে কত দিন!

নরেন বল্লে—এর মানে?

বৌটিই জবাব দিলে—আমি কি জানি? তারপর মুচকে একটু হাসলেও।

মা বল্লেন—তোর আজকে বিয়ে···

বাপের কাছে গিয়ে ছেলে শুধোল—এ সব কী?

বাপ বল্লেন—তোমার আজ শুভবিবাহ বাবা, তৈরী হয়ে নাও চট্ করে'···

নরেন শুধু বলতে পারল—কক্ষনো না।

জীবনে এই তার প্রথম প্রতিবাদ:—অসুখ,অকারণ!

বাপের পাশে বুড়িওয়ালা এক ব্যাক্তোয়ারী বসে'। তাকে বেরিয়ে যান বল্লেন—দু'হাজার টাকার গাওনাদার। তোমার আজ মেয় দিন। নইলে, নইলে কি মিশির-জি?

মিশিরজি হাসছে। বল্লে—নহি তো রাস্তামে মিলাসুনা।

লোকটার হাসি কি নিষ্ঠুর!

বৌটি নরেনের কপালে চন্দনের ফোঁটা আঁকলে। নরেন দেখে তার বুকের দুরু দুরু সত্যই শুনতে পাচ্ছিল।

বৌটি পরে বসে—এই মালাটা পর। পরতে হয়। একটা সোনার মালা নরেনের গলায় দিতে চাইল।

নরেন সেটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে। পরে বৌটিই বরঞ্চ পরিয়ে দিলে।

পায়ে না হেঁটে এই প্রথম বোধ হয় ওর গাড়ী চড়া। বাসরাতী মিশির-জি আর বৌটি। ছোট একটি বেডিং। আর দুটো বাক্স।

মা উলু দিলে। বৌটি শাঁখ বাজালে।

নরেন বোটিকে হেলান্ দিয়ে বসে' ভাবে—মুখে তার লোহরেখা, লীলাপদ্মে নাই। নামটি হয়ত মা নীলিমা। হয়ত মা তারাই। অন্তরঙ্গতা চারিদিকে যেন হাসির ফোয়ারা ছুটে উঠছে।

আকাশের তারাগুলির পানে চেয়ে চেয়ে নরেন ঘুম দেখে।

বিয়ের সতের হাজার টাকার পুঁটলিটা বাপ মিশির জি'র হাতে তুলে দিলে। আর একটি পুঁটলি নিয়ে নরেন বাসর ঘরে এল।

পুঁটলিটি সযত্নে বালিশ কুঁদিয়ে কুঁদিয়ে কাঁধলে। মাকে ছাড়া আর কাউকে শুতে দেখেনি। নরেন গা-টা যদি একটু ছোঁয়, কাঁদবে ওটে।

নরেন জিজ্ঞেস করে—তোমার নাম?

মেয়েটি বালিশটার মুখ গুঁজে বালি গাপে।

বালির বালিশগুলির পানে চেয়ে চেয়ে নরেন ভাবে—পৃথিবীর আজ শুভরাত্রি। সমস্ত কারাগার বিরহী দুর-দুর দীর্ঘ তপস্যার পর তাদের একাকিনী প্রিয়াকে শয়ানশিনী করে' পেল,—একান্ত, সম্পূর্ণ করে'। সেই যে,—বৃষ্টিতে ধরা সিক্তের আজ।

শুভরাত্রির দিন মিশির-জি আবার এল। এবার মেয়েটির মা থেকে গয়নাগুলি খুলে নিলে।

বাপ বল্লে—পা টিপে যে যা বুঝি!

মা বলে—আর ছেলেকে মানুষ করতে পারিনে। বাবা ট্রেনে যাও।

দু বেলা বাবা চড়েও না।

ছোট ছোট ভাই বোনগুলি ভাবে—কেবলি খেটে। মা আবার মাঝে মাঝে গুরুর বেশ—ভারিক্কি।

বছর ঘুরে যায়।

মায়ের কাছে সে নীলিমাই। মা পর্যন্ত ঠাট্টা করে—নীলি মা কেরোসিনের আলি।—তবু নীলিমাই সে।

বলে—ওদের বাড়ীর বৌর মতন সোনার লতা। আমার একটা ঘড়িয়ে যাও না।

আমার বলে—তোমার খাও দাওয়াব? আমাকে একদিন খেতাও দিয়ে যাও না—ইভেন্ মাখেন্।

মায়ের জবাব দেবার সময় হয় না। বেরিয়ে যায়।

বৌ ঝিন্‌ঝিন্ করে' বলে—বড়লোক।

বছর ঘুরে যায়। একটি ছেলে হয়েছে।

মায়ের ভাবে— হয়ত বুঝ. হয়ত বা মেয়েলিপনা।

বৌ বলে—ছেলেটাকে আর কিছু দিনের খেতাব পর্যন্ত পয়সা খোটে না?

মায়ের অন্তরতমের মতো শব্দটা ঝাড়ুকায়। তারপর ছেলেটার মুখের দিকে তাকায়। কেন কেমে ভেবে বড় বেদে।

বছু একজন লিখিয়ে,—নাম করেছে,—কিন্তু খেতাব গরীব।

মায়ে—তোমার হাত খালে নয়, মই দেখ। আমি বিলী করে' দেব।

—কি লিখব?

—এই তোমারই কথা—ঠাকুরমার। অনেক পার-লিশারের সঙ্গেই জানা আছে ত'—একখানা খুব বড়তে পারবেই।

মায়ের কাছের কলম নিয়ে বসল। হাতে আর ফুরোয় না। কেন ছুটিয়ে মেতে মায়ের তলায় এসে বসে।

বৌ বলে—তাকে লেখ চিঠি? আর কাজের?

মায়ের মায়ের তলায় মনে' কী-ই বা না আসে? মেয়েবীয়ের থেকে শুরু করে বাবাকে, ম'। টেন্‌ডার বিজনেস্। কখনো কখনো বা আমারোস্ ষ্টাম—মোবেল প্রাইজ—ভবিষ্যৎ ভূমিক। কখনো কখনো বা বিশ্বভারতী।

বছু এসে বলে—তোমার বই খুব এপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে। তবু কিন্তু লোকে বড়-ই কিনে কিনে চায়।

—বেশ, বেশ তা দিচ্ছ। কত বেচে?

বছু একটা অঙ্ক বলল। পরে পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বলে—ছাপা কাল-পড়'ছে খুব করে' বেচে। এবার তোমার নামাল কে পায়? কাল আমি আসব।

মায়ের ভাবে, বাংলাদেশে নয়—শ্রী আমেরিকা। প্রতি মিনিটে হাজার বই কাটছে। লিখিয়া হচ্ছে এক মইয়ের। ব্রহ্মাণ্ডীর পর্যন্ত।

বৌকে বলে—সোনার বাবা ত' ছাব্। 'অর্থমূলে মূলকলি, মূলকল মাবে'।

বৌ বলে—আমি মরা। ছেলেটার নাবা মাবে'বেন বিছুটী লাগিয়েছে। তারপর মনে মনে বলে—জানোয়ার।

প্রকাশকের কাছে হাত পাতলে—টাকাটা?

প্রকাশক কলমের তলা থেকে চশমাটা নাকের তলায় নামিয়ে বেবুফা চোখে চেয়ে বলে—টাকা। সে তো আপনার বছু শৈলেন বাবু নিয়ে গেছেন।

—নিয়ে গেছে? কথা যেন মায়ের মনে চিনে বেরুল।

—আপনি তাঁকে একটা কড় নই ক'রে দিয়েছেন,—দেখালেন। তাতে যা বিক্রির দরুণ টাকাই তাঁর প্রাপ্য।

—ও! হাঁ,—তাকে লিখে দিয়েছিলাম বটে। মায়ের দরুণ বন্ধ হয়ে আসিয়ে এল। পরে অস্ফুটস্বরে বলে—বেচা। আমি গরীব,—আমারো ছেলে.....

প্রকাশক বন্ধুকে বলে। নরেন বলে—না, যাই।

প্রকাশক আপন মনে খানিকক্ষণ বইটার প্রুফ দেখে। তা-ই নরেন দাঁড়িয়ে একটু ভাবে—যাই অর্থমূল্য। বেরোক্ ত' বইটা।

পথে যাবার বেলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে ভাবে—বেলুড় থেকে ট্রামেবাসে পঞ্চাশ।

খানিং ইটের একটা ঘরে ছাদের ঢালাই,—বড় বাবু হিসেব-পত্র বাঘবাবু বড় দেখাই চান্।

বড় বৈশেলেই অবশ্যি ঘরটা নিলে যা হোক্!

বড় বাবু বলেন—বেশ, অনেক যদি হয়, তাহলেই চলবে। তুমি খানিকটা বৈশেল!

নরেন কিন্‌কিসিয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলে—কত যাইবে?

—ত্রিশ। ঢোকাবাই বাদ হ'লে চলে যা। ঢোকাবটা কাজুক।

—না, না, বেশ—ত্রিশ টাকাই ক'জন আমায়?

এই দ্বিতীয় দিন নরেনের সন্ধ্যার পরেই বাড়ী ফেরা। মাকে গিয়ে বলে—মা, চাকরি পেলাম। বাপকে গিয়ে বলে—বাবা, চাকরি পেয়েছি।

বাপ শুয়ে শুয়ে তালীয় গান করে—রামপ্রসাদী। মা হরির লুট মানত করে। রাত্রে সেদিন স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে হাড়ি হয়ে। ডালনা তাঁরি চেঁচামেচি আর নেই। বোনের গোছাতে মাটির মাটিটা পর্যন্ত যেন হাসে।

ঘরে এসে বৌকে আদর করতে ইচ্ছা হয় একটু। ঠোঁট দুটো একটু চেপে, চিবুকে একটি চুমু খায়। ছেলেটাকে একটু কোলে নেয়—ঘন ঘন ঘরে' আসে—ঘর ঘর হয়ে। খানিকক্ষণ থেকে ঘুমোলিনি।

বৌ বলে—এবার আমাকে সোনার দানা দিতেই হবে। আর ঘোমার জন্য উলের একটা ফ্রক।

নরেন শুয়ে শুয়ে কের ঘর মেপে—ত্রিশখানি করতে বলটাকার নোট। প্রত্যেকটি খানিকটি পর্যন্ত আর চোখে ভাসে। কের ঘর ঘীরনের ফেলে-আসা দুঃখ-ভাবনা ত্রিশখানি ক্রিপ মুখ। কের ত্রিশটি অক্ষরে ভার নাম।

সারা রাত আর ঘুম আসে না।

ঘোর কিন্তুরেই কাজের ঘোরা
বেলা—হাতে উঠ্‌লেন।

ডাকে দেখেও কের বেরুলে না। নরেনই শেষে সমস্যা করলে।

—কাল থেকেই তা হলে জয়েন্ করব? বলটায় যেতে হবে? আমি যু বলটা আগেই যাব'ধর। ওভার-টাইম চাই না তার জন্যে। ঢোকাবটা বেঁচে উঠুক।

বড় বাবু প্রথম চিন্তিত পারেন না। পরে বলেন—ও! হ্যাঁ,—অত লোক বরাদ্ দরে গেছে। বৈশেলের ভগীপতি—পঁচিশ টাকা মাইনে।

নরেন চোক গিলে বলে—আমাকে না হয় মুক্তিটি টাকাই দেবেন। টাইমও বাড়িয়ে নিন।

বড় বাবু হেসে বলেন—তা কি হয়! আমারো তাহলে···

নরেন কের পথ ভাবে—বারাকপুরের পথ।

বাড়ী এসে বৌকে বলে—আফিসের বেলায় যাইনি।

বলটা বাড়ুক বা বাড়ুকই যাক হাতে—শিগ্‌গির একটা বাসার আলো করে' যাও বৌমা। আফিসের বেলা হয়ে যাবে। এদের একটুও যদি হুঁস্ থাকে—

মা আদর করে' তাকে বলে—পরিপাটি করে' গুছোয়। আদর পাতে, দক্ষুর মাটিটা জল দিয়ে একটু লেপেও। বলে—তাড়াতাড়ি করিস্‌নে, আস্তে আস্তে যা। এখনো ঢের সময় আছে।

বৌ ছোট বোনটির হাতে একটা শাখা গুঁজে দেয়। নিজের বলা করে হেসে। ছোট বোনটি হাসতে করে।

বেরিয়ে যাবার সময় নরেনের হাতে একটা পান দিয়ে বৌ আর একটুখানি হাসে। বোঝাই যায়—সবার সবার কিরে। কিরেরে।

বাড়ী ফিরে এসে বৌ বাঁচলে নরেনের বাম মুছে দেয়। পা টিপে দিতে দিতে বলে—আজিস্ বুঝি অনেক দূরের রাস্তা?

পরে কে। বলে—যাইনে গেলেই—বোধার হাবা না হোক্, একটা নাকছাবি অন্তত:। শিশু মেয়েগুলি। আবোল তাবোল্ বকে' বাপকে তার আসল ভাবাতে চায়।

দিন যায়। বৌ খালি জিজ্ঞেস্ করে—মাস কবে ফুরোবে? মাইনে পত্তর পাবিনেই গায়ে বো? নাকছাবি না হয়, বোধার জন্ত একটা ফ্রক এনো কিন্তু।

রাতদিন বোধাকে বুকের ওপর চেপে আদর করতে যাকে।

মাস ফুরোয়ে আর কতদিনই বা বাকি? নরেন হিসেবটা করে রাখে। মাঝে মাঝে পকেট থেকে ছোট্ট পেন্সিল টুকে একটা নোট্ বুকিয়ে পায়।

খালি মনে পড়ে মাসের পাঁচিশ-ছাব্বিশ-তারিখ দীর্ঘ বুক,—যা'র আনন্দোজ্জ্বল রূপ ফুটে ওঠেনা। ছোট ভাই বোনগুলির ম্যাজ্যর মুখ—সারা গায়ে ধুলো, কোথাও ছেঁড়া কাপড়ে জায়গায় টুকরো। মার রাত থেকে পেটটায় ব্যথা। বৌর গায়ে একটা সেমিজ নেই।

নরেন ভাবে, আর পর চলে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে ছেলে মানুষের মতো ঘরোইয়াকিও করতে হয়। কেউ সঙ্গে নিলে বায়স্কোপে কিংবা থেটারে।

মাস মাসের পয়লা। ছোট শালীর অন্ন ভাই উপনয়ন হচ্ছে। বিশেষ কিছুই নয়—একটু ভালো খাওয়া হবে,—কিছুটা। ছোট ভাই বোনগুলি বিকেল থেকেই বাড়ীওয়ালার চারপাশে ঘোরা-ঘুরি করছে। সকালের মধ্যে কত আলোচনা যে হচ্ছে, তার অন্ত নেই। কেউ বলে—আমি যাব এক বেলা। আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বলে—বাইরে লোকা আগে সাতে দিন ছাড়াতের বেশি থাকেই না মোটে। এ নিয়ে তাদের তুমুল তর্ক হয়।

মাকে বৌ উপদেশ দিলে—মাইনেটা বুক পকেটে রেখোনা কিন্তু। পেটেই গোঁজার ফুটো বেঁধে রেখো। যে পাঁড়কাটার মুনুষ।

ছেলে হয়। মাসের মুখ উজ্জ্বল, মার মুখে অপূর্ব কান্তি। মা বলে—কিন্তুর মুখে এক মন ধান কিনে দিয়ে আসিস্ এবেলাকে।

বাপ বলে—বাজারটাও ঘুরে যেসিস্। যদি ইলিশ মাছ পাস্।

বৌ বলে—একটু তাড়াতাড়িই যেও। এবার বোধার মুলোই মাইনে যিনি হবে আর। কে জানে?

নরেন পথে বেরিয়ে পড়ে—উদাসীন ক্লান্ত পথ। ফুরোবার তলা করে গেছে লম্বা নেই; কোথায় যে যাবে, তাও নয়। তবু ভেবে হয় কলকাতার পথ বড়ো।

অফিস ফেরত থেকে কে ডাকল—আরে নরু যে! অনেকদিন বাদে!

নরেন তাকিয়ে দেখলে।—বন্ধু! সৌরেন নয়। এক মুখ হাসি নিয়ে তার এসে ঢুকল।

ইস্কুলের সহপাঠী। এখন _সওদাগরি আফিসের বড় চাকুরে।

ছেলে বেলার আলাপ জমে' গেল। আলাপ মাঝের থেকে পরের মাঠে ছুটলো ঘোড়া। নরেন ধরাশায়ী,—বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে হাসে। নরেন হেরে যাবে।

অফিস বেয়ারা দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে অফিসারের ছুটি চাইলে।

বন্ধু বলে—তুমি একটু বোস ভাই, আমি এই আসছি।

টেবিলের ওপর গ্লাসের চাবিটা ফেলে রেখে। অরুণ চারদিক একবার চেয়ে নিয়ে আলোতে একটা চাবি গুঁজে দিলে। ঘোরাতে দিতেই দরজাটা খানিক হয়ে এল।

থাকে-থাকে নোটের তাড়া সাজানো।—

পর্দা সরিয়ে বন্ধু ঘরে ঢুকে বলে—এ কী কাণ্ড?

অরুণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে উঠল। স্বপ্ন ঘরে বন্ধুকে চেয়ে বলল—আমাকে কয়েকটা টাকা ধার দেবে?

—ধার? এমনি ঘরেই ধার চাইতে হয় নাকি? পরে এগিয়ে এসে বলে—কত?

অরুণের গলা দিয়ে আপনি বেরুল—দশ।

—এই নাও। বলে' একটা নোট ছুঁড়ে দিলে।

বাড়ী ফিরেই সব রক্ত ঘুরে' এসে ফিরে দাঁড়াল। বাপ বলে—বাইরে গেলি?

—কাজ ছিল।

যা বলে—তা হলে আজ রাতে উনুন আর জ্বলবে না?

ঘরে এসে বৌ বলে—খোকার জ্বর কৈ? ডাক্তার?

—দাঁড়া কিনে নিয়ে যাচ্ছি একটু। গিঁটে গিঁটে ব্যথা করছে।

—বড়লোক না। বৌ রাগ করে' পাশ ফেরে।

অরুণের ঘুম আসে না। বেমনি ফেলে ফেলে স্বপ্ন দেখে—

ঘরের দেয়ালে না ঝিলি, ঝিকঝিকের ছবি। মেঝেয় গালী বালিশ পাতা। গ্লাসের আলো থাকে-থাকে নোট সাজানো।

তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে হয়ত।

তারপর চেষ্টা করেও আলাপ আর জমল না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে অরুণ নিশ্বাস নিলে। তারপর—আরো দু'আনা চাইলে পারতাম।

একটা ঘোড়াগাড়ি ডেকে নিল। ড্রাইভার বন্ধু ছুটে গেল। বলে—কাউন্ট্ থাকবার মত। অরুণ সর্দার দিলে। টাকাটা দিলেও;—আজ, কিন্তু চলে না।

আমোদ-আহ্লাদ

বঙ্গনারী—পুরী

আমাদের ভারতীয় জীবনের যে অভাবটির কথা সর্ব্বদাই মনে হয়, সম্প্রতি ইংরাজ মেয়েদের "বোলাপী দিবসের" (Rose day) বিবরণ পড়িয়া তাহাই আবার নূতন করিয়া মনে আসিয়া গেল। সে অভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমোদের—সে অভাব নিছক পারিবারিক জীবন কাটাইয়া আমাদের বৃহৎ জগতের সহিত যোগের। এ বিষয়েও আমার মেয়েদের কথা তাবিলেই হয়। এখন এদিকে সাধারণের দৃষ্টি কিছু আকৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু ইহারই আরও অনেকটা আসাই যে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ, এখন এ বিষয়ে যাহা কিছু হইতেছে তাহা শুধু বড় বড় সহরে, এখন কি বলিতে গেলে কলিকাতার মধ্যেই যাহা কিছু. প্রথমতঃ কলিকাতার কিছুই আমরা বলিতে চলে। কোন প্রচেষ্টার প্রথম অবস্থায় অমন ইহা হইবেই,—সকল নূতনানুষ্ঠানকারীকেই তত্ত্ব লাভ করিয়া তবে সাধারণ চলাইয়া যাবে। কিন্তু এখন আমাদের পূজাপার্ব্বণের সহিত মেলের আমোদের যোগ অনেকই শিথিল হইতেছে। এখন কি, বিবাহাদি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানগুলিকেও বর্ত্তমান কালের রুচি, অবস্থা ও প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া না লইলে তাহা শুধু মেলের বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কারণ, তারা যে সময়, অবস্থার উপযোগী ছিল, এখন তাহার একান্তই অভাব। কাজেই, নিত্যকর্ম্মের কলেবর বর্দ্ধন বিহিত হইতেছে। সেই তত্ত্ব প্রতিকার খুব চেষ্টা করিতেছে। এখন সমীলনগুলির প্রথা তত্ত্ব চলিতেছে। এই সময় এ বিষয়টি বিশেষরূপেই মনে রাখিতে হয়। সমীলন মধ্যবর্ত্তী সময় করিয়া হইলে এসকল উৎসব ও পরিবর্ত্তিত করিয়া আমোদ আহ্লাদের অনুষ্ঠানে যাহাতে উহার অঙ্গ গড়িয়া উঠে, তাহার ব্যবস্থাও অন্য কোন বিষয় অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নয়। আর নব সংগঠনের সকল বিষয়ে নবনারীর যোগ যে অত্যাবশ্যক থাকিবে বলাই বাহুল্য। আনন্দের সময়ই মানুষকে তাহার স্বভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহাই, তখনই সহজভাবে সহিষ্ণুতের তাহাকে লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। তাই আনন্দের সময় হৈয়াও কম বেশিবার বিষয় নয়, যে, তাহা সহিষ্ণুতের প্রেরণা আনিতে পারে। কারণ, সব ভাল বিষয়ের মত অমের দিকে গড়াইবার প্রবণতাও হৈয়াতে আছে।

নিছক আমোদের অবশ্য কম আবশ্যক নয়। কিন্তু শিক্ষিত, সভ্য সমাজের মন আমোদেরও কোন না কোন রকম শক্তি, সৌন্দর্য্যের প্রকাশ চায়। আর আমোদের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধরূপে শুধু অবসর আমাদের আটপৌরে জীবন হইতে,—আপনাকে একান্ত করিয়া দেখা হইতে অবকাশ দেওয়া। তাই আমোদ বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা দ্বারা অন্য অনেক বিষয়ের আমোদের কাজ হইয়া যাবে। সেইজন্য বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক সম্মিলন, আলোচনাদি, যদি মেলের তাহা নানা বিষয় শোনা, রচি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী, কোন সাধারণ আনন্দ বা বিপদে দুঃখ, দুঃখ প্রকাশ ইত্যাদি বহু বিষয়েই তাহা হইতে পারে। আবশ্যক সাধারণ কর্ম্মানুষ্ঠানগুলিও প্রকৃতপক্ষে এই আমোদ দানের উদ্দেশ্যই সাধিত করিবে। যাহা কিছু আমাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া বৃহৎ জগতের সহিত সম্বন্ধের স্থাপন করে, তাহাই আমোদের কাজ অর্থাৎ আমাদের আজ যেন, মনকে সজীব ও বিস্তারমুখের সহিত যুক্ত করিয়া রাখে। তাহলে নিত্যকার আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম দ্বারাও অন্য

নানা রকমে আপনার শক্তির প্রকাশ দেখিবার ও দেখাইবার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে প্রবল। তাই নানা ভাবে উহা দেখিয়া ও দেখাইয়া মানুষ আনন্দ। আর নিত্যকার আবেষ্টন ছাড়াইয়া বিশ্বজগতের মধ্যেই সে তাহা দেখিতে ও দেখাইতে চায়। আমোদে উহার সুযোগ ও ক্ষেত্র দিয়া থাকে বলিয়াও তাহা এত আদরের। মানুষ বলেই সঙ্গ চায়, তবুই তাহার এই প্রকাশ সুন্দর ও সৌন্দর্যপূর্ণ হইতে থাকে, নহিলে সে তাহাতে আনন্দ পাইত না। কাজেই, আমোদ মানুষের সভ্যতার একটি বিশেষ মাপকাঠি। অনেক সময় অবশ্য নিছক সান্ত্বনার আমোদেই আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হয়, কিন্তু তাহা সর্বত্র আমোদানুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য নহে;—আর তাহাতেও নিশ্চিত অনেক একটা সঙ্গতি ও মাত্রা রক্ষা থাকে। তবুই উহার বিরুদ্ধে একটা সুদৃঢ়তা রক্ষা করিয়া যায়।

কেবল পূজাপার্বণ দিয়িল হইয়া আসাতেই যে আমোদের জীবন আবশ্যকীয় হইয়াছে তাহা নয়, বাড়িয়া উঠাদি অন্য নানা কারণের সহিত যৌথপরিবারের বহুলোক সম্বন্ধে অনেক লোকে একত্র থাকায় বাড়ীতে বসিয়াই যে লোকসঙ্গ পাওয়া যাইত, এখন তাহারই সহিত থানে থানে প্রতিবেশী নানা শ্রেণীর সঙ্গে আদানপ্রদানেও তাহা যে কারণ সহজেই মিলিত, এখন বিশেষে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে তাহা লাভ করা অসম্ভব। মেয়েদের পর্দাও তাই আরও কঠিন বন্ধনে পরিণত হইয়াছে। পুরুষেরা বাহিরে তাহা কম পাইয়া থাকেন। কিন্তু গৃহস্থের বন্ধুত্ব, লোকজন বা ভাববিনিময়ের জন্য বাহিরে গেলে মেয়েদের জন্যে মুখ বুজিয়াই অবরোধে বন্ধ থাকিতে পায় না। বিভাকার প্রতিমুহূর্তের খুঁটিনাটি একত্র খুলিবার, ছাড়িবার কোন স্থান ও উপলক্ষ্যই মিলে না। এরূপ অবস্থায় মানুষের সমস্ত মেজাজই চাড়িয়া আসে বাড়ানের অভাবেই যেন পচিয়া উঠে। ইহাতে মেয়েদের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি আছে।

পাশ্চাত্যদেশে আমোদানুষ্ঠান গড়িয়া তোলা বিশেষ সমস্যা মেয়েদের জন্যে। আমাদের মেয়েদেরও সেই রকম ছোট বড় নানারকমে, নানাভাবে আমোদ আনন্দের উপায় গড়িয়া তুলিতে হইবে। পর্দা যে থাকা হইবে না, ইহা অবশ্য বলাই বেশী।—বুদ্ধিকৌশল, যৌক্তিকতা দেখাইবার ক্ষেত্র যেমন রহিয়াছে। আমাদের আমোদের ব্যাপার যেমন চৌহদ্দি বাড়াই হইয়া উঠে,—তাহা না হইয়া একটিমে সকলই আমোদ আহ্লাদের মিলিত করা চাই। পাশ্চাত্যের ভাবে উহাকে আমরা আদর্শ, ঠিক্ করিতে পারি,—কিন্তু আমাদের নিজস্ব করিয়া লইয়াই তাহাকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহাতে যাহারা যোগদান করিবে নিছক আনন্দ, আমোদ আরও বেশীই লাভ করা সম্ভব। এখন বিশেষে পুরুষ পুরুষ থাকায় তাহাদের পরিত্র আরামও আরাম, নিরিবিলির সুযোগ হয় না,—এই রকম ছোট-বড় নানাবিধ আমোদের উপলক্ষ্য দিয়া তাহাকেও সুবিধা হইবে। উহার দ্বারা সমস্যের পরিচিতি হইয়া পরে আবার সাধারণ আমোদের অনুষ্ঠানের পথ তৈরি করিতে হয়।

ছেলে-মেয়েদের লইয়া নানারকম আমোদের কথা উঠিলে সকলের আগেই মনে আসে। সেগুলির ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা সহজেই করা যায় ও সহজেই সকলের আনন্দের বিষয় হইয়া উঠে। বাড়ীর ও প্রতিবেশীদের ছেলে-মেয়েদের একত্র করিয়া ঘরে বাহিরে নানারকম খেলার প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, নিজেরা রচনা করিয়া পাঠ, অভিনয়, গান বাজনা ইত্যাদি বহুরকমে তাহাদের উৎসাহ, আনন্দ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। কখনও বা তাহাদের বিশেষ কোন সভায় লইয়া গিয়া যৌথ গান আবৃত্তি করিতে ছাড়িয়া দেওয়া, তাহার সহিত কিছু জলযোগের ব্যবস্থা, তাহাদের নিজেদের প্রস্তুত ডিবিবের প্রদর্শনী ইত্যাদি সাধারণ মোটামুটি বিষয়গুলিতেই প্রচুর আমোদ পাওয়া যাইবে, তাহার পর ইহার ভিতর আরও নানা রকম বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে। ইহার জন্য ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করার মধ্যেও আমোদ, উৎসাহের ক্ষেত্র পাওয়া যাইবে। তাহাতে তাহাদের শিক্ষাও অগ্রসর না করিয়া এমন হয়।—বিশেষতঃ ছেলেদের বুদ্ধিতে সব শিক্ষাতেই সরলতা

আনিবে। ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, Stereoscope, খেলনার উপকরণ wireless set যন্ত্রপাতি, খেলার, এমনকি রাসায়নিকাদি বাজনা ও আমোদপ্রমোদের নানাবিধ সরঞ্জামাদি ছেলেদের মধ্যেই ভাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সহজ করিয়া তাহাদের হাতের মত প্রস্তুত করাইয়া লওয়া যায়। সব জিনিষের খুঁটি নাটি ও সাধারণ জ্ঞান ছেলেদের নিজেদের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের খাটা-খাটুনী ও শিক্ষার ভার অনায়াসে চালান যাইতে পারে। এইরূপে আনন্দের সহিত অনায়াসে শিক্ষা দিতে পারিলে ছোট ছেলে মেয়েরা ছেলেদের আর কেবল বাধ্য ও উৎসাহশূন্য না হইয়া তাহাদের অনেক শিক্ষা ও আনন্দের বিষয় হইতে পারে। এভাবে ছেলেদের কাছে আসিলে তাহাদের মায়ের কোন বিষয়ে কতটা ও কৌশল আছে, কোথায় বা কি অভাব আছে, তাহাও জানিবার সুযোগ পাওয়া যায়। আমাদের মেয়েরা ঘরে ঘরে ছেলেদের লইয়া ব্যস্তই থাকিবেন; কিন্তু শিশুবয়স্কদিগকে তাঁহাদের এখনও কৌশলই আয়ত্ত হয় নাই, বলা যাইতে পারে। শিশুমন ও শিশুশিক্ষার নব নব প্রণালীর-শিক্ষা তাঁহাদের এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়ে মেয়েদেরই বেশী প্রবৃত্তি থাকায় ইহারা ইহাতে সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন। শিশুর শিক্ষালয় বলিলে যেমনি আমাদের মেয়েদের উপযোগী করিয়া তোলা, এমন কি তাহার নূতন নূতন পরীক্ষা, পরিচালনও তাঁহাদের দ্বারাই হইবে না। আর তাঁহারা এই দিকে আসিতে পারিলে শিক্ষালয়েরও যথার্থ উদ্দেশ্য-পূরণ হইতে পারে। ছেলে-মেয়েরাও শিক্ষার বিভীষিকা হইতে উদ্ধার পায়, তাহাদের মানুষও কিছু সার্থক হয়। রতী-বালকের (Boy scout) শিক্ষা কতকটা প্রচলিত হইয়াছে। রতী-বালিকার শিক্ষাও তেমনি প্রচলিত করিয়া লইতে হয়। সেজন্যেও বেশী সময়ের অবসরই দিতে হইবে।

ছেলে-মেয়েদের বিষয় যথা যথা হইল মেয়েরা আপনাদের অভাবও তাহার অনেকগুলিই করিতে পারেন। আর এই রকম আমোদ-আহ্লাদের মধ্য দিয়া বিশিষ্ট বিশিষ্টই তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত হইয়া আসিবে এবং তাহার সাহায্যে সকল রকম ঘাট ও অভাব-প্রতিকার্য্য করিয়া তোলাও সহজ হইবে। আমোদ-প্রমোদের ক্রমে উন্নতির ও আপনাদের নৈপুণ্য দেখাইবার এবং শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট দিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর ঐরকম বিশেষ বিশেষ আমোদপ্রমোদের দ্বারা ইহারা ছেলেদের এই "খোলাসী বিষয়ে"র মত আপনাদের অভাব-প্রতিকারগুলির জন্য সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইহাতে একদিকে আপনারা বিশেষ বিশেষ কলাকৌশল ও আনন্দলাভ, আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে দান বিষয়ের জন্য আয়ও করা হয়। কাজেই, ইহাতে আপত্তির কারণও কিছুই থাকিতে পারে না। দুরবস্থা পল্লিবাসিনী মহারাণী স্কুলের মেয়েরা যে ঘুমন্ত শিশুদের সাহায্যের জন্য অভিনয় করিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চিত বলা যায়, তাহারা সকলেই প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহ পাইবারই কথা। অভিনয় বস্তুটিতেই যত পাপ ও অসত্য ও আর যাহাই থাকুক, ইহা একটি বিশেষ উচ্চ কলাবিদ্যা। আর যাহার যখন ইহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না,—স্বাভাবিকও এমন একটি কলা ও আনন্দের লোপে দুঃখপ্রাপ্তি বলিতে হইবে, তখন ইহাকে স্কুলকলেজের উপযুক্ত করিয়া লওয়াই কি উচিত নয়? এ বিষয়ের পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের নিকট আমাদের কথার সীমা নাই। তিনি ইহার যে আদর্শ দিয়াছেন,—তাহা হইতেই আমাদের মেয়েদের এই দুঃখনাশক কলাটি সুখ তুলিবার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন শিক্ষিত মেয়েরা ইহার মর্ম্ম অবধিই পাইতেছেন,—কিন্তু শিক্ষিত ভদ্র মেয়েদের ইহার সিসীমানাও কেহ মাড়াইতে দিবেন না। কিন্তু এক পক্ষের শিক্ষা ও ভদ্রতে যে কলাটির উন্নতি হইতে পারে না,—এমন কি আসাই যাহে না, তাহা কলাই নাহক।—বিস্ময়ের অবধি না দিলে বেশী? "শিক্ষিত ভদ্র" পুরুষেরা অশিক্ষিত "অভদ্র" মেয়েদের সহিত মিশিয়া অভিনয়ই কি বড় বাঞ্ছনীয়? সৌভাগ্য ক্রমে মেয়েরা ইহার উদ্ধার করিতে গিয়া প্রতিবন্ধক হওয়া যাওয়াটাই দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশে,—

বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহা অবশ্য ঠিক পাশ্চাত্যের মত হইতে পারে না। বিষম-বিপাকে ও প্রবর্ষণে আমাদের বেশী সাবধানতা আমাদের আবশ্যক। তবে এখন প্রাচীনকালের মত ঘর দুয়ার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে বেশী দাঁড়াইয়া যেতে হইবে বিষম জ্বরেই প্রাণ পর্যন্ত করিতে পারিবে। এখন অবশ্য কিছুই আশ্চর্য্যের হইবে না। যাহাদের উহাতে শক্তি, প্রবলতা থাকিবে, তাহারা সহজেই বৈরী ক্ষেত্র পাইতে পারিবেন মাত্র। যাহাই হউক, বলাধিক্য সবারই ভয় ও উহার করিতে হইলে অভিনেতারা সকলেই ভয় ও নিশ্চিত না হইলে তাহা হইবে কি করিয়া? আর সকলে ভয় নিশ্চিত হইলে উহাতে বিশেষত্ব, চমৎকারও আপনিই আসিবে। তবে ইহার সহিত ছোট ফুলের মেয়েদের নিজেদের জন্য আপনাদের ফুলের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ অভিনয়ের অবশ্য কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য, আমাদের দেশে তাহাতেও নিন্দা! এমনি করিয়া তালকে আটকাইয়াই ত অন্যের অবাধ রাজত্বের সুযোগ চাল চলনই করিয়া দেওয়া হয়।

একটি কথাও মনে পড়িয়া গেল। এখন আমাদের ছেলেরা সব রকম পাশ্চাত্য খেলায় যেমনই মনোযোগ দিতেছেন। সেই সূত্রে ফেন্সিংয়ের সহিত টেনিস্, ব্যাডমিন্টনাদি খেলাও তাঁহারা অবাধেই অভিনেতেছেন। কিন্তু হয় আমাদের মেয়েদের সে সকলের যেন তেমন আসিতে যেন না। মেয়েদের সহিত যদি খেলিতেই হইল, তবে যেমন মেয়েদের সহিত খেলিলেই বা দোষ কি? অন্যায় মনে করিলে তাহা করিতেই হয় না। বন্ধুরা অন্য মেয়েদের সহিত নাই রহিবে, আর যেমন মেয়েরাই বন্ধ থাকিবে,—এ চলে না।

এই শুধু বলিতে হয় যে, সংসারের অন্য নানারকম আমোদ-আহ্লাদে অর্থ সাহায্য যোগের না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বড়ই অপেক্ষিত হইয়া পড়ে। যেমন এবারকার বন্যা বিভীষিকা, একটি পরিবারের উপার্জ্জনের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভাতের যায় ও দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থ পোষাক পরিচ্ছদের ফেসনের উপরই ছেলেরা নাটাভিনয়ের আয়োজন করে। এখনে প্রত্যক্ষ মৃত্যু ও শোকের উপর এ রকম আমোদ-প্রমোদ বড়ই বিসদৃশ! তাহাপেক্ষা নৈরাকারে সাধারণে লিখিত বিষয় সহ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভিক্ষা সংগ্রহই আমাদের জাতীয় ভাবের ঠিক যোগ্য ও সঙ্গত। আর এ রকম স্থলে বিশেষ পরিবারের স্থায়ী সাহায্যের দিকে না দেখিয়া সাধারণতঃ আমের আয়ব্যয়ের সমুদায় অর্থ নিঃশেষিত হইতে দেওয়া যায়।

যাবতীয় অনুষ্ঠানে এই আমোদ-আহ্লাদের রূপপরিবর্তন করিয়া লইলে, ঐ অনুষ্ঠানগুলি কত বেশী উপযোগী হয় এবং যে স্থলে তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি থাকে তাহাও এড়াইয়া যেতে। যেমন উৎসবকালে বাহিরের খেলা, মল্ল ইত্যাদিই উপযোগী আমোদ। বাহিরেলা আবার গ্রাম্য সমাজ অনেকে একত্র হইয়া করা যেমন আমোদপ্রমোদ, গ্রামের নিমন্ত্রণ ইত্যাদি উপযোগ্য। শ্রীষ্মকালে যেমনি ছায়া-শীতল স্থলে গাছের তলায় বিকালে ও সন্ধ্যার মুক্তস্থানের আমোদ-প্রমোদ, গানবাদ্যই উপযুক্ত। সকল রকম অনুষ্ঠানই তখন ব্যবস্থা দিনান্তে, খোলা মাঠেতেই করিতে হয়। বর্ষাকালের নিমন্ত্রণ, স্যাক্রেফিসে নিমন্ত্রণগুলিতে যেমনি ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকে তাসের ও সন্ধ্যার পরিচ্ছদগুলি মনের অবসাদ অনেকটা দূর করিতে পারে। শরৎকে তাহার কাশফুলের ঘর ঘর দিনান্তে আবার মুক্ত পৃথিবীর মধ্যে বসন করিয়া লওয়া যায়। এই সব অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের যে জাতীয় উপযোগগুলির স্মৃতি জড়িত আছে, তাহার আকার ও আয়ব্যয়ের যে অংশগুলির সহিত এখন অনেক যোগ শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাহা বাদ দিয়া তালোপযোগী করিয়া লইতে পারিলে সেগুলি সহজেই অনুষ্ঠানের উপযুক্ত এবং জাতীয় সম্ভাবের প্রকাশও হইয়া উঠিতে পারে। তাহাতে প্রত্যেক অনুষ্ঠান সৃষ্টিই যেন আমাদের জাতীয় সার্থক ও সত্য করিয়া তোলে।

এই রকম করে তাবেই যে আমাদের আমোদ-আহ্লাদ প্রবর্তিত হইতে পারে, বলা যায় না। সভা-সমিতি, লাইব্রেরী, ক্লাব ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নবনারী সকলেরই সহজলভ্য হইলে এবং তাহার

আমাদের এইভাবের নানা আমোদ-আহ্লাদ দ্বারাও বক্তৃতা, কথকতা, বেদীর, বিশেষত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের বিষয়, আমাদের স্বদেশীয় কাহা ও তদ্দেশীয় বিষয়ের আমোদের ছোট, বড়, মাঝারি সব রকম আমাদের জন্য জন্য হইতে থাকিলে, ও যে—কেবল কাজ নয় আমোদের যোগানও আমাদের অনেকই মিলিতে পারে তাহা আগেই বলা হইয়াছে। মেয়েদের জিনিসও যাঁহারা কোন বিষয়ে চর্চিত লাভ করেন, তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনা বা যাঁহারা যোগদানে আসিয়া থাকিলে সকলের জন্য পরিচয়ের ব্যবস্থা যেমনের করিতে হয়। বেশী, বিশেষ এমন অনেক মহিলাই অনেক সময় আসিয়া থাকেন,—কিন্তু মেয়েরা তাঁহাদের বিষয় জানিতেই পারেন না। এই ভাবে আমোদানুষ্ঠান যদি পরিচালনের ভার আমিলে সব রকম কাজের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কত সহজ হইয়া আসে!

মেয়েরা স্বদেশে সঙ্গীত চর্চা, সুধার সুন্দর কথা, সঙ্গীত কথা ইহাও যখন একটা আনন্দ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তাহার আয়োজনও যখন সকল অবস্থায় সহজই হইয়া থাকে, তখন তাহাকে কেবল বাদি না দিয়া সহজভাবে মানিয়া লইলে ক্ষতি কি? সাধারণের মত অভিব্যক্তি না পায়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিলেই হইল। সব বিষয়েই তাহাতে সঙ্গতি থাকে ও স্বাধীনতা যা সহজ স্বচ্ছন্দের ধারা না হয় এবং কুচ্ছের ধারা, কুচ্ছের ধারা দূরে আসিয়া না হইয়া পড়ে তাহাই দেখিবার বিষয়। তাহা না হইলে মন ছাড়া সব জিনিস হইতেই সহজ-বিনোদন, অবসর-বিনোদন আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে।

অন্য নানা বিষয়ের মত সাধারণের আনন্দ-দান করিতে ধনীদের বিশেষ সুবিধা আছে।—কেবল সুবিধা নয়, ইহাতে তাঁহাদের দায়িত্বও আছে এমন নয়। আমাদের দেশে ধনি-দুঃখী নির্বিশেষে সাধারণের সম্মিলন ও আমোদ-প্রমোদের স্থান ছিল। এখন নূতন ভাবেই তাঁহাদের ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে তাঁহারা সাধারণতই যে কেবল উপকার করিবেন এমন নয়, নিজেরাই বরং বেশী উপকৃত হইবেন। আগে সাধারণের সেবন কেবল তাঁহাদের মুখ চাহিয়াই থাকিতে হইত, এখন অবশ্য সেদিন নাই। কিন্তু নূতন আবিষ্কার, রাষ্ট্র-সামাজিক পরিবর্তনের সহিত কাজ-ব্যবহার সাহায্যে সবই এখন সর্বসাধারণের আয়ত্ত হইয়েছে। ধনীরাই বরং আজ তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছেন। তবু তাঁহারাও অনেকটা করিতে পারেন।

আমোদ প্রমোদের দ্বারা অর্থাগমও এখন বিশেষ-ভাবেই প্রচলিত হইয়া উঠিয়েছে। ইহা দোষের বিষয় না হইলেও তোলবারে লাভই একমাত্র লক্ষ্য না হইয়া আমোদের বিষয় ও পারিপার্শ্বিকের উপযুক্ত মত হওয়াই তাহা হওয়া আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়।—আজকাল যেমন যোড়দৌড়ের মত একটি পুরাতন স্বাস্থ্যকর আমোদ-ক্রীড়া কুপ্রবৃত্তিতে দাঁড়াইয়াছে।—যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিজই অল্প দর দেশেরই মানুষের উপরও দোষ হয় বাহি চলিবে। আয়োজন, বিজ্ঞাপনের দামও উঠিবে। তাই নির্মল, উহার আমোদের প্রচলন এবং দুর্বিষহগুলির সংশোধন দুই-ই এখন অত্যন্ত বেশী দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে বিলাতী অবস্থা-গুলি যাহাতে আমাদের গ্রাস না করিতে পারে, তাহাতে বিশেষ সাবধানতা চাই।

তুমি ও আমি

দীপঙ্কর—কলিকাতা

কত ছলে তুমি ছলনা করিছ আমারে—
এই মনে করি নাই
কাছে তুমি নাই
শিশু হয়ে এসে চলিবে যখন,
ছুঁয়ে যাও প্রাণ ভরে দাও মন,
চমকিয়া জাগি ভরেছ কি তবে
শুধাই আমারে ফিরিয়া?
যে দিবেই চাই সেথি তুমি আছ
মোর পাশে মুখ ফিরিয়া!

ওগো আবার মোরাপরা যায় ভাসিয়া
তোমারে পাবার পিয়াসা—
আকুল পিয়াসা
কথায় মন ভুলিয়া ভুলাব,
মন-মরম যাচি করি যাব যাব,
প্রাণ-বঁধুয়ে তোলে পরাব।
"চাই তোমারেই চাই—
তোমার ছিন্ন পরশ না পেলে
শান্তি যে মোর নাই।"

(২)

কত ভাবে আমি তোমারে চাহি সো ধরিতে—
ধরি, নাই দিলে দেখা
দেখা একা একা
অনেক ছিনার মাঝারে আসিয়া,
অনেকের মুখ উঁকিয়া ভাসিয়া,
মনে আড়ালে একের তোমায়
জাগাইয়া তোলো নীরবে—
পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব মিটাই
ভরে যায় প্রাণ গরবে।

এমনি করে কি খেলা অ-তোমায় ঘুরে
তোমায়ই মোরে তোমায়
ছলে-তোমায়?
যবে পরে পাই বিরহ পরশ,
ক্ষণে টুটে যায় ঘর মরম,
হাসি-কান্নার চির বন্ধনে
কেঁদেছ আকুল করিয়া—
মরমে জীবনে বিরহে মিলনে
খেলা চিরকাল ধরিয়া।

যৌবনের অভিসার

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী—কলিকাতা

"যৌবন-বিহঙ্গ আয় পাখী—সবুজ শ্রী সবুজ"

পাখী ছায়ায় মায়া খুঁজিলেও যৌবন আসিবে না। বাঙ্গালীর যৌবন চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী বৃদ্ধ হইয়াছে।

যৌবনের ধর্মই হইতেছে অনির্দ্দিষ্টকে বরণ করা—বাঙ্গালী আজ অনির্দ্দিষ্টের মধ্যে—অজানার উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করিতে ভয় পায়। তাহার হৃদয়ের বল কমিয়াছে—পা পঙ্গু হইয়াছে। বিধিনিষেধ ও আচারের নাগপাশে অষ্টেপৃষ্ঠে শরীরে বদ্ধ হইয়া বাঙ্গালীর যাত্র-পা নাড়া বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে।

এমনিন বঙ্গোপসাগরের প্রেমের সন্ধানীর আহ্বানে বাঙ্গালী বাহিরিয়াছিল। আ-চন্দ্রার্কে কোল দিয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে মুক্তমুক্ত কীর্ত্তনের রোলে বাঙ্গালী তাহার প্রাণের পরিচয় দিয়াছিল।

আর একবার বাঙ্গালী বাহিরিয়াছিল—রামমোহনের ডাকের আহ্বানে। বহুশতাব্দী ঘুমাইবার পর সভ্যতালোক হইতে লোকের চোখে যেমন ধাঁধা লাগে—সে আলোকেও তাহাই হইয়াছিল। বাঙ্গালী আঁখিয়া অন্ধ অনুকরণে তাহার সভ্যতালোক চেতনাকে বিমোহিত করিয়াছিল। তারের পর হইতেই বাঙ্গালীর আর ঘুম আর জাগরণ নাই—কখনও সে পা ছোড়া দিতেছে কখনও বা সে হাই তুলিতেছে—একেবারে ঘুমের ঘোর কাটিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।

বিংশীয় জাগরণের মূলে—যৌবনের প্রেরণায় যে সব যুব-বাঙ্গালী মুসলমান—বাঙ্গলা ছাড়িয়া প্রবাসে আসিয়া বস পাতিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরাই আজ বারাণসী, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, রামপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন :—বাঙ্গলার যৌবন-অভিসার যদি কোথাও সার্থক হইয়া থাকে—তবে এইখানেই সেই সার্থকতার পরিচয়।

প্রবাসী বাঙ্গালীর সাথে বাংলার অন্তরের যোগসূত্র এখনও সংরক্ষিতই আছে। বাংলার আধীন যৌবনের সমস্ত অনুষ্ঠানেই প্রবাসী বাঙ্গালী সাড়া দিয়াছে। বাংলার শিক্ষা, বাংলার দীক্ষা, বাংলার সাধনা, আজ প্রবাসী বাঙ্গালী সর্ব্বত্র ছড়াইয়া—বাংলার বাহিরে বৃহত্তর বাংলা গঠিত করিয়াছেন।

বাংলার দূত প্রবাসী বাঙ্গালীই রাখিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের বিয়োগের শোকে বাংলা এখনও জর্জ্জরিত—তবোও বিশ্বে বাংলার যৌবনোল্লাসে দেখা দিয়াছে। দুইনীতিক বিদেশী শক্তির কূটে রাজনীতির চালে অন্ধ হইয়া বাঙ্গালী ভাইয়ের বুকে ছুরী মারিতেছে :—বাংলার পল্লী শ্মশানে পরিণত হইতেছে—বাংলার অধীনার ঘর ছাড়িয়া কলিকাতাবাসী হইয়া বিলাসে-ব্যসনে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ উজাড় করিতেছেন। পল্লীর সে জাগরণ

নাই—বঙ্গীয় নিধিরে বাংলার পল্লীতে আর চণ্ডী বা ঔরঙ্গজেব মুসলমান বোল উঠে না—সেখানে গ্রামে গ্রামে শিক্ষার প্রসার অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বাংলার গৌরব, বাঙালীর গৌরব—গ্রামে গ্রামে যে সব চৌল ছিল—তাহার অস্তিত্বও বাংলার পল্লীতে পাওয়া যায় না। বাংলার চতুর্দিকে বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়মান—হয়ত বাঙালী ইহাতে লুপ্ত হইবে কিম্বা এই সব আবর্জনা ঠেলে ফেলিয়া বাংলার বাঙালী চিরজাগ্রত হইয়া অমর হইয়া যাইবে। বাংলার এই যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রবাসী বাঙালীরাই বাংলার একমাত্র আশা-ভরসা স্থল। আপনারা সুযোগের একটি ক্ষুদ্র বোধ হয় জানেন—রাজা রেমাপদ ও যদু নামে দুইজন অতি বাঙালকুমার বিলাতে তপস্যা করিতেছেন—তাহারা আই-সী-এস প্রতিষ্ঠা করিবেন।

সেইরূপ বাংলার দুর্দিনে আসিয়া উঠিলে প্রবাসী বাঙালীরাই বাংলার শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিভূ হইয়া বাঙালীকে বাঙালীর শিক্ষা দিবে এই আশা প্রবাসী বাঙালীর মনে অন্ততঃ জাগরূক থাকা দরকার।

আজ বাংলার যেখানে বিদেশী ধনিকের মেশিনগান ও গুরখা সৈন্য বাস লইয়া বাঙালী মুসোৎসব সম্পন্ন করিল, সেইখানে প্রবাসী বাঙালী নিরস্ত্রভাবে মনের আনন্দে নিশ্চিন্তমনে মাতৃপূজা সমাপন করিবেন। ইহা কি প্রবাসী বাঙালীর কম গৌরবের বিষয়?

কিন্তু প্রবাসী বাঙালীর এই আনন্দ-উৎসবের অন্তরালে তাহার মুখে বিষাদ-কালিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা না থাকিলেও প্রাদেশিকতার আসরে প্রবাসী বাঙালীর নিমন্ত্রণের আসন ম্লান করিয়া দিয়েছে! কিন্তু আমি বলি, আপনারা যে সুযোগ প্রাক্-মহাযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে এই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে পরাজয় অপেক্ষা জয়ই আপনাদের নিকট হইবে। কারণ আপনাদের মধ্যেই তাহাদের কর্মতৎপরতা ও যৌবন-দীপ্তি বিদ্যমান। আপনারা নিরুপায় হইবেন না—যখন প্রবাসী বাঙালী নিজীব হইয়া নিজেদের দাবিদাওয়া করুন, আপনাদের উদ্যমে বিপ্লব-সঙ্কুল আপনাদের কর্মধারা দিবেন। তখন প্রবাসী বাঙালীর চাই যেমন উৎসাহ—উদ্যম ও কর্মতৎপরতা—আপনাদের তাহার অভাব নাই—অন্তত সেই কথা আপনাদের প্রতিশ্রুতি।

প্রবাসী বাঙালীর যখনে বীরত্বাদ কেমিয়া মনে খুব আঘাত লাগিল।—যেখানে নিজ জাতিভাগী অর্থাপনে দিন কাটাইতেছে—সেখানে বিপ্লবের যেসন্ধ্যা কি চমৎকার হইতে পারে?

হয়ত বা প্রবাসী বাঙালীর যেনাবসী যৌবনের চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে—কিন্তু প্রবাসী বাঙালীর ইহা ভুলিলে চলিবে না যে বাংলার আজীয় জীবনের প্রাণ-বৃহৎ আপনাদের মধ্যে না উঠিলে বাংলার সব সাধনা ব্যর্থ হইবে।

আপনাদের বিজয়া-সম্মিলন সার্থক হোক। যেন এবছর বাঙালী বিজয়-আনন্দে মাতিয়া—সমূহ-সাধে মন্থিনী চরণ সন্ধ্যাকে সত্য সত্যই নিজ ঘরে চিরমন্থিনী করিতে পারেন! প্রবাসী-বাঙালী তাহার সহায়তা করিবেন।

বিজয়া সম্মিলনীতে প্রবাসী বাঙালীর প্রতি আমার ইহাই সম্ভাষণ অভিভাষণ।

প্রবাসী-বাঙ্গালী ও প্রদেশবাসী

[শ্রীঅমৃতলাল শীল—এলাহাবাদ]

দুই তিন বৎসর হইল একখানি বাংলা মাসিক পত্রে জনৈক বিদুষী লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা-মাতা দুজন অবশ্যনিবাসবাসী, কিন্তু তাঁহারা—আমা-তরীয়া—বরাবরই প্রবাসগত করিয়াছেন, অতএব বরাবরই তাঁহাদের মাতৃভূমি ও বাঙ্গলা ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা। সে সময়ে অনেকেই লেখিকার এই উক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় প্রবাসী-বাঙালীরা এ রীতি অবলম্বন করেন নাই, কলিলে আজ এ সভাতে এতগুলি প্রবাসী বঙ্গভাষাভাষী দেখিতে পাইতাম না।

* সাহিত্য বিজয়া-সম্মিলনী অধিবেশন পঠিত

প্রবাসী-বাঙ্গালীদের মধ্যে সকলে বাঙ্গলা ভাষা শিখা ও অনুশীলনের সমান অবসর ও সুযোগ পান না। প্রধান কারী ইত্যাদি নগরের প্রবাসী অবস্থা বাসাবস্থা হইতে আসলা স্কুলে পাঠ অভ্যাস করিবার সুযোগ পান, কিন্তু যাঁহারা এমন সময়ে প্রবাসী যেখানে মাত্র ২।৩ ঘর বাঙ্গালীর বাস ও যেখানে বাঙ্গলা স্কুল নাই, তাঁহাদের কেবল পিতা-মাতার কাছে মাতৃভাষা শিখা করিতে হয়। কাশী ও বৃন্দাবনের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ প্রদেশে প্রায় ২২৫ বৎসর বাস করিতেছেন, এমন অনেক বাঙ্গালী পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা নানা প্রকার অসুবিধা ও বাধা-বিঘ্ন-সত্ত্বেও অসাধারণ যত্ন-আদর অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি কোনও কালে তাঁহারা অনুভব করেন নাই যে, যুক্তপ্রদেশ জন্মস্থান বলিয়া এদেশের ভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গালীরা মাতৃভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্বতন্ত্রপ্রিয়।

এ-দেশের প্রবাসী-বঙ্গ-সন্তানকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম :—যাহারা বঙ্গের বাহিরে—প্রবাসে—জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশেই শিক্ষিত হইয়া এখন এই দেশেই বাস করিতেছেন। তাঁহারা জানে অন্য দেশে গিয়া থাকেন বা অন্যত্র প্রয়োজন না হইলে যাইবার সুযোগ পান না, বা কখনও দেশে যান নাই। অনেকের দেশে বাড়ী-ঘর-দ্বারও আর নাই, অথবা জ্ঞাতিদের কবলে পড়িয়া অধিকার-চ্যুত হইয়াছে।

দ্বিতীয় :—যাঁহারা বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়া, বঙ্গেই বাল্যাবস্থায় শিক্ষিত, তারপর চাকরি অথবা ওকালতি বা ওকালতি ইত্যাদি ব্যবসায় উপলক্ষে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন, বৃদ্ধাবস্থায় দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু সে সময়ে যদি তাঁহাদের পুত্রেরাও এদেশেই চাকরি অথবা জীবিকা-অর্জন করিবার উপায় পান, তবে হয়ত এখানেই থাকিয়া যাইবেন। অনেকে বহুকাল এ-দেশে বাস করিবার পর বৃদ্ধাবস্থায় দেশের আত্মীয়দিগের সহিত সংশ্রব রক্ষা করিবার জন্য অনিচ্ছায় এ-দেশে থাকিতে বাধ্য হয়েন।

তৃতীয় :—যাঁহারা অল্প কিছুকাল পূর্বে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বা অস্থায়ী পরিবর্তনের চাকরির জন্য আসিয়া বাস করিতেছেন ও শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করেন।

প্রবাসী-বঙ্গ-বাসীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর লোক অতি অল্প ; তাঁহাদের বাদ দিয়া কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য।

আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাই যে, পূর্বে এ দেশে যে বাঙ্গালীরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এ-দেশবাসীর কাছে যেরূপ সম্মান পাইতেন, আজকাল বাঙ্গালীরা আর সে সম্মান লাভ করেন না ; এ-দেশবাসীরা এখন বাঙ্গালীদের বিদেশী, অধিকাংশ প্রবেশক (interloper) মাত্র-পরা বলিয়া ও পর ভাবেন ; তাঁহাদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন ; বাঙ্গালীদের এ দেশে চাকরি পাওয়া বা জীবিকা অর্জন করা কঠিন হইয়াছে, ইত্যাদি।

দেখিতে হইবে, এ সকল কথা কতদূর সত্য, যদি সত্য হয় তবে তাহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্বে এ দেশে যে বাঙ্গালীরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই কাশী অথবা বৃন্দাবনে টোখবাস করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোনও ভাবে এ-দেশবাসীর অন্ন-সংস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েন নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্বে কাশীধামে বাঙ্গালীরা যান করিতেন, তাহার প্রমাণ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জীবন ইতিহাসে জানিতে পারি। বৃন্দাবন ইহার পঞ্চাশ পঞ্চাশীর দেখাদেখি প্রকৃত বঙ্গ-জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে মহাপ্রভু-প্রেরিত বাঙ্গালী গোস্বামীরা আধুনিক বৃন্দাবনের তীর্থস্থানগুলি পুনরায় আবিষ্কার করিয়া আধুনিক প্রাসাদোপম মন্দিরগুলি স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রদেশের অন্য সকল তীর্থের পাণ্ডার অধিকাংশ বাঙ্গালীর আধিপত্য হইয়াছে। সেকালে এদেশের অধিবাসীরা ইংরাজি ভাষা শিখা করেন নাই, অথচ দরবারী অফিসে অধিক আয় ভাবে

ইংরাজিতে হইত। অবশ্য ইংরাজ রাজ চেষ্টা করিয়া বাঙ্গলা হইতে ইংরাজি ভাষাতে শিক্ষিত যুবকদের আনিয়া এদেশে বাস করাইয়াছিলেন; সে সময়ে আমরা বাঙ্গালীরা যে কেবল চাকরি করিয়া আপনার উদর পালন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা নানা প্রকারে এ-দেশবাসীদের উন্নত ও শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যেখানে ৮।৯টি বাঙ্গালী ছিলেন, সেখানেই তাঁহারা সভাসমিতি স্থাপন করিয়া, অবসর কালে বিদ্যা দান করিয়া পাঠাগার, পুস্তকালয়, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়া এ-দেশবাসীর উন্নতির পথ-প্রদর্শক ও বন্ধুবান্ধবের কাজ করিয়াছিলেন। ক্রমে এ-দেশবাসীরাও ইংরাজি ভাষা শিখা করিলেন, তাঁহাদের আর তখন সাহায্যের প্রয়োজন রহিল না। যখন এদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ খোলা হইল, তখন বাঙ্গালী ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী ছিল। আমি যখন এণ্ট্রান্সে 'সিনিয়র ক্লাসে' প্রবেশ করি, সে বার অন্যূন্যাধিক ৩৫০ ছাত্র-সংখ্যা বেশী হইয়াছিল, অর্থাৎ সেই সময় ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির আরম্ভ। আমরা ৩০ জন ছাত্র প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে এণ্ট্রান্স প্রবেশ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ১২ জন বাঙ্গালী। সে সময়ে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে মুসলমান ও পুরাতন মিলাইয়া মাত্র ১২ জন ছাত্র ছিলেন। এখনকার কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ও বাঙ্গালীর সংখ্যা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যান্যে এখন বাঙ্গালী ছাত্র-সংখ্যা অতি অল্প; অর্থাৎ বাঙ্গালীদের সংখ্যা অতি অল্প বাড়িয়াছে, ও এ-দেশবাসীর সংখ্যা অনেক বেশী বাড়িয়াছে। পাঠ্যের ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হইয়াছে। আমরা এফ, এ, অর্থাৎ ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত একটি দ্বিতীয় ভাষা শিখিতে বাধ্য ছিলাম। বাঙ্গালীরা অধিকাংশ পার্শী শিক্ষা করিতেন, বেশীর ভাগ হিন্দী ও সংস্কৃত পড়িতেন। এখন দ্বিতীয় ভাষা নাই বলিলেই হয়। এখন বাঙ্গালী ছাত্রেরা বেশীর ভাগ বিজ্ঞান বিভাগে অর্থাৎ বি, এস সি, শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তাহারা বি. এ. পড়িলে তাঁহাদের অনেকে দ্বিতীয় ভাষা অতি অল্প ছাত্রেরা গ্রহণ করেন।

এদেশবাসীরা 'হিন্দুস্থানী' বা হিন্দী ভাষাকে কথা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেখার ভাষা দুই প্রকার; যাহারা সংস্কৃত পড়া বেশী ব্যবহার করেন ও যেখানের অক্ষরে লেখেন তাঁহাদের ভাষাকে হিন্দী বলে, কিন্তু যাঁহারা পার্শী ও অরবী শব্দ বেশী ব্যবহার করেন ও পার্শী অক্ষরে লেখেন, তাঁহাদের ভাষাকে উর্দু বলে। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ বাঙ্গালী ছাত্রেরা এই দুই ভাষার কোনটি শিক্ষা করেন না। এলাহাবাদ যেখানে ইত্যাদি স্থানে—যেখানে স্কুলে বাঙ্গলা পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, অধিকাংশ বাঙ্গালী ছাত্রেরা মেট্রিক পর্যন্ত বাঙ্গলাতে অনুবাদ করেন, সুতরাং আর দ্বিতীয় ভাষার প্রয়োজন হয় না। যে স্থানে স্কুলে বাঙ্গলা পড়াইবার ব্যবস্থা নাই সেখানে তাঁহারা মেট্রিক পর্যন্ত হিন্দীতে অনুবাদ করেন, কিন্তু হিন্দী-সাহিত্য শিক্ষা করিতে বাধ্য নহেন। আমাদের সময়ে কিন্তু অন্য প্রকার ব্যবস্থা ছিল। পূর্বে বলিয়াছি, আমরা ১৩টি বাঙ্গালী ছাত্র এণ্ট্রান্স প্রবেশ করি, তাহার মধ্যে পাঁচ জন ইণ্টারমিডিয়েটে পার্শী পড়িয়াছি, বাকি ১২জন সংস্কৃত পড়িয়েন। এখন বাঙ্গালী ছাত্রদের এ দেশে পার্শী শিক্ষা করিতে প্রায় দেখা যায় না; হিন্দী সাহিত্যও তাঁহারা শিক্ষা করেন না, অথবা বাঙ্গালীদের মতো হিন্দী সাহিত্য-শ্রেণীর ছাত্র-সংখ্যা এত অল্প—যে নাই বলিলেই হয়। ফল এই হইয়াছে যে এখনকার প্রবাসী-বাঙ্গালী যুবক এদেশবাসী সমবয়স্কদের মতো হিন্দী ভাষায় এদেশের সাহিত্য-চর্চা করিতে পারেন না, বা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারেন না। আমি প্রবাসী যুবকদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা তুলসীদাস, কবীর, মীরাবাঈ ইত্যাদি নাম ইত্যাদি ইতিহাসে পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু সুরদাস, কেশব, পদ্মাকর, বিহারীলাল, ইত্যাদি হিন্দী ভাষার কবির, অথবা মীর, সৌদা, নজীর, জৌক, চকবস্ত ইত্যাদি উর্দু ভাষার কবির নাম শুনেন নাই। তাহারা যে কেবল এদেশের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকদের নাম শুনেন নাই, যা সাহিত্য-চর্চা করেন নাই, তাহা নহে। দুঃখের ও লজ্জার বিষয় যে, তাঁহাদের অনেকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত সাধুভাষাতে

কথা বলিতেও অক্ষম, যাহারা বিশুদ্ধ উর্দু বা হিন্দী বলিতে অথবা বুঝিতে পারেন না। অবশ্য, যেসব প্রবাসবাসীকে কথা বলিতে হয় বটে, কিন্তু ঐ ভাষা যাহাতে বাজারে চলিত হইলেও হিন্দী বা উর্দু কোনও ভাষার নিজস্ব সম্প্রদায়ে বাঙ্গালীর উপযুক্ত নহে। সোজা কথায়, প্রবাসী বাঙ্গালীরা এদেশের নিজস্ব সমাজে বা সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করিতে অক্ষম।

• আমি স্বীকার করি আমার ভুল হইতে পারে, তথাপি আমার বন্ধুস্থানীয়, এদেশবাসী যুবকরা প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকদের সহিত মেলামেশা করিতে অনিচ্ছুক বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হয় না; বরং বলা উচিত যে, বাঙ্গালী যুবকরাই এদেশবাসীর সহিত মিশিতে অনিচ্ছুক। যেখানে এলাহাবাদ ইত্যাদি নগরে, যেখানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা বেশী, যেখানে বাঙ্গালীদের সভা, সমিতি, পুস্তকাগার, বক্তৃতাগার, ক্লব (club) সম্প্রদায় সবই এদেশবাসীর সভা-সমিতি ইত্যাদি হইতে পৃথক। উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান অতি অল্প, অতএব উভয়ের মধ্যে শ্রীবিবর্তন সম্ভব হইতে পারে না। যে সকল স্থানে বাঙ্গালীদের সংখ্যা অতি অল্প, সেখানেও বাঙ্গালীরা একান্ত প্রয়োজন না হইলে প্রায় এদেশবাসীর সহিত মিশিতে চাহেন না, অতএব আদান-প্রদান থাকিলেও লেনদেন হয় না। এ ভাব যে কেবল যুবক ভাবাপন্নদের মধ্যেই নিবদ্ধ, তাহা নহে। প্রবাসী বাঙ্গালী যুবকের বাড়ী নিমন্ত্রণে, পরস্পরে আসে, উৎসবে, বা কোনও সামাজিক ক্রিয়াতে এ-দেশবাসীর নিমন্ত্রণ হয় না। যেখানে বাঙ্গালী অল্প, সেখানে তাঁহারা নিজে হইতে এদেশবাসীদের বাঙ্গালীদের সমবায় করিতে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু বাঙ্গালীরা এ-দেশবাসীর সমবায়ে যোগদান করেন না। যেখানে বাঙ্গালীদের দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, ইত্যাদি হয়, সেখানে এ-দেশবাসীদের প্রথমে "প্রবেশ নিষেধ" বা বলিলেও কার্যতঃ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হয় না; অর্থাৎ বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠা-দর্শন করিতে ও প্রসাদ পাইতে সাধারণ নিমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু অতি বিরল এদেশবাসী প্রতিবাসীদেরও সে রূপ নিমন্ত্রণ করা নিয়ম নাই। যাঁহারা যেখানে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠা-দর্শন করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীরা সমাদৃত হয়েন, কিন্তু এদেশবাসীরা উপেক্ষিত হয়েন, বা উপযুক্ত সমাদর লাভ করেন না। এমন অবস্থায় এদেশবাসীরা যদি বাঙ্গালীদের সম্পূর্ণরূপে পর বা অনধিকার প্রবেশক (interloper) মনে করেন, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যাইতে পারে না।

এদেশবাসীদের মূলস্থানেরা ৩ রকম হিন্দুস্থানী, বিশেষতঃ তাহার মধ্যে অধিকাংশ উর্দু ভাষার পক্ষপাতী। আধুনিক উর্দু ভাষায় সাহিত্যিক ও কবিদের অগ্রে হিন্দু লেখক ও কবির সংখ্যা অল্প নহে; তাঁহাদের সরল ও সরস রচনা উর্দু সাহিত্যে স্থায়ী স্থান পাইয়াছে ও পাইতেছে, কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী তাঁহাদের রচনা অথবা কবিতার ভাষা বুঝিতে পারেন, বা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারেন? এদেশের জলবায়ুতে বিদেশী পর মাত্রেই হয় পুং নয় ক্লীবলিঙ্গ, তাহাদের স্ত্রীলিঙ্গেরও ঐ প্রকার লিঙ্গভেদ হয়, কিন্তু বাঙ্গালাতে ঐ রূপ ভেদ নাই। শিক্ষা অভাবে প্রথম শ্রেণীর প্রবাসীরাও কথা কহিবার সময়ে ভুল করিয়া এদেশবাসী স্ত্রীলোকের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের ভাষা শিক্ষার চেষ্টার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে, নূতন আগন্তুক বাঙ্গালীরা এ রূপ ভুল করিলে এদেশবাসীরা তখনই ভুল ধরিতেন না, বা উপহাস করিতেন না; কিন্তু এদেশে অল্পদিন করিয়া, এখানেই শিক্ষালাভ করিয়া ঐ প্রকার ভুল করিলে, তাহা কখনই উপেক্ষিত হইতে পারে না।

আমাদের যখন এদেশে বাস করিতে হইয়াছে, ও এদেশবাসীর সহিত যখন সদ্ভাব অর্জন করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তখন তাহাদের ভাষা শিখিতে হইবে, তাহাদের সহিত মন খুলিয়া মিশিতে হইবে, তবে উভয়ের শ্রীবিবর্তন সম্ভব হইবে। যদি আমরা এদেশবাসীর কাছে সমাদর আশা করি, তবে প্রথমে আমাদের তাহাদের প্রতি সমাদর দেখাইতে হইবে, নতুবা কখনই সফল হইব না। আমাদের মধ্যে অনেকেই এদেশবাসীকে সমাদর করা দূরের কথা, অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া

পড়িয়াছেন। এদেশবাসী হিন্দুদের জন্য "ফেচ্ছা" "খোট্টা" ইত্যাদি ও মুসলমানের জন্য "নেড়ে" শব্দের প্রয়োগ অনেকের মুখে শুনিয়া লজ্জিত হইতে হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাদের আমরা এরূপ অবজ্ঞা ও অপমান করিতে অভ্যস্ত, তাহারা কখনই আমাদের সম্মান করিতে পারে না। তাহাদের সহিত মিশিতে হইলে, শ্রীবিদ্ধাপন করিতে হইলে, আমাদের অগ্রসর হইয়া তাহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাহাদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া শ্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে হইবে, তবে আমাদের সহিত অবশ্যই বন্ধুত্ব হইবে, তাহারা আমাদের মধ্যে সম্মানীয়ের সম্মান করিবে। এদেশবাসীরা অপমানিত, অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়া কখনই গায়ে পড়িয়া আমাদের সহিত মিশিতে আসিবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে, যখন প্রথম বাঙালীরা এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সে-কালের রাজপুরুষদের বক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন, ইংরাজি বিদ্যার বলে সামান্য কেরাণী হইলেও রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতার বলে তাঁহারা দেশের ও দশের মাথা প্রকারে উপকার করিয়া শ্রীতিভাজন ও সম্মানিত হইয়াছিলেন; এখন এদেশে যথেষ্ট ইংরাজি-শিক্ষিত লোক হইয়াছে, দিন দিন সংখ্যা বাড়িতেছে; বাঙালীরাও পূর্ব্বেকার মত রাজপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতা হারাইয়াছেন, অতএব ইচ্ছা থাকিলেও দেশের ও দশের উপকার করিতে সক্ষম হইতেছেন না, তখন আমাদের পূর্ব্ব সম্মান আশা করা কেবল বৃথা নহে, অহিতিকরও বটে। এদেশে বাস করিতে হইলে এদেশের ভাষা ও সাহিত্য শিখিতে হইবে। আমাদের পুত্র-কন্যাদের কেবল ইংরাজি ও বাঙলা শিখাইলে যথেষ্ট হইবে না, তাহাদের হিন্দী অথবা উর্দু অথবা উভয় ভাষা শিখা দিতে হইবে। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে ছেলেদের এতগুলি ভাষা শিখাইতে হইবে, তাহাদের মোদক অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কথা সত্য, কিন্তু সকল রাখিতে হইবে, যে ইংরাজি যেমন রাষ্ট্রভাষা রাজভাষা, না শিখিলে উপার্জ্জনক্ষম হইবে না; বাঙলা যেমন মাতৃভাষা, অতএব শিখিতেই হইবে, সেইরূপ হিন্দী বা উর্দু, দেশের ভাষা, অতএব ইহাও শিখিতেই হইবে, না শিখিলে চলিবে না, দেশে বাস করা যায় হইবে, আমরা চিরকাল বিদেশী অনধিকার-প্রবেশক থাকিয়া যাইব, দেশের লোক কখনই আমাদের সহিত সহানুভূতি করিবে না বা করিতে পারিবে না। আজকাল এদেশে স্কুল কলেজে হিন্দী ভাষা শিক্ষার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতে ইংরাজি সাহিত্য ছাড়া অন্য সকল বিষয় হিন্দীতে শিখিতে হইবে। বাঙালীদের স্কুলে শিক্ষার বাহন বাঙলা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ স্কুল সমস্ত যুক্তপ্রদেশে কটি আছে? প্রবাসী-বাঙালী ছাত্রদের অধিকাংশকে এদেশের ছাত্রদের সহিত এদেশের স্কুলেই পড়িতে হয় ও হইবে। আমাদের সে সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমাদের পুত্র-কন্যাদের বাল্যে অন্য মাতৃভাষা শিখা দিয়া, স্কুল পাঠ্য শেষ করিবার পর তাহাদিগকে বাঙলা-সাহিত্য শিখিতে উৎসাহিত করিতে হইবে। আজকালকার ইউরোপ ও আমেরিকার বহু গ্রাজুয়েট্ পণ্ডিতেরাও বাল্যে একটার মাতৃভাষা শিখা করেন, স্কুল পাঠ্য শেষ করিয়া যৌবনে ইচ্ছা, রুচি ও প্রয়োজন অনুসারে নানা ভাষা শিখা করেন। আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে।

আমাদের কেবল পুরুষের হিন্দী শিখাইলে যথেষ্ট হইবে না। আমাদের কন্যাদের যেমন বাঙলা শিক্ষা দেওয়া চাই, সেইরূপ বিশুদ্ধ হিন্দী কহিতে ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলারা যেমন মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসাস্বাদন করিতে পারেন বা ৫।৬ জন একত্রিত হইয়া আলোচনা করিতে পারেন, সেইরূপ হিন্দীর প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের কবিতার রসাস্বাদন ও আলোচনা করিবার ক্ষমতার্জ্জন করা তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা এদেশের শিক্ষিতা মহিলা ঔহাদের সহিত মিশিবা কখনই সুখী হইবেন না, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত মিশিতে চাহিবেন না।

আজকের জীবিকা অর্জন করা এখন বহুদূর গড়িয়াছে —এখন কেবল প্রবাসী বাঙালীর পক্ষেই প্রযোজ্য নহে। জীবিকা-অর্জন, সংগ্রাম-সমস্যা ভারতের সকল প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই সমান জটিল হইয়াছে, ও দিন দিন জটিলতর হইতেছে। আমরা জীবিকা অর্থে প্রায়ই কেরানী-গিরি চাকরি বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। যদিও পূর্বাপেক্ষা এখন সওদাগরী ও বেসওদাগরী আপিস প্রভৃতির কেরানীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, তথাপি প্রত্যেক ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তি যে কেরানীর পদকে জীবনের একমাত্র বিবেচনা করেন, তাহা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কোন কালেই সফল হইতে পারে না। এখন এ-দেশবাসীরাও ইংরাজি শিখিয়াছেন ও শিখিতেছেন; তাঁহাদের আপনাদের দেশের, বাসস্থানের কেরানীর পদগুলিতে তাঁহাদের দাবী হইতে পারে, অন্যত্রগুলি হইতে আমরা প্রবাসীর জন্য হইতে পারে না, এবং উচিতও নহে। এখনও এখানকার সওদাগরী অফিসে প্রথম শ্রেণীর প্রবাসীরা চাকরি পাইতেছেন ও যদিও এদেশে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও এ-দেশবাসী বহু ছাত্রেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ছোট-বড় সকল প্রকার চাকরির উপযুক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তথাপি প্রতি বৎসরই দেখিতে পাই যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবাসীর সংখ্যা বাড়িতেছে, অথচ এখন বাঙালীরা এ দেশে চাকরি পাইতেছেন না, এ কথা ঠিক নহে। অথচ, আমরা যেমন কেরানীর পদগুলি বাঙালীদের একচেটিয়া ছিল, এখন এ-দেশে বিস্তার বিস্তারে, প্রতিযোগিতা বুঝি বড়ই আর সে রূপ নাই, থাকিতেও পারে না। আমার বেশ মনে আছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের ইডেন অফিসের অধীনে চাকরীর পশ্চিমে দিল্লী পর্যন্ত প্রায় ৬০০ মাইল রেলে, ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং, ষ্টেশনমাষ্টার, ষ্টাফ ইত্যাদি সকল বিভাগ মিলাইয়া এক কালে—প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে—ইংরাজ ছাড়া দেশের সম্ভ্রান্ত বাঙালী ছিলেন, যদি সব বাঙালী ছিলেন, যদি সব বাঙালী। অবশ্য সে কাল আর নাই, থাকিবারও আশা করাও অন্যায়।

প্রবাসী বাঙালীদের—কেবল প্রবাসী বাঙালীদের কেন, সমস্ত ভারতবাসীর এখন কেবল কেরানীগিরি বা ডাক্তারির জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় বিবেচনা না করিয়া, শিল্প ও বাণিজ্যের মন দিতে হইবে। তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে, চাকরিতে যতই উচ্চ পদ লাভ করুন না কেন, চাকরি ব্যবসায়ের তুলনায় হীন। বাণিজ্যে অপেক্ষা স্বাধীনতার মূল্য বেশী, অতএব সম্মানও বেশী। যদিও সকলেই অর্থের বিনিময়ে পরিশ্রম করে, তথাপি একজন মাসিক বেতন-ভোগী কেরানী অপেক্ষা এক জন ইংরাজ বেতন-ভোগী সওদাগরী আপিসের মুৎসুদ্দী, অতএব সম্মানীয়; আবার একজন দোকানদার বুঝি অথবা ফেরিওয়ালা হকার (hawker) আরও স্বাধীন, অতএব আরও সম্মানীয়। ইউরোপ ও আমেরিকা পরিশ্রমের সম্মান (dignity of labour) বুঝিয়াছে আমরা বুঝি নাই, তাহাই আমাদের আমাদের এবং ছাত্র বলিলে অপমান-সূচক গালি বুঝায়। অবশ্য এ সকল কথা কেবল মুখে বলিলে কোন ফল হইবে না; প্রথমে ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে জীবিকা-অর্জনকে সম্মান করিতে শিখিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। *

দিল্লীতে দুর্গোৎসব

শ্রীবাণিনীকান্ত সোম—দিল্লী

বাঙালী বিদেশে বেড়িয়ে অন্য যাই ভুলে থাকু, সে তার জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবের কথা ভুলে যায় নি। যাদের বাড়িতে এখন বাঙালী-সমাজ আছে, সেখানে প্রতিবৎসর শ্রীদুর্গার আবাহন না হয়।

মজুরের আশা এই যে কিসটি যায় বিনা, এ আমাদের কি কলাগাছ না কিনে যায়! শুভক্ষণের আবির্ভাব, বন্ধুর শ্রীবৃদ্ধি, প্রিয়জনের ভালবাসা, এত সব শুভ জিনিষের একত্র সমাবেশ আর কি কোন উৎসব থেকে আমরা পাই! আমি দিল্লীর কথাই বলি। আমরা বন্ধুরা এক-যোগে কর্মজীবন যাপন করে আমরা দুর্গোৎসবের আনন্দে যখন মেতে উঠি, তখন তা কি ভুলবই বা কেমন করে। আমাদের

* প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

কাশীতে বিজয়ার দৃশ্য

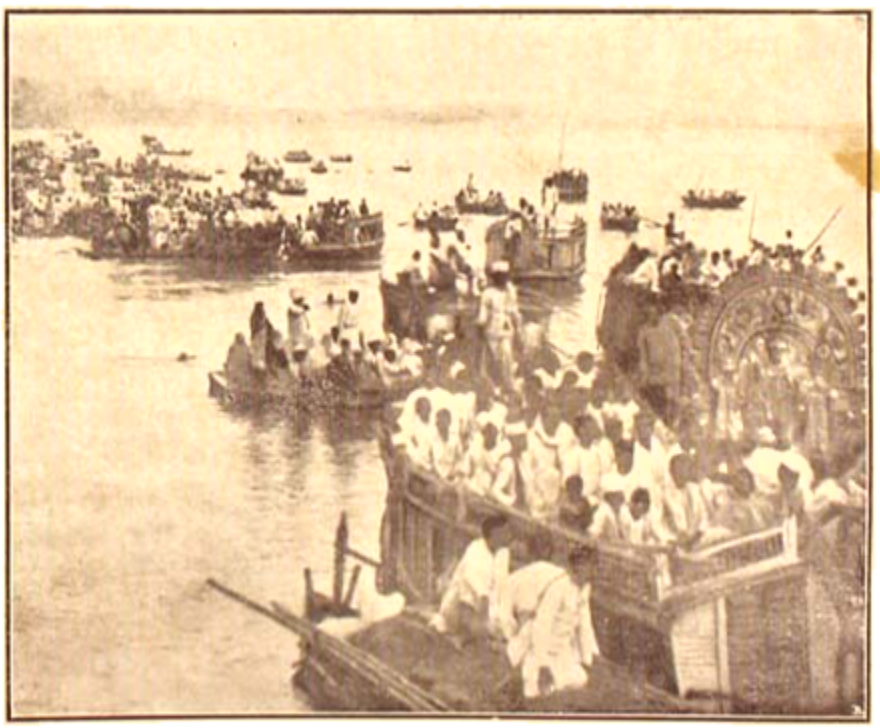

প্রতিমা-বিসর্জন।

খোকা-খুকুরা যখন হুটোপাটি, ধাপাধাপি করে বেড়ায়, অভিভূত ছেলেমেয়েগুলি সব মন্ত্রমুগ্ধের মতো নির্নিমেষ-নয়নে ছুটন্ত ফুলের মতো যখন উৎসব-প্রাঙ্গণে খেলে বেড়ায়, তখন তাদের দেখে কবির এই কথাগুলি কেবল মনে হয়—

(দেবি) ইহাদের চক্ষে নাহিরাজ।
সদা ইহাদের মুখে হাস্যরেখা,
সকলে একত্র মনে,
ইহাদের কর্ম সাধিবারে।

এই তিনটি দিন প্রায় ফুলে মাতামাতি করে বিদায়ের দিনে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে তারপর নতমস্তকে শান্তিবারি নিয়ে, তাই তাই খোকাখুকি করে গুরুজনের আশীর্বাদ মস্তকে নিয়ে, যখন গৃহমধ্যে ফিরি, তখন মনে হয়, তাই তো, এত শীঘ্র ফুরিয়ে গেল! এত আয়োজন তিন দিনেই শেষ হয়ে গেল। উৎসব তিন দিনেই ফুরিয়ে যায় বটে, কিন্তু এই তিনটি দিনেই কি সারা এক বছরের জন্য শক্তি-সঞ্চয় ও কল্যাণ সে আমাদের দান করে যায় না!

শিল্পীতে এবারেও পূজার ক'দিন ফুলোৎসব হয়েছিল—যেমন প্রতি বৎসর হয়ে থাকে। নূতন শিল্পী, পুরাতন শিল্পী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী শিল্পী সবে, এই তিন অবস্থাতেই বাঙালীরা সবের আমাদের করেছিলেন। প্রীতি-ভোজ, আমোদ-আহ্লাদের কোন কিছুরই ত্রুটি ছিল না। এই উপলক্ষে নাটকাদি অভিনয়েরও অনুষ্ঠান ছিল না। নূতন শিল্পীতে 'বসুধা' 'বিজয়ন' প্রভৃতির অভিনয় হয়েছিল। পুরাতন শিল্পীতে হয়েছিল 'হরিভক্তি'। সহরবাসীরা অভিনয় করেছিলেন 'অন্নপূর্ণা' ও 'বঙ্গবধূ'। এই নাটকগুলি বাঙালীমাত্রেরই পরিচিত, কিন্তু বঙ্গবধূর একটু পরিচয় আবশ্যক। 'বঙ্গবধূ' নাটক নয়, প্রহসন। কিন্তু প্রহসন হলেও এর ভেতর উপদেশ এবং ভাব দুই-ই বাঙালার বিশিষ্টতা উচ্চ আদর্শ অন্তর্ভুক্ত। এটি কিন্তু আগে কোথাও অভিনয় হয় নি। এই সর্বপ্রথম 'ডিয়ার' থেকে বার করে খুলনা বাঙালীর বাঙালীদের সামনে পরিবেশন করা হয়েছিল। শিল্পীর যেমনি দ্রব্যের স্বল্পতা তেমনি এটি অভিনীত এবং প্রযোজনা ঘটনার পক্ষে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক রচিত। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গদেশের বাঙালার সাহিত্য-সমাজে যেমন পরিচিত না হলেও শিল্পীর সুধীসমাজে ইনি সুপরিচিত। বাগবৈদগ্ধে ইনি সিদ্ধহস্ত। ইনি আমাদের শিল্পীর "অমৃত বোস"। গত বৎসর ঠিক এমনই দিনে ইনি 'ফুলে ফুল' প্রহসন লিখে ও অভিনয় করে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। 'ফুলে ফুলের' উদ্দেশ্য ছিল হাসানো। কিন্তু 'বঙ্গবধূর' উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়ী। এতে তথাকথিত কবি ও সাহিত্যিকদের ছেড়ে করা হয়েছে। এবং তথাকথিত সঙ্গীতবিৎ ও কলাবিদদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে কিন্তু এই ব্যঙ্গ ও শ্লেষের ভেতর দিয়ে নির্মল হাসির ফোয়ারা ছুটে যায় তা প্রত্যেকই উপভোগ্য।

আগামী বড় দিনের ছুটিতে শিল্পীতে যথা পূর্বাহ্নে "প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন হবে। এই উপলক্ষে সুধীমণ্ডলী এখানে সমবেত হলে, আমরা প্রেম-বিলেম ছেড়ে কবিদের, সাহিত্যিকদের, সঙ্গীতজ্ঞদের ও কলাবিদদের এখানে আগমন প্রার্থনা করবো। সে সময় তাঁদের অন্যান্য উপভোগের সঙ্গে রঙ্গ-ফোয়ার ছল উপভোগ করান যায় না কি? আর তো সবেমাত্র মাস দুই বাকী!

পিণ্ডদান

শ্রীসরিতোষিণী দেবী—কাশী

যার কিন্তু আজ অত্যন্ত আপত্তি—তিনি বেমনি শুনলেন—'রাত পোহালে যোর বিয়ে, যাকে-তাকে ধরে পেছে, এখন টাকা নিয়ে ঘোরে ঘোরে ঘুরে বেড়াবি? যেন-তেন ঘরে যাবলে কি যোর যাওয়া ঘুচবে না? বাড়িতে পাঁচ জন মুরুব্বি রয়েছে—তারাই বা কি মনে করবে?'

মা যা বললেন—সবই সত্য কিন্তু আমার প্রাণ যেন সবার থেকে তৈলনেই পড়ে থাকে। কাল রাত-ভরুর হয় যেয়ে, কালো মাস যো সমস্ত দিনের মধ্যে এক বারও এক পা নড়বার উপায় ছিল না, কিন্তু আজ না যেয়তে পেলে আর পাঁচ দিন আর তৈলনে যাওয়াই হবে না—যাত্রীর মুখ পর্যন্ত দেখতে পাব না। অথচ টাকা নিয়ে তৈলনে বসে থাকা আমার যেন একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই মাকে বুঝিয়ে বললুম—'মা, এখন যো উজানিনীতে যাত্রীর ভিড় নেই, যোর এর মধ্যেই ফিরে আসতে পারবো।'

মার আর কোন কথা শোনবার অপেক্ষা না করেই টাকা নিয়ে তৈলনের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

লাভ-লোকসান ঠিক টাকাওয়ালার করম ছিল না। সর্বাঙ্গে রসুই-মাখা, পায়ে যোজা, কোমরে কষানি, (যোট) হাতে বড়া, গলায় ছিপির (লক যোটের যোজা) যোটাযের মুক্তা মাল, মাথায় পাগড়ী,—পায়ে মজীর মাখনা, তবে মুটো মজী, আমার বাড়ী ও আর ছিল না।

বলা বাহুল্য—আমি বিলুপ্তাবী ফমির, তবে ছোট বেলায় প্রায় দশ বছর বাংলা যেশ থাকায় পরিষ্কার বাংলা কথা বলতে পারতুম আর এই বাঙালী জাতির ওপর কেমন একটু মমত্ব জন্মে গিয়েছিল। সেই জন্য বাঙালী যাত্রীদের মুটো বাংলা বুলি শুনিয়ে তাদের চমক লাগিয়ে দিতে পারতুম। সুদূর প্রবাসে তাঁরা বাংলা কথা শুনে অবশ্যিকটা একটু আশ্বস্ত যোধ করতেন। সুতরাং তাঁরা নিজে অন্যের চেয়ে মুলধনী বেশীই হবে আসুক।

আজ আমার প্রথম বউনি, বেলা ৭টা থেকে বসে বসে ৯টা বেজে গেল, একটি ছায়া যো দূরের কথা—কেউ উঁকি পর্যন্ত মারেনি। যাই যোক ১০-টার মেলগাড়ী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো, মাকে যো বলে এসেছি ঘণ্টার মধ্যে ফিরবো, কাজেই এখনি যাবার কোন তাড়া নেই।

ঘড়িতে ন'টা বাজতেই যেন এসে তৈলনে দাঁড়ালো। তখন সারা তৈলনের ভিতরে ও বাহিরে একটা বিরাট কোলাহল ও ছুটোছুটি পড়ে গেল। চারিদিকেই মহা ব্যস্ততা, টাকাওয়ালা ও কুলিদের চোখে-মুখে এমনভাব যে বিরাটাকার অজগর গর্জিয়ে উঠেছিল, এমনভাবে যাত্রী-সমাগমে মুহূর্তের মধ্যেই সে ভাব মিলিয়ে গেল।

যাত্রীদের মধ্যে এদেশী ও পশ্চিমী লোকই বেশি, মাত্র একজন বাঙালী বাবু—সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও একটি ছোট মেয়ে।

যাত্রীরা ট্রেণ থেকে নেমে অনেকেই টাকা ভাঙা করে। কেউ যেটি আবার হেটেই চলে যেতো। বাঙালী বাবুটি একটি মূল্যবান বাক্স ছোট পাটরাটি চাপিয়ে টাকাওয়ালাদের সঙ্গে কেমনি ভাড়া নিয়ে তর্ক করছিলেন,—তাঁর কথাবার্তার ভঙ্গীতেও বড় চমৎকার।

'সর্বনাশ, এই রাস্তাটা যেতেই দেড় ক্রোশ? দিন যেলা উপায় কর, বলে ত যাবো, একবারে ভাঙা গলা কাটবার মতলব, আমারা সবাই মুরোদ কি না? তবে আমাকে ভুল্ যোগ করে নেছি তা সত্যি যে, হুঁ! আমি হেটেই পাড়ি মারবো বাবা! যাব! যাব। আমাকে যাত্রীদের গাধায় পাড় আর আর একটাও পিণ্ডদান করতে পারলুম না দেখছি!'

কুলিটা মুখে মুখে হাসছিল, সে বিরক্ত হয়ে বলল—'বাবুজি, আমার যেলা মুসকিল। দুই এক

আনা কয়টি বিছিয়ে, এক টাকাকে উঠতে বৈঠা যাইবে, তাই কি হয়েছে যে ঘরে যে'।

"যাই! যাই!" মন যাহা-বেহাই কেবল যাইবার ভাবনাই ভাবে। আর আমি শালা কেবল টাকার বেলায়—সেইটা টাকা আসে কোথা থেকে! দিব হাজার ঘরে বহুৎ—তুমি থাক, তা নয়, এসেছেন তীর্থ করতে, নাও, —এখন কর তীর্থ,——আমি আমার টেনে যৌক. আমার কি—হুঁঃ!—বলেই তিনি এমন ভাবে কাপড় কাচা গুটোতে লাগলেন, যে মনে হল, বাস্তবিকই তিনি এবার বেন যৌক পাঠাবেন।

তাঁর স্ত্রী এই ব্যাপার দেখে একটি ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন,—যেন সব অপরাধ আমাদেরই। তাঁর চোখ দুটি যেন স্পষ্টই বলছে—তোমাদের কি একটু লজ্জা নাই? শুধু টাকাটাই এত প্রিয়? এমন করে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো?

সেই নীরব করুণ দৃষ্টির প্রতি চোখ পড়তেই কেমন একটা লজ্জায় আমার মাথা নীচু হয়ে গেল। তিনি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল, প্রতিপদেই যেন তাঁর হাত অবশ হয়ে ফেলে পড়তে চায়; কোলের মেয়েটি যেন মুটমুটে ও মোটা-সোটা, তাকে কোলে নিয়ে আর তিনি যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না।

বাবুটির যেন গৌরবর্ণ মলিন যৌবন, বয়স প্রায় পঞ্চাশ-এর কাছাকাছি, তবে বাঙালীদের বয়স বোঝা যায় না। চোখে মুখে কেমন একটা অত্যন্ত বিরক্তির ভাব, আমার তাকে মোটেই ভাল লাগে নি, তবু যাবার কাছে আমি তাড়াতাড়ি বহুৎ—'বাবু, আপনি আমার টাকায়, যা আপনার উচিত মনে হয়, তাই ভাড়া নেবেন।

বাবু একটা অতিরিক্ত নিশ্বাস ফেলে বলেন—'যেতে যাক বাবা, তারাও ভেবা ভালো করবেন। শাস্ত্রে বলে 'সর্বে নারী বিবর্জিতা'।'

তার পর তিনি স্ত্রীর দিকে চোখ করেন—'নাও, এখন উঠে বস।'

তিনি নিজে উঠে বসলেন, তাঁর স্ত্রী মেয়েটি নিয়ে গাড়ীর কাছে এসে যেন বিব্রত হয়ে ইতস্তত: করছিলেন। মেয়ে কোলে করে উঠতেও পারছেন না, অথচ কারু কোলেই বা দেন।

আমি তাঁর এই উভয়-সঙ্কট ভাব দেখে বহুৎ—'মা! খুকিকে আমার কোলে দিয়ে আপনি উঠে বহুৎ।'

তিনি একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় তাঁর অনুমতির আশা করলেন। বাবু তখন গম্ভীরভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন।

অগত্যা আমার কোলেই মেয়েটিকে দিয়ে তিনি উঠে বসলেন। কুলিটা এতক্ষণে গাড়ীটি খাড়িয়ে দিয়ে মজুরী চাওয়ায় বাবু এবারে তখনকে তার দিকে দুটি পয়সা ফেলে দিলেন, বেন তাকে তার উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। কুলিটি তীর্থের খুশী হলেও এতজন বাবুর মধ্যে মুখে তার বেশ বিশ্বাস হয়েছিল যে এখানে বেশি বাকি করা বৃথা, তাই সে একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে পয়সা দুটি তুলে নিয়ে চলে গেল। বাবু মুখটি ঘোরার পর তাঁর স্ত্রী দিকে চেয়ে বোঝেন—'মেয়ে কম কোলতে হয় এই বোঝে, বুঝলে—মা, তা নয়, কেবল, পা-পুজো,—আর পা-পুজো—

আমিও হাত-ঘাটের দিকে গাড়ি চালালুম।

সমস্ত যাত্রা বাবু যে স্ত্রীর কথা, সময়ে শিক্ষালেন হলো না, এই কথা আমায় অনেক রকম করে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। তাঁর এই অযাচিত দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবার আমার প্রবৃত্তি ছিল না, কাজেই, আমি যথাবৎ চুপ করেই রইলুম।

ঘাটে গিয়েই তিনি স্ত্রীকে বলেন—'আমের জিনিষ-পত্র গুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও, ——আমি ততক্ষণ ঘাটটা সেরে আসি।'

যে কথা, সেই কাজ,—আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে স্নান সুরু। স্নান সেরেই তিনি জলে নেমে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী ঘাটের সেই দিকে চুপ করে বসে থেকে মেয়ে অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার বাবুর—'বাবা?

তুমি বুঝিয়ে একটু বলবে'? যদিও যেন একটা অন্যায় আবদার করে ফেলেছেন, এমনি ভঙ্গিতে বুড়ীকে বলে ফেললেন। বাঙ্গালী মেয়েরা স্বামীকে বশ করে শুনেছি, তবে কোলকাতার ধারা ধারে কাছে ভাইকে ডাকার না।

তার সেই ডাক শুনে আমি বল্লুম—'মা, আপনি এত বুড়ীর হলেন কেন? এস খুকুমণি, আমার কোলে এসো।'

মেয়েটি বেশ শান্ত, আদর করে ডাকতেই আমার কোলে এলো।

খেলা একঘোটার সময় নিশ্চয়ই করবে বলে রিনটার সময় বাবু উঠলেন। মা সেই যে নাম যাত্র জল করে খোটাকতক পান সেজে রেখে তাঁর কাছে চলে গিয়েছেন, তারপর থেকে আর একবারও এদিকে আসেন নি।

যাবার সময় আমার হাতে একটা আঙুলি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, 'বাবা, বেলা হয়েছে তুমি কোথাও খেতে গিয়ে আবার কিনে জল খেয়ে নাও। আর পারো তো বুড়ীকে একটু দুধ খাইয়ে দিও। এ দুধটুকু দিয়ে খেতে পারে।'

মেয়েটি অনেকক্ষণ আমার কাছে শান্ত হয়ে খেলা করছিলো, তাই তাকে বাবাকে দেখেছিলুম, কিন্তু বাবু যদি সন্দেশের ছোট্ট মেয়ে, আর একজন অচেনা মানুষের কাছে থাকতে পারে! ক্রমে সে ঘাটের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘাইবার উপক্রম করছে দেখে আমি তাকে নিয়ে একবার জলের ধারে নেমে গেলুম।

তখনো স্নান শেষ হয়নি। বাবু পিতৃদান করছেন, যা প্রয়োজন তিনিটি ভরিয়ে রাখে তুলে দিয়েছেন, যে জিনিষগুলি উৎসর্গ হয়ে গেছে, সেগুলি সরিয়ে রাখছেন। ঘোটের উপর তাঁর সেখান থেকে এক-পা নড়বার উপায় নেই।

ব্যাপার দেখে সত্যই বড় হাসি এলো। বাবু যে বীর ভক্ত বিষয়ে অবহিতা ভোগ করছেন, সে-কথাটা খুব সত্য। মার তো নড়বার যো নেই, অগত্যা আবার আমি মেয়েটিকে অনেক করে বুঝিয়ে গাড়ীতে তাকে নিয়ে এলুম।

বাহির বাবে কাজ শেষ করে এসে আবার মাঝ-সমুদ্রে ডাকে বাবু আমায় বলেন—'হ্যাঁ হে, তোমার নামটা কি বলো?

আমি বল্লুম—'আজ্ঞে, রঘুনাথ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ রঘুনাথ। আচ্ছা রঘুনাথ! এর দুই পাতা বাঙ্গালে এখানে কত খরচ হয়ে থাকতে পারে?'

পাতা ঠাকুর মানুষ সুবিধে এসেছিলো, এ কথা শুনে সে তো একটা লাফ—মনে 'আরে এ লোকটা দেখছি বাজুনে উনুন্ন মুখ হয়েছে নেই, ই তো আমাদের খুশি হয়। ভেবে নেয় দেও—না দেও তাই নাই। ব্রাহ্মণ ভোজন করাও সে—উনুন্ন নারায়ণজীরা তোমার সাথে যা। পাঁচ কাঠা মানুষে যে—দুই দশ বিশ তো মানুষ নেই!'

'আমাদের খাটো মুখ! দশ বিশ মানুষেই হলো—কিন্তু কে? হুঁঃ! টাকা আমনি খোলায়-দুটি কি না? কি বলো হে রঘুনাথ? হুঁঃ!'

পাণ্ডা বলে—'কিন্তু আপনি খুশি—ভরিয়ে তো যায় যায়? দুই-দুই তরফার মুখে যা কাদল তোমা?'

'আরে রও! রও! যেন তোমায় কিনে দিয়ে এসেছ! দু দণ্ড সবুর নেই! তাল বিপদ দেখছি। কি হে রঘুনাথ! তুমি বুঝি কিছুই বলবে না? তাল বুঝিল!'

পাণ্ডা বলে '—ইস্ যে বুঝিল কেমা হায়! কিনাই তো বেচিয়াও। মুখনে হায়—আপ্ পাণ্ডা তো যে তামাম চীজ্ তোলায় দেও—যাম্ দুই তো যায়। কসিয়া সে হামারা মুহ জরুরত নেহি।'

আমি বল্লুম—'তাই করুন না। আপনি দু'জনের মত যি চিনি আটা—যা-কিছু দরকার কিনে দিন।'

ব্যাপার এই—এখানে পাণ্ডারা যাত্রীদের কাছে 'তুলসী' লাভের উদ্দেশ্যে যি ময়দা চিনি ইত্যাদির দাম নিয়ে মিঠাই তৈরি করে খায়। এ দেশের লোকেরা এই লাড়ু খেতে বড় ভালবাসে। যত বড় যেটি হয় বাবু কিন্তু আপত্তি করিলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর যখন 'তুলসী' পাওয়াই স্থির হলো, তখন একজনের মত তিনটি কিনে দিয়ে পাণ্ডাকে বিদায় করলেন।

পাতা উল্টে যেতে যাবু আমায় বলেন—'ছেইস ! কিন্তু যাত্রীদের থাকবার ঘর কই রে ? '

আমি বলুম—'আজ্ঞে হুজুর, এই আমরাই যাত্রীবাড়ি—আসুন, আমিই ঘর দেখে দিচ্ছি। ওই যে যাত্রীওয়ালা বিছানা এদিকে এনেছে, ও এখনি সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

যাত্রীওয়ালা এবার যাত্রীদের দেখে নিয়ে বলে—'ঘর আছে ? আইয়ে বাবা ! এদিকে ঘর ঠিক আছে দেখা, উপর কা কোঠরি খালি হায়, সড়ক কা ওপর ঝিল ঠো ঝিকলী লাগা হয়া—হাওয়াদার ঘর—সমস্ত দে দূর তক্‌লিফ নাহি হোগা, বহুত ঘর আরাম্ হায়—সৌকর কি বাবিৎ —চলিয়ে।'

'আরে বাপু—আস্ ! আস্ ! তুমি আমার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা দেখছি। আমার কি—আমি থাকবো—তারপরে রাত্রে যোগার যা ব্যবস্থা হয় হবে ? বল, তাই বাপি—আমার মাথার মাথের এক মাটি—ব্যস্ ! কথা সাঙ্গ ! আর তুমি তখন জলের ঘুরে তীর্থ-বাস করো !'

বাবুর কথা শুনে আমি হেসে বলুম,—না, না, সে ভয় করবেন না। এটা মোটেই মুল্লুক নয়। কত বড় বড় লোকও তো এখানে এসে দশ পনেরো দিন থেকে যান্, কখনো এ রকম গোলযোগ হয় না।'

মা ব্যস্ত হয়ে বলেন—'আমি তো যাবার কথা বলি নি। কাজ তো শেষ হয়ে গেছে—আজই কি ফিরে যাওয়া যায় না ?'

যাত্রীওয়ালা কথাগুলো স্পষ্ট না বুঝলেও বাবুর অনিচ্ছা বুঝতে তার বাকি রইলো না। 'আপ্‌কা খুশি—বুঢ়ী জরুর-বস্তী তো নাহি হায়' বলে মুখ ভার করে চলে গেলো।

আমারও মন বিরক্ত হয়েছিলো, এক ভাড়াতে সারা দিন খেল, তার উপর যা পাব সে বেচারী পাবে—আর ভাড়াতও এ নিয়ে কচকচানি করবো ?

বাবু কোন কথা বল্ না দেখে আমি বলুম—'তা হলে কি ফিরে যাবেন ? ষ্টেশনেই ফিরে যাবেন না কি ?' হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে তিনি বলে উঠলেন—'হ্যাঁ। না বাপু ! যেতে যাক, তোমার পরামর্শটাই আমি নিলুম, ষ্টেশনেই যাব, গাড়ীর টাইম্‌টা কখন বল তো বাবা ?'

আমি বলুম—'সাড়ে ন-টায় গাড়ী ছাড়ে। আপনি তখন ষ্টেশনের সামনেই যে বাবাদের দোকান—সেই খানে বসে ঘন্টা দেড়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে পারবেন। সেখানে মেয়েদের—'

বাধা দিয়ে বাবু বলেন—'আরে মেয়েদের জন্য তুমি যে ভাবি ব্যস্ত হয়ে পড়লে দেখছি—ব্যাপার বিশেষই গড়া পেয়েছ ! শোন—ঘন্টাদেড় বাবার কোন দরকার নেই, এই তো রাত ন-টা-দশটায় সময়েই বাসায় পৌঁছুব—বুঝলে ? আমি বলছিলুম কি তুমি এই সময়ের মধ্যে একখানা বড় বড় মটর-টমর যোগাড় করতে পারবে ? আমার কি, আমার অত তো দরকার ছিল না—তবে মাঝারি এসেছে সঙ্গে—সেই জন্যই বলছি। কিন্তু গাড়ী পাওয়া চাই, না হলে বিপদে পড়া যাবে—বুঝলে ?'

'—আজ্ঞে হ্যাঁ ! তোমার মটর খুব বড় হবে, তবু এই সময়ের মধ্যে গাড়ী যুটিয়ে আপনাদের মহাল্লায়, হরিদ্বি ও কাপ্‌কা-বাবার মন্দির দর্শন করিয়ে ঠিক গাড়ীর সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু কাপ্‌কা-বাবা আর ভর্তৃহরি গুহা টাঁচা যায় না, অনেক খানি পথ হাঁটতে হয়। আপনারা খুব তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন ?'

'—খুব পারবো, সে জন্য একটুও ভেবো না।'

আমি আবার বলুম—'আপনার পায়ে জুতো আছে, আপনি মন্দির পারেন—মা বোধ হয় পারবেন না। সে পথটা ভাল নয়—বড় হাঁটা, যা তা পায়ে যাবেন কি করে ?'

বাবু গম্ভীর ভাবে বলেন—'সে উনি বুঝুন, যেমন এসেছেন পথ করে, আমি তার কি জানবো ! তুমি চল বাপু, আর দেরি করো না, আজ আমার কিছুতেই হবে। তোমার দু-আনা পয়সা জল খেতে দেবো অবশ্য, গাড়ীটা পাইয়ে দিতে পারো।'

(৩)

আমি আর বিরক্তি না করে পাড়ী ঘুরতে লাগলুম। পাণ্ডা ঠাকুরও এসে হাজির হলেন। প্রথমে আমরা দুজনাতে মন্দিরে ঢুকলুম। এই মন্দিরটী বেশ চমৎকার—চারদিকে বেশ বড় দালান—দালানের একধারে একজন হালুইকর ভাল ভাল খাবার তৈরি করে বিক্রি করে। সেখানে গিয়ে দেবীর দর্শন ও পূজা শেষ হলে পাণ্ডা আর আমি দুজনেই বল্লুম,—'আপনারা যখন আজই সব দর্শন করে ফিরবেন, তখন এইখানে কিছু খাবার কিনে নিন্—মন্দিরের পিছন দিকের দরজা দিয়ে বেরুলেই "পিছিরালাও" বলে একটী পুকুর আছে। পুকুরের ধারে মহাকালের মন্দির, তাঁকে দর্শন করে পুকুর-ধারে বসে জল খেয়ে নেবেন, আমি টাঙ্গা নিয়ে মন্দিরের দরজার কাছে যাচ্ছি।'

আমার কথা শুনে মা বল্লেন—'বেশ কথা—তাই করবে।'

'যাবচ্চন্দ্র! তাও কি হয়! আমি ত বেশি নি? তবে তুমি না খাওয়ালে যার খাও—সে তোমার খুসী।'

মা লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বল্লেন—'না—না—আমি আমার কথা বলি নি, বাপি খুকিকে কিনে দিলেই হবে।'

বাবু হেসেটিকে এক পয়সার পেঁড়া কিনে দিয়ে বল্লেন—'চল রে চল! ছেলেমানুষ নিয়ে এ-সব ঝামেলায় আসাই বরুমারি—বাপি খাও—আর খাও!'

এবার আমরা মহাকাল দর্শন করে বাবুরা যাবার মন্দিরের দিকে যাত্রা করলুম।

এইখানে আরেকটা কথা বলে রাখি। পথে চলবার মুস্কিল—সেই মুসোর জন্যে ছোট ছোট খাটো-খাট বসান।

আমার মনের প্রথম, দুটী এখনও মনে নি। তারপরই সে সব খাঁটো-খাট শুকিয়ে মুসোর জন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। খুব সাবধানে মা ছেলে এখানে শুদ্ধ-পায়ে যাওয়া অসম্ভব।

পাণ্ডা-ঠাকুর টাঙ্গা থেকে নেমেই বল্লেন—'বীরা পড় যাই কি চল্লা বড়া মুস্কিল হোগা।'

বাবু এরকমের দেখে অস্থিরপদ—হাত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—'হোগা ত হোগা, তোমার বেটা আর নেহি হোগা? তুমি চলনা বাবা—এমনি ত আর পথ দেখিয়ে নিচ্ছ না, পয়সা নেবে ত? সব জোচ্চোর এক যায়গায়, সবার মুখেই এক কথা! চুলোয় যাক্—আমি এই এলাই চল্লুম! যাক্ সব ঝঞ্ঝাটও এইখানে! ধুঃ!'

পাণ্ডা-ঠাকুর বাবুর রাগ দেখে একবার ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলো, হঠাৎ তাঁকে চলতে দেখে—'আইয়ে! আইয়ে! ঈধারসে যানে হোগা!' বলতে বলতে এক রকম ছুটেই আগে আগে চলে গেল।

মা বেচারি খুকিকে নিয়ে বিষম ফাঁপরে পড়েছিলেন। আগেই বলেছি—মেয়েটী বেশ হষ্ট-পুষ্ট, মা অত্যন্ত দুর্বল—সে মেয়ে নিয়ে চলাই তাঁর পক্ষে দুষ্কর, তার উপর পৌঁছে যাওয়া ত একেবারে অসম্ভব।

আমি বল্লুম—'মা, পথ বড় বিশ্রী—সবারই অসুবিধে—আপনাকে ছুটোই মেয়ে হবে। ওকে নিয়ে পারবেন না—ওকে আমার কাছে দিয়ে যান্, দেখুন ওরা অনেকদূর চলে গেছেন, শীঘ্র যান্।'

মা তাড়াতাড়ি খুকিকে আমার কোলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলে গেলেন। আমার এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল, মাকে ডেকে যাবার করি। এক দুর্বল মানুষ, তারে সমস্ত দিন অনাহারে, দিয়ে ছুটোছুটি করে কী পেয়ে লাভ কি? কিন্তু মানুষ যে স্বার্থী হয়ে, এর তো এখনি ডেকে একটা অনর্থ বাধিয়ে তুলবেন, তাই কিছু বলতে সাহস হলো না। তা ছাড়া আমি একটা সামান্য গাড়োয়ান, আমার এত কথায় দরকার কি? তবু যতক্ষণ দেখা যায় চেয়ে রইলুম। মাঝে মাঝে থেমে পায়ের কাঁটা বের করে জোর-দুম মুছতে মুছতে মা ছুটে চলেছেন, মনে হল যেন তাঁরাও তাঁরাদেরই যাচ্ছেন।

বাবু আগে গিয়েছিলেন, তাঁরাই আগে গিয়ে এলেন। মেয়েটী আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে দেখে বল্লেন—'যাঃ! ভাল আপদেই তুমি পড়েছ ত হোক্—সারা দিনটা তোমার কাঁধেই মেয়েটাকে চাপিয়ে রেখেছে।

আমা মেরে যাইব, যাবা! এই বাজীর কথা তোমার বহুদিন মনে থাকবে! ছি, ছি!' মনে মনে ভাবলুম, অনেকদিন কেন, চিরদিন মনে থাকবে। মুখে বল্লুম—'তিনি যে চাপান দি, আমিই ছোট ছেলে ভালবাসি, তাই নিজেই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু মা যে এখনো এলেন না?'

—'তিনি কি আজ টেস্ট মেল্ না করিয়ে ফিরবেন মনে করেছ? কখনও না। তাঁর আসতে আমি চিরটাকাল এমি আসছেন হয়ে গেলুম! তাঁর এখানে আসবার কি দরকার ছিল বল তো? বিশ হাজার বার বল্লুম, তুমি থাক—নাঃ! তোমার সঙ্গে না খেলে আমার খাওয়া হবে না। আরে হবে না, সে কি আর আমি জানি নি? আমার মত এমন বীরত্ব-নাড় আর কাকে নাচাতে পারবেন? ছি, ছি!'

পাণ্ডা-ঠাকুর বল্লেন—'রাম খোকা আসে চলুকে রেখে?'

বাবু মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন—'না, না—রেখবে আবার কি? আসতে হয় আসবে, না হয় থাকবে পড়ে! আমার কি—ট্রেণের সময় হলে আমি যাবো টেনে এক ঘোড়া! হুঁঃ! কত সব অবাবা দেখেছি!'

এখনও মাকে দেখা যাচ্ছে না। মেয়ে কি সত্যই টেস্ট ফেল হবে না কি? তাই যদি হয়, তা হলে তো একটা মুস্কিলের মধ্যে পড়ে যাবে দেখছি। মা কেন যে এখন মানুষের সঙ্গে এসে তার ঠিক নেই। না হয় বৌধ-বর্ধন নাই হতো।

আমি একবার ভয়ে ভয়ে বাবুর মুখ-পানে চেয়ে দেখলুম—রাগে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে, অবজ্ঞার অধীর ভাবে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি জেনালার পথের দিকে চেয়ে আছেন।

আমি মনে মনে এই মেয়ের পরিণাম কি হবে ভাবতে আরম্ভ করলুম। আর মুখ তুলতে সাহস হলো না, যেন আমিই তাঁর অপরাধী।

খুকী এতক্ষণ পরে মুখ তুলে উঠে একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। মাকে তোমার না দেখতে পেয়ে সে এইবার ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠলো।

আমি তাড়াতাড়ি মাকে একটু সরিয়ে দিয়ে দিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছি—এমন সময় বাবুর কর্কশ চীৎকারে চমকে উঠলুম।

'ঐ যে মেম মাকে দিয়েছেন। কথা, একটু তাড়াতাড়ি পা ফেলে এসো। ট্রেণ তো আর আমি নয়, যে তোমার জন্যে চল্বো, তুমি দিয়ে নাচবে, আর নাচবো? এখানে একটু তৎপর হয়ে বল্লতে-চল্লতে হয়। ভালো বকুনিয়েই পড়েছি যা হোক! হুঁঃ!'

ছেলে মেয়ে সবাই যা আসুক, কিন্তু তাঁর আর তখন চলংশক্তি নেই বল্লেই হয়। খুকী মাকে দেখে আমার কোল থেকে নামবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু যা তাকে নেবার চেষ্টা করা মুখে যায়, তার দিকে চেয়েও দেখলে না। কোন রকমে টল্তে টল্তে এসে টাঙ্গায় উঠে বসলেন। তাঁর মুখ একেবারে লাল পাঁচাশে হয়ে গিয়েছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে। গাড়ীর হুড়টা তুলে পাশের দিকে মেলান দিয়ে তিনি বুঁজে পড়ে আছেন।

তাঁর এই ভাবান্তর ও অবসন্ন অবস্থা দেখে পাণ্ডা-ঠাকুর বল্লে—'মাই কি কিছু খাবার দিয়া, খোকা খানি দিয়ছে সে আমা তোমা, লেকিন্ ইয়া সব কিসে কাঁহা?'

বাবু তো মেমের ওপর একেবারে রাগে গজ্‌গজ্ করছিলেন, তার উপর পাণ্ডার এই কথা শুনে তিনি একেবারে রাগে আগুন হয়ে উঠ্‌লেন—হাত নেড়ে মুখ ঘোরে বল্লেন—'কিসসে তো ভালই তোমা, কিন্তু এ তো ঘর-বাড়ী নয় যে, হুকুম করলেই তখনি তা হাজির করবো? এখন মানুষের পথে আসাই ঝক্‌মারি। ব্যাটারা সব জানোয়ার করলেই হলো! এরা যদি কখন তোমা তো টাকা খেয়ে মানুষকে খানি আনতে পারবে নি! হুঁ সব ব্যাভারের কল, হুঁঃ!'

তারপর আমার দিকে ফিরে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—'কি রে খোকা? তুমি বা করে বাঁচিয়েই থাকবে, না গাড়ী হাকাবে? তোমাদের মতলবটা কি তাই বল?'

বল্লুম আমার মাথা আর মুণ্ডু—খুকীকে কোলে করেই নিজের আসনায় উঠে বল্লুম।

ভদ্রলোক ওরা বসবে বলে আসেনি। ট্রেণের মিনিট দুয়ি দেরি থাকতে আমরা ট্রেণের পৌঁছলুম। বাবু তাড়াতাড়ি বেয়ারা টিকিট কিনতে চলে গেলেন।

আমি চাকরকে জল থেকে এক ঘটি জল এনে বল্লুম—'যা, বাবার মুখে একটু জল দিয়ে—তা হলে শরীরটা অনেক সুস্থ বোধ হবে। আর আমার খোকা ঘরের পয়সা দিয়ে কিছু খাবার কিনে আনি, একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল একটু খাও। আপনার শরীর আর বইছে না, দিন চই করে, আর বেরি করবেন না।'

বা সজোরে পাখার হিসে হেসে বল্লেন—'না বাবা, খাবার আনবার দরকার হবে না, বেলল মাখাটা ধুয়ে ফেললেই হবে। এই খাবার খানা খেয়ে আন গো বাবা, কিছে রাখছ খানা পাট করে মাখার দিয়ে রাখি।'

আমি বল্লুম—'খাবার আমি এখনি কেউ আনছি কিন্তু বাবার আসবে হবে না, আপনি বলেন কি? আপনার মাথা ধোবার দরকার নেই, রোদ মুখ করে গেছে, ট্রেণে ওঠলে আপনার সঙ্গে আসব, না, না, আমাদের এ ভাবে তা কেবেন না। পয়সা দিন, কিছু খাবার এনে দি।'

বাবা হিসে হাত ভাবে না বল্লেন—'ঐ উনি আসছেন! বাবু আর খাবার খাবেন হবে না, এই অনেক জলেই ঠিকিয়ে নিছি।'

বলতে বলতেই বাবু আমাদের কাছে এসে পড়লেন—বা হিসে একবার চেয়ে বল্লেন—'কি ব্যাপার? ঐ-এ আবার পুরী না কি! ভীষণ কলতে এসে আজ দেখছনিয়ে করছেন, বা হোক! ছি! ছি!'

আমি বল্লুম—'না না, কিছু হয় নি, সমস্ত দিন রোদ লেগেছে, তাই পুরীর মুখ-হাত ধুইয়ে দিতে চাইছেন।'

—'তা যোগাড়—এদিকে ট্রেণ যে এসে পড়লো।'

পাণ্ডা ঠাকুর এসে বল্লে—'বাবা, আর কো বাবাকে কাবু হো হুয়া, আবু মুখন মে লিজিয়ে, হাম চলা যাত।'

—'আর কো নমস্ত নেই বাবু, মাতা এসে পড়লো, এলো গাড়ীতে উঠবার সময় সবেই তোমাদের পাওনা মিটিয়ে দেবো, এলো কো, বলতে হবে না কি?'

—'না, আমি বাচ্ছি'—বলে মা আমার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লেন—'কিছু মনে করো না বাবা, আজ তিন তোর তোমার অনেক কষ্ট দিলুম'—আর বলা হল না, বাবু তাঁর হাত ধরে এক হ্যাচকা টান দিয়ে ঝিঁচিয়ে উঠে বল্লেন,—'চলতেও পারবে না এক পা, আবার বলতে গেলেও না, না, তবে যাও এইখানে পড়ে, আমি চল্লুম, হুঁ:! এলো যে জোকুরা! তোমার ভাড়া নেবে এসো।'

সবাই আর সময় ছিল না, আমি একজন লোককে টাকার কাছে রেখে পুরীকে কোলে নিয়েই ট্রেণের কাছে ছুটলুম।

বাবু বল্লেন,—'বাবুবাবু, তুমি আমার অনেক উপকার করেছো, এইবার একখানা গাড়ী রেখে এঁকে তুলে দাও, আমি একটু বিশ্রাম করে যাই।'

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন অনেক গাড়ীই খালি ছিল, আমি সাথে একখানি গাড়ীতে তুলে দিয়ে পুরীকে তাঁর কোলে দিলুম। তিনি নীরবে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

আমি ছুটে যাব পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছি, এমন সময় বাবু এসে বল্লেন,—'আরে তুমি যুঁ করো কি? কিছু বুঝতে না কি? এ দিকে পাণ্ডা ঠাকুর যে আমার গলায় ছুরি দিতে চায়! বলে পাঁচ টাকা দাও, দাঁও, পাঁচ টাকা।'

পাণ্ডা ঠাকুর বল্লে—'মেহেরবানি কি যো দেখো। দিন ভর আপকো সাথ যোড়ত দিয়া, কিত বখিসা, পাঁচ রুপাই, মুখন, সব্ মুহ্ ওহি পাঁচ রুপিয়াকে যো বাতা। ই কেয়া বহুৎ হুয়া! আপ যা পাস মুহ্ ভর দিয়া তো যাহ্ তা নেহি।'

—'আরে ছেড়ের ছেড়ে—মাথাও নেই, চাইলেই যা তোকে দিচ্ছে কে! টাকা কি গাছের ফল, যে নাড়া দিলেই পড়বে? এই দুটো টাকা দিলুম, ইচ্ছে হয় নাও,

না বার ফেলে যাও,—বলে বাবু গাড়ীর পাদের বাঁকে দুটি টাকা ফেলে দিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

গাড়ী তখন ধীরে চলতে শুরু করেছে। বাবু তাড়াতাড়ি আমার হাতে একটি টাকা ও দু-আনা পয়সা দিয়ে বল্লেন, 'যেতে যাব যাবা, তুমি আজ বড় উপকার করেছ।'

আমি চুপ করে রইলুম, বলবার মত যেন কথা তখন মুখে এলো না। কিন্তু গাড়োয়ানকে বাবুর হাত থালা করে ফেলে দেয়, 'আজ আটটা একটা রূপিয়া কি তো দেও।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাবু বল্লেন—'এত পয়সা যেতি দেয়, তুমি কি লুট পেয়েছ না কি?'

গাড়ীর গতি বাড়তে লাগ্‌লো। গাড়োয়ানকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'আরে শিউ, আজাদবুকে কি পয়সা যেতি দেওয়ে—রাম্ রাম্—এ কভু হোগা দুবারা—'

যা এসে বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে কি বল্লেন, সঙ্গে সঙ্গে বাবু তাঁর দিকে চেয়ে বিরক্ত-স্বরে চীৎকার করে বল্লেন, —'যেতে যৈ কি! তুমি আমার পিত্তি নিতে এসে সর্দ্দি দিয়ে যেও!' বা দুরে গাড়ীর ভিতর সরে গেলেন। আর তোর কথা শোনা গেল না, গাড়ী টেশনের বাইরে চলে গেল।

বার উপর আজ সমস্তদিন ধরে যে অত্যাচার চলতে যেতেদুর তাতে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সারা জীবন ধরে এই অত্যাচার যিনি নীরবে সহ্য করেছেন। তাঁর জীবনে পাবার কোন বিষয় আছে কি না কে জানে! আমার মনে হল, আমি যদি সত্যই তাঁর ছেলে হতুম।

গাড়োয়ানকে বিজয়গর্বে ফিরে এসে বল্ল, 'আজকা দিন বাবু লোগ্‌কা বহুৎ বুরা দিয়া, কিন্তু তব দো আনাকে ভুতুরা একটা রূপিয়া, আউর হামকো বেটো রূপিয়া যে দো আনা—তা তবে, গাড়ী ছুট দিয়া, যেতি যো পাস রূপিয়া থেকে তব্ বাবু ছোড়ব্—বাব! বাব! ছুটি-ছুটি হামারি হল।'

গাড়োয়ানের কথা শেষ হতে এমন ভাবে সাইসের দিকে চেয়ে বললো, যেন গাড়ীখানা পেলে সেখানা ফেলে দাঁড়িয়ে ফেলে সাবাড়িয়ের কৃতি পুরণ করে নিতো।

আমি হেসে বল্লুম,—'গাড়ীর ঘোর নেই ঠাকুর, তার উপর বাস করা বৃথা, আজ তোমার কপালে ঐ দুটি টাকাই ছিল, কি আর করবে—বাড়ি ফিরে যাও।'

'—হাঁ ভাইয়া, যব তো যাবেকেই সাবী, হুঁ! পিত্তি বাব বন্দুকে আজা—আরে বাব! বাব!'

গাড়োয়ানকে বিষণ্ণচিত্তে আস্ত পথে চলে গেলেন। আমিও আস্ত সমস্ত দিনের খাঁটা-ভলো ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে রওনা হলুম।

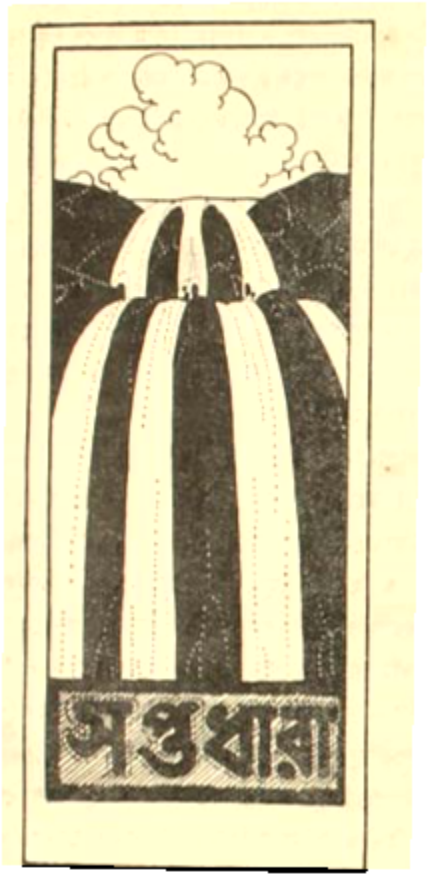

কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি ও তাঁহাদের কবিতা

শ্রীঅমৃতলাল শীল—এলাহাবাদ

কবি মঞ্জু

অওধের বাদশার দরবারে কবি মঞ্জু নামক এক প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় নাই। যদিও তিনি একজন বেশ বড় কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি তাঁহার অতি অল্পই কবিতা পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অওধের সেনাপতি অবদুল হমীদ খানখানাঁ যখন পাণী, তুর্কী, হিন্দী ও হাজপুতী ভাষার প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন ও অনেক কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একদিন কবি মঞ্জু নিম্নলিখিত কবিতা হমীদের গুণ বর্ণনা করিয়া রচনা করিয়া আনিলেন ও বাদশাহ বেবম-পুত্র অবদুল হমীদ খানখানাঁকে শোনাইলেন :—

[illegible]

অর্থাৎ যে দিন বেবম-পুত্র খান-খানাঁ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন, সে দিন সমর ক্ষেত্রে স্থির হইল আর কাহার-মনে হেন না; গর্ব আপনার মণি ফেলিয়া আর যুঝাইয়া লইতে সাহস করিল না; পবনদেব ভয়ে আর প্রবলরূপে বহিতে সাহস করিলেন না; হয় বাদল-সঞ্চারের ন্যায় করিল; চক্রবাক ও চক্রবাকী উভয়ের নিকট আসিয়া ভয় পাইল; দুঃখী পথিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে আসিতে সাহস করিল না; কবি মঞ্জু বলিতেছেন যে, স্বয়ং অমিত-তেজ সূর্যদেব ভয়ে রথ বন্ধ করাইয়া স্থির হইয়া রহিলেন।

খানা-খানাঁ সেই সময়ে বা অন্য যুদ্ধে একখানি ৩১ লক্ষ টাকার হুণ্ডী পাইয়াছিলেন, হুণ্ডীখানি সম্মুখেই ছিল। কবির গুণ বর্ণনা শুনিয়া তিনি সেই হুণ্ডীখানি কবিকে বখশিস দিলেন।

কবি নজরি

অওধের বাদশাহ-সভাতে কবি নজরি যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার আদিনিবাস অতেপুর জেলাতে অসনি-গ্রামে। তিনি ১৪০৫ ঈসাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও ১৪১০ ঈসাতে ১০৫ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

অওধের নবাব-আসে বসিয়া সাধারণ প্রজার দোষ অভিযোগের কথা শুনিতেন, ও সকলের দুঃখ দূর করিতেন। এক দিবস ঐরূপ নবাব-আম সভাতে

কবি নয়বার হাইরেছিলেন, পথে দেখিলেন একজন আসাই একটি গাধী লইয়া যাইতেছে। গাধী তাহার মালিকের মরণ হইতে পলাইয়া কবির গাধীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কবি কলাইকে মূল্য দিয়া গাধীটি লইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন এখন এ গাধীটি কি করি। ঠিক করিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত কবিতাটি একখানি কাগজে লিখিয়া গাধীর গলায় বাঁধিয়া দিলেন ও সওয়ার-আরে অভিযোগকারীদের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। গাধীর গলাতে কবিতাসহ কাগজ বাঁধা দেখিয়া একজন পড়িতে বলিলেন, কবিতাটী পড়িয়া শুনাইল :—

خدایا تو مرا خوار مکن، زیرا که ترا بنده بسیار است،
تو مرا خوار مکن، که ترا خدمتگار کم است،
بنده ات نیک نباشد، خود را بد بنده باش،
خدمتگار خود را دوست دار، بنده را خدمتگار باش،
خود را بد بنده باش، بنده را خدمتگار باش،
خدایا تو مرا خوار مکن، زیرا که ترا بنده بسیار است۔

অর্থাৎ—প্রভো যদি মনে দুঃখ হয় তবে লোকেরা আমি তাহাকে মানেন না, আমরা সকল সেই দুঃখই পাইয়া থাকি, কখনও দীন হইয়া উচ্চ মনের কথা কহি না, আমরা নিজ অন্তর-মত দুঃখ ভাব করি, আপনার সেবার ভার তোমারের দিই, নিজের মনের দুঃখ দিয়া দুঃখীদের কষ্ট দূর দিই না, সকলকে সমান দিয়া থাকি। কবি সাহারি বলিতেছেন, হে অবনত ভক্ত, মো-আরি হাতে জোড় করিয়া বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, আমরা কি অপরাধ করি যে আমাদের তোমরা মার? আমরা ত আপনার চাকরী দিয়া তোমাদের সেবা করিয়া থাকি।

প্রবাদ আছে যে, এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়া অবনত পরে আপনার রাজ্যে ঘোড়ার নিষেধ করিয়াছিলেন।

(১৪৭৮ ঈঃ)

কবি জাফর

আওয়ারজেবের সময়ে বিহারীতে জাফর নামক এক কবি ছিলেন। তাঁহার বিদ্রূপাত্মক কবিতাকে সমাটও ভয় করিতেন। তিনি জাফর জটল্লী (Jafar Zatalli) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। একবার তিনীর প্রীতের আতিশয্যে ঈশ্বরকে পাইয়া বলিয়াছিলেন :—

مرا بخشیدی از دوزخ، ترا چه کم شود ای خدا،
بخشی اگر بخشی مرا، تا چه کم شود ای خدا۔

(হে ঈশ্বর!) তুমি আমাকে নিরয় হইতে ত্রাণ করিয়া দিয়াছ। যখন তোমার এই স্থান মধ্যে আমারও এক স্থান ছিল, তখন আমায় ক্ষমা করিলে কেন?

সাধী ও হাফিজ

পারস্য দেশে পীরাজ নগর বিদ্যান, কবি, সাধু ও ফুলের জন্য প্রসিদ্ধ। একজন লেখক লিখিয়াছেন, পীরাজের জল-বায়ুতে এমন গুণ আছে যে সহস্র বিদেশ অধিক চালনা করিয়াও কেহ ক্লান্ত হয় না। পীরাজে ২৩জনি বড় বড় কবি ও বিদ্বান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অন্য কোনও এক নগরে এত জন্মগ্রহণ করেন নাই। পীরাজের কবিদের মধ্যে সাধী ও হাফিজ প্রসিদ্ধ।

সাধী (মসলহ-উদ্দীন শেখ্ সাধী পীরাজী) বলিয়াছেন :—

১। تو کی دانی که در دنیا چه بسیار است و چه اندک،
چه بسیار است و چه اندک، که در دنیا چه بسیار است و چه اندک۔

যে কেহ পরের দোষ তোমার কাছে আসিয়া কীর্তন করে, সে নিশ্চয় তোমার দোষও পরের কাছে বলিয়া বেড়ায়।

২। دو مسکین پای پیل مست،
که هر یک را بیک پشه شکست،
یکی گفت از کجا می‌آیی ای دوست،
بگو تا پیش تو زحمت که برد۔

যদি কোনও বুদ্ধিহীন ব্যক্তি (আমার সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়ায়, যে অমুক লোক নির্দোষ। তাহা হইলে (তোমারা) আমার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না পাইলে এ কথা বিশ্বাস করে না; কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার

ইঙ্গিত দ্বারাই আপনাকে পর-বিমুখ বলিয়া প্রকাশিত করে।

[illegible]

[illegible]

সমস্ত নগরে যদি একটি মাত্র বড় কর্কশ স্বরে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে পরিবর্তের অন্য যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী তাহার পায়েই সে কাঁটা ফোটে। অর্থাৎ দুরবস্থার পরিষ্কার আপন বিপদ আসিয়া থাকে।

১। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিদ্যা, তুমি হে ইচ্ছা তত অর্জন কর, কিন্তু যদি তাহার সদ্ব্যবহার না জান তবে তুমি একটি মূর্খ। (সদ্-ব্যবহার না জানিলে) তুমি আচার্যও হইবে না, বুদ্ধিমানও হইবে না, ঠিক একটি চারপায়ে (খাট অথবা চতুষ্পদ পশু) মত থাকিবে, বোঝার উপর কতকগুলি পুস্তকের বোঝা থাকিবে। বোঝার মত অধিক পুস্তক থাকি কি বুঝিবে বোঝার পিঠের উপর এক বোঝা জ্ঞানানী কাঠ রহিয়াছে কিংবা কতকগুলি পুস্তকের বোঝা রহিয়াছে।

১। [illegible]

[illegible]

তৌরী অধিকে দজলা নদীর (Tigris River, a river famous for floods) জলের আইবারহে পারা যায়, কিন্তু পর-বিমুখের মুখ হইতে কথা বাহির করা যায় না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যদি কেহ অল্প পরিমাণে আহার করে ও বিরক্তিকারী হয়, তবে লোকে (বিমুখেরা) বলে সে বড় কৃপণ, পরের জন্য কম করিতেছে। কিন্তু যদি কেহ ভাল জিনিস খায় তবে (বিমুখেরা) বলে সে একটি উদর-পরায়ণ, নিজের পেটই লইয়াই আছে।

ওমর খৈয়াম

ইরানের প্রসিদ্ধ কবি ওমর খৈয়াম বলিয়াছেন :—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাধুরা বলেন, স্বর্গ এ দুই বেশ ভাল জায়গা। কিন্তু আমি বলি আঙ্গুরের তলা অতি সুন্দর জায়গা। এই হাতে হাতে নগদ সওদা (অর্থাৎ আঙ্গুরের সুরা) গ্রহণ কর এ বাকির সওদা (অর্থাৎ আজীবন রস ভোগ না করিয়া পরকালে স্বর্গ ও হুর লাভের আশা) ছাড়িয়া দাও; মনে রাখিও, ঢাকের বাদ্য দূর হইতেই শুনিতে বেশ ভাল বোধ হয়। [অর্থাৎ এমন খাঁটি আঙ্গুরের সুরা পান করিয়া সুখ করিয়া লও, পরকালের আশায় থাকিও না, পরকালে কি হইবে না হইবে কে জানে, তাহা ভাবিয়া নগদ পাইয়াছ তাহা হারাইও না।]

সঙ্গীত ও সঙ্গত

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ সান্যাল—লক্ষ্ণৌ

১৯২৮ সালে মার্চ্চ মাসে আমার একটী অদেখা সঙ্গীতপ্রিয় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। ভদ্রলোক অতি অমায়িক ও বিনয়ী। তাঁর গান শুনে বেশ তৃপ্তি হল, কিন্তু সম্পূর্ণ আনন্দ হল না। তার দু-তিনটি প্রধান কারণ ছিল; প্রথম, ভদ্রলোক চাপা গলায় গান করেন ও গলার আর সবটাই চাপা গলায় বেধান। এতে যে গান শুনতে মিষ্টি লাগে না একথা বলা যায় না, তবে ভক্তি-মধুরের চেয়ে বেশি আর কিছুই হয় না। এ বিষয়টী তাঁর কাছে উল্লেখ করায়, তিনি বলেন যে, ধ্রুপদ অঙ্গ তিনি খোলা গলায় গেয়ে থাকেন, অবশ্য এ অঙ্গের গান তাঁর কাছে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে উনি যে ধ্রুপদের মতন ধ্রুপদ গাইতে পারেন, এ ধারণাটিকে অনেক চেষ্টা করেও মনে স্থান দিতে পারলাম না। তাঁর দ্বিতীয় দোষ, আমার ধারণায়, তিনি সুরে সিরে মিনিমি আওয়াজ গলা দাঁপান। এ বিষয়ে উল্লেখ করাতে তিনি বলেন, "আমাদের সংস্কার জানতে হবে, এরপ যে বিধিবদ্ধী তাল সেটী রক্ষা আমাদের কর্ত্তব্য"—তাতে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, বে, পি, ধ্রুপদ অ্যালবেত্রা পর্য্যন্ত অঙ্গের বিষে বিয়ে বিউটিন-স্থাপিত সংস্কার জানতে চেষ্টা করা পাগলামির লক্ষণ। আমি আরো বলায় যে, সুরের সঙ্গে গলা স্বাভিমুখে মেওয়া বড় শক্ত কাজ আর সবাই এতে হেসেই থাকে। কণ্ঠনালী পরিষ্কারের এত সময় নেই বলে বোধ হয় আমরা একটু মেশিনারির কাঁপিয়ে সহজলভ্য সৌন্দর্য্য জোড়াসবের সাধনে ঘরে ফেরে, আমাদের দেশে এমনি ভাবে সঙ্গীতের বিকাশ সম্ভব নয়, এ লক্ষণ সঙ্গীতাচার্য্যেরাই জানেন।

এ বিষয়টী উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য, শুধু সেখান, অনেক যুবকদের ধারণা এরকমও হতে পারে।

'সকল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাসপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গায়ক শ্রীকৃষ্ণ ও বিলীপকুমারের তুলনা করেছেন। বিলীপকুমার বাঙ্গালী—শুধু তাই বলেই সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে উচ্চ। তবে বিষয় প্রকাশ না করে থাকা যায় না যে, লালাজীর বক্তব্যের সঙ্গেও (সেদিন বিলীপকুমারের "কে লিল মোর পাণে মুরলী মুরলী" বেকর্ডের গান খানি শুনে) এঁর তুলনা করাটা তিনি অনুচিত মনে করেন নি।

বিলীপকুমারের সঙ্গীতের বিষয়ে আমি কিছু বলতে সাহস করি না, কারণ যিনি সঙ্গীতের অধিকাংশ গায়ক গায়কের গানে "আহাম্মক" বলে উপহাস করে পারেন, তাঁর যে সাধারণের চেয়েও উচ্চ শিক্ষা হয়েছে এ কে এমন মূর্খ আছে যে না মেনে নেবে। কিন্তু শুধু লালাজীর বক্তব্য লালাজীর, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের আর বিলীপকুমার বিলীপকুমারই থাকবেন,—যাঁরা এঁদের গান শুনেছেন, তাঁরা নিজের নিজের ধারণা নিজের নিজের কাছে রাখুন, আমার এ বিষয়ে কিছুই বলবার নেই।

সুরের ভাব ও কথা নিয়েও দুর্গাদাস বাবু একটু আলোচনা করেছেন—১০ পঙ্ক্তির প্রবন্ধের পাঠক না, বে, বা, যার নাম শুনেছেন বটে কিন্তু ব্যাপারটী কি তার বিচার করতে হলে হারমোনিয়মের কাছে আমায় ভিক্ষা করতে হয়। এখানে আবার বাঙ্গালার অপূর্ণ সঙ্গীত কবিকে টেনে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, সুরের নাম শুনলেই কথা মনে পড়ে।

"ব্যাকরণ" কথাটার পৃথিবীতে অন্তর্গ্রহণ করার আগে

স্বপ্নের সৃষ্টি হয়েছে—তার স্বাদের উপর রয়েছে, আর স্বাদগন্ধ ছাড়া আর অন্য কোন্ চেষ্টা করছে কি না এর বীক্ষণ কে করবে?

ভোজের জন্য তাদের সঙ্গে স্বপ্নের কোনও সম্বন্ধ নেই—শিল্পী তুলি দিয়ে ছবি আঁকেন—কবি তাদের তার বর্ণনা করেন—রসায়ক সুরে বেঁধে ঝঙ্কার তোলেন—তুলনা বা তরজমা বাদে নিজ ভাষা শৈলীর বিকাশ করেন। (অবশ্য যাঁরা অন্ধ তাঁরা শেষ কথাটি বিশ্বাস করবেন না।)

এখানে এই স্পষ্ট ভাবে বোঝাতে চাই যে, উপকরণ প্রয়োজনটি নিয়ে—যাকে আমরা চলতি ভাষায় আর্ট বলে এবং প্রয়োজনটির অনুকৃতির জন্য স্বপ্ন চাই—প্রাণ চাই—তার চাই। রোদ, ঘাস, বাঁশ, দুধ তার বাহক মাত্র। (কে জানে হয়ত কোনো দিন কোনো শিল্পী নিজের বিকাশের জন্য মনকে ব্যবহার করতে পারেন—দুধের কথাই ওঠে!)

আর একরকম অনুকৃতি—যার জন্য ভাবের বা ভাবনার প্রয়োজন হয়—যথা, চলচ্চাষাদের অনুকৃতিতে ছবির একটিরও প্রয়োজন হয় না—তাই এতে আর্টের অভাব। রসায়নজ্ঞ যাঁরা ঘাস বা বাজনা শোনের আর ঘাস বা করেন তার মধ্যে অনেকে রোজেন না কেন ঘাস পাচ্ছলো। (এখনও অনেকে আছেন যাঁরা "রোজেন" এই ভাব দেখাবার জন্যই শুধু ঠোঁটের বা মাথা নাড়েন।) তখন ভাল লাগার "ভাল" পরিচয়ের ভাবে নির্ণয় করতে পারবেন তখন ঠিক অনুকৃতি হোল।

আর্টের ব ব ব ব হোল, "কেন" কথাটি "ঐ ঘাসটি আমার জন্য ভাল লাগছে"—কেন—কেন?

এর মধ্যে (১) ঘাসের (২) আমা (৩) দুধ (৪) ঘন্টা (৫) ভাল (৬) বাজনা (৭) বিজ্ঞাপন ও (৮) নিজের ভাব কি হবে? অর্থাৎ।—

(১) যদি ঘাসের দুধের দুর্গন্ধির রোগ তাহলে ভাল না লাগার রোগটা হোল ঘাসেরও ভাব।

(২) যদি ভালটি প্রাণহীন অর্থে দুধের ঘাসনা না হয়ে অন্যান্য কিছু হোক তা হলে যা প্রয়োজন হোক সেটা হোল আমার ভাব।

(৩) যে যে পশু ঘাসের জন্য দুধকে ভাল লাগে তাদেরই দুধের অনুকৃতি।

(৪) যদি ঘন্টা রোগাও ঠাণ্ডা, রোগাও টাঁক না হয়ে বৈচিত্র্যহীন হোক বা এই রকম কুচিন্তা হয়ে একটু নীচু হোক তা হলে যা প্রয়োজন হোক, তার জন্য ঘন্টা দায়ী।

(৫) যদি সমস্ত চাঁদ ভাল না হয়ে একটু তীক্ষ্ণ রকম দুর্গন্ধযুক্ত কিছু হোক তা হলে যে গন্ধটুকু হোক তার জন্য সে দায়ী।

(৬) যদি হাতেমাবিরাটি নিয়ে থাকেন মহাপ্রভুকে একটি ভাবুক দেখা হয় তা হলে যা প্রয়োজন হয় তার জন্য বাজনা বা বাদ্যকৌশল দায়ী।

(৭) যদি ঘাসের একজন দাসী লোক না হয়ে সাধারণ একজন কেউ হতেন তাঁর যদি এর (উচিত বা অনুচিত) বিজ্ঞাপন না থাকতো তা হলে যা ফল হোক তার জন্য বিজ্ঞাপন দায়ী।

(৮) ঘাসের ভাবের সঙ্গে নিজের মনের ভাবের যদি সামঞ্জস্য না থাকতো তা হলে যা ফলাফল হোক তার জন্য নিজে দায়ী অর্থাৎ আমাদের সময় আমাদের বা দুধের সময় দুধের গানে আর সাধারণ সময় এ দুজনের গানে যা তফাৎ হয় তার জন্য নিজে দায়ী।

প্রয়োজনটি ভাববার সময়ই মন ওটিকে যেমনটি যেমন ভাল লাগলো তেমনটি করে ভাবতে হবে। অবশ্য প্রয়োজনটিই সাধারণের ভালবার এবং সর্বাঙ্গসুন্দর হতে গেলে সমস্ত গুলিরই সাধনার চাই কিন্তু এখনও সাধারণের মনের শিক্ষা হয় নি বলে কোনটির তরফের প্রভাব ঠিক বুঝতে না পেরে এটি। ভাল ওটিকে, আর ওটির জন্য সেটিকে দায়ী করা হয়—তবে যিনি এ ভাবে সবগুলি আলাদা করে বিচার করতে পারেন তিনিই যথার্থ সমজদার আখ্যা পাবার অধিকারী।

দুঃখের বিষয়, এই যে বুঝতে গেলাম বলা দুরের কথা—না খোলার ছাড়টাই প্রায় লোকের বেশী দেখা যায় আর সমস্ত কথা খোলাখুলি ভাবে পরে তাঁরা নিজের মনে করবার জন্য বা তা নিয়ে সময় বুঝিয়ে দেন।

"রূপ যেখানে ভাল লাগে না" এ কথা যারা মনে মনে বলে মুখে বলতে লজ্জা পান, তাঁরা একটু খুব বিয়ে বাড়ী ভাড়া করেছেন তাঁরা তার জোরে এসব বলেন না। কতিপয় চুটকি গানই হচ্ছে বিশ্ব ভাষে ভারতীয় প্রাণ ভরে না। যে সকল, যাঁরা বাঙলা জানেন তাঁদের দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি না পড়লে সে রকম তৃপ্তি হয় না।

কোনো বিখ্যাত লেখক বলেছেন, "পরে যেমন আমাদের মেয়ে আমরাও যদি সে রকম ভাবে নিজেদের দেখতে পারতাম তা হ'লে অনেক অঘটন ঘটতো না।" কথাটা খুব ঠিক। পাশ্চাত্যের অন্য অনেকেই ওরকম কোনো না কোনো সময়ে বলেছেন—"লোকটা খাইল বদ নয়, তবে বড় বাধা নাচলো ও অমনভাবে বললো" কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বুঝবেন যে সাধারণতঃ শুধু মুখ খুলে "না"তে কাজ চ'লবেও লোকে প্রায় সেই বিকাশের জন্য মাথাটাকে দু-এক বার এদিক থেকে ওদিক ক'রে হাত নেড়ে বোঝিয়ে দেয়; তাতে কেউ আপত্তি করেন না অথচ যারা প্রাণ খুলে গান ক'রতে তাদের অঙ্গ চালনার জন্য কখনই কম হ'তে পারে না।

কাজ হ'য়ে ব'সে গান গেয়ে কখনও তার পূর্ণ বিকাশ হ'তে পারে না। আমি ব'লে নিচ্ছি, বেশী হাত পা ছোড়া দেখতে মোটেই ভাল লাগে না, আর আজকালকার সভ্যতা হিসাবে "ডীসেন্ট"ও নয়, তবে সঙ্গীতে এদিকে টেনে আনা হেলেদোদুলী—লোকে গান শোনে—না দেখে তা অন্ধ কোনো কারণে হবে।

ইটালী দেশীয় কোন বিখ্যাত শিল্পী যীশুর ১০টি ছাত্রের ছবি এঁকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করায় অনেক লোক দেশ-দেশান্তর থেকে সেটি দেখতে আসে; সবাই খুব প্রীত হয়ে ছবিটির বিশেষ প্রশংসা করে। একটি ছেলে শুধু ব'লে উঠলো "সব ভুল হয়েছে, যার মুখের চলিশ—তবে এতে তেইশটি পা আঁকা হয়েছে কেন?" বস্তুত তেইশটি পা-ই আঁকা হ'য়েছিল, কিন্তু তাদের ছবিটির সিমেট্রী একটুও করে নি।

মেয়েদের রুচি অনুসারে পুরুষ নিজেকে তৈরী করে এবং পুরুষের মনের মত করার জন্য মেয়েদের সাজ পোষাক ইত্যাদি আবিষ্কার হয়। মেয়েদের চুলটা বেশী ভাল লাগে ব'লে না শুধু কতিপয় পান শুনেই তাঁরা বেশী আকর্ষিত হন ব'লে আজকালকার লোকে মেইরকম গানই দেখেন ও দেখান। আজ যদি মেয়েরা চুটকি গান শুনে ঘরে আগুন দেন, কাল থেকে প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায় রূপকের প্রশংসা বেরোবে।

কথাটা অপ্রিয় সত্য—নিবারণ উপায় এই, যদি কেউ আসল সঙ্গীতের উন্নতি চান মেয়েদের রুচি আগে বদলান। তাঁদের রূপ নিয়ে কেউ ব'লছে না, শুধু এদিকের যে সৌন্দর্য আছে এ কথাটুকু মেনে নিলেই জোর করে যাবে, আশা করি।

গান দু-রকম, এক, সাধনা অঙ্গ—যাতে আত্মার উন্নতি, আর এক শিল্প অঙ্গ—যাতে বিকাশে আনন্দ। এই পরেরটি নিয়ে দু-একটী কথা বলবো। প্রথম বিষয়ের আলোচনায় এ যোগ্য স্থান নয়।

প্রথমতঃ, যেমন ইংরেজিতে গানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ব'লে আর ইতালি ভাষে জোর করে বলানো হয় তেমনি ভাষতে গানের শ্রেষ্ঠ ভাষা বোধ হিন্দুস্থানী—বাঙলা জোর ক'রে বলানো হয় মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, বাঙলা ভেবে গায়ক অপেক্ষা কবি বড় বড় থাকাতে তাঁদের আশ্রয় করে থাকে হয়—তবে তৃতীয়তঃ, আজকালকার বাঙলা গান এমন খোঁয়া খোঁয়া ভাবের আর বিচ্ছিন্ন সুরের প্রচলিত হচ্ছে যে, গানের মধ্যে পদ্য ভাবটাই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

আমার এ রকম বিদ্রোহীর মত কথা শুনে অনেকেই বলতে বসবেন হবে কিন্তু আমি যা ব'লছি সে বিষয়ে দু-এক দিন ভাল করে ভাবলে আমার প্রতি একটু সদয় হবেন আশা করি।

আগে বলেছি, "রোজার জন্য" ভাষার কবে সুরের কোনও সম্বন্ধ নেই কিন্তু গায়কের জন্য রীতিমত আছে। ভাষার যে ছবিটি ফেলে আমি, সুরে সেটিকে ফোটাতে হবে—সুরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। কবি যদি বিশেষ জ্ঞানী হ'ন তিনি এ কাজ করতে পারেন,

তা না হ'লে তাঁর ভাবটিকে আমরা ক'রে সঙ্গীতজ্ঞ এ কাজ ক'রবেন; গায়ক নিজে কবি হ'লে সবচেয়ে ভাল প্রযোজনা হয়।

যিনি গান করেন তাঁর সুর ও ভাষাকে পরিষ্কার ভাবে সামলে রাখতে হবে, তারা হ'লে সুর নিয়ে যত খুশি খেলবেন—প্রাণ দিয়ে গান হবে না। আর যাঁরা গানের ভাষা ও সুর দুটোই শোনেন তাঁরাও শুনে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বিশুদ্ধ সুর সময় সময় প্রয়োজন হয়। যেখানে দুটি সুরের প্রয়োজনটা গানের রসের উন্নয়নের করতে পারে সেখানে অবশ্য-বিশেষে তাদের মিশ্রণ করা যায়; তবে এর মাঝে এক পা দিয়ে সুর বৈচিত্র্য করে নূতনত্ব দেখিয়ে নাম কিনে শেষ অবধি খাদেই পড়ে।

যারা দিনি গান শেখে থাকেন তাঁরা তার মানে জানতে সময় নষ্ট করতে চান না—প্রায়ই তালের জন্য ঐ ভাষায় ব্যবহার করেন। আমার বোধ হয়, হিন্দুস্থানী শিক্ষার সঙ্গে বাঙলার ঐতিহ্যের যত বেশী সম্বন্ধ—শুধু সঙ্গীতেই নয়—চেষ্টে দেখলে প্রায় সমস্ত বিভাগেই এর প্রয়োজন—এ শিক্ষার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি হ'তে পারে না।

দুই-তিনটি উদাহরণ দিয়ে এবার সঙ্গীতের বিষয় বক্তব্য শেষ করবো।

আমি জানি, সঙ্গীতের ইতিহাসের বর্তমান অবস্থায় যখন শিক্ষিত সমাজ তাকে নীচু থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা ক'রছে—তার একটু অধঃপতন অবশ্য লক্ষিত হবে কিন্তু আশা করি বেশী দাঁড়াবে না।

(১) বিভূতিবাবুর গান ও সুরটির কি হবে সময় তা তাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরাই বুঝতে পারবেন—গানটির স্বাভাবিক দ্রুত মিশ্রমিত অর্থাৎ প্রত্যেক লাইনের ১২টি প্রায় অক্ষর আছে, কিন্তু আমি তার মাত্রার হিসাবে ধরেছি বিলম্বিত। উদ্দেশ্য, তাঁরা যথার্থ এ গান গাইবার অধিকারী তাঁরা একটু বই ক'রে এদিকে ক'রে নেবেন, —যাদের তেমনটা শক্তি নেই তাঁরা যেন মন্দা ক'রে এ গানটিকে হত্যা না করেন এই আমার অনুরোধ—বিলম্বের জন্য তাল বা বিরতি সমান না গাইলে বাধিত হব।

গানটি এই :—

(১) আকাশ ভরা যে বাসনা—
(২) কে বুঝিবে বল, তার অন্তরতল
(আমার) বুঝিবি তুমি তার সে বেদনা।
(৩) লোক-মুখে শুনি আছে দিক-বিদিক,
অন্তরাল এ আঁধার আছে যবনিকা,
আছে দুরাশার মরীচিকা ছলনা
আমি সব জানি তবে কেন যে বেদনা।
পরাণের সোনা বেঁধেছি কবচে
(আমি) অনাগত সুখ না জানি কেমন,
তবু অজানার বিরহ আমার,
আমি সব জানি তবে কেন যে বেদনা।
তবি আমি বিনি এ মনের মুকুল
ফল-মূলে তোমা করিবি প্রদান,
(আমার) আমি নাই তবু তিনি অজানা
তাহাতে আমার ভাবি-বেদনা।

গানটি প'ড়ে যে ছবিটি আমাদের সামনে ফেলে উঠলো তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই :—

একটি মনে একটি অন্ত ব'সে রয়েছে (১) সে নিজের দুঃখ প্রকাশ করছে (২) ধীরে ধীরে ভাষাটি ফেটে সে বলছে "কে বুঝিবে বল···ইত্যাদি (৩) তার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা দেখা দিচ্ছে, দুঃখের সঙ্গে সেটা মিশে যেয়েছে "লোকে মুখে শুনি···ইত্যাদি" (৪) এর বেশী তার দুঃখ হ'চ্ছে যে তার সঙ্গে ব'সে আছে—সে ধীরে ধীরে বলছে "পরাণের সোনা···" ইত্যাদি—অন্তরটা তার দুটি গান গেয়ে শুনাচ্ছে। (৫) আর সে সহ্য করতে পারছে না—মাথাটা উপরে তুলে হাত দুটি উপরে তুলে সে ভগবানকে টেনিয়ে ব'লছে "আমি নাহি তিনি"··· ইত্যাদি।

অনুরূপিপি :—আমি আমার অভিজ্ঞ নিয়ে সাধারণ গানের বড় সহজ অতি কিছু তাতে একটি ছোট ঘরে নিয়েছে, সেটা তত কিছু নূতনত্ব করতে যাওয়া হয়েছি। সমস্ত সর্তার ফোনটি এক একটি অক্ষর আমা প্রকাশিত হয়। যথা 'আ'র ফোনে "অ" ইত্যাদি কিন্তু "আ"র ফোনে "আ" ইত্যাদি

তালের সেখায় যেমন মা ছাপার বেলায় তেমনি খোলবোধ করার সুবিধার জন্যে আমি "মা"র বেলায় "মা" দ্বারা প্রকাশ করবো—যেখানে "মম্" অর্থাৎ দুই মাত্রা সেখানে "ম" স্থানে "ম" দেব।

(৮ মাত্রা)

(১) সা গমা পা মা। | মপা পপা। মা। | +
গা। সা।।
ও ছে ব | যে০ ন০ ত | না০০০

(২) সা মপা পা পা। | পা ধপমপা মমা।। | মা মা মা গমমা। | পপা। গমা মমা
কে ন০ ছি যে | ব ল০০০ ক০ | কী বি ত ল০ | ০ আমা০ ৫
পা ধা সা র্সা। | ।মপা ধধ: প: পপা। | মা মপা মপধপা মা। | মপা মা। সা

(৩) পা মা পা ধমমা। | ।মা মা।। | মা র্সা র্সা র্সা। | র্সমা ধর্সা।।
দো ত দু যে | ০ত নি০ | আ ছে নি মা | নি শি ০০
পা র্সা র্সর্সা মা। | মমা পপা পা।। | পা মা। মপর্সা। | ধমপর্সা। র্সা মা।।
আ লো তো কী | ০০ ধা যো০ | আ ছে০ ন০ | নি০০০ ন শী০
পপা। পা পা। | মপধমা মা মপা। | পা গপা মা মা। | মা গমা ধমা।।
আছে০ দু হ | যে০০০ন০০০ | দু খ০ দু ব | ধা নি০০
পা মা পা মা। | ।মা মা।। | পপা। মা মা। | পা মমা। গমা।
কী বি মা ই | ০ জা ই০ | দেখা০ যো যো | দো মা০ক্ত যে যাওনা ইত্যাদি

(৪) মমা। ধ্ব। সা। | পা পপা।।। | পপা। পঃ পা। | পা ধপা মা ধমা।
ওরা০০ যে | কি খোরা০ ক | দেখি০ নি ত | খ ন০ ০০
গপা মা পা।। | মা। মা।। | র্সা মর্সা মা মা। | মমা। ধধ: পঃ।।
আমি০ ত০ | ন০ শী০ | ত০০০ | দুঃ০০০০০
মা ধপা মা গপা। | মা পা ধমা।। | পা পা ধপা মা। | পা পা ধপা মা।
মা মা০ নি০ | কে ন ন০ | ধ ত০ ক | র্স শী ত০
মা মা মা ধমা। | মা গমা মমা।। | মা মা মা পা। | মা পা পা ধপা
শি শু ত আ | ন ন০ ০ ন | কী বি মা ই | মা ই০
মমা। মা পা। | মা মা। গমা। |
দেখা০ যো যো | দো মা০ "ওরা যে যাওনা ইত্যাদি

(৫) মা পা পা মা। | মা মর্সা র্সর্সা র্সর্সা। | র্সা র্সা র্সা র্সা।
ম বি মা হি | মি শি০০০০ | এ ন ত ন

পর্সা র্সা র্সা র্সা।	। র্সর্রা না ধপা।	পা মা ধনর্সর্রা মা।	না না । না।
ঃ ন ঃ ঃ	ং কে ং ন ং ং	ক বি বি ং ং ং প্র	ঘ ং ং ন
পপা । পা পা।	পাঃ পধঃ র্সপা পপা ধধঃ পঃ ন পা ধপা ধপা।	মা মা পধা ধপা।	
আমার জাঁ বি	মা ং ং ই ঃঃ	বি বি ং ং ং ং	অ ঃ ঃ ং ন
মা মা পা মা।	। মা না ।।	ধর্সা না পা মা।	পা পপা । পপা।
ধা ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ	ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ	ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ	ং মা ং ঃ ঃ ঃ ঃ ইত্যাদি

আমরা গানে তানের আর সুরে অলঙ্করণ এত বেশী যে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে বার করতে হয় না। দেখি যদি অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সুরে তাঁর নিজের তৈরী একখানি গান গুনেছিলাম। সে গানখানির স্বরলিপি দেখি "ভারতবর্ষে" দেখলাম। সুর লেখা আছে আধাআধি, তান লেখা। সুর যে আধাআধি রয়ে এ ব'লে আউড়ে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ৮০ শতকরা সাধারণ গায়কই জানেন না আধাআধি আর পৌনঃপুনীকে কি তফাৎ। অবশ্য এ গানের সুরটি দুষ্টি হয়ে একটিরও বাদ দিয়ে যায়নি। যেন কথাটার উপর জোরটা ঠিকমত পরিষ্কার ভাবেই তার বিবরণ দিয়ে রাখি :—

আধাআধিকে ঃ—ঃ—ং—ং বানানে। যদি পা—ধপা হীন—অর্থাৎ আরোহণে "পা" ব্যবহার নাই, আর পৌনঃপুনীকে পা—ঃ—ং—ং বানানে—যদি পা—ধপা সহ—অর্থাৎ আরোহণে "পা" আগে ব্যবহৃত হয়, তাকে ধ'রে নিতে পারে না—অর্থাৎ পা—ং—ং—ং পরস্পর আলাদা হয়ে যাবে—একটা থেকে আর একটায় গড়িয়ে যাবে না। তাতে ধরবার ভঙ্গ এসে যায়—এর জন্যে সুরবার ঠিক সঙ্গীতে একটু ধরীর মেল পর্যন্ত হেঁকে হবে। সে পর্যন্ত হেঁকে আর সুরবার প্রয়োজন হবে না। জিনিষটার মীমাংসা তার্কে না করতে পারলেও প্রাণ দিয়ে করা শক্ত হবে না।

বাকরা তান হেঁকা যোগ হয় স্বরলিপির সুবিধার জন্য—আর একটু বিলুপ্তানী গন্ধ গানটাতে হেঁকার জন্য। তাহার পরিচয় বিষয় সময়ের বর্ণনায় জানায়। মোট কথা, অক্ষর গুণেই বোঝা যাবে যে, প্রত্যেক লাইনটি ৮ মাত্রায়—তাই ত্রিমাত্রিক সুর আনতে কথাগুলি নিয়ে টেনাটেনি করতে হবে।

আমার ধারণায় তাল হিসেবে সুর দিতে গেলে এ রকম হবে—

সা ঋপা পা পপা।	+ মা ধা পধা পা।	জ্ঞঃ পঃ জ্ঞা ধরজ্ঞা মা।
অ আমার ং আ	ছি ং মা ং ঃ	আ ং ং ছি
+	[। পধা]	
মা সসা । সা।	রঙ্গা রঙ্গা ধপা জ্ঞরপজ্ঞরসা।	পধা পা ।।
অ পাখীঅ গা	ছি ং ছি ং ং এ ছি ং ং ং ং ং	আ ং ং ন ং
+		
ঃ পা পর্সা র্সা র্সর্সা।	জ্ঞর্সা পজ্ঞা রঙ্গা পধা।	ধপা ধঃ ধপঃ জ্ঞরা সসা।
অ ও নি বি ং এ	ন ং ন ং ং মা ও ধা	এ যে ন ং ং ঃ

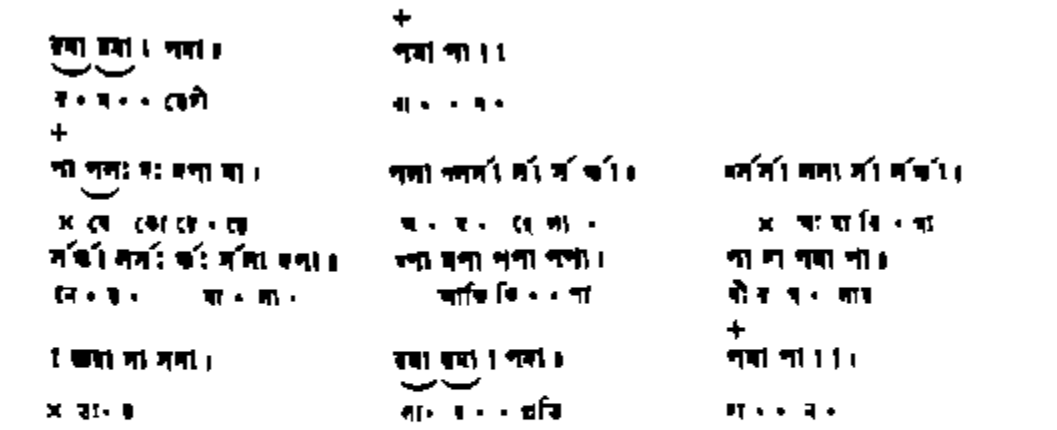

আর একটি অবস্থায় যেখানে আবেগ বেশী দেখা যাচ্ছে, সেখানে সুর এ-রকম হওয়া উচিত :—

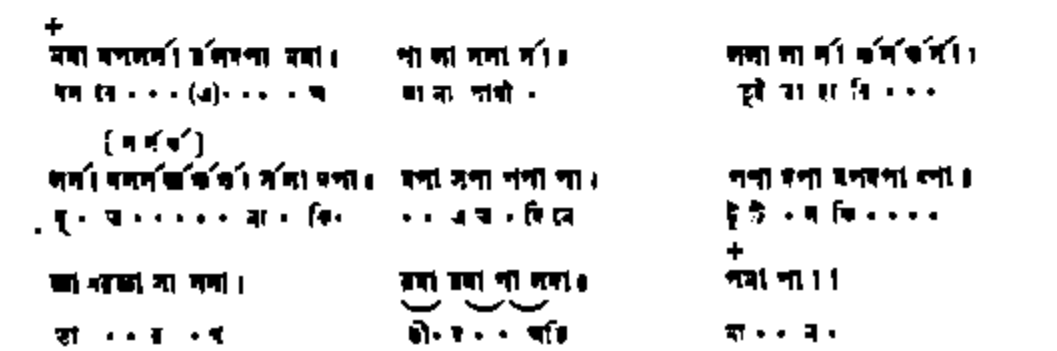

আমি যে-রকম ভাবে এ গানটিকে গাই সে-ভাবে বিভোর হয়ে শ্রোতা হাজারে একজনেরও কাছে আসবে না ব'লে সহজ করতে গিয়ে অনেকটা সৌন্দর্য্যের ক্ষতি হয়েছে—কিন্তু তবু আশা করি কবি ও অন্যান্য গুণীরা এতে ভাষা ও সুরের ভিন্ন দেখতে পাবেন।

বৈষম্য

(উপন্যাস)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ভাগলপুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬

অহীন্দ্র সমারোহের সহিত রায়সাহেবের বিচারগৃহ হইয়াছিল। উইলটার সমাপ্ত-পত্র পরিচ্ছন্নরূপ বলবান তর্কযুক্তিসহি এই দুইটি বাদের মূল-তত্ত্ব। তিনি প্রাথমিক ক্রিয়া শিক্ষা মুহূর্তবাদের মূলে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তেশ্বর-দুর্গার-রাধ-বন্দনা, ব্রহ্মচারী-সন্তর প্রভৃতি বেদবাদের বন্দনীয়া নিখিল-বিচার অধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবীকে প্রণত করিয়া এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ফলে, বেহিত যখি বিচার সমর নিত্য-তত্ত্ব হইতে এমন সকল বেদা সম্পন্ন হইয়াছিল যে, তর্কযুক্তিসহি ব্যবসায়ের প্রবেশ সম্মুখে রায়সাহেবের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্রখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বহুদর্শনার পর তিনি যোগ্য করিয়াছিলেন যে, বলের প্রাণ এবং অবলম্বনে অধিষ্ঠাত্রী পণ্ডিত হইয়া কালে হাইকোর্টের জেষ্ঠ বিচারাসনে অধিকার করিবে।

এই অমোঘ কল্পনা ব্যর্থ হইবে, এমন কথা বলিবার দুঃসাহস কাহার আছে? অসীম ভবিষ্যতের সীমাহীন সম্ভাবনা! প্রীমান্ রায়সাহেব জেলাকোর্টের উকিল হইতে অনায়াসে কত বড় উচ্চে উঠিতে পারে—তাহার নির্দ্দেশ বা করিবে কে?

এই ব্যাপারে হাক-কোল বাহু-পরিবেষ্টনকে দৃঢ়-তর আলিঙ্গনে করিয়া তুলিয়া দাঁড়ালিলের সরল অন্তরে যে বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা হইতে ফল দাঁড়িয়া তাহারা দেখিতে আসিল তাহারা প্রবলতর হাতে ওকালতি শিক্ষা লাভ করিয়া অন্যদের পরাজয় করিবার পথ পায় না। বহুদূর প্রসঙ্গপ্রসঙ্গে আলোচিত হল এই হুকুমের পূর্বের প্রতি লাঠৌপরিধি বিধান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই। তার যাইয়া তাহারা মনে মনে উপলব্ধি করিয়াছিল যে, সুখের চেয়ে বাদুর উচ্চাসের প্রবলতা অনেক বেশী। এবং নিষ্পত্তিকার পক্ষ উপযুক্ত মনে কোন প্রকারেই লঘু হয় না।

রায়সাহেবের সাজার-জিমাদারি সুখী একার অতি-নিবেশের সহিত পর্যবেক্ষণ করিত। তাহার মনের সকল বৃত্তি যেখানে ঢেলিয়া যাইত সেখানে তাহাকে বিপক্ষ ব্যাপার সমস্ত বিষয়টাকে প্রহেলিকা করিয়া তুলিত। বিচারের ফল প্রবণ করিয়া সুখীর মনে লোভের সঞ্চার হইল। মক্কেলের বিচারক করিতে তাহার মনে তীব্র ইচ্ছা হইল। কিন্তু সহসাকে এ কথা বলিতে আর বিন্দুমাত্রই সাহসে কুলায় না। অবশেষে এক গভীর রাত্রে সে কাতুকুতি মিনতি করিয়া সহসাকে ধরিয়া বসিল। পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে কোন্ পিতা-মাতার না ভাললাগে? তবুও সহসা মনে মনে হাসিতে লাগিল। সে ভাবিল, সুখী, তার বেই এই সব ব্যাপারে—বলা বেঁচে থাকলেই আমাদের ভের।

সুখী মনে মনে বহু আলোচনা করিয়া স্থির করিল যে, এখন মনে বাঁচিয়া থাকিবার কোন ফল নাই। তাহার উপরোধ অনুরোধের শেষ রহিল না, কাজেই একদিন সহসা সুখীর এই জটিল সমস্যার মাঝির ভার-ভার তাহারা তীক্ষ্ণ বঙ্গের হাতে সমাধানের ভার নিবেদন করিল।

তীক্ষ্ণ বঙ্গের অতি-মানবতার অধিষ্ঠান করিলে কোন দাঁড়ালের আর কথা ছিল না। ফল হইতে

বল বিল বলা ভুল-প্রেম, তাহার উদ্ভাবে সে ভোর করে। তখন মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ ভোর-দৃষ্টি নিক্ষেপ নিমেষে অনিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত—মানুষের কথা ত' বর্ণনার অপেক্ষা নহে!

লছমনের এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া আচার্য্য-দেব মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা সে বেটা! কাল পুত ক'রে সব্ বলবো।

পরদিন প্রাতে লছমন গুরুদেবে বন্দনা করিলে সুখী আর কোনক্রমে বেগ ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে না। কি-হল—কি-হল; বেশ ঘরুণ-বাড়ুনের প্রশ্ন! স্থির হইয়া সে আর কোন কাজ করিতে পারে না, ঘর এবং বাহির করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

তীক্ষ্ণ মতন তখন আদ্যোপান্ত কথাটা অতি খুঁটি-নাটির তলে লছমনের সহিত চক্রান্তের গভীর মন্ত্রণা করিয়া পরিতৃপ্তির সহিত পরিণতি সেবন করিতেছিল। ঘরিয়ানন্দের প্রভাবে সকলের চক্ষু ভোর রক্ত বর্ণ।

লছমন সাঙ্গাঙ্গে প্রণিপাত করিতেই তীক্ষ্ণ তর্জ্জনী উঁচিয়ে তাহাকে সেই চক্রের মধ্যে বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। এত বড় সম্মান লছমনের জীবনে উদিত হয় নাই, তাই সে নিমেষে ধন্য এবং কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিল।

রাত্রি দ্বিতীয় পর ধীরে ধীরে এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। লছমনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীক্ষ্ণ কহিল, এরে লছমন রাম্বি, ভোর বেটীর বদির বড় বেগ..... ...কথা শেষ না হইতেই লছমনের মন ঘন মাথা নাড়িয়া জানাইল—তাহা ত' বটেই, তাহা ত' বটেই,—এ কথায় যে সন্দেহ করিতে পারে?

তীক্ষ্ণ আবার আরম্ভ করিল—কাল রাতে, রাদ্‌রে রাদ্! দু-দুটি লাবটা! অর্থাৎ এই অল্পবয়স সংখ্যার দুজনের সহযোগে ইতিপূর্ব্বে আর কখনো হয় নাই! লছমন রাত্রি তাহাদের কথা এবং লড়াই শুনিয়াছিল। তীক্ষ্ণর দুই-চোখের চাহনীতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, এমন একটী অভিজ্ঞতা তাহার জীবনে আসে নাই বলিয়াই।

লাঙ্গলাল পাঁড়ে ও লাখাটি সহ লছমনই কলাপ-গুরুত্ব,—তাই দুই দুটি রাত্রি, লছমনের পুত্রের শুভ সূচনা করিয়েছিল। কিন্তু বিবাহের ব্যাপার লইয়া দুজনের মধ্যে মারাত্মক মতভেদ হইয়াছিল। এক দল বোধ করিয়াছিল যে, ইহা হইতে এই জাতির কাল অবধারিত, কিন্তু অপর দল—যাহারা সংখ্যায় বেশী, বলিয়াছিল যে, এই অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য, এবং তাহাদের জাতিকে পরিপূর্ণ যৌবন দান করিবে।

তীক্ষ্ণর কথা শুনিয়া শ্রোতারা স্তিমিত-মৌন হইয়া রহিল। তখন সে লছমনের প্রতি প্রশ্ন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, খুব খুব-ঘরাকার মনে কিন্তু এটাকে বন্ধুকে হবে যে ভুল, তা পারবি?

লছমন হঠাৎ কেমন যার মাত্রিয়া যাইবার করিয়া ফেলিল যে, সে পারিবে। তীক্ষ্ণ অধিকার উৎফুল্ল হইয়া বলিল, সাবাস্ যে বেটা, সাবাস্!

চারিদিকে তাহার প্রশংসা-তারিফের ঝড়-ঝড় পড়িয়া গেল! তখন আচার্য্য-দেব এই অনুষ্ঠানের মঙ্গলাময়ত্বের উৎকর্ষের একটী লম্বিত তালিকা দিলেন :—

(১) দু-দুটি লাভ বন্দুক বলি দিতে হইবে।

(২) লাখটী পাঁঠী।

(৩) এক গোছা বাঁশ।

আরো যারা আচার্য্য-দেবের তুলীর অস্ত্র—তুলি, তাহারা কথা বলা বন্ধ রাখিল।

* * *

* * *

ভোর বলি বৈধ-ভাবিত হইয়া লছমন তীক্ষ্ণর করিয়া বলিল যে, এই সকল ব্যবস্থা সে করিবে। কিন্তু ফিরিবার সময় পথ চলিতে চলিতে এই বিরাট ব্যয়ের কথা চিন্তা করিয়া সে বিশেষরূপে ভাবিত হইয়া পড়ে।

ঘরে ফিরিলে সুখী সকল কথা শুনিয়া বলিল, তুই ভাবিস্ না—আমার টাকার চুড়ি আমি বেচে দেব যে।

লছমন ম্লান মুখে বলিল, সুখী হবে না যে, ওতে হবে না।

তবে ? কত্তা চাই ?

লছমন দুই হাত দুই পাশের খানিক দেখাইয়া বলিল, এক-কুড়ি !

সুখী বিস্ময়ে চিৎ হইতে লাগিল। পার্বতী নদী যেমন করিয়া সাগরে যাবার জন্য অস্থির হইবার বেগে বারবার উদ্বেলিত হইতে থাকে তেমনি করিয়াই যেন সুখীর ইচ্ছার আবেগ তাহার অবাধের পাশদুটো বিরক্ত আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে লছমন অন্যান্য গরু-বাছুর লইয়া মাঠে চলিয়া গেল ; তাহার ফিরার মধ্যে আগুন ছিল না। যাহা অসাধ্য তাহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া সে বলিল, তোমাকে পাওয়া যাবেই না—তোমার কথায় বিয়ে ভাবনা ছেড়ে দেব কি হবে আমার ?

কিন্তু সুখীর মন ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ উৎকণ্ঠায়ের ; সে অন্যের মধ্যে নিজেই ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। তাহার একটি ভাবের ছোঁয়ার উপায় অন্বেষণ করিয়া দিনে দিনে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল।

সেদিন সকালে মুহূর্মুহুরাম একটা মোরগ ধরিয়া বাহির হইয়া যাইবার পর, জয়াবতীর নিকট সুখী গিয়া বলিল, মা, দিনটা টাকা কর্জ দে।

মোরগের মুখের ভূমিকা না করিয়া অকর্ম যদি এমনি করিয়া টাকা চাহিয়া বসে, তাহা হইলে টাকা ত পাওয়া যাবেই না, অধিকন্তু কেবল একটা উগ্র উষ্মার সৃষ্টি হয়।

যদী বধিরের মুখে তাহার অভাব-দুঃখের কথা কাহিনী-ভূত শুনিতে চায়। বোধ করি, পীড়িতের যেহি-যেহি মনীর ইচ্ছার পরশনে যথাই তাহাকে ক্ষুব্ধ এবং ক্ষুব্ধ করিয়া আনিতে থাকে, তখনই তাহার মনের মধ্যে পূর্ণতর হইয়া উঠে !

জয়াবতী বিস্ময়ে বাহিরা কক্ষ করিয়া বলিলেন, দেখেছ, দেখেছ আমার ছেলের ? চোখার কিছু নেই, হুস্ ক'রে এসে বসে কিনা—দিনটা টাকা কর্জা দে ত !

আ-মরে যাই, তোর জন্যে এই সাত-সকালে আমি টাকার থলে নিয়ে ব'সে আছি নাকি ?

সুখী তাহার মায়ের অসাধারণ সমজদার সহিত বলিল, যে যা,ণে, দুই দিবি না ত' দিয়ে কে গো মা ? আমার বড় দরকার আছে যে !

জয়াবতীর একটুও ভাল্লা হইল না,—তোর দরকার ত' আমার কি লা ? যা, যা, আমি তোকে টাকা-কড়ি দিবে-টিবে পারবো না—গুন্ডিস্, আমার যা কথা তাই জান।

সুখী বুঝিল যে, জয়াবতীর কাছে টাকা পাওয়া যাইবে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, রাগ করিস্নে মা, আমি যে তোর কথা ভাবছিলাম, টাকা ত' ফেরে নিয়ে আমি বি ?

সে চলিয়া যেতে জয়াবতী খুব জোর করিয়া বলিয়া উঠিলেন। টাকাটা না দিয়া মনে মনে বিদুষায় ভরি বোধ করিলেন না। উপরন্তু, কেমন যেন একটা উদ্বেগ তাঁহার বক্ষ মনের মধ্যে ধড়-ফড় করিতেই লাগিল। মনে হইল, দাঁড়ালেরা ত' সংসে টাকা ধার করিতে আসে না, এবং যদি ধার লয় ত' তাহা পরিশোধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সুখী আসিয়াছিল নিশ্চয় কোন লাভে ঠেকিয়া। কিন্তু— এই ধার জয়াবতীর ধার হইল, কিন্তু সে-কথা ভুলিয়া, প্রকাশ করিয়া বলিতে তাহার কি হইয়াছিল ?

জয়াবতীর একটা ক্রমাগতই এই ব্যাপার লইয়া তোলা-পাড়া করিতে লাগিল। মনে হইল, হয়তো বা কোন মানৎ-পূজা ছিল, তাই টাকার প্রয়োজন। টাকা না পাইলে পূজা বন্ধ হইয়া যাইবে। সেই অসাধ্যের হয় ত' একটা ভয়াবহ ভাব তাঁহার উপর অর্পাইতে পারে। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মন তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ খারাপ হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, না হয় সুখীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে টাকা-পাঁচেক দেন। কিন্তু তাহাতেও লজ্জা বোধ হয়।

সুখী বাড়ি ফিরিয়া মাসে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, মুনিবের কাছে

হারিলেই টাকাটা পাওয়া যাইবে, আহত টাকার ত' উহাদের অভাব নাই; সে অত্যাবশ্যক স্থানের অভাব কিছুতেই পূরিয়া আসিতে পারিল না। অবশেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু টাকা তো আমার চাই-ই চাই।

অন্য মনে বরদার শিকল গুটাইয়া ফিরেই ফিরত হইবে যমলা ভাবিয়া উঠিল। সে নিজের ভুলের জন্য একটু লজ্জিত হইয়া যমলাকে সঙ্গে করিয়া ঘাটে লছমনের কাছে চলিল;—ভাবিল, দেখি সেই বা কি বলে।

লছমন সকল কথা শুনিয়া বলিল, সুখী, তুই এ আশা ছাড়।

লছমনের নিষেধের ফলে সুখীর যেন উল্টোরোক্ত বাড়িয়া চলিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই শুধু কর্মের জন্য টাকা মিলিবেই-মিলিবে। কিন্তু বাড়ি গিয়া নিশ্চয় বলিয়া থাকিলে টাকা কি আপনি হাতে আসিয়া পড়িবে?

সুখী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যমলা বহিন তোর কাছে—আমি বাসিয় বাড়ী যাবো।

যমলার বাসীর বাড়ি যাইতে বড় ভয় লাগিল, তাই সেও যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। না, তুই যাবি না বলিয়া সুখী তাহাকে পাশে একটা চড় বসাইয়া দিতে, সে নীতিমত কান্না জুড়িয়া দিল।

যমলার গায়ে হাত দিলে লছমন বোধ হয় কেমন চটিয়া উঠিত: সে রাগ করিয়া বলিল, হক-না-হক মারিস্ কেন? তুই বড় ঘর-খেলাখি হয়েছিস্ সুখী, ব'লে দিচ্ছি, তোর যদি যমলাকে কোন দিন মারিস্ ত' দেখতে পাবি।

যমলা গিয়া পিতার কোলে চড়িল এবং সুখী রাগ করিতে করিতে চলিয়া গেল। মার্কাদার সঙ্গে লড়াই করিবার তীব্র ইচ্ছার এতটুকু গতি-রোধ যেন তাহার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন পথ অন্ধকার হইতে সন্ধ্যা নবীন হইল, তখন মনে পড়িল যে লছমন-যমলের খাবার কোন ব্যবস্থা না করিয়াই সে যেন পাপের ঘর ছুটিয়াছে। মনে মনে একটু লজ্জা বোধ করিয়া ফিরিয়া উচ্চ স্বরে লছমনকে বলিল, হাটিয়া থেকে তোদের জন্যে কিছু-খাই আন্‌বো কি বলিস্?

লছমন খুশী হইয়া বলিল, আন্নো যা যা! —ক্রমশঃ

রোমান্স

শ্রীযোহিতলাল মজুমদার—কলিকাতা

(Andrew Lang হইতে)

উত্তর-সাগর-কূলে ছাদশ কানন,
তার মাঝে একখানি দৃশ্য প্রাসাদ—
সে দিন আমার সেই প্রিয়ার ভবন:
মোর লক্ষ্মীর লীলা উৎসব অবাধ
যেথা যায় দুই দিন। ঘোর-ঘোরান্তর—
যবনাম্বা-অন্ধকারে, শীত বালুচর।

দেখা, যেন-বাহিনীর তপ্তাসি প্রভায়
অন্ধকারে রবিরশ্মি মিলায় সুদূরে,
আমনে আমার কাঁদে, গোধূলি-ধূসায়,
ধূসি-ধূসিরী আসে বাহিরিয়া ধূরে—
ধূপুঞ্জ-ধবল ধারা অন্তরতর,
ফিরে যায় উষারাগে উৎসাহারা নর!

জানি না, আজো কি আছও সেই উপবন
দৃশ্য প্রাসাদখানি যেমনি দেখিনা,
জানি না, গাছের ফাঁকে যেন দুইজন
চলিতে গলায় দিয়া উষারে হেরিনা!
প্রিয়ার শিয়রে এবে ঘোরে কৃষ্ণকেশ,—
হিয়া মোর ক্ষুণ্ণিত—অসাড়, নীরস!

বাঙলা-ভাষার ক্রমবিকাশ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত ভারতে আর্য ভাষা যে ভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, তার একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করা যাক। এই ক্রমবিকাশের ধারাটি নিম্নলিখিত ভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে :—

(১) প্রাচীন আর্য ভাষার বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত রূপ। খৃঃ পূঃ ১০০০-এর আগেকার সময়ের বৈদিক যুগে এই ভাষার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপ দেখি, আর এই ভাষার আর কোনও রূপ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারি না। খৃষ্টপূর্ব ৪০০ সালের পরবর্তী সময়ের লৌকিক রূপ।

(২) মধ্যযুগ আর্য ভাষা পালি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আর সংস্কৃত থেকে কৃত্রিম ভাবে প্রাকৃতিক হয়েছে, খৃঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৪০০ খৃঃ। এই সময় বৈদিক ভাষার আনুষঙ্গিক প্রাকৃতিক ভাষা

একটু ভাল। [২য় ও ৩য় অংশ।] মাঝের-এর এই দুটো ভাষার মধ্যবর্তিতার ধারা কখনও আগের প্রকৃত নির্ণয় পাই না। তার আনুমানিক কল্পিত ভাষার সাহায্যে এই ভাষার অবস্থাটিকে কিছু কিছু আন্দাজ পাই। যে থেকে বুদ্ধের পরে যায় যে পূর্বী অঞ্চলে যে ভাষা তাকে তার উত্তর অঞ্চলের ভাষাই অপেক্ষাকৃত বেশি প্রাচীন ধারার ছিল। আমাদের পূর্বী ভাষার পূর্বী সেখানে হয়। পূর্বী থেকে এই ভাষা ভাষার কোনও নিদর্শন পাই না, কিন্তু বৈদিক ভাষার-এর কতকগুলি ভাষা ভাষার মোটা-মুটি-অনুমানিক পরে ভাষার ধরে আসে—বিহার, যুঃ, বিহার, আঃ, পঃ, বিহু আদি।

(৩) এই সব থেকে আধা অঞ্চলের এই ভাষা আরম্ভ হল দিয়ে, দুই ভাগে বিভক্ত করে বিশেষ :—এক, পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা ; যার দুই, পূর্বী অঞ্চলের ভাষা—এখন তার ধারে ধারে বেহারী ভাষা দেখা যাচ্ছে। আমাদের অনুমানে এই পশ্চিমা ভাষাগুলি বিশেষ পাই। পূর্বী ভাষার এই পশ্চিমা ভাষার ভাষা থাকি এই ভাষাগুলি যে, খৃষ্টীয়ের সব ভাষার পর আসার ধরে, যার পশ্চিমে কিছু সংস্কৃত আসার ছিল না, এর আসার পরে সংস্কৃত ছিল। দু' একটি প্রমাণে দেখে এই পূর্বী ভাষা ও বাকী ভাষার নিদর্শন পাই, এগুলি আসার মূলে এগুলির ভাষা যেমন-আসুরের ভাষার ভাষার-নির্দেশ এর ওপর ভূমিকায়। ঐ দু' মূলের পৌঁছাবে থাকে এই পূর্বী-ভাষা ভাষার দেখে ভাষা ভাষা আসুরের ভাষার হয়।

(৪) সবচেয়ে ভাষার ভাষা আসুরের নিদর্শন পাই মাঝের ভাষার ভাষার। ইহার এক্ষুর ভাষার ভাষা ভাষার দেখে এর ভাষা ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনা করা যায়।

(৫) ভাষার এর ভাষার ধরে এর দুই-ভাগ—ভাষার দেখে ও ভাষার দেখানোর ভাষার ভাষা ভাষার নিয়ে পাই—ভাষা-ভাষার দু' একটি ভাষা ভাষা ভাষা নিয়েই দেখা যায়। এই ভাষা ও ভাষা ধরে ভাষার আসুর ভাষার ভাষার ধরে ভাষার—বিহারী (দেবনাগরী বৈদিক ভাষা), ভাষার, ভাষার ভাষা ভাষার ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল।

(৬) এর পরে ভাষা ভাষার এসেছে আধুনিক ভাষাগুলির ভাষার ধরে পৌঁছায় নিয়ে—১০০০ খৃষ্টাব্দের নিকে ভাষাগুলির ভাষার ধরে ভাষার ভাষার ধরে।

(৭) ভাষার ১১০০ খৃষ্টাব্দ, দুর্ভাগ্যের ভাষা ভাষার ভাষা পড়ার দেখে ভাষার ধরে ৬৬—ভাষার ভাষাগুলির ভাষা। দু' পা ভাষা ধরে ভাষা-ভাষার দেখে বৈদিক-ভাষা নেই। তবে এই ভাষাগুলির ভাষার ভাষা ভাষার ধরে। পরে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

...ধারণায় "New India" পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন—

"The appointment of Mr. Asit Kumar Haldar as Principal of Lucknow School of Art marks a specially important step forward in the cultural movement in India for the first time as far as we are aware, a working artist in the purely oriental style has been given a front rank appointment of great responsibility in a Government school in British India without any of the limitations of training in the western style and without any conventional academical acquirements."

বিলাতি পত্রিকা-সমূহ অবিমিশ্র প্রশংসা করিয়াছেন। ...কলা ইহাতে তিনি আরও অধিক সময় নিবিষ্টচিত্তে কলা বিশ্লেষণের ও পূরণ করিতে পারিবেন। ইহার লিখিত "অজন্তা" "ভারতের ও সিংহল", "ইণ্ডিয়ান আর্ট এণ্ড লেটার্স" প্রভৃতি বিখ্যাত। ইহার পরিচয় বাহুল্য ও অন্য অনেক পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং ভারতের সাধারণের ইহা অবিদিত নাই। কিন্তু অন্য অন্য ইহাতে এমন সমালোচনা পরিপোষণ দিয়া পত্রিকা হইয়াছে। তিনি একখানি পত্রে এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আমার নিজ ধারণা পরিবর্তন করিবার অনেক কিছু আমাকে পড়িতে হইয়াছে। আমার ধারণা ছিল যে, ভারতীয় আমার 'অজন্তা আর্ট ইন্ডিয়া' হইতে আমার ধারণা পরিবর্তন করিয়াছিল। এ পড়িয়া আমার ধারণা পূর্বের ধারণা পূর্বাপেক্ষা অধিক ধারণা হইয়াছে। ফলে, যে ভি-আর্ট ও আমার-সম্পাদিত বিলাতী পত্রিকাগুলি লইয়া বিশেষ ইহাতে ও সেই সকল বিলাতিদের অধিক আমার এই ধারণা হয়।"

...আমার-আমাদের দেশের ও বিদেশের অনেকগুলি বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ আছে। তিনি "আমেরিকা অন্ বিদেশ আর্ট কমিশনার" সহিত এবং পরি-বিদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশ্বকলা পরিষদের সভ্য, এডমিনিস্টার মেমোরিয়াল (Rorrick Museum, U. S. A.) কমিশনার সমিতির সভ্য এবং ইহার সভা ও সমিতি সম্পাদিকাদিগের ও এর সংগঠন করে একখানা আমেরিকানী। তিনি ইহার প্রায় প্রতিটি সভাতে অধিবেশনে পূর্ব-প্রধানত্বে, সভাপতির ও সম্পাদিকাদিগেরই পদে ও সভার সমিতি যোগ করিয়া পরিচয় পরিচয় করিয়াছেন, ইহার আমার, সভাপতি, সম্পাদক, কুশলাদি, পরিচয়, সভাপতি, প্রতিষ্ঠাতা প্রভৃতি ভারতের এবং

সভাপতি ও বিশেষ সভা করিয়া ভারতের সাহিত্য ভাস্কর্যের বিশেষ যোগ পরিচালনা করিয়াছেন। ইহার একটি ভারতের এবং আমেরিকার ইহাদের সম্পর্কে যে ভারতবাসীদের পরিচয়, বিদেশে ভারতবাসীদের বিশেষভাবে যোগ আমাদের এবং ইহাদের সভা বিশেষ পরিচয়ের সাধারণ পরিচয়ের এবং আমেরিকার পরিচয় আমাদের অনুভূতির ও পরিচয় করিয়াছেন। ইহাদের বিশেষ পরিচয় উপযুক্ত ও ভারতীয়-ভারতীয়দের আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা আমাদের আমাদের। দুই সভা পূর্বে আমার-আমার ভারতের সভার সভা হইতে লিখিয়াছিলেন—

...Mr. Asit Kumar Haldar, an artist of undoubted original talent and wide general culture, possessing the qualifications which make a good teacher ...Mr. Haldar has both the creative instinct and the teaching capacity which are necessary in a good art teacher ..."

ভারতের পরিচয়ে সভার বিশেষ পরিচয়-সমূহ সিভিলিয়ান পরিচয়ে ভারতীয় ভারতবাসীদিগের মধ্যে (Mr. N. C. Mehra, I. C. S.) লিখিয়াছেন—

"Asit Kumar has true imagination and feeling and with the perfection of his technical resources, would play an important role in the revival of Indian painting."

ভারতের পুস্তকাবলী: "Selected Examples of Indian art", ইংরেজিতে লিখিত বিশ্ব পুস্তক "A History of Fine Art in India and Ceylon", সাময়িক "Art Gazette" "The Modern Review" "The Modern World", "The Connoisseur", "The Chicago Daily Tribune" প্রভৃতি বহু ইংরেজি এবং ভারতের ও সাময়িক পত্রের বিশ্ব বিশ্ব পরিচয়-সমূহ ভারত আমাদিগের পূর্ব ইতিহাস পরিচয়ে।—প্রবাসী, পরিচয়, ১৩৩০

ব্যবসায় ও মনোবিদ্যা

ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়

...ভারতের ও পরিচয় আমাদের প্রভাব করা হয় সাহিত্যে ইতিহাসের পরিচয়। Furnaceএর ইহার ভারতের পুস্তকাদি প্রভৃতি ও আছে, আমাদের ভারতে ইহার পরিচয় নয়, ভারতের পরিচয়ের ইতিহাস পরিচয়ের আমার নয়,—এ সকল ভারতে সাধারণ পরিচয়ে যোগ

হয়। অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে বিশেষত্ব হলো একঘেয়েমি দূরীকরণ ক্ষমতা। এতে এ ধরনের, যাদের কাজে দৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজন হয়, তাদের কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যে কর্মীদের কাজের মান বৃদ্ধি হয়, এরা হলেন তারা যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করে, তাদের বিভিন্ন ধরনের কাজের সন্ধানদাতা। পরীক্ষার ও প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শ্রমিকের একঘেয়েমি দূরীকরণ, কাজ নিয়ে যেসব শ্রমিকের মনে।

কিন্তু যেসব পরীক্ষা-কাজ বিশেষত্ব কাজের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকেই প্রযোজ্য না, এর অনেক পদ্ধতি আজ প্রায়োগ করা যাচ্ছে। যে সমস্ত কাজ শ্রমিকের, যদি তারা সাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাদের কাজের হারেই। যেমন: যে কাজ-কারখানায় এই প্রক্রিয়ার কাজ হয়, যে শ্রমিক এই কাজ করতে পারছে তাদের অবস্থা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে পদ্ধতিতে কাজের ফল ভালো হয়। যেমন Furnace-এর কাজে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কাজ যেসময় এরই কিছু, কাজের ধরনই পরিবর্তিত হয়ে। এই সব কাজে শ্রমিকদিগের কাজ প্রশিক্ষিত করিবার প্রয়োজন কিন্তু কেন্দ্র নেয়া যায়। আমেরিকার Workingman's Insurance systemএর কাজ হইতে এই কিছু অনুকরণ করা হইয়াছে। সেখা বিশেষ যে, কাজ পরিবর্তন ও কাজ শ্রমিক সম্পর্কিত করিবার প্রয়োজন।

কারখানার মধ্যপরিবেশ যেসব বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন হয় এই পরিবেশে কারখানা কাজ যে বিশেষ বিশ্রামের সময় নয়। বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন, বিশেষ পরিবর্তন বিশেষত্ব কারখানা, কারখানার কাজ কারখানা পরিবর্তন অন্যান্য। এই সব কারখানা কারখানার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাজের পূর্তি করে হইয়া গেল। এখানে কারখানার কারখানা হয়, কারখানা বিশেষ বৈজ্ঞানিক একজনের কাজ দূর পরিবর্তন এবং পরিবর্তন বিশেষ কারখানা একটি দু-কারখানার কারখানা হয়। এই কারখানা পরিবর্তন পরিবর্তন এবং কাজ বিশেষ কারখানা হইয়াছে। কারখানিকদের যেই বিশেষত্ব কারখানার কারখানা ও পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন কারখানা পরিবর্তন। এরা Industrial Psychology বিশেষ হইয়াছে।

Industrial Psychologyর বিশেষ কারখানা কাজ কাজ বিশেষত্ব কারখানা কারখানাকে পরিবর্তন হয়েছে। কারখানার পরিবর্তন কারখানা, পরে বিশেষত্ব কারখানা বিশেষ দৃষ্টি বিশেষ পরিবর্তন কারখানা কাজ কারখানা বিশেষ হইতে বিশেষ পরিবর্তন কারখানা কারখানা কারখানা হয়। কাজ, কারখানার কারখানার পরিবর্তন হয়। যেসব কারখানার কাজ কারখানা কারখানা কারখানা

[illegible] [illegible] [illegible] [

ঠিকানায় 'বুধবার'

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত—এম্‌এ

তার নাম বুধবার।

আর দু'টী দিন বাদ দিলে সপ্তাহের, সকলেরই সে বুধবার।

—সেই বাড়ীটাতে যেগুলি ছোট বড় ফুলুরুলী কৌতূহল-প্রিয় চপলা আনন্দ-লহরী তাদের পরণে লইয়া যখন তখন তাহাকে ঘেরিয়া আসুল ঘুনিয়া বলে—ঐ বুধবার।...

কেবল ফুরাটির মুখে শোনা যায় বুধবারের সঙ্গে আর বিশেষণটি।

যায়!.....

অন্যান্য পাখের অন্যান্য ব্যবহার আর বেশী হইতে পারে না—যেমন হইয়াছে ঐ মানুষ প্রয়োগে।

যাহার সম্বন্ধে যেহু ঐ নামটির উদ্ভব হইয়াছে তাহাকেও সে বুধবার।

ঐ একটি দিন.....

তার আর কোনো নামে যেখানকার কেউ জানে না। এই বস্তীর বাহিরে সে কে-নামেই পরিচিত থাকু, সকলের উপরে তার নিজের কাছে টিকেও সে ঐ পাতলা নামটিরেই সত্য হইয়া উঠে।—

ঐ একটি দিনের সে আনন্দরাজ।—

সকলের বিশ্বাসে অন্যান্যদের পরণানি আকাশে আকাশে বেশী করিয়া বাজে। অভিসারিকার অঞ্চলরব যাহাদের যাহাদের বেশী করিয়া নিবিড় হইয়া ওঠে.....

রাত্রি প্রভাতে যত রাত্রিরাই তার সর্বাঙ্গসুন্দর আলোর হইয়া জ্বলে পড়ে, আজ সে বুধবার।—চন্দ্রালোকের মত ধীরে ধীরে বিলম্ব রাত্রিরা সে ঘরে পড়ার উপর নয়। বিদ্যুতের ঘড়ঘড়ীর আলোকের মত সে-মূর্তি ঝলকিয়া ওঠে।—

বুধবারটির সে একমাত্র সন্তান।—

ঐ দিনটির উপর আর কারারো দাবি নাই, তাহার অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্ব নাই। আবার প্রভাত না আসা পর্যন্ত তাহার কোনো কিছু অর্থের মত ঘুচিয়ে যায় ঘুচিয়ে।...

আর দু'টী দিন সে বন্ধী—

নিজেরই গড়া ঘর-দোরা লইয়া এক একবার অথাকের জন্য অন্ধ হইয়া বিদ্রোহী সে মুহূর্তে ছিঁড়িতে যায়।—সেদিন ঘরগুলি বন্দিনী হইয়া ওঠে.....

কিন্তু তা হবার নয়।—

আর দু'টী দিন বুধবারের চক্রের মত এক নিশ্বাসে চক্ষের নিমেষে ঘুরিয়া ঘুরের প্রত্যাশে সে চক্র কের বিশ্রাম পায় না।.....দীর্ঘ, অফুরন্ত, নিষ্ফল—একেবারে অবরুদ্ধ-গতি চির-বিরাম!—উপবাস উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতলের অন্ধকারের ঘরে যদি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া ঘুমিয়া যায় তবেই তার বুধবার অক্ষয় হইয়া ঐ একটি দিনের সিংহাসন তার চিরদিনের মত আগলায় রইতে পারে,—তবেই এই বিরাট বাস্তব-দিবস তাহাদের মত ঘুমিয়া পড়ে।...

বুধবারটিকে যদি বাঁধিতে পারা যায়!.....

বাঁধিবার মত কৌশলই না তার পাগলা খেয়ালে আসে; তার সবগুলিই যেন অদ্ভুত তেম্‌নি সহজ।...

ভাবিতে ভাবিতে মন নীল হইয়া ওঠে—

বুক কাঁদিতে চায়—

রক্ত-মাংস-স্নেহ-মমতা এসবে মথিত হইয়া যেন হলাহল উদ্গিরিত হইতে থাকে।.....

বুধবারের আগে তার পা বাড়াইবার যো নাই—এম্‌নি কঠিন শাসন।...মন যেমন থাকে, থাকে বসাইয়া যাবে বসিয়া বসিয়া ভূপতিত চৌহিয়া বসিয়া রক্ত-বমি করাইয়া ছাড়ে, তেম্‌নি শাসন করে বুধবার রাত্রি বারো দিন—

তাহার কঠিন নিষ্পেষণে প্রাণ তার বন্ধকে বন্ধনে বন্ধ-বন্ধন করিতে থাকে—

চুম্বকশলাকার মত এক লক্ষে শুধু দিগন্তের দিকে তাকিয়া সে শ্বাস টানে—

আর কোনো অবলম্বন, নিজেকে ভুলাইবার মূল তার নাই—

শুধু চাই তার পূর্ণাঙ্গ।.....

আকাশে মেঘ করে।—

অবাধ অন্ধকারে রমণী ডুবিয়া যায়—

জল নামে। অন্তরীক্ষ তার ধারা; মৃত্তিকার শরীর ধারি যাহিয়া চলে—

তালে তালে কাঁপে অন্তরীক্ষ নিরন্তরিত জল-তরঙ্গের গান।.....আকাশের বায়ু, পৃথিবীর মাটি শীতল হইয়া যায়—

কিন্তু দিনটি তা'তার ফুরায় না।

তার অন্তর-আকাশে রাগল-সূর্য জ্বলিয়া ওঠে,—মনে হয়, প্রীষ্মদিন আর আর উত্তপ্ত অবসান ছাড়া জগতে আর কিছু নাই—

ধরিত্রী তৃষ্ণায় পুড়িয়া শুষ্ক-বুকে উপুড় হইয়া লুকাইয়া পড়িয়াছে। বুঝি তার লজ্জা নাই।.....

—মেঘ জমিয়া যায়; জ্যোৎস্না ফোটে; ফুরফুরে হাওয়া ছাড়ে; পথিক বিরহের গান গাহিয়া যায়; দিকে দিকে সুখ-মুরলী জাগিতে থাকে—

কিন্তু এ-ঘরে কোঁচায় কোঁচায় শুধু অবিশ্রি হইয়া লাগল হয় শুধু তাহারই বুক, অতৃপ্তির অভিশাপে নিঃশেষে শুকাইয়া যাহার প্রাণ শুধু হইয়া যায় নাই।.....

এ-দেহে শত-শত আছে যার হিসাব নাই—

প্রত্যেকটী কণিকা তার রোমকূপ-পথে অনন্ত্য রোমকূপ দিয়া বাহির করিয়া অন্তরঙ্গ যাহার অঙ্গের স্পর্শ চাহিতেছে সে কাছে নাই।—দু'টিদিনের মুহূর্ত গণিয়া গণিয়া দিন শুধু ওঠে যাচে.....

দু'দিনের সেই নিরীহ সবগুলি মুহূর্ত একটী ক্ষিপ্ত মুহূর্তের মত না আসিতেই নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। উত্তপ্ত নিশ্বাসে হাসিয়া সে উত্তপ্ত অবাধ উপর উঠিয়া বসে।

ঐ আকাশগঙ্গার অযুতা রমণীর লাবণী দিনের একটি দিন সে তুলা দিয়া বিনিময় লইয়াছে।.....রমণী বিস্মিতা—

কিন্তু তার ঐ অনন্ত-এলায়িত অনাবৃত দেহ, ঐ যৌবন, ঐ রূপ, ঐ অধর, ঐ চক্ষু, যেন দুনিয়ার সকল পুরুষকে নিদারুণ-ক্ষুধে কেবলি ডাকিতেছে—এস, এস।—

পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া রমণীর সেই আকুল আহ্বান, নিজেরই দিকে অযুত সেই মুখর-ইঙ্গিত, সুরার উত্তেজনার মত, অবাধ ধরিয়া চলিয়াছে.....

কে-তাকে শুনিয়াছে কেবল সে।—

শয্যাগ্রহে, দুয়ারে, মোকামে, রাজপথে,—আরো দূরে, আরো দূরে,—দূরে: আকাশে, মেঘে, বৃষ্টিধারে, সূর্যে, গ্রহলোকে—ঐ একটি রমণীর আহ্বান বিরহর লহরি হইয়াছে যাহারই চিরসঙ্গী হইয়া,.....মধুকের আর মত লাখ প্রাণ অনন্ত উল্লাসে অহরহ গুন্ গুন্ শব্দে উঠার বেগ সেই অনিবার কম্পনে।.....

এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।—এক-নিমেষের বিলম্ব, মারণের দীর্ঘবিরহ।.....

অন্তরের বহ্নি তার চক্ষুর দুয়ারে ধক্ ধক্ করে।—

শনিবারের রাত্রে সে অন্ধকারে পথিক।

মেঘের মালা ছাপাইয়া এক দৃষ্টিতারা প্রবল হইয়া উঠিল, সন্মুখের দুয়ারটা বুঝি ফাঁকি দেবে।.....রোমশয্যা কণ্টকশয্যা হইয়া উঠিল।—দুর্দান্ত অধিকারে দুই দুই করিয়া বীভৎসপ্রাণের মাত্রা বাড়িতেছে। সে ঝাঁপি দিয়া একেবারে পড়িয়া যায় যাদু—

কিন্তু দুয়ারের সন্ধ্যা যেন ফাঁকি না দেয়।

লীলা, লীলা, লীলা।—

...ওই শুকাইয়া যাওয়ার কাছ হইয়া গেছে কিন্তু, বাড়িয়া ঐ-আসটী জল করিতে করিতে।.....যাহির হয় ফুরাইয়া যাইবে যদি তুমি একবার কাছে এস।..... তোমার নলিত মুকুলিত অঙ্গলতা, তোমার অতল উতল চক্ষু দু'টি, তোমার মৃণাল-বাহু, তোমার স্তিমিত, তোমার ললাট, তোমার অধর, তোমার হস্ত, তোমার যৌবন—

একটিবার কাছের দিকে তোক বুলিলেই আমি বাধিমুক্ত হইব; এস, একবার এস, দেখা দিয়া যাও··

কিন্তু এ-অনুরোধ কক্ষ মৃদুবর্তীনীর অন্তরে পৌঁছিল না।—

ছল দিয়া লীলা স্বামীকে বিদায় দিয়াছে, সে বিদায়ের অর্থ দিয়া তার মূল্যবান্ দিবে।·

মূল্যবানের সন্ধ্যায় সে তোক বুলিল।—

—আজ কি বার?

—মূল্যবার।

—এখন সকাল, দুপুর না সন্ধ্যা?

—সন্ধ্যা।

—সন্ধ্যা?

চমকিয়া সে উঠিয়া বসিল।

তার চঞ্চলবর্ণ চক্ষু। ও-দিকে মাথার ভিতর মাথা ঘটাইয়া ঝড় ছুটিতেছিল।

মূল্যবানের সন্ধ্যা।—

তার বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্ক এক-মুহূর্তেই স্বচ্ছ শান্ত পরিষ্কার হইয়া গেল—যেমন ঘটিবার পর নদী হয়।.....

সে যাহিরে আসিল।—

আকাশ আলোকিত—চন্দ্রমুখের দিকে তোক বুলিয়া সে চন্দ্রিমায় স্নান করিল।.....

চলিতে চলিতে দেহের উত্তেজিত শিরাজাল ধীরে ধীরে শিথিল অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। উত্তপ্ত মালুকার উপর বায়ু যেমন পরিশীতল স্পর্শিল হইয়া আসে, তার তোকের সম্মুখের সকল অঙ্গ বস্তুগুলি স্নিগ্ধ যেমনি করিয়া ফুটিতে লাগিল.....

পায়ে পায়ে ছড়াইয়া আসে—

মাথা বুকের উপর নুইয়া পড়ে—

সন্ধ্যাসমীরের অলক্ষ্য যৌবনোল্লাস সঙ্গে মুছিতে মুছিতে যখন সে লীলার বাহিরের দরজায় আসিল তখন তাহার চরণ শিথিলায় কিন্তু আবার আগন্তুক-ভাতি সঙ্গ-পক্ষির শেষ-সীমায় আসিয়া থর্ থর্ করিতেছে।.....

লীলা!—

প্রাণান্তকর প্রয়াসের আহ্বানটী কণ্ঠমূল পর্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া নিজেরই দুর্বলতার ভারে নিশ্চল হইয়া রহিল—

উদ্বুদ্ধ অন্তর্দাহের সঙ্গটী সহ্যাতীত করিতে করিতে মুখের ভিতর ঠেলিয়া যাইয়া সেইখানেই আবর্তিত হইয়া আবার নিঃশেষে-বায়ু ছাড়িয়া বসিল।.....

ভিতরে দেওয়ালের গায়ে তখন বিদ্রুত-ঘড়ির হাসির শব্দ আবার জাগিতেছিল।—

* *

আলস যারে যাহির হইতে আসিয়া যে-আজি তখন দিল সে মূল্যবানকে চিনিত না।

বলিল,— একটা লোক পড়ে আছে মুখ গুঁজে, লীলা, তোমাই দরজায়।

লীলার কি যেমন হ'ল।

—চল্ দেখে আসি যে, একটা নতুন রকম হবে। বলিয়া সে গায়ের কাপড় জড়াইয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।—

একবার যোক করিলে তোকটাকে সরাইয়া দিতে হবে।

যিছিল ধীরিয়া চারপায়ায়ে কলরব করিতে করিতে বারান্দা যেড়িয়া চলিল—

লীলা চঞ্চলচরণে সঙ্গসর আসে।

সন্ধ্যের আলো মূর্ছিত তোকটার মুখের উপর যেলিয়াই লীলা মৃদু কিনারীয় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বলিল,—আমারই মূল্যবার! বাবু সঙ্গে। চল্।

অন্ধকূপের অন্ধকারে

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার রায়—কলিকাতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দুই

সকাল বেলায় উমা ঘরের ভিতরে চুকে দেখলে, যুবকের ঘুম ভাঙ্গেনা আছে নি।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যৌবনশ্রী ভোরে যুবককে দেখতে লাগল। তার মুখ সুন্দর যৌবন, প্রশস্ত ললাট, টানা টানা চোখ, দীর্ঘ নাসিকা, মুখে শ্মশ্রু-গুম্ফ নেই। দেহখানি ছিপ্‌ছিপে হ'লেও বলবান্। তার দিকে তাকালেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, নিশ্চয়ই সে সাধারণ ঘরের ছেলে নয়। তার পাশের মাটির দেওয়াল ও এই জীর্ণ খাটের ভগ্নাবশেষের মাঝখানে এই অসহায় যুবককে এমন বেমানান দেখাচ্ছিল যে, নিজের মনের ভিতর থেকে উমা কেমন এক সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল।

এমন সময়ে যুবক চোখ মেলে চাইলে। বিছানায় উপরে উঠে ব'সে দু-হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে—"বেয়ারা!"

উমা হাসতে হাসতে বললে,—"এখান থেকে আপনার বাড়ী থেকে আপনার বেয়ারা তো শুনতে পাবে না!"

যুবক চমকে উঠে সবিস্ময়ে ফিরে তাকালে। পরিক্ষণে উমার মুখের পানে চেয়ে থেকে সে নিজের মাথায় হাত দিলে। সেখানে তখনো 'প্যাডেজ' বাঁধা ছিল।..... ধীরে ধীরে সব কথা তার মনে পড়ল।

উমা বললে,—"এখন সুস্থ হয়েছেন তো, আপনি কোথায় আছেন?"

যুবক মৃদুস্বরে বললে,—"হুঁ।"

—"আপনার কি দরকার আমাকে বলুন।"

—"একটু চা খাওয়াতে পারো?

—"চা তো আমরা খাই না!..... আচ্ছা, একটু বসুন, আমি এনে দিচ্ছি!" ব'লেই উমা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যুবক ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল।.....কালকের রাতে যা যা ঘটেছিল, একে একে সমস্তই তার মনে পড়ল।

সেই অন্ধকারে মাটির আখাত, অজ্ঞান হয়ে পথে প'ড়ে থাকা, তারপর অত্যন্ত সাবধানে এই বাড়ীতে আনা পাওয়া, এই অজানা রহস্যময় মনে হোল, তার মমতা-ভরা হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয় এবং সর্ব্বোপরি যার হারিয়ে-যাওয়া হাতঘড়ী সম্পর্কীয় সেই ঘরপাগলা ও বাতুলালয়ক উমার মূর্ত্তি,—একে একে সব কথাই যুবকের মনের ভিতরে ভেসে উঠল।

এমন সময় ও মুখের হাত মুখ, এমন প্রাণ ঢেলে নিঃস্বার্থভাবে সেবানিপুণ হাতে তার যত্ন এর আগের পথের পরিচয়কে যে তুচ্ছ ক'রে আজ দিলে, তোর—সে কি তোর—সত্যিই সে কি তোর?

কিন্তু সে তার ঘড়ী চুরি করবে কেমন ক'রে? তাকে যে মাটী থেকে তুলেছে, ঘড়ীটা সেই-ই চুরি করেছে। কিন্তু উমা নিশ্চয়ই তাকে মাটী থেকে তুলে নি!

অথচ তার ঘড়ী উমার হাতে! কি ক'রে এটা সম্ভব হ'ল?

যুবক এই সব কথা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করছে, এমন সময়ে উমা আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। তার হাতে এক পেয়ালা চা।

যুবক জিজ্ঞাসা করলে,—"এই যে ফলে তোমরা চা খাও না, তবে এ চা আসলে কোথা থেকে?"

—"মাটিমাকে দিয়ে তোমার থেকে আনিয়ে নিলুম!"

ছায়ের সেরাসাটি উষার হাত থেকে নেবার সময়ে যুবক লক্ষ্য করলে, তার মণিবন্ধে উষার হাতের বাঁধা রয়েছে!

সেরাসার স্নিগ্ধ-গম্ভীর মুখে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"আচ্ছা উষা, তোমার বাবা কি করেন?"

—"তিনি এ-পাড়ার ছেলেদের মাস্টার-মহাশয়।"

—"ঐ ঘড়ীটি তোমার বাবা বুঝি তোমাকে দিয়েছেন?"

উষা হেসে বললে,—"আমার বাবা দরিদ্র-ব্রাহ্মণ, তিনি কি আমাকে এমন সোণার ঘড়ী কিনে দিতে পারেন?"

—"তবে?"

—"কাল রাত্রে মণিক আমাকে এটা দিয়েছে।"

—"মণিক কে?"

—"সে এই বাড়ীতেই থাকে।"

—"সে কি তার বন্ধু?"

—"তার জামাইবাবু হোলেও আছে!"

—"তাকে এখনো ডাকতে পারো?"

—"না, এখনি!.....মণিক, ও মণিক—শুনছ?"

একটি এগার-বারোঁ বছরের যুবক ঘরের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে বললে,—"কি উষা, ডাকছ কেন?"

—"আমি নই, এই বাবু তোমাকে ডাকছেন।"

মণিক যুবকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

যুবক মণিকের দিকে ঘড়ির ঘড়ীটিকে তুলে একেবারে প্রশ্ন করলে,—"উষার হাতে যে ঘড়ীটা আছে, সেটা তুমি কোথা থেকে পেলে?"

এই আকস্মিক প্রশ্নে মণিকের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কোন জবাব না দিয়ে সে চুপ ক'রে রইল।

—"ও ঘড়ী কি তোমার?"

মণিক ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

—"ও ঘড়ী তুমি চুরি করেছ?"

মণিক তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল,—"না—না, আমি চুরি করি নি।"

যুবক ধমক দিয়ে বললে,—"মিথ্যা কথা! ও ঘড়ী তুমি নিশ্চয়ই চুরি করেছ—কাল রাত্রে আমার মাথা লাথি মেরে আমারই পকেট থেকে তুমি চুরি করেছ!"

—"না মশাই না, আমি ও ঘড়ী চুরি করিনি, আমার কথায় বিশ্বাস করুন—আমি সত্যি বলছি!"

—"মণিক, আমার কাছে মুখোমুখি চোরো না। আমার নাম আনন্দমুরারি বসু। দেখ, ঐ ঘড়ীর সোনার 'কেসে'র উপরে আমার নামের আদ্যক্ষর খোদা আছে!"

উষা নিজের হাতটা তুলিয়ে ঘড়ীর সোনার কেসটার দিকে চেয়ে, মুখ তুলে বললে,—"মণিক, এ-সব কি কথা শুনছি? তুমি চুরি ক'রে আমাকে ঘড়ী উপহার দিয়েছ?"

মণিক করুণ ভাবে বললে,—"তোমার দিব্যি উষা, আমি চুরি করি নি!"

—"তবে এ ঘড়ী তোমার কাছে এল কেমন করে?"

—"তাহ'লে শোনো সব কথা।—...কাল রাত্রে আমাদের পাড়ার রাস্তায় গ্যাস জ্বলে নি জানো তো? অন্ধকারে আমি বাসার দিকে ফিরছি, হঠাৎ পায়ে কি ঠেকল। সেটা তুলে দেখলাই জ্বেলে দেখি, ঐ ঘড়ীটা! দেখলাইটা নেবার আগেই আমো এক ভদ্রলোক ছুটে দেখলুম। একটা লোক পথের উপরে উপুড় হয়ে প'ড়ে রয়েছে—তার জামা-কাপড় রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে! বুঝলুম, নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা হয়েছে তার! তাকে খুন ক'রে গা-ঢাকা দিয়েছে! ভয়ে আমি তখনি সেখান থেকে পালিয়ে এলুম। ও ঘড়ী তো আমার হাতে আসবে না, তাই বাসায় এসে ঘড়ীটা আমি তোমাদেরই উপহার দিয়েছি!"

উষা তীক্ষ্ণ-স্বরে বললে,—"কিন্তু এ-সব কথা তুমি কাল আমাদের বল নি কেন?"

মণিক মুহূর্তে চোখ নিচে বললে,—"সব কথা শুনলে ঘড়ীটা কি তুমি নিতে উষা?"

উষা ঘৃণাভরে বললে,—"নিশ্চয়ই আমি নিতুম না,—আমি কি তোমার মতন চোর?"

আবিদ ফিস্‌ফিস্-করা অরে বললে,—"তোমার কাছে তোড়াতাড়ি আমি যাব চাইছি, তুমি আমার ওপরে রাগ তোরো না—"

উমা ক্রুদ্ধ স্বরে বললে,—"যাও, এখনি এ-ঘর থেকে চ'লে যাও।"

—"উমা, ঘড়ীটা আমি লুকিয়ে রেখেছি, আমি সে-চুরি করি-নি—"

—"চ'লে যাও, চ'লে যাও বলছি! একলো ছেলে না।"

আবিদ আর কিছু না ব'লে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আনন্দ দেখলে, দুঃখে লজ্জায় অপমানে উমার ভাগর ভাগর দুই চোখ অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে কোমল স্বরে বললে,—"উমা, তোমার চোখে জল কেন? তোমাকে আমি তো কোন কথাই বলি-নি!"

উমা অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বললে,—"এতক্ষণ নিশ্চয়ই তো আপনি আমাকে চোর মনে করছিলেন?"

—"না, না, তা মনে করব কেন?.....ও কি, ঘড়ীটা তুমি হাত থেকে খুলছ যে?"

—"আপনার ঘড়ী আপনি ফিরিয়ে নিন" এই ব'লে উমা ঘড়ীটা আনন্দের দিকে এগিয়ে দিলে।

—"না উমা, এ ঘড়ী আমি আর নেব না। ওটা তুমিই রাখ।"

—"আপনার ঘড়ী আমি নেব কেন?"

—"ওটা আমি তোমাকে উপহার দিচ্ছি।"

—"এতদিনের আলাপে কেউ কাউকে এমন দামী জিনিষ উপহার দেয় না। ঘড়ী আপনি ফিরিয়ে নিন।"

—"আলাপ দুদিন আগেই আমরা নিয়ে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। বিনা আলাপে এমন উপকারও তো কেউ করে না! মনে কর, তারই প্রতিদানে আমি তোমাকে ঐ ঘড়ীটা দিলুম।"

উমা ক্ষুব্ধিত মুখে বললে,—"প্রতিদানে পাবার ব'লে আমরা কারুর কোন উপকার করি না। আমরা গরিব হ'তে পারি, কিন্তু এতটা নীচ নই।"

উমার কথায় বীতশ্রদ্ধ হেসে আনন্দ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর বললে,—"উমা, তোমার সঙ্গে তর্কে আর কখনো আমার জেতা হবে না। কিন্তু তুমি আমার যে উপকার করেছ এ জীবনে আমি তা ভুলতে পারব না। আমার সেই ভুলভাঙার ঘড়ির মত এই বৃদ্ধ উপহারটি তুমি যদি গ্রহণ কর, তাহ'লে আমি অত্যন্ত সুখী হব।"

উমা কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে বাহির থেকে একটা কর্কশ মোটা গলার আওয়াজ শোনা গেল—"উমি, তোর অসুখ কেমন কে কথা কইতে রে?"

—সঙ্গে সঙ্গে দরজার সামনে যে জীবটির আবির্ভাব ঘটল, তাকে অনায়াসেই বহুরূপের একটা বিদ্যুটে ও বিচিত্র নমুনা বলা যেতে পারে।

সর্বাঙ্গসম্বেই রোগে পচে ঝরে যেতে অসাধারণ দীর্ঘতা, মাথায় মাথার সে অভাব হওয়াই আই-ঢাই ঢিকি ছেড়ে কম উঁচু হবে না! যেমন লম্বা তেমনি চওড়া মাপ এবং সেই বিপুল দেহের উপরে স্থীর ও লোমশ মুখের কঠিন মাংসপেশীগুলো দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, লোকটার গায়ে অসুরের মতন শক্তি আছে! আর তার গায়ের রং,—সেও একটা ভীষণ ব্যাপার! পরিবর্তে যেন জমাট অন্ধকারের কিংবা তুলি তুবিয়ে লক্ষ্যে তার সর্বাঙ্গে কেউ কে'রে দিয়েছেন! তার তুলনায় সেই অতি-বড় দেহের তুলনায় অত্যন্ত ছোট। মাথাটি টাকে ভরা সে মাথার কোনখানে একগাছা চুল অবশিষ্ট করেছে ব'লেও সন্দেহ হয় না! টাকের মাঝে মাঝে পোকাধরের গভীর ক্ষত-চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—বোধ হয় অনেক বারই সেখানে বাজলো অস্ত্রের আঘাত পড়েছে। গোল গোল ঠাঁটার মতন চোখ দুটো। মুখের চ্যাড়া এবং নাকটা ঠিক বনমানুষের মতই এক-বেমী খ্যাবা ও চ্যাপ্টা যে, তার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়! ঠোঁট দুখানা দেখলে কাফ্রির মতন পুরু নয়, উপর-ঠোঁটের মাঝখানকার খানিক অংশ খাবার একটা ঘাটা যে, দিবার থেকে দুটো হলদে দাঁত বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে। মুখে দাড়ী-গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই। বয়স নির্ণয়ের বেশী ঘরে না।

আনন্দ নির্বাক বিস্ময়ে এই অদ্ভুত মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটা এবারে আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে উষার দিকে ফিরে বললে,—"এ কে রে উষি?"

লোকটাকে দেখে উষা যে ভয় পেয়েছে তা বেশ বোঝা গেল। সে থেমে থেমে বললে,—"ওতারা ওঁর মাথায় লাঠি মেরেছে।"

—"কিন্তু ওকে আমার এখানে আন্‌লে কে?"

আনন্দ বললে,—"দেখাই, উষা কাল রাতে আমাকে এখানে আন্বার নিমন্ত্রণ ক'রে আমি প্রাণে বেঁচে গেছি।"

লোকটা বললে,—"ওহো, ঘটে, ঘটে! কাল রাতে তুমিই বুঝি সেই ভাবেলা বাধিয়েছিলে? কিন্তু তোমাকে ওরকম খুন দিলে কে রে ছোক্‌রা?"

—"উষা। আপনিই কি উষার বাবা?"

লোকটা হো হো ক'রে এমন জোরে হেসে উঠল যে, বাঘারা ঝাঁপড়ে যায়। হাসির ধাক্কা থামিয়ে সে বললে,—"ঘটে, ঘটে! আমি যে বাপ তুমি জানো না? এ পল্লীর কালাপাহাড়ের নাম কখনো শোনোনি? আমি হচ্ছি সেই কালাপাহাড়—জোড়াবাগানে আমার এমন বাপে-খেদানো এক-ঘাটে জল খায়! এ ছাড়ী আমার, উষার বাবা আমার ভাইটে!"

আনন্দ কালাপাহাড়ের নাম আগেই শুনেছিল—তার মতন বিদ্যার গুণ্ডা কলকাতায় খুব কমই আছে। তার জোরালো ঘুষোর আঙ্গা আছে এবং যেখানে নিম্ন কলকাতায় যে-কখনও ভীষণরকম ঘটনা হয়, তাদের অধিকাংশতেই নাকি তারই সহকারী হোকেরা হয়, পুলিসের উপরওয়ালারা পর্যন্ত মনে মনে ভয় ক'রে চলে। এমন লোকের উষার মতন মেয়ে কেমন ক'রে আসে, আনন্দ অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবতে লাগল।

কালাপাহাড় বললে,—"উষি, তুই জানিস্, আমি বাইরের আদমকে বাড়ীর ভেতরে আসা পছন্দ করি না?"

উষা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

কালাপাহাড় বললে,—"কাল আমি নিজে এই ছোক্‌রাকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে দিই নি। আর সে-কথা তোকেও দুই বোল্ সাফে এসে আমার ভেজের থেকে এনেছিস্?"

উষা খুব মৃদুস্বরে বললে,—"উনি বড় বিপদে পড়েছিলেন, তাই—"

মাথা দিয়ে কালাপাহাড় ঘুষুকে উঠল,—"তোর বিপদের বিদুষি করেছে? এর বিপদ, তা তোর কি? দোরার চালমুখ দেখে তোর বাবা খুন খেয়ে যুদ্ধি?"

আনন্দ লজ্জা-ঘৃণায় খুব রাঙা হ'য়ে বললে,—"এ আপনি কি বল্‌ছেন?"

কালাপাহাড় ঘরে চাঁচা ঘোর পাকিয়ে গর্জন ক'রে বললে,—"খবর্দার! তুমি এখানে চাঁ-চোঁ করলে এখনি গলা টিপে খতম করব!— ভালো চাও তো এখান থেকে যাদে যাদে স'রে পড়, বুঝলে যাদু? ও চাঁদ মুখ থেকে আমি খুলব না!"

ক্রোধে অপমানে আনন্দের কপালের উপরে শিরা ফুটে উঠল! দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে সে তক্তাপোষের উপর থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল, কিন্তু তখনি উষা তার জামাটা নিয়ে এগিয়ে-এসে তার হাতে দিয়ে বললে,—"আপনার পায়ে পড়ি, এখনি চ'লে যান!"

তার ভীত-ব্যাকুল মুখের ভাব দেখে আনন্দ রোষ বহুকষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে, তাড়াতাড়ি নিজের জামাটা গায়ে প'রে ফেললে। তারপর রোষবিকৃত মুখ তুলিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে গুনতে গেলে, তার পিছনে কালাপাহাড়ের হাসির আওয়াজ!.....

পথের উপরে চলতে চলতে সিগারেটের 'কেসটা বার করবার জন্যে আনন্দ পকেটের ভিতরে হাত দিলে। কিন্তু সিগারেটের 'কেসে'র সঙ্গে আর একটা জিনিস তার হাতে ঠেকতেই সে চমকে সেটাকে টেনে বার করলে।

সে হচ্ছে তার সোনার ঘড়িটা যা কাল রাত্রে, —যখন আনন্দের সঙ্গে উষা নিজে ঘড়িটা লুকিয়ে তার পকেটের ভিতরে রেখে দিয়েছিল!

—ক্রমশ

লাইব্রেরীর উপকারিতা বৃদ্ধির উপায়

লাইব্রেরীর ব্যবস্থার ভার যদি কোন উপযুক্ত অথচ যা শিক্ষিত কর্মচারীদের উপর অর্পিত না হয়, তাহলে সাধারণ লোকে এগুলির সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। শিক্ষা-বিস্তারের সহিত লাইব্রেরীগুলির আয়তন ও পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে ও সেই কারণে কর্মচারীদের কাজও বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে অর্থাৎ যা কর্মচারীদের বেতনের হার বাড়ে নি। সেই জন্য আমেরিকার লাইব্রেরীর সুযোগ্য অধ্যক্ষের অভাব অনুভব হচ্ছে।

লাইব্রেরীর বইগুলিতে যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত আছে, সাধারণ লোকে যদি অল্পায়াসে সেগুলি না পায়, তাহলে লাইব্রেরী স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। লাইব্রেরীর আয়তন থেকে তাতায় পাঠকেরা যে সব বই পড়তে চায়, কর্মচারীরা সবগুলি আর সেগুলি দিতে পারেন না, অনেক সময়ে পাঠককে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্য New York এর Carnegie Corporation ৩০ লক্ষ ডলার (১ডলার=৩।০ টাকা) দান করেছেন। এই লক্ষ ডলারের আয় থেকে কোন একটি বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ তৈরী করবার জন্য একটি বছর বিদ্যালয় খোলা হবে। অপর এক লক্ষ ডলারের আয় থেকে অন্যত্র স্থানে কয়েকটি লাইব্রেরী স্থাপিত হবে। অবশিষ্ট টাকার আয় থেকে একটি লাইব্রেরী এসোসিয়েশন্ গঠিত হবে ও তার কার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

(Scientific American)

ভারতবর্ষ ও জাপান

প্রায় ১৪০ বৎসর ধরে ভারতবর্ষ ইংরেজের শাসনাধীন হয়েছে। প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ এসিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার অধিবাসীদের কাছে সুপরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের খ্যাতি শুনেই আলেকজাণ্ডার এই দেশ জয় করতে যাত্রা করেছিলেন। যীশুখ্রীষ্টের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও প্রচারকেরা সমস্ত এসিয়া ও ইউরোপের প্রায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। রোমানেরা ভারতবর্ষের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষ থেকে বহুমূল্য প্রস্তর, সিল্ক ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য রোমে পাঠান হ'তো। ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য ভেনিস্, জেনোয়া ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপকূলস্থিত অন্যান্য নগরগুলি সমৃদ্ধিশালী করেছিল। প্রায় দু-হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত নগরগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। স্থলপথে ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায়ে নানা প্রকার অসুবিধা হতো, তাই বহুদিন থেকেই ইউরোপের উদ্যমশীল ও সাহসী অধিবাসীরা জলপথে ভারতবর্ষে আসবার নূতন আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে কলম্বস্ স্পেন থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি আসতে পারেন নি, কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। পর্ত্তুগীজ নাবিক Vasco Da Gama সর্ব্বপ্রথমে জলপথে ভারতবর্ষে আসেন। এই পথ আবিষ্কার হবার পর ইউরোপের প্রধান জাতিগুলি,—ইংরাজ, ফরাসী, ডচ্ প্রভৃতি,

ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবসা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে আরম্ভ করেন। অষ্টাদশের মধ্যভাগে ইংরাজ, ফরাসী, ও ওলন্দাজ এই তিনজন ব্যবসায়ীর মধ্যে বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার ফলে ফরাসী ও ওলন্দাজ পরাজিত হয় ও ইংরেজই এই ব্যবসায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। তার পর কি ভাবে বণিকের ব্যবসা থেকে রাজত্বে পরিণত হয়, ইতিহাসপাঠিকা পাঠকমাত্রেই তা অবগত আছেন, এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

ভারতবর্ষের সহিত তুলনায় জাপান একটি ক্ষুদ্র দেশ। আয়তনে জাপান ভারতবর্ষের সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র। জাপানের লোক-সংখ্যা ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। জাপান এশিয়ার পূর্ব-প্রান্তে কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টিমাত্র। এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। ভারতবর্ষ এশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভারতবর্ষের মত জাপানের প্রাচীন ইতিহাস নেই। ৭০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বাহিরের জগতে। সঙ্গে জাপানের কোন পরিচয় ছিল না। এই সময় আমেরিকার Commodore Perry বলপূর্বক জাপানে প্রবেশ করেন ও বাহিরের জগতের জন্য জাপানের দ্বার উন্মুক্ত হয়। জাপানের প্রধান ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। তার শিল্প ও কলার জন্য জাপান চীনের কাছে ঋণী। কিছুকাল পূর্বপর্যন্ত ভারতবাসীদের মত জাপানীরাও একটি প্রবল জাতি ছিল। তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করেনি। ইংরেজের অধীন হবার পূর্বে ভারতবর্ষ একটি সমৃদ্ধ দেশ ছিল। জাপান কিন্তু সে সময় ছিল না।

অল্প সময়ের মধ্যে—মাত্র ৫০ বছরে—জাপানের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে। জাপান আজ এশিয়ার সর্ব-প্রধান ও জগতের অন্যতম ঐশ্বর্যশালী জাতির অন্যতম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের অবস্থা কিন্তু বিপরীত। দু-হাজার বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষ এশিয়ার প্রধান দেশ ছিল। আজ কিন্তু ভারতবাসীরা জগতের একটি নিম্নস্তরের জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষ ও জাপানের ইতিহাস আলোচনা করলেই কি কারণে যে এই দুই দেশের অবস্থার এত প্রভেদ হয়েছে বেশ বোঝা যায়। ভারতবর্ষ প্রায় ৭০০ বছর একটি বিদেশী জাতির অধীনে এসেছে। জাপান তার স্বাধীনতা হারায় নি। স্বাধীন ছিল বলেই অল্প সময়ের মধ্যে জাপান এরকম অসাধারণ উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছে।

বর্তমান সময়ে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, দুনিয়ার অন্যান্য কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না। জাতির উন্নতি অবনতি শিক্ষার উপরেই নির্ভর করে। জাপান ও ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা করলেই আমাদের অবনতির কারণ বোঝা যাবে।

বাহিরের জগতের সহিত যে দিন জাপানের যোগসূত্র স্থাপিত হ'লো সেইদিনই জাপান সর্বপ্রথমে জাপানী নর-নারীর মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে শিক্ষার জন্য একটি নতুন আইন পাশ হয়। "Education is essential for all persons, and whereas in the past learning has been looked upon as a means of securing official position, henceforth the whole population of the country, regardless of classes, must be educated, so that no village shall contain a person devoid of learning nor any house contain an illiterate inmate."

এই আইন পাশ হবার পরেই প্রাথমিক ও উচ্চ শ্রেণীর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় জাপানের নানা স্থানে স্থাপিত হয়। কৃষি, শিল্প ও টেক্‌নিকাল শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়, কৃষি, শিল্প ও টেক্‌নিকাল প্রতিষ্ঠানগুলিতে দলে দলে জাপানের মেধাবী ছাত্রেরা নানা রকম শিক্ষা লাভ করবার জন্য সরকারের সাহায্যে যেতে আরম্ভ করে। সেখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর তারা দেশে ফিরে এসে দেশবাসীদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দান করতে আরম্ভ করে।

বহু পূর্বে জাপান শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষের চেয়ে কোন অংশে উন্নত ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিও তাদের বিশেষ টান ছিল না। জাপানীরা যে সময় নানা দেশীয়ে বিব্রত ছিল। শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী কৃষিজীবী ছিল। কয়েকজন শোগুন যে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাপানে প্রবেশ করলেন, সেই বিদেশী ভাবের আবহাওয়ায় উন্নতি লাভ করলো। জাপান সরকার জাপানকে এশিয়ার সর্বপ্রধান জাতিতে পরিণত করতে সংকল্প করলেন ও তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই উপায়গুলি অবলম্বন করলেন।

(১) আপামর জন-সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা। (২) দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য প্রদান। (৩) বৈদেশিক বাণিজ্য ও নৌ-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সরকারী সাহায্য। (৪) প্রথম থেকেই জাপানের ঘর-বৃদ্ধির চেষ্টা।

জাপানের বিগত ৮০ বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে মনে হয় যে, স্বাধীন জাতি হ'লে আমরাও এই সময়ের মধ্যে জাপানের মত উন্নতি করতে পারতুম। আমরা তা যে পারি নাই এর বিশেষ আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় নি।

(Modern Review)

এলেন কেই

গত এপ্রিল মাসে, তাঁর স্বইডেনের বাসভবনে, নারী-অধিকারবাদের অগ্রদূত, শ্রীমতী এলেন কেই পরলোকে গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর দীর্ঘ জীবনে (১৮৪৯—১৯২৬) নারীদের অবস্থার যত পরিবর্তন হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন সময়ে এত পরিবর্তন হয় নি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যেমন মন গঠন করেন নি, তা তেমন মনের মেরুদণ্ড গ্রহণ করেন নি। এই জন্য তাঁকে এই প্রচেষ্টার মেয়াদ আগে থেকে কোন ক্রমে অন্ত হতে হয় নি। বিশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নারীরা যখন ভোট, ব্যবসা, শিক্ষা ও শিল্প-ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ও তাদের জীবন স্বাধীনভাবে, বিয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করেন, এলেন কেই তখন এই আন্দোলনে যোগদান করেন নি। তিনি এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন—সমস্ত জীবনের বিশ্বাসের ফলে হয়েছিলেন। আবার নারী-আন্দোলনে আরম্ভ করেছিলেন বলে তাঁর সমসাময়িকেরাও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধির চক্ষে দেখতেন না। এই সব অধিকার যখন নারীরা লাভের তখন বহু লোক বুঝতে যে, রাষ্ট্রের অধিকারই নারীর চরম ও শেষ অধিকার। এলেন কেই যে সব কথার বাণী প্রচার করেছিলেন, তার সমসাময়িকদের কাছে তা অভিনব না হলেও অবশ্যই। নারী-অধিকার প্রসঙ্গে নতুন শব্দও আবিষ্কার করেছিলেন ও বহু বছর থেকে স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে অনুসরে যে ধারণা চলে আসছে সেগুলি তাঁরা যাচাই করে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দে তাঁর লেখা বই "Century of the Child" বা "শিশুর শতাব্দী" প্রকাশিত হয় ও এটি নব যুগের সূচনা করে। তিনি প্রচার করে গেছেন যে, প্রত্যেক নারীরই কি সন্তানের জননী হবেন কি না তা স্থির করবার অধিকার আছে। জন্ম-নিরোধ প্রথা অবলম্বন না করলে তাঁর আদর্শ কার্যে পরিণত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এলেন কেই কিন্তু জন্ম-নিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেন নি। নারীদের চরম বিশ্বাস যে মাতৃত্বে এই সত্যটি তিনি বিশ্বাস করতেন। নারী যদি অন্য ভাবে সব বিষয়ে পুরুষের অনুকরণ করেন, তা হলে তাঁর জীবন সার্থক হবে না। এলেন কেইয়ের শিক্ষার সার-মর্ম এই যে, নারীকে তাঁর নিজস্বের নারীত্ব ও মাতৃত্ব ফুটিয়ে তুলতে হবে। অন্যকে যদি শিক্ষা কালোপযোগী করে তুলতে হয় তা হলে শিক্ষা, শিল্প ও রাষ্ট্রীয় জগতে পুরুষের আদর্শের অনুকরণ করা নারীর পক্ষে সমীচীন হবে না। পুরুষ যে জগৎ সৃষ্টি করেছে, তাতে শিশুর স্থান নেই। শিশুর জন্য নারীকে এমন নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ হলেই তিনি এ কার্যে সফল হবেন।

(The Birth Control Review. America)

শ্রীবাসবীকান্ত মুখোপাধ্যায়—লক্ষ্ণৌ

ভুঁইচাপা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী—কলিকাতা

ভুঁইচাপা তুই ভুঁয়ে ফুটে' মুদিয়ে থাকিস্ চুপে—
চোখে রেখে' চির আষাঢ় বাথার পরে ছুপে।
নীল আকাশের আলোর পরশ
নীল চোখে তোর দেয় না হরষ—
মাটির কোলের মায়া তবু আঁচল চোখে তুপে।

স্বর্ণ-চাঁপা বাতাস্ যদি ঈষৎ আবীর পায়ে,
ধরার ধরা এড়িয়ে চরণ যদি যায় সে ধেয়ে,
তখন চোখে জল মাখে
সরম ভিজায় বিরস প্রাণে,
যত্নে হাতে আনায় টানি চাঁদের কনে যারে।

তুই রেখা যাস্ ভুঁয়ে ব'য়ে মৃত্তিকা মা'র বুকে,
মায়ের স্নেহ রসের ধারা লেগেই থাকুক্ মুখে।
আমি যখন পথের মোড়
আমি যখন সবার পিছে
থাকুক্ সে তোর আসনখানি সজল-হরষ বুকে।

"গুরুর দশা"র প্রতিবাদ *

শ্রী——বাণী

১

কোনও বিষয়ের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে সে বিষয়টা কি তাহা জ্ঞান করিয়া জানিতে হয়। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান যত বেশী সমালোচনাও তাহার তত ঠিক হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, যে সব বিষয় পারিবারিক জগতে আবহমান কাল হইতে পরম্পরায় পরম্পরায় বহিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহার সম্বন্ধে পৃথিবীর ছেলেমেয়ে একটী ধারণা লইয়া রহে—সকল ছেলেই মাতৃভাষার অবধি নাই, সেই সকল বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ না করিয়া যা-তা একেবারে উপেক্ষা করিয়া শুধু নিজের অনোভাবের কতকগুলি লক্ষণ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া যারা মনে আসিল তাই বলিয়া আক্রমণ করাকে কি নাম দিয়া তাহা বলা কঠিন।

যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার পর সমালোচনা করিতে হইলে অত্যন্ত পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। কাজে-কাজেই সাধারণে এতটা পারিয়া উঠেন না, এবং সেজন্যই তাঁহাদের চলনার মূল্য নাই। কিন্তু যাহারা সদা সর্ব্বাই চিন্তাশীল এবং যাঁহাদের লিখিবার পটুত্ব আছে তাঁহারাও যদি এই নিয়ম পথ অবলম্বন করিয়া নিজের লিপি-কুশলতার সাহায্যে যা-তা লিখিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাহা সাহিত্যিক দুঃখের কথা হইয়া পড়ে।

২

ঠিক ইহারই একটী নিদর্শন উদাহরণ গত সংখ্যা 'উষা'র "গুরুর দশা" নামক প্রবন্ধটীর মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রবন্ধটী পড়িলেই মনে হয় যে লেখকের মনে এক সময় একটা ভাব জাগিল যে অমুক বিষয়টী আমাদের

---

* এই প্রবন্ধটি লেখক উষাকে উদ্দেশ্যেই এক আকারে লিখিয়া 'গুরুর দশা' পাঠান—তাহার ইংরেজির দিকের অংশ ও লেখক নাই। তাহাতে যেন কেহ ভুল বুঝিয়াছেন এমন সম্ভাবনাই অধিকতর তাহাদেরই অধিকতর। আমরা বিষয় একটু উপেক্ষা করিয়া এখানেই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। উঃ সঃ

সংস্কারের কথা বা আমাদের culture-এর কথা আছে বলিয়াই আমাদের এত অহংকার। সে কিনিসটির স্বরূপ কি এবং তাহা আছে কি ভাবে প্রশ্ন করিবারও যেন আবশ্যক হইল না। আবশ্যক হইল শুধু ইহার সম্বন্ধে নিজের ধারণা, এবং তাহাকে support করিবার জন্য কতকগুলি distorted facts, এবং কতকগুলি even fact মাত্রের অস্তিত্ব লেখকের মস্তিষ্ক ছাড়া অন্যত্র কোথাও নাই। এই সব উপাদান তথ্য সংগ্রহের পর বক্তৃতা উপাদের বিচার চলিল এবং একতরফা ডিক্রীও হইয়া গেল।

৩

লেখক বলিয়াছেন যে, শিশুকাল হইতেই আমাদের ধারণীয় বিষয় যাবতীয় কৌতূহলের বিরুদ্ধে "অভিভাবক প্রহরীর দল···সদা আগলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে" ও আমাদের মনে প্রাণে "পরনির্ভর" করিয়া তোলে। বস্তু হইলেও স্বীকার আমরা "যে কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া নির্বাচনার দিন কাটাইতে পারি না" এবং "যে কোনও ব্যক্তিকে একেবারে চলমান্ যন্ত্র করিবার অপরূপ ধারণা উদ্ভাবন করিয়া" বসি। লেখকের মতে ইহাই শুরু।

লেখকের মতে শুরুর লক্ষণ কি কি :—

১। যাহারা খুব বড় "হিপক্রীট"।

২। "তাকু লাগাইয়া দিতে" যাহারা অসম্ভব মজবুত।

৩। যাহাদের মাথা "কৃপা করিয়া চলার ভাব" পুরা মাত্রায় বর্তমানে

৪। যাহারা "অন্যান্য জোর বিশ্বাসের জমীতে নিজের অসাধারণ শক্তির নানা রকম কাহিনী বলিতে পারেন।" ইত্যাদি।

লেখকের কথায় শুরু কি উপদেশ দেন :—

১। "বৎসের চক্ষু বুজিয়া আমার পায়ে মাথা লুটাইয়া পড়িয়া থাক তোমার সব বোঝা আমার!"

২। "আপনাকে জড় বলিয়া জান···ও আত্মশক্তিকে বর্জন করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে।"

৩। এ সম্বন্ধে "কোনও রকমের লাভ করিবার কি করিবার বাসনাকে!···একপ করিলে মৃত্যু-অন্তে তোমার অন্তর স্বর্গ উঠিল বলা থাকিবে।" ইত্যাদি। *

ইহাই হইল লেখকের শুরু-তত্ত্বের সারাংশ।

৪

শুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহার ধারণা এইরূপ বিধি যে ইহার বিষয় আলোচনার ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি এই সব অভিমত তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন।

শুরুবাদ শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর কোন না কোন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইংরাজিতে ও ইউরোপের অন্যান্য সকল ভাষাতেও এ সম্বন্ধে আলোচনা কম হয় নাই। বাংলা ভাষার ইহার অপ্রতুল নাই। লেখক দেখাইয়া দিতে পারেন কি তোমার কোন্ দেশে কোন্ সম্প্রদায় এই সব উপদেশ দিয়াছেন? বাংলা দেশে দুইটি মহাপুরুষ সম্বন্ধে বিস্তর কথা আছে—একজন খ্রীষ্ট বাবরক্ত সবরহস্য ও অন্যজন খ্রীষ্ট বিরোধক মোহান্ত। ইহাদের উপদেশাবলীর মধ্যে কোথাও কি মানুষের জন্য বলিবার কথা আছে?

৫

কেহ শিখাইয়া না দিলে আমরা কোনও নূতন কিছু শিখিতে পারি না ইহা একটি অবিসম্বাদী সত্য। শিখিতে গেলেই আমাদের কাহারও না কাহারও নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়-ই। এখন প্রশ্ন হইল বিদ্যা সম্বন্ধে এই কথাটা যদি তখন প্রযোজ্য—যাহা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তাহার সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে না কেন? শুরু-কৃপা ব্যতিরেকে ইহার অনুশীলন অসম্ভব। এখন যদি নিজ শুরুর উপদেশ-মত না চলিয়া নিজের খেয়ালমত পথে চলে তবে তাহার কতদূর উন্নতি হইবে বলাই বাহুল্য। যে শিখাইবে তাহার যে সে বিদ্যার অধিকার আছে এখানে তাহা ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

৬

ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার অর্থ হইতেছে নিজেকে সবের পূর্ণতা হইতে মুক্ত রাখা। ইহাই চরমে (in the limit) গিয়া যাহা দাঁড়ায় তাহাকে নাম পূর্ণ-অবস্থা বা মুক্তি। লেখক যাহাকে "আপনার অন্তরলক্ষ্মীকে মুখর করিয়া অসীম করিয়া উপলব্ধির" কথা বলিয়াছেন বস্তুতঃ ইহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে। তবেই এই চরম বা পরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করিবার পথ-প্রদর্শক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যতক্ষণ এই অবস্থা প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ তাহার নাম স্বেচ্ছাচার। স্ব-তন্ত্র হইবার ইচ্ছা যাহাদের মূলধন,—ইহার উপলব্ধি হয় শুরুর উপদেশ অনুসারে চলিলে পর—স্বেচ্ছাচারিতার পথে নহে। কামনা বা বাসনার দাস হওয়া যতই হেয় হয়।

---

* লেখক যে style-এ বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব। এমনই সুর যে বিষয়ের সারাংশ (যদি কিছু থাকে বা থেকে) কি এরূপ তথ্যের করিতে হয়! এইরূপ আলোচনার ফলে করিয়া বিষয়টির পরিচয় দেওয়া যায়।

অতএব আমরা দেখিলাম যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও গুরু-বাদ উভয়ের মূল উদ্দেশ্য একই। গুরু-বাদের দ্বারা আমরা আমাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করি। তথাকথিত ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদ পথে আমরা আমাদের কামনা-বাসনার পথেই ঘুরিতে থাকি। এইখানেই এই উভয় পন্থার বিরোধ। একটি প্রেয়ের পন্থা, অন্যটি শ্রেয়ের পন্থা। প্রেয় ও শ্রেয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয় তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়। পরিণামে বুঝিতে পারা যায়, যাহা সত্য শ্রেয় তাহাই জ্ঞেয়েরও চরম আদর্শ।

অন্যান্য তুলনায় ইহাই হইল গুরু-বাদ, "জ্ঞেয়ী-সাধনা" ইহা নহে—ইহা দ্বারা সত্যোপলব্ধি আসে নাই। জ্ঞেয়ের গুরুত্ব লক্ষণ ও উপলব্ধিপ্রণালি ইহার মধ্যে কোথায় স্থান পায় তাহা দুর্বোধের বিষয়। তিনি ভ্রমদর্শী তিনি দ্রষ্টা অন্য কেহ সত্য-গুরু হইতে পারেন না।

৭

যাহা হউক, শুধু গুরু-বাদের দোষ-গুণ সাধারণভাবে বিচার করিলে, তাহা যে ভাবেই হউক না কেন, কোনও বিশেষ শক্তি-বৃদ্ধির কারণ হইত না। মানুষের নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা চিরকালই আছে। কিন্তু তাঁহার গুরুবাদের নির্দেশ যখন তিনি যে তিনটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহা নানা কারণে অত্যন্ত আপত্তিজনক। যে তিনটি উদাহরণ দিয়াছেন তাহার মধ্যে এত বেশী ব্যক্তিগত ছাপ রহিয়াছে যে তাহাকে type বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আর যদি সত্য-সন্ধানী ইহাদের 'জ্ঞেয়ী' বাদ দিয়া ফেলিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি সত্যের অনুরোধে সর্বসমক্ষে আসিয়া তাহা প্রকাশ করিলেই পারিতেন,—এই ছদ্মবেশের প্রয়োজন কি ছিল। ইহারা সকলেই ত জীবিত আছেন ও এখনও ঐ প্রকার "জ্ঞেয়ী-সাধনা" দিয়াই লোকের ভক্তি পাত্র হইতেছেন।

৮

যাহারা সত্যসন্ধানী জ্ঞেয়ী তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি থাকিবেই। ঐ শক্তিকে "বিভূতিমত্ত্ব" বা ঐ ধরণ কিছু বিশেষণ নাম দিয়া অভিহিত করা আবহমান একটা ফ্যাসনে দাঁড়াইয়াছে। শুধু একটা নাম দিলেই কিছু explanation হয় না—শুধু নাম দেওয়া হয় মাত্র। জ্ঞেয়ের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞেয়ের সহিত তুলনা করিয়া একজন বড় Hypnotist বলিয়া দেখিয়াছেন তিনি সকলই কি, তাহা পরীক্ষা করিবার তাঁহার ইচ্ছা ও অবকাশ হইল না, (যদিও ইচ্ছা করিলে তাহা তিনি পারিতেন) শুধু লোকের কথা ও নিজের ধারণা এই [illegible] একত্র করিয়া যাহা মনে আসিল বলিয়া গেলেন।

Hypnotism এর মূলে যাহার সত্তা—reality যাহে না, তাহার সত্তা ideal অর্থাৎ কল্পনায় ও ভাবময়। উহার কোনও material existence থাকে না। Hypnotism এর ইহাই প্রধান লক্ষণ। অথচ এই লোকটি যে সব বস্তু নির্মাণ করিয়া দেখান, তাহা যে সত্যকার জিনিষ এবং তাহা যে একটির পর একটি বহু অন্যান্য বাস্তব পদার্থের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় সে সম্বন্ধটা প্রথম-লেখক আবিষ্কার চেষ্টাও করিলেন না। লেখক ইহার সম্বন্ধে কতকটা সঠিক সংবাদ রাখেন তাহা তাঁহার "আত্মার নীলিমা হইতে পরমধু বৈরাগী"র কথাটার মধ্য হইতে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে সকল কথা ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহার বেশীর ভাগই অসত্য এবং যেটুকুর সত্যের ভাগ আছে তাহাও এত distorted যে তাহাকে মিথ্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি কথা লইয়া তাঁহার ভুল প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়।

৯

ব্যক্তিরও সর্বজ্ঞই আছে এবং গুরুরও প্রয়োজন হওয়ার যে তাহা প্রথমে অস্বীকার করিয়াছি তাহা বলিতেছি না। তাই বলিয়া কি আদর্শের বিষয় করিতে হইবে? বর্তমান বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া কত লোকে তাহার কত ব্যাখ্যাই করিতেছে—তাই বলিয়া কি বিজ্ঞানকে মানুষের অকল্যাণকর মনে করিতে হইবে। সেখানে ব্যাখ্যার তারতম্য ও অসিদ্ধিই হইবে, কিন্তু সত্যান্বেষীকে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র বাহির করিয়া আনিলে তাহাতে অনিষ্টাপেক্ষা সম্ভাবনা সম্পূর্ণ।

গুরুবাদ মানুষের অকল্যাণের নহে এবং তাহা ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার পরিপন্থীও নহে। ইহার দ্বারা মানুষ "পরনির্ভর" হয় না, নিজেরই শক্তি কত মহান্ কত প্রচণ্ড তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা সে দুর্বল হয় না—জীবনী-শক্তির উৎস খোলায় তাহারই সন্ধান মেলে। সে আরও লাভ করিয়া বড় হইয়া যায়।

গুরুবাদ ও পরমতত্ত্বের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

[illegible]—উদ্বোধন পত্র, ১ বিভাগ ৫ম সিরিজ, ৩য় সংখ্যা—৩য় বর্ষ।
পরিচয়—উদ্বোধন কার্যালয় ১৭৩ আপার সার্কুলার রোড—কলিকাতা।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর মুখপত্র

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ)

সম্পাদক— শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, বার-এ্যাট্-ল.
ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

সহ-সম্পাদক — শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

মন্ত্রণা-পরিষদ

শ্রীসরলা দেবী বি-এ, অধ্যক্ষ শ্রীযোগীনাথ কবিরাজ এম্-এ, ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পি-এইচ-ডি
ডাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ডি-এল্-সি, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ।
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর,

পরিচালক
প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী
চিত্তরঞ্জন অফিস, লক্ষ্ণৌ।

কলিকাতা [illegible]
২০৪, কর্ণওয়ালিস [illegible]

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲]

[প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা

উত্তরার সূচি

অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

সম্পাদক :—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক :— শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী

লেখ সূচি

ধান—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

বিদেশ-কেরীর অত্যাচার—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় ...

রাখী (কবিতা)—শ্রীরাইচরণ রায়চৌধুরী

রাখী (গল্প)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সম্পাদক :—

রাজার—অধিনায়ক মজুমদার

আমার অতীত জীবন—রাজকুমারী বসু

কবি ওমর খৈয়াম—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মানুষের মূল্য (কবিতা)—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

আহরণী—শ্রীবাসিলীকান্ত মুখোপাধ্যায়

(ক) সাফল্যের কারণ ১৪৩

(খ) অসবর্ণ ১৪৪

বৈধব্য (উপন্যাস)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৪৯

বন্দরে-বন্দিরে (গল্প)—শ্রীসরোজকুমারী মুখোপাধ্যায় ১৫৭

লেখ সূচি

সম্পাদন :—

(ক) কবুতরখোপ—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) কীর্তন-সঙ্গীত—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

ধান ও ধরণিপি—শ্রীসুনীলকুমার রায়

প্রবাসী-বাঙালী :—

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন—বিবরণ

এলাকী—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়

চিত্র-সূচি

ওমর খৈয়াম (রঙিন)—মহম্মদ আবদুর রহমান চাগতাই মুগল

গাছের অভিব্যক্তি—শ্রীবিমলেন্দ্রনাথ কর্মকার

(১) ধান
(২) আবহ
(৩) অনুশোচনা
(৪) লোপ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কার্যের সুবিধার জন্য এখন হইতে "উত্তরার একটি শাখা কার্যালয়" ৪৬নং তেলুপুরা, কাশীধাম—এই ঠিকানায় স্থাপন করা হইল। এখন হইতে চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন, ইত্যাদি উক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য। কেবলমাত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি 'উত্তরা'-সম্পাদক সমীপে—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

—কর্মকর্তা, উত্তরা।

উত্তর:

The Indian Press Ltd., Allahabad

দ্বিতীয় বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ | তৃতীয় সংখ্যা

গান

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

সিন্ধু খাম্বাজ—কাল একতালা

কে আমার বাজায় বাঁশী—এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে।
শুনি মোর উতল কাঁদি, চরণের সেই স্বপনে।

কোয়েলা ডাকুল আবার, যমুনায় লাগ্‌ল জোয়ার,
কে তুমি আনিলে জল, ভরি মোর দুই নয়নে।

আজি মোর মৃদু-জ্বালা, কি দিয়ে গাঁথ্‌ব মালা?
কেন এ নিঠুর খেলা, খেলিলে আমার সনে?

হয় তুমি থামাও বাঁশী, নয় আমায় লও হে আসি;
ঘরেতে পরবাসী, থাকিতে আর পারি নে।

বিদেশ-ফেরতার অত্যাচার

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার—কলিকাতা

(১)

বিদেশে আমার-সন্ধানেরা যারা কিছু করিয়াছেন বা করিবেছেন যারে যারে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি যাত্র। সংবাদ হিসাবে এই সকল চরিত্রের বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে। কোনো কর্মবিশেষের সমালোচনা অর্থাৎ দু-চার আলোচনা করা এই সকল বিবরণের উদ্দেশ্য নয়। বাস্তব ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের তরফ হইতে লোকজনের নাম ও কাম এবত্ত করা হইয়াছে যাত্র। অবশ্য সকল পর্যটকের সকল প্রকার কথাই আমার মতের পরিচায়ক এরূপ বুঝিতে হইবে না।

কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা বিদ্যা-বিশেষের বা ব্যবসা-বিশেষের কথাকে টানিয়া এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করা হয় নাই। অধিকন্তু, কোন ধন-বিশেষের, জাতি-বিশেষের বা প্রদেশ-বিশেষের গুণ গাহিবার দিকেও লক্ষ্য ছিল না। কি পর্যটক, কি ব্যবসায়ী, কি ছাত্র-ছাত্রী, কি গবেষক, কি বক্তা, কি লেখক, কি রাষ্ট্রনৈতিক প্রচারক,—সকলেরই বিদেশ-সম্পর্কীয় জীবন-কথা দুইয়া রাখিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

(২)

সম্প্রতি দেশ হইতে নানাপ্রকার খবর পাইতেছি। কানাঘুষার প্রকাশ যে,—আমাদের বিদেশ-ফেরতারা দেশের উপর জুলুম চালাইতেছেন। ব্যবসায়ী-মহলে কোন মালপত্র অনধিকারীকে কম্ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের রহিয়াছে বেশ যাইতেছে।

"সকল" বিদেশ-ফেরতা সম্বন্ধেই এইরূপ দুর্নাম রটিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। কিন্তু হয় ত বা কেহ কেহ, যে সকল ভারতবাসী বিদেশ মেলেন নাই তাঁহাদের উপর "চাল" মারিতেছেন। বিদেশ-ফেরতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইবার সময় বাকি অন্যান্যেরা কিছু ভয়ে ভয়ে চলিতে থাকা হন।

কথায় কথায় বাকি বিদেশ-ফেরতারা বিদেশের নজির দিয়া থাকেন। বিদেশ-প্রবাসের অভিজ্ঞতা, বিদেশী ভাষার পাণ্ডিত্য, বিদেশী-বিদেশিনীদের সঙ্গে মিশি-বিশিবার, বিদেশী পত্রিকাদের সঙ্গে খবরের লেন-দেনের,—ইত্যাদি কথার জোরে বিদেশ-ফেরতারা অন্যান্য নরনারীকে অপ্রতিভ ও "থাবা" করিয়া ছাড়িতেছেন বলিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বেয়াদবও দু-চার করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রত্যেক প্রদেশে এবং বড় বড় সহরেই বাকি এইরূপ দুই চার দশ বিশজন বিদেশ-ফেরতা "বরাখাবাকেরা" জাত বজিয়া প্রসূত হইতেছেন। দেশ, ধর্ম, বিদ্যা, ব্যবসা ইত্যাদি সকল বিষয়েই ইহারা একমাত্র "বোদ্ধা" এইরূপ ইহাদের বিশ্বাস। অন্যান্য নরনারী বাকি এই বোদ্ধাদের সহ্যে অস্থির। এ এক নূতন আপদ ও অত্যাচার।

(৩)

যাঁহারা বেয়াড়বাদীর এবং অহিংস-পন্থী, তাঁহারা এই অবস্থায় হয় ত বেয়াদী লোকজনকে ডাকিয়া হিতোপদেশ শুনাইতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহারা বোধ হয় বলিতে থাকিবেন :—"বেয়াদবি করা কি ভাল? বাহাদুরী পরের জিনিষ। দেশের লোকেরা সকলেই ত ভাই ভাই এক ঠাঁই। না হয় দুটি কিছু বেশীই খা খান। তাই বলিয়া অপরকে কি দুঃখ করিতে আছে? ছিঃ।" ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের চিত্ত বিশ্লেষণ করা বর্তমান লেখকের মতলব নয়। অথবা দেশের নরনারীকে "ডাক্তার-" পূর্ণ "সত্যযুগের" বেয়াদবীতে পরিণত করিবার আশাতি

লইয়া খাটা-খাটি করার তাঁহার বাসনা নয়। যাহারা দুর্নীতি-দুর্নীতির চর্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা বর্তমান-ক্ষেত্রে তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। যদি লাভ হয়, ভালই।

তবে ভারতীয় বিদেশ-কেরাণীদের বিরুদ্ধে যেসকল লোক আছেন,—এই কথাটা একবার "নীতি", "ধর্ম", "প্রতিজ্ঞা" ইত্যাদির ধারণা নয়। বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের লেন-দেন একটা অতি-বড় ব্যাপার। এই ব্যাপারটা আরও বড় হইয়া চলিবে। কাজেই, বিদেশ-কেরাণীদের সঙ্গে অন্যান্য ভারতবাসীর যোগাযোগ একটা বড় প্রশ্ন। মোটা দামাজের যা দেশের এই সমস্যাটা এক বিস্তৃতর ও গভীরতর ক্ষেত্র হইতে সমুদিয়া দেখিতে হইবে। এই হিসাবে "নীতি", "ধর্ম", "দেশের", "হিতোপদেশ" ইত্যাদির ধারা ছাড়িয়া দিলেও বিদেশ-কেরাণীদের লইয়া সকল ভারতবাসীরই কিছু কিছু মাথা ঘামানো আবশ্যক।

"সেকালে" বিলাত-ফেরতারাই ভারতের একমাত্র বা প্রধান বিদেশ-কেরাণী ছিলেন। আজকাল ইয়োরোপেরিকার সকল দেশ,—বস্তুতঃ দুনিয়ার প্রায় সকল দেশই ভারতীয় বিদেশ-কেরাণীদের কিছু কিছু করিয়া কদর্থার আসিয়াছে।

আগেকার দিনে প্রধানতঃ ব্রাহ্মেরাই ছিলেন বিদেশ-কেরাণী। আজকাল প্রায় সকল ব্যবসা এবং সকল ধরনের লোকই বিদেশ-কেরাণী হইয়াছেন।

সেকেলে বিদেশ-কেরাণীরা প্রধানতঃ ছিলেন, বড় বড় সওদাগরী আফিসের বা ব্যাঙ্কিংয়ের। তাঁহারা একঘরে হইয়া থাকিতেন এবং নিজেদের গণ্ডীর ভিতর একটা জাত্ গড়িয়া তুলিতেন। আজকাল আফিসের ছাড়াও অন্যান্য বহু বিদেশ-কেরাণীদের ভিড় দেখা যায়। "বিদেশ-কেরাণীদের জাত্" এখনো বোধ হয় কিছু কিছু থাকিয়া বজায় করিয়া চলিয়া থাকে। তবে সেই "গভীর" বিশেষত্ব অনেকটা হারিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করি।

এই সকল কথা ১৯১৪ সালের পরবর্তী দশ বৎসর সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া ধরিতে হইবে। ১৯২৪ সালের মূলে অবশ্য ভারতীয় বিদেশ-কেরাণীদের এই অবস্থার সুস্থানাই।

(২)

বিদেশ-কেরাণীরা অবস্থাপন্ন কেন হয়? প্রথম কথা,—তাঁহারা টাকা রোজগার করেন কিছু মোটা হারে। যাঁহাদের বেতন খুব তাঁহারা বেশকী। "কমিশন" লাভই তাই। এখানে সেখানে, অল্পে বিস্তরে।

কিন্তু সকল বিদেশ-কেরাণীই মোটা মাহিয়ানা পাইতেছেন কি বা কিছু স্থায়ীও রোজগার করিতেছেন কি? কখনই না। যাঁহারা মোটা দিন বিদেশে না থাকিবার মাই তাঁহাদের অনেকেই বিদেশ-কেরাণীদের চেয়ে বেশী রোজগার করিয়া থাকেন। কাজেই, "উচ্চ-বেতন" অবশ্য হইতে বিদেশ-কেরাণীদের বেশকী কথা আসাযুক্তি।

(৩)

দ্বিতীয় কথা,—ভাষার অভিজ্ঞতা। যাঁহারা আগে-হিতে হইতে অল্পে বিদেশে বিরিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় ভাষার "ঝাঁক" করেন না। ফরাসী এবং জার্মান তাঁহাদের বেশ বেশ হইতে উচ্চতর শিক্ষালয়ে কিছু কিছু শিক্ষিতে অবশ্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল ভাষায় "পারিতা" তাঁহাদের বেশকের বোধাক রোজগাইতে পারে না।

যাঁহারা বিলাতের বাহিরের ইয়োরোপে কিছুকাল কাটাইয়া বিয়াছেন তাঁহারা ফরাসী, জার্মান এবং ইতালিয়ান শিখিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কতখানি শিখিয়াছেন?

আমাদের বেশের বি, এ, বি, এস্ সি. এবং এম বি ইউনিভার্সিটির বা ব্যাঙ্কিংয়ের ছাত্রে আমরা যতটুকু বা যতখানি ইংরেজি শিখি ততটুকু বা ততখানি ফরাসী, জার্মান এবং ইতালিয়ান শিখা করজন ভারতীয় বিদেশ-কেরাণীর পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখার কথা। কথাটা খুলিয়া বলা আবশ্যক।

ইংরেজি ভাষার সাহায্যে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ইত্যাদি দেশের পত্রপত্রিকা বাঁচিতে অনেক কাজই চলিয়া যায়। কাজেই, ভারতীয় বিদেশ-প্রবাসীরা "সময়ের অভাব" দেখি দিকেই ঝুঁকিয়া থাকেন। যাহার "সর্বাপেক্ষা

ভয় ভাষার পক্ষটা" বুঝিয়েই ফরাসী। নতুন নতুন ভাষা শিখিবার চেষ্টা চলিতে থাকে বটে, কিন্তু এই চেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হয় না।

(৭)

অধিকন্তু ভাষাগুলা সমান কঠিন। ইংরেজির সঙ্গে ফরাসীর কিছু কিছু যোগ আছে। কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে জার্মানের একপ্রকার কোনো যোগ নাই। আর ইতালিয়ানের সঙ্গে জার্মানের সম্বন্ধ বর্জ্যের মধ্যেই গণ্য হয়। ফরাসী ও ইতালিয়ানকে যদিও দুই লাতিন "বোন" বলা হইয়া থাকে, তথাপি ফরাসী-ভাষা লোকের পক্ষে ইতালিয়ান পড়িতে হইলে প্রত্যেক লাইনে বিনবার করিয়া অভিধান খুলিতে হয়।

ভাষা-বিজ্ঞানের যুক্তি দেখাইয়া, ব্যাকরণের তুলনা চালাইয়া, শব্দের সংখ্যা গুণিয়া ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান ও ইতালিয়ান এই চার ভাষায় "বৈজ্ঞানিক আত্মীয়তা" প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভাষা শিখিবার বেলায় যখন চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন বলিব যে, ইংরেজি-জানা ভারত-সন্তানের অন্য তিনটা ভাষার জন্য তিন তিনবার নতুন করিয়া পরিশ্রম হইতে হয়।

ধরা যাউক, কোনো ব্যক্তি ফ্রান্সে গেল, দুই বা তিন বৎসর কাটাইল। আর ফরাসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষার দিকে সে নজর দিল না। তথাপি সে ফরাসী ভাষায় নিখুঁত চিঠি বা প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে কি না সন্দেহ। আইনৌচ কথাবার্ত্তা চালানো কঠিন নয়। কিন্তু যে হাজার দশ বারজন ফরাসী নর-নারী কোনো "অপরিচিত" বিদেশ থেকে ফ্রান্সের সেই ঘাটে বসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা সহজ বিবেচিত হইবে না।

(৮)

মনে একবার ভাষা শিখা কঠিন বলিয়া ধারণা থাকে তাহা হইলে কথা স্বতন্ত্র। অথবা এমন কি, যদি ভারতীয় ভদ্র-সন্তান বড় জোর মাইলের বেশী না হয় এবং অন্যান্য কাজের চাপ কম থাকে তাহা হইলে নতুন দেশে বসবাসের ফলে বিদেশী ভাষাটা "রপ্ত" করা অসাধ্যসাধন বিবেচিত হইবে না। কিন্তু যে সকল ভারতবাসী ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সে বিদেশে আসেন এবং নানা কাজ কারবার লইয়া আসেন তাঁহারা দেড় দুই বা এমন কি তিন বৎসরেও একটা বিদেশী ভাষায় "পণ্ডিত" হইতে অসমর্থ।

বিদেশী কারবারের এবং দেশের খাঁটিয়ার কথা ত্যজে রাখা যাই। বিদেশী চিঠি পড়িয়া বুঝিবার কথাও দেওয়া যেতে। কিন্তু বিদেশী ভাষায় চিঠি লেখা অথবা প্রবন্ধ রচনা করিতে অগ্রসর হওয়া "পাগলের ঝোঁক" বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। কথাগুলা সাধারণ ভাবে বলা হইতেছে। ব্যতিক্রম আছে সন্দেহ নাই,—তবে প্রত্যেক ব্যক্তিক্রমেরই কোনো না কোনো "বিশেষ" কারণ দেখানোও সম্ভব।

এখন জিজ্ঞাস্য এই,—যে সকল ভারত-সন্তান অনেক বলিয়াই ফরাসী, জার্মান বা ইতালিয়ান এবং কম বা জাপানী পণ্ডিতেছেন তাঁহারা বিদেশ-ফেরতদের চেয়ে "ভাষার অভিজ্ঞতা" হিসাবে কম কিসে? তাঁহারাও বিদেশী ভাষায় কারবারও এবং দেশের খাঁটিয়ার কথাও রাখেন। বিদেশী ভাষায় চিঠি পড়িবার কথাও তাঁহাদের আছে। সুতরাং এইসে দুই চার দশ লাইন ফরাসী বা জার্মান লিখিতে যে তাঁহারা অসমর্থ এরূপ বুঝিবার কোনো কারণ দেখি না। অবশ্য "কথা বলিবার" অভ্যাস তাঁহাদের নাই। কিন্তু তাহাতে বলিয়া বিদেশী ভাষায় কথা বলিবার দরকারই বা পড়ে কখন্?

কাজেই, ভাষা লইয়া বড়াই করা বিদেশ-ফেরতদের আর এক আহাম্মুকি। আর, সমাজের তরফ হইতেও বিদেশ-ফেরতদিগকে লইয়া মাতা-মাতি করা অবিবেচকের কার্য্য। দেশের নর-নারী এই কথাটা বুঝিয়ে "বিদেশ-ফেরতরা আপনা আপনিই "চিট" হইয়া আসিবেন।

(৯)

বিদেশী নরনারীরা ফ্রান্সে বৎসর মাস বা বৎসর বৎসর কাটাইয়া স্বদেশে ফিরিবার পর ফ্রান্স সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন অথবা লেকচার দিবেন। এই সকল লেকচার ও বক্তৃতা ভারতবাসীর পক্ষে অনেক সময়েই সন্তোষজনক নয়। সমালোচনার উপলক্ষে আমার সাধারণতঃ বলিয়া থাকি :—"লেখক বা বক্তা ফ্রান্সের

তথা দেখি কিছু জানেন না। রেলে চাপিয়ে ট্রামে বসিয়া আমাদের বেশ ও সমাজ সম্বন্ধে যতটুকু দেখানো যায় তাহার বেশী অভিজ্ঞতা এই সকল বিদেশী পর্যটকের নাই।" ইত্যাদি।

ভারতীয় বিদেশ-কেরাণীদের বিদেশ-বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও বিদেশী-বিদেশিনীরা ঠিক এইরূপ সমালোচনা করিবারই অধিকারী নহি কি? বাস্তবিক পক্ষে, ভারত-সম্রাটের কিংবা তাঁহারা বিদেশ-পর্যটন অভিজ্ঞতার তাঁহারা বিদেশ-সম্বন্ধে কতখানি জানেন? এই প্রশ্নটা ভারতীয় সমাজে তুলাইয়া বসাইয়া আলোচনা করা দরকার। এই দিকে আমাদের যথোচিত দৃষ্টি পড়ে নাই।

(১০)

আলোচনা করাও বড় সহজ নয়। যে সকল ভারতীয় বিদেশ-কেরাণী বিদেশ-পর্যটনের ডায়েরি ছাপিয়াছেন তাঁহাদের রচনা এই হিসাবে প্রথম শ্রেণীর। ইয়োরপি, আমেরিকা বা হিমালয়ে এই বিদেশ-সাহিত্য অল্পবিস্তর গড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু একমাত্র এই সাহিত্যের উপর নির্ভর করিলে বিদেশ-কেরাণীদের প্রবাস-জীবন-সম্বন্ধে বেশী কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যতটুকু পাওয়া যায় তাহাতে এই বুঝি যে, এই জীবন অতি অল্প পরিমাণ অভিজ্ঞতার স্থান পাইয়াছে। আর এই অভিজ্ঞতার গভীর অতিশয় সঙ্কীর্ণ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে সকল অভিজ্ঞতা ঠাঁই পায় নাই সেই সমূহ জানিবার উপায় পর্যটকদের সঙ্গে মৌখিক আলোচনা করা। কিন্তু হাজার হাজার ব্যাপারী, পর্যটক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কিজন কয়জনের সঙ্গেই বা "চিত্তরঞ্জনের কথা"-গুলা স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা করা সম্ভব?

যাহা হউক, চীনে, জাপানে, বিলাতে, আমেরিকায় এবং ইয়োরোপের নানা দেশে নানা শ্রেণীর এবং নানা জাতির ভারতীয় যোদ্ধাধিকদের সঙ্গে কমবেশী মোলাকাৎ করা গিয়াছে। দূর হইতেও কিছু কিছু কথা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। অধিকন্তু পরস্পর পরস্পরের চলাফেরা, লেন-দেন ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলাবলি করেন তাহারও কিছু কিছু কানে পৌঁছিয়াছে। তাহা ছাড়া বিদেশ-বেড়ানেওয়ালা দেশ হইতেও অন্যান্য দল বিদেশের লোক সম্বন্ধেও খানিকটা আন্দাজ করা সম্ভব।

(১১)

ভারতীয় বিদেশ-কেরাণীরা বিদেশে প্রধানতঃ তিন দৃষ্টিতে দেখা দেন। প্রথমতঃ—ব্যাপারী, দ্বিতীয়তঃ—পর্যটক, তৃতীয়তঃ—ছাত্র। বিদেশী সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার ইত্যাদি সম্বন্ধে এই তিন শ্রেণীর লোকের কাহার কতটুকু বা কতখানি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিবার সম্ভাবনা? বাক্তিরেক-গুলা ছাড়িয়া দিতে হইবে বলাই বাহুল্য। আলোচনা করা যাউক।

বিদেশী ব্যাপারীরা ভারতে সুপরিচিত লোক। প্রথমতঃ, তাঁহারা বড় বড় ব্যবসায় কর্ণধার; কাজেই, পরমাত্মীয় লোক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা মূলতঃ অথবা গৌণতঃ একটা উচ্চতর জাতিবিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার প্রতিনিধি।

কিন্তু বিদেশে ভারতীয় ব্যাপারীদের ইজ্জৎ আছে কি? এমন কি, জাপানেও তাঁহারা বড় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক নন। ইয়োরামেরিকার দেশগুলার কথা ত অবশ্য। অধিকন্তু পরমাত্মীয় ভারতীয় ব্যাপারী বলিলে বুঝিতে হইবে পাশীদিগকে। কিন্তু পাশীরা বিদেশে ভারত-সন্তান নামে পরিচিত কিনা সন্দেহ।

অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিদেশীদের সঙ্গে "আফিসে" দেখা করেন। আফিসী জীবনের বাহিরে বিদেশী নর-নারীদের সঙ্গ-লাভ কিরূপ তাহা দেখিবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে না। শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, জাহাজ, ম্যাগাজিন মালিক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন কয়জন ভারতীয় ব্যাপারীর পক্ষে ঘটিয়া উঠিয়াছে। হয় ত আঙুল গুণিয়া বলা যায়। এই শ্রেণীর বিদেশীদের পরিবারে প্রবেশ করা এক প্রকার অসম্ভব। বড় জোর,—কোনো রেস্তোরাঁকে বা হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন বা চা-পানের নিমন্ত্রণ ছাড়া আধাআধি ঘর কোনো সুযোগ নাই।

তাহা হইলে,—ভারত-সন্তান বিদেশের কতখানি দেখিতে পান? যে হোটেলে বসিয়া এই কথা হয় তাহার কি-চাকরটী হইতেছে বিদেশী-সমাজের প্রথম বাণী-প্রতিনিধি। রাস্তার ঘাটে সন্ধ্যাকালে যে সকল বারাঙ্গনা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা হয় বিদেশী প্রতিনিধি। অধিকন্তু, সিনেমার এবং নাচঘরের দর্শক-মণ্ডলী যা নাই-নাই ভারতীয় ব্যাপারীদের পক্ষে বিদেশী-সমাজের অল্প এক বড় সাক্ষী।

(১৭)

যাঁরা সপ্তাহ বা মোসাফির ব্যাপারী, তাঁহারা কোনো শহরে পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকেন না। তাঁহার যেমন সমাজ জোর তিনি সেইরূপ হোটেলে বা বাড়ীওয়ালীর ঘরে অতিথি হন। মিউজিয়াম দেখিবে যাওয়া তাহারও ধারণার বাহিরে নয়। তাঁহারা এই সব দেখিয়া থাকেন। তবে "সহর দেখা" বলিলে বাগ-বাগিচা, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি ভিতর বাহির হইতে যে সব ভিন্ন দেখা হওয়ার সেই সবের অনেকগুলা দেখা হইয়া যায়। বিদেশী লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার সুযোগ সাধারণতঃ প্রায়ই ঘটে না। কোনো বাড়ি বা পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরম্ভ করা ত অসম্ভব ঘটেই।

বিদেশের বড় বড় সহরে আজকাল দুচার জন ভারতীয় নর-নারী প্রায়ই স্থায়ী বা অস্থায়ী হিসাবে বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা অনেক ভারতীয় পর্যটকের এবং ব্যাপারীর পক্ষে সম্ভব। তাহাতে আপদকালের সাহায্য কিছু কিছু হয়। কিন্তু তাহাতে মোটের উপর ভারতীয় "অবলাকান্ত"ই অসহায়।

আজকাল আমরা সর্বত্রই ছোটখাট "ভারতীয় সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাস্তবিক ভারতীয় পর্যটক বা ব্যাপারী কোথাও উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে এই সমিতির তরফ হইতে অভ্যর্থনা করা হয়। কখনো কখনো এই সকল সমিতির সাধারণ সুবিধাজনক বিদেশী-বিদেশিনীর সঙ্গে তাঁহাদের করমর্দন ও বাক্য-বিনিময় করা ঘটিয়া উঠে।

(১৮)

তবে এই করমর্দন ও বাক্য-বিনিময়ের সময় ভারতীয় ব্যাপারী ও পর্যটকেরা বিদেশী-বিদেশিনীদের নিকট দেশের ইজ্জৎ বাঁচাইয়া চলেন। যে কোনো বিদেশীকে অধিবাসীর শীর্ষ নিবেদন করা ভারত-সন্তানের স্বভাব। তাঁহাদের সঙ্গে বাড়া বাড়া কথা বলিতে আমাদের অধিকাংশই অসমর্থ। আমাদের নীচাশয়তা এবং দোলাক-চরিত্র দেখিয়া বিদেশীরা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি নীচু ধারণা পোষণ করিতে শিখিয়াছেন। এ সংবাদটা খুবই ভারতের মহলে মহলে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বিদেশীদের ভিতর যাঁহারা সত্য সত্যই নামজাদা বা কৃতিত্বশীল লোক তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে ইংলণ্ডে কোনো কোনো ভারত-সন্তানের মৌখিক আলাপ ঘটে না এমন নয়। কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। তাঁহাদের পা চাটিতে লাগিয়া যাই। অনেক সময়ে—আমাদের প্রতিনিধ স্থানীয়দেরও নিজ নিজ যোগ্যতার ফল করিয়া বিদেশীদের সঙ্গে সমানে সমানে মেলা-মেশা চালাইতে পারেন না। অতিমাত্রায় খোসামোদ, অতি প্রশংসা, ইত্যাদি দৌর্বল্যে ভারতীয় মনস্বীরা বিদেশীদের চোখে বাঙ্গ-বাই বুদ্ধ জীবে পরিণত হন।

যে সকল ব্যাপারী ও মোসাফির কিছু বেশী দিনের জন্য কোনো সহরে সময় কাটাইতে বাধ্য হন তাঁহারা বিদেশী লোকজনের চিত্ত কতু যুগাইতে পারেন কি? বলা কঠিন। আমাদের অধিকাংশ লোকই "বাবা বয়ন" মার সকল করিয়া বিদেশে আসিতে বাধ্য। কোনো ক্রমে হোটেলের খরচ চালাইয়া দিনাতিপাত করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক!

বিদেশীদের সঙ্গে মাখামাখি করিতে হইলে পয়সা খরচ হয়। কোনো পরিবারে যদি কোনো ভারতীয় অতিথি বিবেচিত হন তাহাতে পরিবারের খরচ বেশী কিছু নয়। বল জন বাড়িতেছে,—তাহার সঙ্গে আর একজন বাড়িলে হিসাব বাড়িয়া যায় না। কিন্তু কোনো ভারত-সন্তান যদি দুই একজন বিদেশী-বিদেশিনীকে নিমন্ত্রণ করিতে তাহলে তাহা হইলে খরচ বড় কম নয়। "ভদ্রলোকেরা" যে সকল হোটেলে বা রেস্তোরাঁতে

যায় সেই সকল জায়গা হইতে অল্প খোরাক নিয়ত্ন করা চলে না। কিন্তু এই সকল সমনে একবার পাঁচ পাঁচ জনের বৈশ ভোজন দিতে হইলে ভারত-সন্তানের এক মাসের খরচ সুধাপুরি উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কাজেই, বিদেশীদের সঙ্গে ভারত-সন্তানের "গলে গেলে দুইটু" নীতি বজায় রাখা অসম্ভব। ফলতঃ, বিদেশ সমনে ভারতীয় বিদেশ-ফেরতদের অভিজ্ঞতার যাচনদ-নাই অবস্থা।

(১৪)

ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশী সমাজে কতদূর প্রবেশ করিতে পারেন? তাঁহারা প্রধানতঃ দুই বা তিন বৎসর বিদেশে থাকেন। প্রত্যেকের মাসিক বৃত্তি গড়পড়তা বেশ প,' দুই শ' বা আড়াই শ' টাকা। যাহারা "সরেস" বা অধ্যাপক তাঁহাদের অবস্থাও এইরূপ।

এই টাকায় খুব-অল্পের বেতন দিয়া বাকী থাকে অতি সামান্য। তাহার সাহায্যে খাওয়া-পরা চালাইতে হয়। এই খোরপোষ অতি নিম্নস্তরের হইতে বাধ্য। যে সকল "বোর্ডিং হাউসে" "ফ্যামিলি"তে বা ছাত্রাবাসে দরিদ্রতর লোকের সন্তানেরা থাকে আমরা তাহাতে উপরে উঠিতে পারি না। যে সকল রেস্তোরাঁতে বা ভোজনাগারে সাধারণ এবং মুদীখানার লোক খানাপিনা করে আমাদের ছেলে তাহার উর্দ্ধে নয়।

সমনের একবারের বেশী ভাল একটা রিস্টোরাঁ বেলা বোধ হয় অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অবসরে বসিয়া উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শুনিবার সাধ প্রায় আমাদের অনেকেরই কিছু কিছু থাকে। কিন্তু "উহার জন্য সীজনে দরিদ্রাগার অনেকগুলা।"

অর্থাৎ ব্যাপারীরা এবং ভোগাধিকারীরা বিদেশী সমাজ সমনে যতখানি সুবিধার সুবিধার সুযোগ পান ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সুযোগ আদায় ক্রমে অনেকটা কম। "বাড়ীওয়ালীর মেয়ে বা বি ভারতবাসী" আর বাড়ীওয়ালীর "বাস্তুভূক ঘোড়া" এবং ঐ ধরণের অন্যান্য পাড়া-পড়শী দ্বারা আমাদের ছাত্রেরা বিদেশে অল্প খোলো শ্রেণীর লোকের সংস্রবে সাধারণতঃ আসিতে পান না। বিদেশ, বিদেশী সমাজ, পাশ্চাত্য আদর্শ ইত্যাদি সমনে আমরা যে সকল সমাচার বোলচাল বাড়ি তাহার পশ্চাতে বাস্তব অভিজ্ঞতা এই পর্যন্ত।

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপকদের "কেহ কেহ" বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কাজে দাঁড়াইতে পারে। এই সূত্রে অধ্যাপকের পত্নী, অধ্যাপকের মেয়ে, অধ্যাপকের আত্মীয়া বা বা ইত্যাদি দুএক জনের সঙ্গে মাসের দুএকবার সমবেদনের সুযোগ ঘটে। কিন্তু এই সকল সুযোগে বিদেশী-সমাজের "আইসবার্গের" জীবন স্পর্শ করা সম্ভব নয়। অধ্যাপকের পরিবার বা আত্মীয় স্বজন ভারতীয় শিষ্যকে নিজ নিজ "সোসাইটী" আবশ্যকমত দেখাইবার সিকেই বেশী সমন দিয়া থাকেন। অধিকন্তু, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রায়ই অন্যান্য ভারত-সন্তানের সঙ্গে বিদেশীদের পরিচয় করিয়ে ঘুরিয়ে। কাজেই, মেলা-মেশার আসল বন্ধুত্ব পরিচয় উঠিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কথাটা শুনাইতেছে খারাপ। কিন্তু খুবই ভারতে অন্যের আত্ম-সম্বন্ধোচনার মূল আশ্রিয়াছে।

(১৫)

বিদেশ সমনে বিশুদ্ধ এবং গভীর জ্ঞান লাভ করা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য। এই বিষয়ে ভারতীয় বিদেশ-ফেরতারা আজ পর্যন্ত বেশী দূর অগ্রসর হইবার সুযোগ পান নাই। মোটামুটি এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অন্যত্র এইরূপই আমার বিশ্বাস। সৌজন্যিক বাধিয়া কথা বলিতেছি না।

ভারত-সন্তানের বিদেশ সমনে বিশেষজ্ঞ বা "বিদেশ-বক" রূপে দাঁড়াইয়া তুলিবার কৌশল ভারতে আলোচিত হওয়া কর্তব্য। সেই আলোচনায় সম্প্রতি আমরা নামাইব না। যেরূপ দুর্দিনে আমরা চলে যে আজকাল এই দিকে আমাদের ওজাদির মাত্রা খুব কম।

তবে যে সকল ভারত-সন্তান বিদেশ দেখিবার কোনো সুযোগ পান নাই তাঁহাদের চেয়ে বিদেশ-ফেরতারা যে বিদেশ-সমনে বেশী অভিজ্ঞতা রাখেন সে কথা বলাই বাহুল্য। এই হিসাবে তাঁহারা যদি "বেয়াকুব" হন তাহা হইলে অন্য লোকের দাঁড়াইবার কিছুই নাই। এই

মনে রাখিতে হইবে যে,—"নিরক্ষ পাশ্চাত্য দেশে এরকোয়ণি জন্মায়ছে।"

(১৬)

তথাপি প্রত্যেক বিদেশ-ফেরতাকেই যাচাইয়া লেওয়া দরকার হইবে। প্রথম জিজ্ঞাস্য—তুমি কত দিন কোন্ দেশে ছিলে? সেই দেশে কতজন লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ এবং বাক্য-বিনিময় ঘটিয়াছে? তাহাদের সামাজের ঠিকানা তুমি জানিতে বা এখনো জানো? এতদিনকার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে কত জনের সঙ্গে? সেজন্যে ঘটির তাহাদের মধ্যেকে বা কোনো সার্বজনিক হইবে? তাহারা কোন্ কোন্ ধরনের এবং মর্যাদার লোক? ইত্যাদি।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য—তুমি বিদেশের কোনো মফঃস্বল দেখিয়াছ কি? ছোটখাটো সহরে অথবা পল্লীগ্রামে কত রাত্র কাটাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে?

তৃতীয় জিজ্ঞাস্য—তোমার পরিচিত নর-নারীর বিষয় ইহাদের সংখ্যা ছিল বিদেশ? ইহাদিগের পরিবারে বা পারিবারিক ও সামাজিক মজলিসে খ্রীষ্টিয়ান অথিতি বা বন্ধু-বান্ধবের আসনে বসিয়াছ কতবার? আবার খ্রীষ্টিয়ান পরিবারের ইহাদি নর-নারীর খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে কতদিন কি? ইত্যাদি।

(এইখানে জানিয়া রাখা দরকার যে—ইহুদিরা শিক্ষা-দীক্ষার দরুণ উঁচুতে উঠিয়া না গেলে, ইংরাজেরা কিন্তু "সমাজে" তাহাদিগকে "অস্পৃশ্য"। ইহুদিদের সম্বন্ধে কোনো কথায় "পাশ্চাত্য আদর্শ" বলা হইলে এইরূপ বিবেচনা করা চলিবে না। অবশ্য খ্রীষ্টিয়ানদের ইহুদি-বিদ্বেষ অবশ্য-সন্তানদের মরণ করিতে হইবে এমন কথা হাস্যাস্পদ। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের "জাতিবের" যে অতি প্রবীণ ভাবা জানিয়া রাখা আবশ্যক।)

(১৭)

এইবার বিজ্ঞান তরফ হইতে ভারতীয় বিদেশ-ফেরতাদের যোগ্যতা বিচার করা যাউক। যে-সকল ভারতীয় বিদ্বান্ বিদেশে না যাওয়ায় নাই, তাঁহাদিগকে এই বিদেশ-ফেরতা পণ্ডিতেরা বিদ্যায় পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন কি? যাইয়ান লেখকের মতে, পারেন নাই। অবশ্য বিদ্যার মজলিসে বিদেশ-ফেরতাদের ধাক্কা খাওয়া এক আধাআধি।

ভারতীয় জনসাধারণ ও শিক্ষা-সেবকেরা এই প্রশ্নটা কখনো তুলিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু তুলিয়া দেখা দরকার। আমি সম্প্রতি সংক্ষেপে দু'চার কথা বলিয়া রাখিতেছি।

আমাদের ছাত্রেরা আপানে, আমেরিকায়, বিলাতে জার্মানে এবং ফ্রান্সেতে বসবাস করিয়াছে। অর্থাৎ জাপানী, আমেরিকান, ইংরেজ, জর্মান এবং ফরাসী জাতির মুখরোচক ভারতীয় বিদ্যার্থীরা পশ্চাদ্‌বর্তী নয়, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে, মোটা অঙ্কের টাকা যোগাইয়া একমাত্র দম্ভ যে সেরা ছাত্রই বিদেশে পাঠানো হয় নাই। উচ্চ, মধ্যম, অধম অর্থাৎ সকল স্তরের মাঝা-আলা ছাত্রেরাই ভারতীয় বিদেশে গিয়াছে। আর বিদেশী মাল-কাটতি উন্নয়নের আশায় ভারতীয় উন্নয়ন ঘরে পাইয়াছে, মধ্যমের মধ্যে উচ্চ গিয়াছে ভারতীয় মধ্যমরা, ইত্যাদি—ইত্যাদি। সুতরাং আমরা যে সুতরাং দুনিয়ার যে-কোনো জাতের সমকক্ষ তাহা বুঝিতে বিদেশীর আর বাকী নাই।

ইহার দ্বারা বুঝা গেল কি? এই যে,—যে-সকল ভারত-সন্তান কোনোদিন বিদেশে যাইয়া বিদেশী-বিদেশিনীদের সঙ্গে উচ্চ বিদ্যার সুযোগ পায় নাই, তাহারাও প্রকারান্তরে বিদ্যাবত্তার কর্মক্ষেত্রে কোনো হিসাবে পশ্চাদ্‌পদ নয়। আর যে-কোনো ভারত-সন্তানের 'মাথা', যে-কোনো বিষয়ানীর মাথার সমান,—অধম উচ্চ, মধ্যম, অধম ইত্যাদি শ্রেণী-বিভাগ মনে রাখিতে হইবে।

কিন্তু ইহার দ্বারা এইরূপ প্রমাণিত হয় কি যে,—বিদেশ-ফেরতা ছাত্রেরা স্বদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের চেয়ে উঁচু? কখনই নয়। বিদেশ-ফেরতারা সুবর-ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ বিদেশে থাকিবার সময় যথেষ্টের ইজ্জৎ বাড়াইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র তাহার

দোষে যুবক-ভারতের অন্যান্য দোষ হইতে যাঁহারা উহাকে আলাদা করিয়া লইয়াছেন এমন বলা চলিবে না। যাঁহারা দ্বার বিদেশে বিদেশে বিদ্যা বিদেশ হইতে কিনিয়া লইয়া বিকিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

(৯৮)

আমার দ্বিতীয়বার "কী" বা কথাটা বলা বোধ হয় ভুল। প্রথমতঃ, আমরা যাহাকে বিদ্যা বলি তাহার অধিকাংশই বেদবৎ। আসল মানুষের যা কাজ বিদ্যা বিদ্যার মুহূর্তে তেমন নয়।

দ্বিতীয়তঃ,—বিদ্যার সংখ্যা অগণিত। আর প্রত্যেক বিদ্যারই পাড়া-প্রতিবেশী অনেক। এইজন্য ভিতর কোন্‌টায় কতখানি যেদবৎ ভাগে আর কোন্‌টায় জ্ঞান-খানি মানব ভাগে, তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে গভীর-প্রসার বিদ্যার কথা বলা চাই। বলা বাহুল্য, সেই কথা, এই লেখকের কেন?—কোনো ব্যক্তিবিশেষেরই নাই। তবে যে-যে বিষয়ে কোনো জ্ঞান নাই তাহার কোনো কোনোটা সম্বন্ধে অন্যান্যের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি।

এমন অনেকগুলা বিদ্যা ও বিদ্যার পাড়া-প্রতিবেশী আছে, যে সম্বন্ধে তাহাদের উচ্চ শিক্ষার বা এমন কি সাধারণ শিক্ষারই আয়োজন নাই। এইজন্য যে-সকল ভারতীয় বিদেশ-ফেরতারা বিদেশে থাকিবার সময় শিখিয়া নিয়াছেন সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা অন্যান্য ভারত-সন্তানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ,—বলাই বাহুল্য। ব্যতিক্রম থাকেই থাকে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন বর্তমান ক্ষেত্রে অন্যত্র। যে-যে বিদ্যা বা বিদ্যার পাড়া ভারতে শিখা সম্ভব সেই সকল বিষয়ে বিদেশ-ফেরতারা অন্যান্য ভারতীয় বিদ্যার্থীদের ছাপাইতে সমর্থ হইয়াছেন কি? এই সম্বন্ধেই প্রথমে বলিয়া রাখিয়াছি,—হন নাই।

গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জীব-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প-শাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভারতীয় বিদ্যার্থীরা আজকাল গবেষণা করিতেছেন, প্রবন্ধ রচিতেছেন, বই লিখিতেছেন। এই সকল গবেষণা, অনুসন্ধান, "থিসিস্" এবং ছাপাছাপি করিতে বিদেশ-ফেরতারা অন্যান্যদের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর লোক নয়। হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,—বয়সে বসিয়াই ভারতীয় বিদ্যার্থীরা যেমন বিদেশে যাহা কিছু ছাপিয়াছেন তাহার তুলনায় বিদেশী "ডিগ্রীওয়ালা"দের তারতম্য অল্প-কিছু নয়। বিদেশ-ফেরতা ছাত্রদিগকে আমার করিয়া রাখিতে থাকিলে যুবক-ভারত নিশ্চয়ে বেশুন সন্তোষ করিয়া ছাড়িবে মাত্র। থাকিবেকগুলার কথা বলিতেছি না।

(৯৯)

তবে কি বিদেশে লেখাপড়া শিখিবার কোনো দরকার নাই?—খুবই আছে। নতুন নতুন বিদ্যা এবং বিদ্যার পাড়া-প্রতিবেশী শিখিতে হইলে বিদেশে আসিতেই হইবে। তাহা ছাড়া যে সকল বিদ্যা ভারতেই শিখা সম্ভব সেই বিষয়েও অনেক "নতুন কিছু" বিদেশে আছে, তাহার জন্যও "যাওয়া দরকার" বিদেশে আসা আবশ্যক।

"যাওয়া-যাওয়া" অধ্যাপক বিদেশের নানা সহরে আছেন অনেক। "যাওয়া-যাওয়া" তাহাকে বলে? তাঁহারা প্রত্যেক বছর, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, দু', তেরো' জনকে তফাতে একসঙ্গে তিন তিন বিষয়ে "থিসিস্", অনুসন্ধান, গবেষণা, আবিষ্কার ইত্যাদির কাজে যোগাড়ের রাখিতে সমর্থ। এত তিন তিন বিষয়ে যাওয়া যেমনতো যে-সে লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। লড়াইয়ের মাঠে বড় বড় সেনাপতি বা নৌ-বাহিনীর যে শক্তির বিদ্যার লাইনে "যাওয়া-যাওয়া"দের সেই শক্তির,—শক্তিটা ঐরকমই বুঝিতে হইবে।

আর এক কথা, "যাওয়া-যাওয়া"রা সপ্তাহে সপ্তাহে এবং মাসে মাসে নতুন নতুন অনুসন্ধান চালাইতে চালাইতে পাকিয়া উঠিয়াছেন। প্রত্যেক সপ্তাহের এবং প্রত্যেক মাসের কাজ ও হিসাবনা লইয়া অন্যান্য অনেক পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ চালানো তাঁহাদের জীবনের আসল অভিজ্ঞতা। যোগা মাঠের সমালোচনা হয়ত করিয়া করিয়া, প্রতিপক্ষীয়কে পাঁচ-ঘা লাগাইয়া এবং

প্রতিদ্বন্দ্বীর তাক হইতে নামে খুলা পাইয়া তাঁহারা বন্ধুর হইয়াছেন।

এই বছরের "বাবা-বাবা" পতির তারতে করজন আছেন? তাঁদিকে খুব করিলেই দেখিব যে, যুবক-তারতকে বিদ্যার দাইরে পাঠাইয়া তুলিতে হইলে একমাত্র তারতীয় বিদ্যাপীঠের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বিদেশী "বাবা-বাবা"দের সঙ্গে যা-হোক-হোপি করিবার সুযোগ পাওয়া যুবক-তারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বাঞ্ছনীয়। কেবল বাঞ্ছনীয় নয়—মোটে আবশ্যক।

তারতে বসিয়া তারত-তন্ত্রীরা "যুঁইফোড়" পতির হইয়াছেন। অধ্যাপকের আসন সাধারণ তারতে জুটে না। কেন না যথার্থ অধ্যাপক-গবেষণা লোক তারতে বিরল। তারা সবের যুবক-তারত অনেক কিছু করিয়া দেখাইয়াছে। "বাবা-বাবা"দের আশ্রয়ে থাকিয়া যদি কেহ বছরের দুই বছরের ভাটাইতে পারিল আরও অনেক কিছু দেখাইবার অধিকারী হইতে পারিবে। তারতে আজকাল যাহারা গুরুগিরি করিতেছেন, তাঁহাদের "বাবা-বাবা"র পরিচয় হইতে একশো পঞ্চাশো বিশ বছর দেরী। পঁয়ত্রিশ পঞ্চাশ বছরের বয়সের পূর্বে কোনো বিদেশী পতির সাধারণতঃ "বাবা-বাবা" বিবেচিত হন না।

তার পর আর এক কথা,—প্রবণালা তৈরারী করিতে সাথে সাথে চাই টাকা। সেই পরিমাণ টাকা বছরের পর বছর স্যাংকশনের করিবার জন্য। বিল্ডিংসাথে, চিকণালা ইত্যাদির সাথে সাথে টাকার আবশ্যক। এই সকল তার-বিজ্ঞানের কর্মকেন্দ্র তারতের বছর বিশ ত্রিশ বছরের চিন্তার ধারা তুলিতে পারিবে কি? সেইরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাইতেছি না। অথচ বিদেশে এই সকল প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি। এইগুলা হইতে সম্পদ সৃষ্টির জন্য যুবক-তারতকে দলে দলে "বিদ্যুদ্বিদ্রে" বাহির হইতে হইবে। বর্তমান যুগের "যুবক তারত" অনেক সময়ে এই দৃষ্টিতেই দেখা দিবে।

(৮০)

দেখিতেছি, দেশাত্মী একথার সঙ্গে বিদেশ-ফেরতদের আদল কোন কারণ নাই। কিন্তু দেশাত্মী একথাটা কোনো যুক্তিযুক্ত কারণের উপর নির্ভর করে কিনা সন্দেহ। যে ব্যক্তি আমদানী এবং রপ্তানীর ব্যবসা করে অথবা বিদেশে হাড়-বরফ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে বাহির হইতে তাহাকে বাধা দেওয়া হয় কঠিন। কোনো প্রকার তর্কশাস্ত্র বা বিজ্ঞান তাহার ধুমুর নয়।

দেশাত্মের আধ্যাত্মিক কারণ যাহাই হউক তাহার বাস্তব কারণ অতি সোজা। যারা আছেন তাই যদি তারা ভোগের মাঝে তারা হইলে তুমি অন্ত হইবে বঞ্চিত। এই "পার্থক্য" ভোগকে অন্যান্য লোক হইতে "বিশেষ" বিশেষত্ব করাইবার পথে ঠেলিয়া তুলিতে পারে। এই বলের বলবত্তা এবং পার্থক্যসূচক বাস বাহাদের গায়ে আছে তাহারা সাধারণ অ-বাসীদিগকে অবজ্ঞা করিবার দিকে অগ্রসর হয়।

দেশাত্মী লোকের দেশাত্ম তাড়িবার পাওয়াই তবে কি? "বিষস্য বিষমৌষধম্।" দেশের ভিতর অনেকগুলা দেশাত্মী লোক সৃষ্টি হয়। ইহাই হইতেছে চরিত্র-চিকিৎসার চরমব্যবস্থা। দীক্ষা-দেশাত্মের বিস্তারসাধন একান্ত বিশ্বপ্রয়োজন। চাই দেশের গণ্য-মান্য, তজন-তজন, পঞ্চ-পত্র ব্যবসায়ী তারতাবিদিষ্ট পার্থক্যহীন নর-নারী। তাহা হইলে বাসীদের আর জোর বাস থাকিবে না।

যতদিন বড় বড় সহরে দু-চার ঘরওয়ালা যারা বিদেশ-ফেরতা "সবে ধন নীলমণি"রূপে "ঘরসংসার করা হয়" বিদেশ করিবেন ততদিন "পার্থক্য", "যাতন্ত্র্য" ইত্যাদি শব্দ থাকিতে যাবে। ততদিন বুঝিয়া না বুঝিয়া আধুনিক বিদেশ-ফেরতার কদর করিবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু যদি প্রত্যেক জিলায় আর মহকুমায় বিদেশ-ফেরতা ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য লোক আস্ আস্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকেরই "মোদর ঈক" হইয়া যাইবে। কেহ কাহারও দিকে তাকাইবে না, তাকাইবার অবসরই পাইবে না। বিদেশ-ফেরতারা যে একটা আস্ত কিছু সে কথাই সমাজ ভুলিয়া যাইবে। চাই এখন হাজার হাজার বিদেশ-প্রবাসী তারতীয় অন্বেষক, পর্যটক, অনুসন্ধানকারী নর-নারী। একমাত্র পাঁচী ছাড়ার কথা বলা হইতেছে না—চাই বহুসংখ্যক সকল বয়সের এবং সকল ব্যবসায় বিদেশ-ফেরতা।

তখনও যদি কোনো বিদেশ-ফেরতা দেশাত্মী থাকিতে চাহেন তবে একমাত্র নিজের স্ত্রাদ্ধ নিজে করাইয়া মরা ছাড়া তাঁহার আর কোনো গতি থাকিবে না।

রমণী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী—কলিকাতা

রমণী বিচিত্র প্রহেলিকা!
আঘাতে সরসে বেদনা
অপূর্ণ অমৃত চেতনা—
পীযূষে-মাখানো অগ্নিশিখা!

রমণী এমনি প্রহেলিকা—
একাধারে ছায়া ও কায়া
দিবস উজ্জ্বল দীপ্তি
তৃষাহরা মৃদু-মরীচিকা।

একই সময়ে চাঁদে ও সিন্ধুতে
অমর বিরহ-বাণী
নয়নে নিয়ত টানি'—
রচিবে যৌবন-কল্পনায়!

নারী সে বিরাট নিরুপায়!
এক চোখে হাসি আসি
অন্য চোখে ঝরে মসি—
সাধে কি বলায়ো সে কি মায়,
যারে ত প্রেমিক তারি ধরা।

বাঁশী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল—কলিকাতা

কর্তার তিন বিয়ে—

প্রথম দু'পক্ষ দুইটি ছেলে রাখিয়া মারা গেছে। গেরস্থালী নিতান্তরূপে কিন্তু বিধবা হইয়া বাঁচিয়া আছে।

দু'জনের কথনো দেখা—তাবও দেখেনি।

সংসারের সংসার—

সংসার বলে, আচ্ছা বহু—তুই যা বল, তোর কেমন-যেন নেই? হাজার হ'ক পড়িয়া ছেলেমানুষ ত!

বাধিয়া ছেলে বহু ঘোৎনা তথা নয়। বলে, তু-তু-তাবলে আমার সামনে অমনি করবে? তু-তু-বলি আমি

হইছি একটু সহীহ ক'রে বিড়ি টানু, তা নয়! তু-তুমিই বল না, এটা ভাল?

তাবি আমার,—ও-বার হইতে শইল জলে। বলিয়া হাসে আর বিড়ি টানে।

বহু বলে, তু-তু-কেমনে বৌমা? ওই তাখো, অমন আম্লা বিয়ে বৌমা বেরুচ্ছে। যা উজ্জ্বল যা—যা তুই বহু—তু-যত—বলিয়া চলিয়া যায়। আমার পা দুইটা আবার ছোট বহু।

শইল বয়সার কাছে বাহির হইয়া আসিয়া মা আমার—

বড় কিরিয়া দাঁড়ায়। চোখ দুইটা তাহার জ্বলিয়া ওঠে। বলে, তু-তু-ভাইকে যাদাযাদ দিয়ে মেরে—তৈরে ত্-ত্-পাজার বেটা পাজা বলছুস্—দুয়ার, পাজা টাক—

পটল হি-হি করিয়া হাসে।

বৌমা বলে, বিশ বছর বয়েস হল এখনও বড় ভাইয়ের সঙ্গে কথা?—দুখে আগুন! সেই ছেলে হ'লে—

ছেলে কেন্তুক—না বৌমা? পটল বলে। বলিয়া লম্বাদের কোলের কাছে শুইয়া পড়িয়া একটা বাঁশী লইয়া বাজায়।

বৌমা একটু হাসিয়া বলে, একটা জামা দিবার নাম নাই পটল! দুইটি করিস্ কেন—ওই অত ত খাস্—বলিয়া তাহার মাথায় টপর হাত বুলায়। আবার বলে, যাই—সেই কোন্ সকালে হাটে-ভাতে করেছিস্, খাবার এনে দিই যে—বলিয়া উঠিয়া যায়।

ভাইয়ের বাঁশী শুনিয়া পাশের ঘর হইতে বড় বলে, ভরতাখার ওই একটা গুণ আছে। বাঁশী বাজালে বাবা-কেষ্টর কথা মনে পড়ে। গানও গায় তেমনি—শুনে কাঁদতে হয়—

চপলা পানি লাগিতে লাগিতে বলে, যাদের গুণ থাকলে হয়—তবে আবার উনারা অর্ধেক থাকলা কেন?

বড় কৌস্ করিয়া ওঠে, বলে, তু-তোর কি? আমার ভাই—আমি ত্-তুকুস্, তুই ওকালতি করিস্ কেন?

তোমার ভাই—আর আমার বেওর নয়?—চপলা বলে।

ক বেওর! বেওরের মরে জানি যাবে। যা—ত্-বেওরকে নিয়েই ঘরে থাকুগে যা?

চপলা বলে,—আপন জনেই হাসে—। তাহার মাথার বড় বড় কৌকড়ান চুল কোলের উপর কাঁপাইয়া পড়ে।

বিড়ির ধোঁয়ার ধমক—ঘরটা ভরে যায়।—

কিন্তু বড়র মনে আরও কি একটা সন্দেহ ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

কলে আর কি?—চপলা বলে,—আমার ছেলে যা হয় হবেক বিয়েরের ঘর?—এই ত? আমারই এখন ভাল করে জ্ঞান হয় নি—তা তুর!

হাত ছিটাইয়া বড় বলে, করি খুশি—বলিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিয়া যায়। আপন মনে বক্-বক্ করে। হাত দিয়া জিব কামড়ায়।

পটল খোলা দরজা হইতে আসিয়া চপলার মাথার খোঁপা নাড়িয়া দিয়া বলে, করি খুশি তুর বাপে?

কিন্তু করিয়া চপলা হাসিয়া ফেলে। বলে, তোমার এত মাথা—বড় আমার সঙ্গে কথা কইবে? কি আবার তুমি বাদ্?

মাথায়-ঝাঁটা চুলগুলি হাত দিয়া গোছাত করিয়া পটল বলে, কথা কইতে বারণ করেছে—কে?

চপলা এদিক ওদিক চায়। তার পর পটলের কানের কাছে মুখ আনিয়া বলে, আমার বর।

তবে কথা ক'য়ো না—বলিয়া পটল চলিয়া যায়।

আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলে, কইবে না ত?

চপলা বেড়ার দিকে মুখ ফিরায়। পটল হাসিতে হাসিতে কাছে সরিয়া আসে। বশ্ করিয়া চপলার মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিয়া বলে, কালা বাদি?—শুনতে পাও না?

যাও—বলিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া চপলা দুম্-দুম্ করিয়া চলিয়া যায়।

ভাইকে বলিয়া পটল বলে, বাহুটা যে রেঁধেছে!

কেন রে?—বৌমা বলে।

ভাই হয় নি—জমে পুড়ে খেছে—

বৌমা বলে, তোর বৌদি রেঁধেছে—

পটল আড় চোখে বৌদির দিকে চেয়ে বলে, আর একটু নুন দিলেই খারাপ হয়ে যেত—বলিয়া হাসে।

চপলা হাসিয়া ফেলিয়া বলে, যেখানে যা?—কুন্ দিকে কয়া ভাই—

আমি কি জানু, তোমার মনের কথা—বলিয়া বৌমা চলিয়া যায়।

পটল বলে, ছাই চালা—না হয় না খাস্—

দুধারে দাঁড়াইয়া বন্ধুর পা জোড়া ঘষিয়া ওঠে। ঠেলাইয়া বলে, ভ্-ভ্-ভবে খাস্ কেন? উ-উঠে যা'না—

পটল মুখ তুলিয়া যাদবকে দেখে। তার পর হাসিয়া বলে, যাদা না আমা—

ভ্-ভ্-তুই আসা। ভ্-ভ্-তোর ইয়ে আসা—বলিতে বলিতে বন্ধু লাল হইয়া উঠিয়া পুনরায় বলে, দু-দু-দুজনে আড়ালে বসে যেন যাচ্ছেতাই হচ্ছে—একটু লজ্জা নেই?

চপলা চোখ পাকাইয়া বলে, লজ্জা আছে কতখানি?

মুখ ফেরাইয়া বন্ধু বলে, দু-দু-দা আইকে লজ্জা করিস্ নি, এইবার থেকে আমার লজ্জা করিস্—আমিই তোর বেওয়া—

যাওয়া শেষ করিয়া পটল হাত হাতিতে হাতিতে উঠিয়া যায়। বন্ধু আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলে, তোমরা যেন ওস্তা—যেমনে হয় করে। দু-দু—কোন্‌দিন আমায় খুন্তি মেরেই বসে—

চপলা হাসিয়া বলে, তাহলে-তোর যেন কাঁপা কাঁপা চুলটি! গায়ের ঘাটিও—

বন্ধু বলে, ও-ও-তার সব ভাল, আমার সব খারাপ—এই ত! কি করবে, আমার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়েছে তখন—

মুখ ঘাড়টা দিয়ে চপলা বলে, চুপ কর বাপু, সব-সব কথা না, যা সব তাই বলা—আজে এখুনি চলে যাস্‌নে—

বন্ধু চুপ করিয়া যাইতে যায়। চপলাকে সে একটু ভয়ই করে। চপলা বলে, আর দুটী ভাত খেয়ো? পেট ভরে না খেয়ে ত তোমরা দিনকে-দিন কালি হয়ে যাচ্ছ—

বন্ধুর মুখের ভাব মুহূর্তে পাল্টে যায়—বী করিয়া হাত মুখের দিকে চায়। তার পর হাসিয়া বলে, আমার খুব ভালবাসিস্ না যে চপ্‌দি?

বেওয়ের সঙ্গে এতখানি মাখামাখি যৌয়ারও ভাল লাগিল না। একদিন বলিল, ও-কি দিনরাত তোরই বসে থাকবে?—কাজ-কর্ম কিছু কি করতে পারে না?

কাজ দিলে সব করতে—বন্ধু বলিল।

দেখা পাচ্ছও ত' মোটার ওপর—

বন্ধু বলিল, কিছু হবে না যৌয়া, কিছু হবে না—ওই ত' সেদিন ফুলের মোটার চালান দিবার কিছু আগে পরনা মোহরার কর্তে গিয়ে তখনি থেকে হুঁচোট দিয়ে ইয়ার-বক্সিদের বাইরে এল'—

যৌয়া বলিল, তা বলে ত আর বসে থাকতে পারে না—

বন্ধু বলিল, বসে থাকতে হবে না, আজই আমি একখানা ফার্স্টক্লাস এনে দি,' সেইখানা পরুক আর বাজারের পরনা থেকে চুরি করে মিটি যাক। চলিলটা ভক্তা বৈ ত নয়, যা'হক করে খেটে যাবেই—

আড়ালে দাঁড়াইয়া পটল সব শুনিতেছিল।

যাদা তুমি বন্ধুর অবধি পড়েছিলে?

তাতে ভ্-ভ্-তোর কি দু—দরকার—তোর কি ই—দরকার? বলিয়া বন্ধু হাইবার উপক্রম করিতেই পটল গলা জড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, বলতেই হবে—

চপলাও আড়ালে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। হঠাৎ তাহার দিকে নজর পড়িতেই বন্ধু বলিল, দ্বিতীয় ভাগ! বুঝলি? সব শেষ হয়ে গেছল' তোর যখন নয়! চ-চপলা মানে বিদ্যা-ইস্—বলিতে বলিতে হঠাৎ পঞ্চমের কাপড় খানার আলালাম অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সে বন্ধু হন্ হন্ করিয়া বরজার বাহির হইয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে পুনরায় আসিয়া বলিল, যৌয়া শুনছ? কি?

ওর এখন আর কর্ম করে দরকার নেই—

মুখ তুলিয়া যৌয়া বলিল, কেন রে?

খাচ্ছে না—বেশ ও আছে। ছেলে মানুষ! কাজে লাগলেই ত সংসারী হয়ে যেত—

যা' বুঝিস্ কর্—বলিয়া যৌয়া ফিরিয়া বসিল।

সেই ভাল! ও এখন বেশ মেয়ে খেলাক—বলিয়া নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই পটল আসিয়া বলিল, দাদা?

হাতে বাড়াইয়া বঁধু হাসিয়া বলিল, আয় ভিতরে আয় ভিতরে আয়!

পটল আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না দাদা—মাপ কর—

দাদা আনন্দে একেবারে বিগলিত হইয়া গেল এবং হঠাৎ উঠিয়া বলিয়া তোর বৌদি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথাটিই বলিয়া ফেলিল, তুই একটা হারমোনিয়ম কেনেছিলি না রে? কালই এনে দেখা—

চপলা মুচকি হাসিয়া বলিল, আমার একটা কথা এনে দিও, ঠাকুর-পো'র পায়ের মতে ভাল দেখে—

দ্বিতলের দালান। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে।

জানলার ধারে বসিয়া পটল বাঁশী বাজাইতেছিল।

ঘরের মধ্যের তক্তপোষের উপর দু-চারিটা তোবড়ান পোষা বেদা বিরাজ করে।

কতক্ষণ পরে হঠাৎ পিছন হইতে চপলা বলিল, নিরুপায় কথা কি ভাল ঠাকুর-পো?

বাঁশী থামাইয়া পটল বলিল, কি?

গান বাজনা আর—

অসমাপ্ত কথাটা পটল বলিয়া দিল, আর বৌদির সঙ্গ—বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

তবে তুই তুমি—বলিয়া চপলা কাছে বসিয়া পড়িয়া পুনরায় কহিল, আজ এখনও বাড়ী আসা হয়নি—

আজ ছুটীটা মাটে যুদি?—বাদ তুমবে? পটল বলিল। বড় বড় চৌকড়ানো চুলগুলি তাহার মুখের উপর বাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া চপলা বলিল, আচ্ছা, তোমার দাদা বড় এক-গুঁয়ে—না?

পটল একটু হাসিল, বলিল, ও রকম তোর কি আর হবে বৌদি? আমি ত'—আমাদের কি ঘরে ফের ফিরে আসুন করেছে। ছোট-খাটো তোর মনে থাকে আমার ভাল লাগে। বল না বৌদি—দাদা ফিরে আসার আর কেউ নেই!—বলিয়া একটু চুপ করিল। পুনরায় কহিল, ওদের আমি—ও সব ছাড়তে পারে কিন্তু আমার ছাড়তে পারে না—

চপলা হাসিয়া বলিল, ছাড়তে পারে?

পটল আমাসা করিয়া বলিয়া ফেলিল, ছাড়তে না পারেও আমায় দিয়ে দিতে পারে—

মুখ টিপিয়া চপলা বলিল, তুমি নিয়ে কি করবে?

তাও জানিনি, তোমার কেবল এই কথা—বলিয়া পটল উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই চপলা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, যাদু—যাদুর আর লজ্জা করতে হবে না। পুরুষ ত নয়—মেয়ের মত! আচ্ছা ঠাকুর-পো, তোমার দাদা যখন কালির মতন হয়ে থাকে কেন বলতে পার?

জানি বোধ হয় বৌদি?—পটল বলিল।

নয়ই ত, তোমার দাদা হলে মরেই যেত না। ঐ চেয়ে তোমার দেখতে ভাল—বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে চপলা উঠিয়া পলাইল।

যখন তখন চপলা বলে, তোমার চোখ দুটি আমি চুমো দিই—

তোমার চেয়ে—পটল বলে,—কখনই না। কেবল টানা-টানা—বলিয়া অকারণেই দু'জনে হাসে। সে হাসি আর থামিতে চায় না। বন্ধুর বলার সাড়া পাইলেই চাপা হাসির শব্দ বেশী করিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

আবার এক সময় পটল বিদায় করিয়া বলে, আমি ফিরে যাচ্ছি, জান বৌদি?

বৌদি বলে, আঃ—আমি বাঁচি তা হলে—

কেন?

চপলা হাসিয়া লুটিয়া পড়ায়।

একদিন বন্ধুর নজরে পড়িয়া গেল। চীৎকার করিয়া সে বৌদিকে ডাকিয়া বলিল, আমার আর ঐ দু-দু-বাড়ী খাওয়া হল না বৌদি। চ-চ-চলনুম, ভ-ভ-তোমরা থাকো—

কেন কি হয়েছে?—বৌদি বলিল।

ঘু-ঘু-পাল টিপলে—ঘু-ঘু-ছড়িয়ে যেতনুম। দুর করে যাও আমি ভু-ভু-ভাইকে। ঘু-ঘু-মুখ দেখবে চাইনি। বে-রে-বেরিয়ে যাও—

তারপর পটলকে ডাকিয়া বলিল, যাও—তু-তুমি আর এখানে দু-দু-থাকতে পাবে না। তোমার মু-মু-মুখ দেখব না। আলাদা হয়ে যাও—

কেন কি করেছি ?—পটল বলিল।

তু-তু-তা জানিনি।—দুরার, দু-দাদা-রে-রে-বেরিয়ে যাও ! দুর হ' সামনে থেকে—

পটল ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

সবাই অবিশ্বাস্য ব্যাপার !

পরদিনই লোক লাগাইয়া বড় বাড়ীর মাঝামাঝি বেড়া তুলিয়া দিল।

বৌমা বলিল, এবার মান কর যাও—

তু-তু-তুমি বেরো যাদুর এসব কথায় যেকো না বৌমা—

বৌমা চুপ করিয়া চলিয়া গেল। আহার মুখে সেদিন ভাত উঠিল না।

কি জানি কেন, চপলা সারারাত ঘুমাইতে পারিল।

রাত্রে বসু বলিল, পারে ওরে মান চা'ক—ওরে হারু—

তার মান গেছে—চপলা বলিল, তোমার মান যাবে না—

বসু বলিল, তু-তু-তোর অত মাথা-ব্যথা কেন ? ও-আ-আমি ফিরে আসার পরে থেকে বসুর—তু-তু-তোর কি ? আমার ভাই আমি বুঝব—

হাই বুঝবে—ভাইকে চিনতে পারে এমন কেউ না—

একটু থামিয়া আবার বলিল, বেড়ার মাঝখানে একটা দরজা খুলিয়ে দেওয়া হ'ক।

বসু কটমট করিয়া চাহিল। চপলা চলিয়া গেল।

আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাকে বিয়েই হত না—আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। ঘি-ঘি, লোকে মনে করে কি ? তোমার আলায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে—

ঘু-ঘু-মুখ দেখে আর কথা কয়নি ! সাধু সাজা হচ্ছে—বলিয়া ঝেমনি করিয়া বেড়াইবে বেড়াইবে বড় চলিয়া গেল।

ঘর মো'ট সব শুদ্ধ—তোমার কিছু নাই।

কাপিলে কয়েকগুলা পয়সা বাকী করিয়াছে—ভিক্ষুকে তাহাদের ডাকে আর আলাপালা হইয়া যায়।

ছাদের কোণ পাঁচিলে বসিয়া একটা ঘুঘু ডাকে। উদাস করুণ—কত তার—কের সুদূর গভীর, কোন আহ্বান !

ঘির আর ভাতে না—কাজ বৈরাগ কি মানুষ বাঁচে ?

ডাল-তরী-তাল বাঁধিবে হাত পুড়িয়া যায়। ভ্রুক্ষেপই নাই।

বেড়ার বাকা দিয়া দেখে—পড় কি না। দেখিয়া একটু হাসে, ভাবে, একটা হাতের ধাক্কাও সইতে পারবে না—

চপলা উৎকর্ণ হইয়া তাহার কথা শোনে।

পটল গুমাইয়া গুমাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলে, বাবা না মামা—

কিন্তু কেহই তার কথার উত্তর দেয় না। পাখাদের ঘুমে তার নিষ্ফল উক্তি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

আলোক তাহার বিপুল আবেগের সম্ভার চোখের সুমুখে আনিয়া ধরে—অন্ধকার আসিয়া আবার সে বিরাট জীবনের শূন্যতা ভরা করিয়া দেয়। রহস্য-পুরীর দুয়ারে মানুষের মর্ম প্রশ্নেই নিরন্তর মাথা কুটিয়া মরে।

বাসনার দুর্গম বন্ধা—আর কিসের বিরাট ও দুর দুর করিয়া দুর্দিন মানবাত্মার অভিসার ?—সমাজ সংসারের বাধাই ত সে অভিসারের পথ কণ্টকিত করে।

.....পটলের চোখে জল আসে।

.....অন্ধকার রাতে হঠাৎ বসু উঠিয়া বসিল।

ঘোমটার মুখের উপর বাঁশীর কীণ সুর তখনও ঘরে নাই। অন্তর্যামীর ন্যায়, জীবনের অধ্যায়িক খেলাই যেন সে বাঁশীর সম্বল। বাঁশী ও এমনি করিয়াই চিরদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কেউ তাকে চিনিতে পারিয়াছে কি?

বধূ উঠিয়া বাহিরে আসিল। একটু দাঁড়াইল, তারপর আপনার মনের পরিচয়টুকু দিয়া সে কলি ও বন্ধুমার বেড়াটাকে সোজাইয়া দিয়া এঘরে আসিয়া দেখিল, ঘরামার পটল নাই।

দুয়ের উপর উঠিয়া দিয়া দেখিল, পাশিমের ঘরে বসিয়া পটল বাঁশীতে সুর দিতেছে।

নিকটে দাঁড়াইয়া সে বলিল, আজ খাওয়া হয়েছিল, পটল?

পশ্চিমে সূর্য আকাশে তখন রাঙটুকু বুলিয়া গেছে।

পটল সুর থিরাইল। তারপর চোখের জল মুছিয়া বলিল, জল হয়েছে—

বধূ আবার মাথার উপর আর একটা ঘাড়িয়া বলিল, আমার ওপর রাগ হয়েছে বুঝি? চল্ নীচে যাই, এত ঠাণ্ডায় বসে থাকে না—

পটল কোনও কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বধূ পুনরায় বলিল, রাগের মাথায় জ্ঞান থাকে না, বা'ত্য' বলে ফেলি। আমার কথাও আমার লোকে ধরে?—যে যে চলি বুঝি?

চপলা আড়াল হইতে বাহির হইয়া বলিল, এখন পালালি না ভাজাই বল?

ও-ও-দুই যেয়ো—দু-দুর ব'। ব-বর মাঝে ব-যোগ দুই—

এ—দুর ব'! যোগের নামে যবনাথ দিলে সুর সোজা হয়। এস, পায়ে ঠাণ্ডুরপো আমার ফেরত যেও—এই ত?

পটল সরিয়া আসিয়া চপলার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, বৌদি আমার রাগ কর নি—

চপলা আবার দুখানি হাত ধরে তুলিয়া ধরিল, তারপর তাহার চিবুকে হাত ঠেকাইয়া দুটি আঙুল চুম্বন করিয়া বলিল, যাকে ভালবাসি তাকে আবার রাগ করব কি?—দুই, ছেলে মেয়েমানুষ!

হঠাৎ বধূ সচিত দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিল। তারপর বলিল, রাগ করিস্ পটলা—আমারই ভুল হয়েছিল ভাই—

সেদিন দুধের সোলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পটল বলিল, বৌদি ভেবেছে! আমার বিয়ে হবে! যাবা মেয়ে ঠিক করেছে—

চপলা হাসিয়া বলিল, আয় ঠাকুরপো—আমার খোকন বরে আয় চানবে না ত?

লজ্জায় পটল মুখ রাঙা করিয়া বলিল, যাও—যোমার কেবলই ইয়ে—বলিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বধূ তখন আনন্দায় দরোজায় ঝিক্-ঝিক্ করিয়া হাসিতেছে।

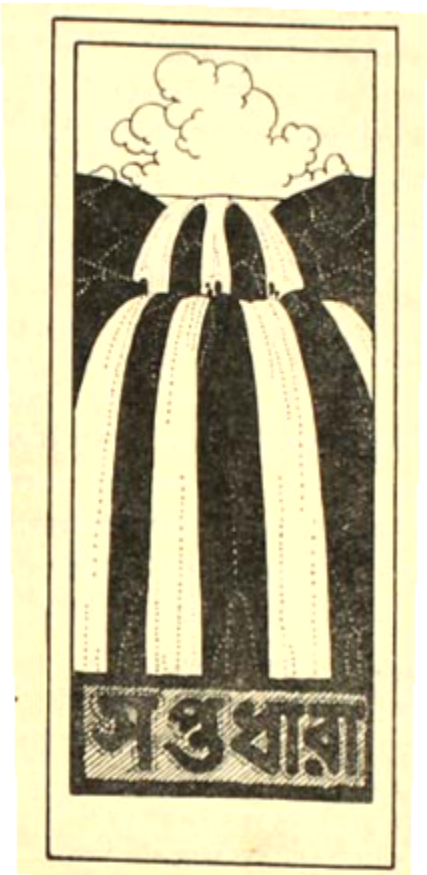

রহস্যরাস

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার—লায়োর

দোহরা

যাদ আনে যত, যাদ পয় ভাঁহৈ ক্রিপা অপার।
আপ হাত যৈ মাথ মুরি, বন্দ করু বচন বিচার।

চৌপাই

যৈসে অবধপতি শ্রিরাম ভয়াউ। তিনহ বিসন করযুঁ মাহি বিশাউ।
আন হৃদে পহিচান ন তিনসো। বিষয়াদী মোহী পদ ঈস সো।
যহাঁতাস রহস্যহি হুমারো। যহা লোধ যৈ বিস্তর থারো।
আপনা আন করো রহস্যহি। মাহি ধরে কী লাজ বিচার।

আপনা আন মুঁহি প্রতি পরী জৈ। চুন চুন সব হুমারে মী জৈ।
যেন যেন জগদীস মোহি রাখে। তাস আপ মুহি ঘটহ ন ভাখে।

ভাবানুবাদ

দুই পংক্তির পয়ার

সব কারিকর সবের প্রতি আমার প্রণাম জানাই।
আপনি কিছু হয় নিজে আমার ভাল করে, যেন মন, কথা, আর হাত দোষের ঘটে।

গদ্যপদ্য

আমি অবশ্যই অনেক পুরো করিয়ে। তুল বিচুতে অনেক হাল করিয়ে। যদিও পুরিয়েছি, কিন্তু এখানের কারুর পরিচয় নাই। আমার এবং ও যেমন এই সমান।
আমাদের আমার ভুবন। আমার যেমনি:। আমি নিজের পরমাত্মীয়।
আপনার কারিকর আমার ভাল করে। যে যেমনি হয় পরিচয়ে মহা। সকল জানে।
আপনার কারিকর আমাকে অভিপ্রায়ন কর। যাহিরা কারিকর আমার পক্ষ বিশাস কর।
ভগবান যেমনে। অভিপ্রায়ন ও সমান দুই জন। যুদি আমাকে ভাল, আমার যেন সকল করিতে পারিবে না।
তুল হয় কারু সহা প্রতিপালা। তুল সাহিব যৈ যান জিহাজ।
আন আপনা মুঁহি নিবাহ। আপ করো হুমরো লজ রাখে।
তুল যো সব জাগরনকে রাজা। আগে আপ ঘরীব নিবাজা।
যাদ আন কর ক্রিপা করহ মুহি। হার পায় যৈ আন যাহ-মোহি।
আপনা আন করো প্রতিপালা। তুল সাহিব যৈ কিংকর বালা।
যাদ আন যৈ হাথ উঘারো। হুমারে সব যৈসীজন লাগারো।
শ্রিরাম করো অবধপুর যো বিমানো। বহু করো কবিতা বিষ বানা।
ক্রিপন জানা যবি রহিম উচারো। তুল যোই তবি সেহ হুমারো।

ভাবানুবাদ

তুমি আমার সকল প্রিয়তমা হও। তুমি বন্ধু, আমি তোমার দাস।
যে প্রভু আমাকে আনন্দ দানে। আমিই আমার সব আশা তার।
তুমি সকল আনন্দ হরণ। আমিই বন্ধু পরিহরা অভিশপ্তজন।
এস আমিনা আমার। আমি তুমি হও। হারিয়া নিজ যৌবন যদি আমিনা পরিহরি।
আমার আমিনা আমাকে প্রিয়তমা হও। তুমি বন্ধু, আমি তোমার কিঙ্কর।
এস আমিনা যাই ফিরে ইয়েমেন দেশ। আমরা সব ইয়েমিনিজন আমার ঘর।
প্রভুর অন্তরালে আছে আমিনার। যারা সব তাদেরি নিন্দায় নিন্দিলাম।
যেমন বৃষ্টি কৃষ্ণ মেঘের উৎপাত করিলাম। তুমি যারা হইয়াছ আমি তার করিয়া প্রাণে।

তবুও যাই। দোহরা।

তো বিনু প্রভু তো সো কহ, সো করি তো অনুযায়ি।
তো বিনু প্রভুকো বিশ্বাই ঐ আর তুমর তো আহি।
যদি যদি তন দুই এক হৈ বিন বিশ্বায় বহু আহি।
তুমরে উপর তারণ কিউ তুমহি বিনে নহাহি।
আর আইস প্রভু তো তরো তুমর দয়া তব আই।
আর যৈ কথা সংসারসরে সহজু কহিব তুমারী।

তবি যাই।

আঁচ তরো যৈ তোর তব তুমর তুমা বিন ছাই।
পলক ছাড়ে তব তুমহ যৈ তুম তুম কহা সহাই।

ভাবানুবাদ

কবির উক্তি। বিনতী।

আরে আমার বন্ধু আমার কহিলাম, তবে তুমারে ছাড়ে রহিলাম।
ঈশান সেই বন্ধুর আর কহিবে ঈশানে অন্তরে আর আছিলাম।
বহিও যদি তব দুই এক, তিন ছাড়া কিছু নয়।
তুমারে বিনা তারণ যে তারণ আমার আরো বিনিময় নয়।
তব বন্ধুর আছাড়ে হইব তুমা তুমারে তার হইব।
এসব আমি আছাড়ন এই কথা তুমারে কহিয়া তুমাইয়েছি।

কবির উক্তি

আমি তোর তরে বন্ধুর বন্ধুর তুমারে হইলাম, বন্ধুর আমার কহিয়া বিনয় করিলাম।
তুমারে তুমি তুমারে নিশ্চিত পাবে, তুমা তুমি আমারে কর।

দোহরা

তে তে তুমরে বিশ্বাস তো বিন ঐঁ বিশ্বাই নহ।
তুমা হইয়েছ তুমরাতুল পাবিয়ে তুমরহ।
তুমারে পুরুষ তো যেহ যেহ তোমার বিনয় মহেন।
তোমি ঈশ্বর তুমরা বিনে তবি যদি তোমি তুমেন।
তার কথা তুম তুম আমি লক্ষ্মেরা তাপনার যেহ।
তুমরা যাদ বন্ধুর তুমা সবারী পুরী সন্দেহ।

চৌপাই

তো ঈহ তুমা তুমিন তুম পাবে। তুম পাপ বিনু বিনষ্ট না পাবে।
বিনয় তুমতি তীব্র তুম তোমি। আদি বিশ্বাদি ঈহ সংসার তোমি।
সবরত সতরহু লক্ষণ পাবে। হাড় বৃদ্ধী প্রিয়ে তুম যাবে।
তব প্রণাম তব প্রভু তুমারা। তুম পরী সব নেহ তুমারা।

ভাবানুবাদ

যে যে বন্ধু বিনা বিনয় তাঁহার তোমার যাদ আসে।
পাঁয়ে আছে বৃদ্ধি তুম পরিহরে ও তুমরাতুল পরিহরে।
তুমার পুরুষ পরমেশ্বরের নেহ তোমি তোমি বিনু ও আসে যাওয়ে।
তোমি ঈহ ও তুমা তুম বৃদ্ধি পরী তোমি তুমে।
তুমরে তুমা তুমে তুম তুম আমি, তুমরে বিনয় বর্ণিয়েছে।
তুমুলাই যাদের তুমা সবারী তুমরে পর্যন্ত তুমিয়েছিলেন।

চতুষ্পদী

যে এই তুমা তুমে তুম যায়। তুমে ও তুম তুমরে বিনয়ে পরিহরে।
বিনু-তুমিন এই তুম হয়। আদি আদি তুমারে পর্ব তুমিয়ে পরিহরে।
বিনয়ে পুমরা তুমরে। তুমরা যাদের তুমরাতুমের তুমরা তুমারী বিনিময়।
তোমরা বৃদ্ধির তুম পরিহারিয়ে তুমিলাম। তুম হইয়ে তুমরে তুম তুমিয়ে তুম।

দোহরা

তোর তুমরাতে চরণ তব নয়নের, তীর তারণ।
ঐরূপরূপ পুরুষ বিনো বন্ধুর তুমা প্রণাম।
যাদ তুমার আমিতে নাহি যারে তুমার বিনয়।
তুম নয়ন পুরুষ তীব্র তুমরূপ বিনা প্রণয়ে।

যাই সবে বলকের তুমরে ওতরে কোট খাঁর তরে নহী আনয়ো।
রায় বরীস পুরাণ তুরাণ অনেক করে যব হাম এক ন মানো।
লিখ্ত সাসত্র বেদ সবৈ যহ ভেদ করে হম এক ন জানো।
শ্রী অনিলাম জিপা তুমরী কর ভৈন অহিট দত তোহি বখানয়ো।
লাল তুমার মো হাড়ি কৈ পহিট তুমারো তুমার।
বাহি সবে কী লাজ অব গোবিন্দ দাস তুমার।

মোহাত্ত পর্যন্তের পাদপদ্মে পত্র খানি সমর্পিত।
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ভাষা-গ্রন্থ অন্য তথা সম্পূর্ণ হইল।
প্রভু অন্যত্র আমি যে, তোমার সঙ্গ বিচ্ছেদ কিছু পাই নাই।
তথাপিও তুমার অন্তর পাইয়া মনের ভ্রম সম্পূর্ণ গিয়াছে।

যে অবধি তোমার দেখা পাইয়াছি, তখন হইতে আমারও চিত্ত সদা তোমাতে।
হয়, ঈশ্বর, পুরুষ, তোমার আমার মত আমার, একটিও আছিল।
তুমি পত্র লেখ নাই, যে তোমার কথা আমি, আমি একটিও লিখিলে।
যে অভিলাষি। তোমার আমার ভ্রম, আমি কিছু ভিন্ন নহি, তুমি আমার অধিক।
সকল তুমার মাঝিয়া তোমার তুমার পাইয়াছি।
যে আর অধিকার আমার নাম তুমি হয়, আমি সেখিব তোমার নাম।

আমার মাঝারে আনন্দ রহিল, আমি সন্ধান পাইয়াছি।
সংসার মাঝেই পাইয়াছি, যব আনন্দে প্রভুর হইয়াছি।
রাম রস বাণীর অমিয়া। পরিব পথ (তথায় তথায় তার) পাইয়ে অনিয়ার।
হরিজন সঙ্গে—যিনি সকলে ভিন্ন। অনিয়ার।
সকল আসে, আনন্দ হইল আমি সন্ধান পাইয়াছি।

এ মন মোরিয়া তুঁ সব রহ হরিনামে।
হরিনাম রহ তুঁ মন মেরে সুখ সতি বিশ্রাম।
আশীকার তুহ করে তেরা কারজ সতি সবহিনা।
সকলা ধনা সহজ সুখাবী সো কিউ মনহরি নামে।
কহৈ নানক মন মেরে সদা রহ হরিনামে।
নাহে সাহিবা কিআ বাহী যহ তেরে।
যহ ত তেরৈ সতি কিছু হৈ কিছু নেহ তু পাস্ত।
সদা সিকত সলাহ তেরী নাম মন ধ্যাস্ত।
নাম জিনৈকে মন বসিআ সাচে সবদ মনেরে।
কহৈ নানক সচে সাহিবে কিআ বাহী যহ তেরে।

এহ আমার মন তুই দর্শন হরির সঙ্গ রহ্।
হরির নরির সঙ্গ রহ আমার মন, যিনি সর্বান্তরযামী।
যিনি অন্তীকার করিল তোর সকল তথা যিনি সাক্ষাৎকার।
যাহী সকল আশা সম্পূর্ণ করিবে সর্বে, উহাকে তোর মন হইবে বিশ্রাম যহ।
আনন্দ আনন্দ, রহ আমার মন সদা হরির সঙ্গ রহ।
যে সঙ্গ যাহী। তোমার যহ কি নাই?
তোমার ঘরে সকল কিছু আছে; যাহাতে তাহ তোর নাই।
তোমার আর সকলি তোমার তুল ও বহিয়া অন্যের অধিকার ভরে।
আনন্দের মন আর অধিকার হইয়াছে, আমাদের মনে পর তুল মন পরিয়াছে।
আনন্দ আনন্দ, সঙ্গ যাহী। তোমার ঘরে কি নাই।

আমার অতীত জীবন

আনন্দময়ী বসু—লাহরঘাড়ী

আমার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন আমি "পুরুষের প্রতি উপদেশ" শীর্ষক অভিধাসহ দুই-চারি-পূর্ণ একটী কবিতা লিখিয়া স্বামীকে দিয়াছিলাম; তাহার প্রথম অংশ এই—

> যখন যখন ঘরে আসহ ফিরিয়া
> পূর্ণিমা শশিনি, পুরুষ হৃদয়ানী
> দেখিবে অধিনী আমি, বিরহেতে হায়
> মিলনাশা, দেখিবে না অধিনী বিলায়!
> কুল কলি সম দেখে যে যখন দেখি।
> দেখিবে বিলাস নাই হাস্য মিশ্র-মুখে।

পত্রটী সুলিখিত হইয়াছিল। স্বামী এবং তাঁহার কলিকাতার বন্ধুগণ ইহা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হন। কিছু দিন পরে একজন বন্ধু এই কবিতাটী "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রে মুদ্রিত করেন। ইহাই আমার প্রথম প্রকাশ লেখা।

কবিতাটী মুদ্রিত করিয়া উক্ত সংবাদের সম্পাদক টীকায় লিখিয়াছিলেন, "আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মপুত্রী; ইনি ইহার শিক্ষা-কর্ত্রী বালকা অবিস্থাকালে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহার মনের আশয় প্রকাশের সত্ত-রবী হয় পাওয়াইলাম। চেষ্টা থাকিলে ইহার সুখ্যাতী লেখনী কালে অনুত্ত প্রদর্শ করিবে।"

ইহা দেখিয়া পণ্ডিতের আমাকে বলিয়াছিলেন, "লোকে প্রশংসা করিলেই বলিয়া তুমি যেন গর্বিতা হইও না। দেখ দেখি, তোমার মামা কত বড় বড় কবিতার কবি ছিলেন। তুমি তাঁহার উপযুক্ত ভাতুষ্পুত্রী হইলে তবে আমার শ্রমসাফল্য হইবে। স্ত্রীলোকের ক্ষমতা বলিয়াই বলনে একটা প্রশংসা করে।"

যাহা হউক, আমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়া দুই বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি কবিতা, প্রবন্ধাদি এবং উপন্যাস লিখিয়াছিলাম। তাহা স্বামীর কাছে লিখাইলাম; তিনি তাঁহার অনেকটী বন্ধুর এবাস প্রাপ্তির তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্বামী আমাকে কলিকাতা হইতে ইংরাজী শিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আগ্রহে আমি আনন্দের সহিত আমার একমাত্র ভাতাকে সঙ্গিনী করিয়া বাটীর বালকদিগের নিকটে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমার বয়স যখন সতর বৎসর তখনই আমার একমাত্র সন্তান—আমার কন্যাটী ভূমিষ্ঠা হয়। তখন আমি পিত্রালয়ে ছিলাম।

আমার কন্যার বয়স যখন দুই দিন তখন আমার শ্বশুরালয়স্থ দেবরেরা যাইয়া আমাদিগকে অনুল শোক-সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করেন।

তাঁহার উদ্দেশে আমি একটী শোক-গাথা লিখিয়াছিলাম। তারপর অনেকদিন আর লেখাপড়া করিতে পারি নাই।

পর বৎসর স্বামী মেডিকেল কলেজ হইতে এল্, এম্, এস্ (L.M.S.) উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে, এবং কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিয়া উপাধি লইয়া বাটী আসিবার কিছুদিন পরে আমাদের কন্যাটী এবং বাটীর অন্যকে পীড়িত হন। তাঁহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা তিনিই করিতে লাগিলেন।

সেই বৎসর আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার স্ত্রী কতকগুলি শিশু-সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসময়ে আমি যারপর-নাই আকুল হইয়াছিলাম। সেদিন পরিবেশ আমাকে যে স্নেহপরিপূর্ণ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহা আজিও মনে হইলে আমার প্রাণ সোহাগীত ভাষায় আকুল উল্লাস করে!

কিন্তু আমার অদৃষ্টে এত সুখ ও সৌভাগ্য বেশীদিন সহিল না! আমার শ্বশুরাকুরের অনুরোধে এবং অবশিষ্ট সন্তান কয়টির নির্বিঘ্নাধিপত্যের স্বার্থে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ আমার ভ্রাতারা করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে "ভূবন চিকিৎসক" বলিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইলেন। দু'জনেই মনে করিয়াছিলাম, এইবারে আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইল। তিনি আমাকে মাঝখানে বলিয়াছিলেন, "এইবার আশিনগর হইতে তোমাকে, খুকিকে এবং আমার ছোট ভাই দু'টিকে আমার কাছে লইয়া যাইব"। আমার এক ননদও শীঘ্রিই শ্বশুরালয়ে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুই তিনদিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া, হঠাৎ বৈদ্যনাথ শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন। আমরা উভয়েই আশিনগরের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

ছয়েক মাসে তাঁহার লেখা চিঠি পাওয়া আসিল। আমার শরীর, আমার অন্তরের ভালবাসা, আমার বাবা প্রভৃতি এসব চিন্তায় হইয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেলেন। কেহ আমাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন না। আমি কিন্তু মুখফুট, লজ্জায় ভয়ে কিছুই বলিলাম না। কেবল তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম। কেবল তাঁহার স্বপ্ন-বাসনায় ভগবানকে ডাকিলাম। এই সময়ে এক সন্তানসম্ভবা বিধবা বহিনা, আমাকে যে রকম আদর ও শক্তি দিয়েছে, তাহা আমার মনে চিরদিনই মুদ্রিত হইয়া আছে।

তারপরে আর কি লিখিব? সংবাদ পাইলাম, তিনি আমার শ্রদ্ধেয়-শ্বশুরের অবলম্বন, আমার সেই পরোপকারী, দয়ালু, স্নেহপ্রবণ পতিদেব, তিনি চলে স্বর্গের স্নেহাধারের বাহিতে আমাকে অকূলের দুয়ারে ভেসেছিলেন করিয়া, ভগবানের কাছে চলিয়া গিয়াছেন! ঠিক সেই মুহূর্তে বিজয়কৃষ্ণের বাটীতে থাকিয়া আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।*

তখন আমার বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই—সাড়ে আঠারো।

অতি বাল্যকাল হইতে ভগবানকে আমি ভক্তি-বিশ্বাস করিতাম। আমার পিতৃদেব এই ভক্তি-বিশ্বাসের বীজ বপন করেন এবং স্বামী ইহার বিকাশ সাধন করেন। যে কোন বিপদ বা ভয়ের সম্ভাবনায় আমি সেই বিপদ্‌ভঞ্জন দেবতার অভয়চরণে শরণ লইতাম। কিন্তু যখন সেই সর্বশক্তিমান দেবতা থাকিতে আমার এমন সর্বনাশ হইল, তখন তাঁহার করুণায় উপরে আমি অবিশ্বাসিনী হইলাম। তাঁহার উপরে আমার অভিমান হয়।

অতি বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এইরূপ হইয়াছিল যে, কোনরূপ সুখ-দুঃখাদি কর্তৃক আমার মন একটু উত্তেজিত হইলে আমার একটী কবিতা হইত। এই কবিতা প্রায়ই পদ্য, সময়ান্তরে গদ্য কবিতাও লিখিতাম। আমি, যখন সেই তরুণ বয়সে বিরহের পরিশোষে প্রাণ হইলাম, তখন যেন আমার হৃদয় নিংড়িয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল। এই শোকোচ্ছ্বাস অবস্থায় আমার গদ্য-কাব্য "প্রিয়-প্রসঙ্গ" রচিত হইয়াছিল। উহা কেবল নিজের মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই লিখিয়াছিলাম। বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য কোন চিন্তা করি নাই।

আমার একজন কুটুম্বিনী আত্মীয়া উহার কীট কিছুই হইতে ঐ গদ্য-লিপি দেখিতে পান, এবং উহা ছাপাইয়া বিধবা রমণীগণের একটী সাহায্যার্থ তিনি হইবে এইরূপ পরামর্শ দেন। আমার স্বর্গীয় পতিদেবের একটী স্মৃতি রক্ষা হইবে, ইহা মনে করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আমি একান্ত উৎসুক হই। আমার স্বামীর পরলোক গমনান্তে আমার আত্মীয়গণ, যাঁহারা কিছু অর্থ আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই অর্থ দিয়া

* আমার স্বামিদেব পরলোকে গমন করা অবধি আমি যাঁহা কিছু স্বপ্ন দেখিয়াছি সমস্তই সত্য হইয়াছে। আমার পারিবারিক আত্মীয়দিগকে এখন আমার জানা আছে।

আমার আত্মীয়ের নিকটে উহার মূল্যবোধের ভার গ্রহণ করি। পুস্তকে আমার নাম এবং পরিচয় দিতে নিষেধ করি। এই কাজ খুব গোপনে করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয়, তখন আমার যে বয়স ও অবস্থা ছিল, তাহাতে যদি আমার নাম সেরূপ আত্মপ্রচারিত না হইত, তবে আমি "প্রিয়-প্রসঙ্গ" ছাপাইতে পারিতাম না। যাহা হউক, "প্রিয়-প্রসঙ্গ" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে, আমার আত্মগোপনের বহু চেষ্টাসত্ত্বেও অনেকে বুঝিতে পারিলেন আমিই উহার রচয়িত্রী। তখন অনেক হিংসা, দ্বেষ, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আমাকে সহিতে হইয়াছিল। আমার এত আদরের "প্রিয়-প্রসঙ্গ"ও দাদামহাশয়ের হাতে আসিতে রহ গেল। বিজ্ঞাপনাদি অভাবে অনেকে উহার অস্তিত্ব পর্যন্ত অনেকদিন জানিতে পারিলেন না। সেই সময়ে আমার স্বর্গীয় পরিবারের স্নেহের অভাব, আমার সন্তানের স্নেহপ্রবণ অন্তর যেমন, উহা বিশেষ আদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়াছিলেন।

যখন ক্রমশঃ দিন যাইতে লাগিল, তখন কেবল ভগবানের সেবা, শিশু-পালন অথবা সংসারের অনুকূল করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না। বাকী জীবনটি কি করিয়া কাটাইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। ভগবান এ অধম সন্তানকে যে বিদ্যানুরাগ ও একটু কবিত্বশক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমে মনে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিদ্যা-বিষয়ের কতকে আত্মোৎসর্গ করা উচিত। কথা যাইল, তখন ভগবানের স্নেহে কবিত্বের বা তাঁহার উপরে আমার ভক্তিরসের বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমার আই-ডল আমি পাইলাম, ইহাতে আমার বড় বিশ্বাস হইল।

আমি মনে করিলাম, সকল মহিলাদিগের যেমন ভগবানের কাছে করা কর্তব্য, বিধবা মহিলাদিগের সেইরূপ পরমেশের কাছে করা কর্তব্য। ইহা যখন আমার "সত্য" বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অভিপ্রায়ের কতকে আমি পরমেশের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারিলাম।

এই সময়ে আমি পুরাতন বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের কবিতা এবং সাহিত্য-গুরু কবিবরেন্দ্রের অনেক গ্রন্থ পড়িলাম। নবজীবন, প্রচার, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্র এবং গোবেন্দ্রবাবু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ছবেলোজ্জ্বাস পড়িতে আমার যত্নে ও সমাদরীয়া ভগিনী-দিগের কত অনেক চিন্তা উপস্থিত হইত। সেই সকল চিন্তা আমি অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিতাম। যখন পিত্রালয়ে থাকিতাম, তখন আমি মাতার নিকট অনেক মিনতি করিয়া তাঁহার কাছে একটু ইংরাজি পড়া শিখিয়া লইতাম। একখানি উপক্রমণিকা ব্যাকরণ হইতে পড়িয়া, মাতৃভাষা প্রভৃতি মুখস্থ করিতাম। আমার বয়স প্রথম পত্নী-বিয়োগ ঘটিলে তাঁহার পুত্রগণের উৎসাহ, স্ত্রী-শিক্ষার-প্রভৃতি হ্রাস হইয়াছিল; সেই জন্য আমার বড় মনস্তাপ হইত। এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত কোন পুরুষের সম্মুখীন হইতাম না। কোনরূপ আমোদ বা উৎসবে যোগ দিতাম না এবং স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ মিশামিশি বা বন্ধুত্বালাপ করিতাম না। আমার স্বর্গীয় স্বামী দৃষ্টি দর্শনাই আমার উপরে নিপতিত আছে, ইহাই আমার ধারণা ছিল।

আমাদের বাড়ীতে "সখা" নামক মাসিকপত্র আসিত। সম্পাদক প্রসন্নকুমার সেন স্নেহের বালক-বালিকাদিগকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং নীতিশিক্ষা দান করিয়া পত্রিকা চরিত্র করিবেন এই উদ্দেশ্যে "সখা" প্রবর্তন করেন। আমি তাঁহার এই সাধু কার্যের কিছু সহায়তা করিতে একান্ত ব্যগ্র হইলাম। "সখা"র উপযুক্ত কবিতা লিখিয়া প্রসন্ন-বাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি যত্নপূর্বক প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে কিছুদিন পর্যন্ত "সখা"র লিখিতে লাগিলাম।

কিছুদিন পরে প্রসন্নবাবু ইহ-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই অ-পূর্ণ শূন্য-সংসারে আমি মনে মনে বড় শোকাকুলা হইলাম। এরূপ দুঃখে কেহ সহানুভূতি করিবে না বলিয়া কাহারও বলিলাম না। তখন "শোক-সঙ্গীত"-শীর্ষক একটী কবিতা লিখিয়া সখার উদ্দেশে প্রেরণ করিলাম। প্রসন্নবাবুর ভাতা এবং

"সখা"র সম্পাদক বাবু অম্বিকাচরণ সেন দ্বারা সাদরে গ্রহণ করিলেন। আরেকগুলি প্রাপ্ত কবিতা হইতে কেবল আমার সেই কবিতাটি "সখা"য় প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে একখানি অতি সুন্দর রবির পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন।

আমার আত্মীয় স্বজনদিগের জন্য কিছু ব্যস্ত করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল হইল। সেই জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আমি বামাবোধিনীর লেখিকা শ্রেণীভুক্ত হইলাম। কিছুদিন বামাবোধিনীতে কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার অধিকাংশ আমার স্বর্গীয় পতিদেবের উদ্দেশে রচিত।

বামাবোধিনীর ২৫শ বর্ষ পূর্ণ হইলে উক্তিহাসের উদ্দেশ্যে বঙ্গ বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় উহার জন্য "ঝুমিনী" করেন। সেই সময়ে অনেকগুলি পুরস্কার প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেন। আমি তিন চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া তিন টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। বামাবোধিনীর বিজ্ঞাপনানুসারে "ধনবাদিনী" নামক এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি উহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বামাবোধিনী ঝুমিনীতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি, বিধবা রমণীর কর্তব্য বিষয়ে আমি অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম। সেই চিন্তার ফলে আমার মনে হইল, অবসরকে আত্ম বন্ধন করিয়া, ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, হৃদয়ের অন্তঃ বর্তীর স্বার্থ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, আত্মীয় স্বজনদিগের উন্নতি সাধন, বিশ্ববিদ্যকে উপযুক্তরূপে গ্রহণ এবং অনাথ আতুরদিগকে স্নেহ, ইহাই বিধবা রমণীদিগের কর্তব্য। আমার এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে "ধনবাদিনী" লিখিয়াছিলাম। ইহা বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় পড়িয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ধনবাদিনীর প্রকাশের অনেক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় "বালাশ্রম" প্রতিষ্ঠা হয়, তখন উক্ত মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখেন, "আপনার 'ধনবাদিনী' পড়িয়া সফল হইয়াছে, কলিকাতায় বালাশ্রম নামক এক 'সেবাশ্রম' স্থাপিত হইয়াছে"—ইত্যাদি। ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণের নিকট খুব আদৃত হইয়াছিল।

এই "ঝুমিনী" সময় হইতে বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় আমাকে নিজ কন্যারূপে স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর, যিনি ও আমার কল্যাণ সাধন, তাঁহার কর্তব্য কার্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমার লেখা তিনি সাগ্রহে, সমাদরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিষয়ে কোন ত্রুটি হইলে তাহাও স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিতেন। আমাকে যেরূপ সহানুভূতি দিয়া পত্র লিখিতেন, আমার জীবনে তাহা যেরূপ প্রার্থনীয় সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য। তিনি ধার্মিকাগ্রগণ্য এবং যেরূপ ভক্তিভাজন ছিলেন তাহার কাছে পত্রাদি লিখিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সঙ্কোচ হইত না। আমি মনে মনে তাঁহাকে আমার পিতৃদেবের মত ভক্তি করিতাম।

এই সময় হইতে বামাবোধিনীতে আমি পত্র অপেক্ষা গদ্য প্রবন্ধ অধিকাংশে লিখিতে লাগিলাম। আমাদের অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামের স্ত্রী-চিকিৎসক এবং রাজীর আবশ্যকতা বিষয়ে আমি সাধারণের অনোযোগ আকর্ষণ জন্য একাধিকবার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বাল্য-বিবাহ নিবারণ এবং বালকদের অর্থপুস্তকতা নিবারণ বিষয়ক কুদ্রাপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম।

অতঃপর আমি বন্ধুবান্ধবের পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাসিক পত্রে দুই চারিটি কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

"বঙ্গমহিলার বঙ্গ মহাশয়ের পুরস্কার প্রবন্ধ "বাঙ্গালী রমণীদিগের পূর্বেপ" রচনায়, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায়, আমি ১২৯৮ সালে পুরস্কার পাইয়াছিলাম। ঐ কথা শুনিয়া আমার জনৈক আত্মীয় "অন্তঃপুর-সুহৃদ্-সম্মিলনী" সভার বিজ্ঞাপনানুসারে "বিবাহিতা রমণীর কর্তব্য" বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় আমি প্রথম হইয়াছিলাম

এবং বিশেষ হি, যে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল।

সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষের সেই প্রবন্ধটী উক্ত সম্মিলনীর বার্ষিক-বিবরণীতে প্রকাশ করেন। বামাবিহিতী পত্রিকার প্রীযুক্ত হারাধুমার কবিরত্ন মহাশয় তাহা দেখিয়া নিজ পত্রিকায় একার আবশ্যক হন, এবং আমাকে বিশেষ উৎসাহজনক পত্র লিখিয়া কয়েকখানি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া বরাহা মুখার মুখোপাধ্যায় মহাশয় (বাবা-শিশু-প্রেমের) তাঁহার "বাঙ্গালীর মেয়ের শীক্ষিশিক্ষা" পুস্তকে আমার নাম মুদ্রিত করিয়া, বিশেষ সৌজন্যসহকারে এক পত্র মুদ্রিত করিয়া, উহা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার পরে আরও দুইবারে আমি অন্যান্য-সম্মিলনীতে "মুসলমান রমণীর শিক্ষিতের প্রতি কর্তব্য" এবং "ঘরে বাইরে" নামক প্রবন্ধ পাঠের প্রথম লিখিত হই, এবং যোগ্যতর পুরস্কার পাই।

প্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাধুমার কবিরত্ন মহাশয় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার এবং বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি অধিকতর উৎসাহসহকারে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে চেষ্টা করি। তখন আমার শিক্ষক বিশেষ কেহই ছিল না। আমি অভিধানের উপরে নির্ভরপূর্বক একার চেষ্টা করিতেছিলাম। একদিন ইংরাজী পত্রিকার আর একদিন সংস্কৃত পত্রিকায়। ইংরাজী এবং বেদবাক্যের অনুবাদ লিখিতেও শিখিয়াছি। সেদিন আমার ইংরাজী প্রবন্ধের বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম, আর যে দিন উহা দেখিয়া মুখার-সহকারে পড়িতে পারিয়াছিলাম, সেই দুই দিন ঐ মহাশয়ের যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমার চিরস্মরণীয়। মানবের মনস্তত্ত্ব-শিক্ষা-প্রেমের যেন অপরিশোধনীয়, ঐ দুই আমাদের যেরূপ ঋণ আমার সেইরূপ অপরিশোধ্য।

আমার পূজনীয় শিক্ষক মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বন্ধে যখন বক্তৃতার প্রতিজ্ঞা হয়, তখন বক্তৃতাদের বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের আদেশক্রমে আমি একটী কবিতা লিখিয়াছিলাম। তিনি তাহা নিজ হাতে ছাপাইয়া, উক্ত কার্যস্থলে বিতরণ করেন। সেই সূত্রে উক্ত কবিবরের জীবনী-প্রণেতা, আমার অগ্রজ-প্রতিম ভক্তিভাজন যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকটে আমি পরিচিত হই।

এই সকল সময়ে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। আমি রাত্র-মুহূর্তে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পাঠাভ্যাস করিতাম। আমার পাঠাভ্যাস শেষ হইলে তখন বাড়ীর সকলে উঠিতেন। তখন আমি ঘরকন্না-কৌমুদীর পারিচর্য্যা মুখস্থ করিতে করিতে, অথবা ইংরাজী ব্যাকরণ লিখিতে লিখিতে মুখস্থ করিতাম। আহারের সময় বেশী থাকিলে পাছে শরীর অসুস্থ হয় সেই ভয়ে সামান্যরূপ আহার করিতাম। বিকেল বেলায় এক ঘণ্টা এবং রাত্রিতে ৮।৯ ঘণ্টা খেলা-ধূলার সময় পাইতাম। আহার নিদ্রা বিষয়ে বিশেষ সংযত হইয়াছিলাম। কিন্তু বেশী দিন ইহা সহিল না—সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আমার "শারীরিকী-বৃত্তি সকল অপরিচিত অনুশীলিত" হইয়াছিল না, তাই কিছুদিন মধ্যে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল।

অনিয়ন্ত্রিত, বামাবোধিনী, বঙ্গ-ভারত প্রভৃতি মাসিক-পত্রে আমি কবিতা লিখিতাম। পূজনীয় কবিবর মহাশয় দেখা প্রভৃতি হইয়া সেই সকল সংগ্রহপূর্বক "বাল্য-কুসুমাবলি" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি তাহা উহার বিজ্ঞাপনে লিখিয়া গেছেন। সেকালে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ—সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমবাবু, কবিবর হেমবাবু ও নবীনবাবু, মনীষী চন্দ্রনাথবাবু, খ্রীশ্চ কৃষ্ণদাসবাবু, কবিপ্রবর রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি আমার কুসুমগুলি পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে যারপরনাই উৎসাহ দিয়াছিলেন।

ইহার পরেও সেকালের কবিবর মহাশয়ের আরও ও অনুগ্রহে আমার "কবিতাবলি, প্রিয়-প্রসূন (২য় সংস্করণ), বীরকুমার-বধ কাব্য" একসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামাবোধিনীর নিজ সময়ের সম্পাদক এক মুসলমান হইয়াছিল। আমি তাহাকে বিজ্ঞাপনাগারে "বিনয়

সভাপতি ভারত-মহৌষিদের অবস্থা"-শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ-চন্দ্র মহাশয় তাহার পরীক্ষক ছিলেন; সেবারেও আমি অনেকজন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হই।

যাঁহারা দেশ-বিদেশী, নারী-বিদেশী এবং সমাজ-শিক্ষক, তাঁহাদিগকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধার ভক্তি করিতাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "ভক্তিযোগ" পত্রিকা অর্পণ প্রভৃতি প্রস্তাবে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতাম।

স্বনাম ধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি জীবনে কখনও না দেখিলেও তাঁহাকে একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার মৃত্যু সময়ে আমি আমার জনৈক ডাক্তার দেবরের বাসায় কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। সেই ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই আমার অন্তরঙ্গ শান্তড়ীর সহিত নিমতলার ঘাটে মহাজন করিতে গিয়া মহাত্মাদিগকে সিন্ধুতুল্য দুঃখ, মহাবৃষ্টির উদ্দামতম বহ্নি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত দেহ দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে মৃত দেখিয়া, আমার হৃদয়ে যে কি আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমি বাড়ীতে ফিরিয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে তখনই শোকোচ্ছ্বাস পূর্ণ এক গুচ্ছ কবিতা লিখিয়া, চির সুহৃদ্ ধাত্রীবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আরও তিন চারিটি কবিতা লিখিলে ধাত্রীবোধিনী সম্পাদক মহাশয় এবং কবিবর মহাশয় উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন।

"আশা-মুকুলাবলি" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে আমরা দেওঘরে গিয়াছিলাম। সেখানে কবিপ্রবর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া ছিলাম। তিনি আমাকে যে আশীর্বাদ ও স্নেহ করিয়া ছিলেন, তাহা আমার মনে চিরদিনই জাগিয়া আছে। আমি আসিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, "মা! আমাকে মনে রাখিও, তোমার কবিতা আমি খুব কবিতা বাসি"— লজ্জা ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

ইহার কিছু দিন পরে আমি একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করিতে যাই। সেই বৃদ্ধ-দেবতা যখন আমার মাথায় হাত দিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তখন আমার জীবন যেন পবিত্র হইয়াছিল।

যাঁহারা আমাদের বর্তমান মহিলা-কুলের গৌরব, সেই সকল স্বনামধন্যা দেবীগণকে আমি চিরদিনই ভক্তিশ্রদ্ধা সহ পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।

এই স্বদেশের যাঁহারা সমাজ-শিক্ষক রূপে পরিগণিত— যাঁহারা ধর্মবেত্তা, নীতিবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং কবি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মহত্ত্বের লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্যক্তিগত ভাবে বা বাঁহাদের পত্রিকার ভাবে) আমি এই সকল লোকের নিকটে ঋণী। এই রূপে মহাত্মাদের অন্যতম সুকবি বাবু যোগিন্দ্রনাথ বসুর কবিত্ব-শক্তি এবং পরিব্রাজকের রায়-চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক পত্রিকার নিকটে আমি বহুল পরিমাণে ঋণী। সকলের অপেক্ষা সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই আমার স্বতন্ত্র। কেবল সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে নহে। আমার চির অভ্রান্ত, ধর্মতত্ত্ব-প্রবক্তা আচার্য দেবরূপে আমি হৃদয়বেদের আসনে বসাইয়া, তাঁহারই উদ্দেশগাহস্থ্যে আত্ম-মর্ম-ভেদী কবিতাটি।

কবি ওমর খৈয়াম

জীরেন্দ্রচন্দ্র রায়—কাশী

[বাংলা ভাষায় ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনেক অনুবাদ হলেও ইংরেজি থেকে কিটজেরাল্ড অনুবাদই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। তিনি ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদগুলি সম্বন্ধে বলেছেন যে ওমরের ইংরেজি অনুবাদ নয়, একটি সুন্দর স্বতন্ত্র কবিতা। এই অনুবাদগুলির মধ্যে কবিতাগুলি অনুবাদের চেয়ে মূলের অনেকটা কাছে এসেছে। ওমর খৈয়াম যে কবিতা লিখেছিলেন তার ভাবের সঙ্গে ফিট্‌জেরাল্ড নিজের ভাবের অনেক মিশিয়ে দিয়েছেন। ওমরের রুবাইয়াৎ ফিট্‌জেরাল্ডের হাতে পড়ে যে রূপান্তর লাভ করেছে তাতে ওমরের কবিতার সঙ্গে ফিট্‌জেরাল্ডের কবিতার তুলনা করা চলে না। ফিট্‌জেরাল্ড নিজেই বলেছেন—তিনি এই অনুবাদ যে ভাবে করেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে মনে করেন না। ওমরের অনেকগুলি রুবাইয়াৎ নাকি ফিট্‌জেরাল্ডের নিজের লেখা। ফিট্‌জেরাল্ড নিজে এই অনুবাদটি লাভ করেই ক্ষান্ত হন নি, ওমরের কবি-পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর অনুবাদ থেকে কয়েক পৃষ্ঠা কবিতার ইংরেজি ভাষান্তর করেছিলেন। সে অনুবাদটি তাঁর নিজস্ব রুবাইয়াৎ-অনুবাদ বলেই গণ্য। অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে কি না, তাও আমার জানা নেই। কিন্তু ফিট্‌জেরাল্ড যে পথ নির্দেশ করেছেন সেই পথ ধরেই কি না, কবিতাগুলি এবং ইংরেজ কবির ওমরের রুবাইয়াৎ-অনুবাদের তুলনামূলক সমালোচনা করে দেখি সেটি একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হবে বলে মনে হয়। ওমরের রুবাইয়াৎ-অনুবাদ করবার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে যে কাজ সেই বাংলা ভাষায় ওমরের মূল অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকের উপহার দিয়েছেন সে কাজ বাঙালী মাত্রেই গৌরব অনুভব করবেন। সম্প্রতি সেদিক দিয়ে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১১২৩ খৃঃ) ওমর খৈয়াম ইহলোক ত্যাগ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকেরা তাঁহার সম্বন্ধে যে সব বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, ওমর খৈয়াম পারস্য সাহিত্যে কবি হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া যাইতে পারেন নাই। অয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ওমর সম্বন্ধে পারস্য সাহিত্যে যা-কিছু তথ্য পাওয়া যায়, তাহার সমস্ত আলোচনা করিয়া পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক ব্রাউন বলেন যে, সেই সময়ের লোকেরা ওমরকে একজন পণ্ডিতবেরা দার্শনিক এবং জ্যোতিষী বলিয়াই বিশেষ সম্মান দিয়াছিল। রাজ-দরবারেও ওমর জ্যোতিষীর সম্মানই পাইয়াছিলেন। অথচ আজ প্রায় আটশ' বছর পার হইবার জীবিত কালের বিশেষ পরিচয়টি ম্লান হইয়া গিয়া তাঁহার কবিপ্রাণের পরিচয়টিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ওমর আজ জীবিত থাকিলে তাঁহার এই পরিচয়ের পরিবর্তন দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া যাইতেন। তাঁহার রুবাইয়াতের সত্য অর্থ তাঁহার যে দুইটি গুণ করিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলে তিনি আরো অবাক্ হইয়া যাইতেন, সন্দেহ নাই।

ওমরের কাব্য সাহিত্য আজ রসিক-সমাজের মনকে খুব অধিকার ও তাহার ফলে ওমরের নামে, আজ রুবাইয়াৎ কবিতাই সাধারণ হইয়াছে। সেই সব রুবাইয়াতের মধ্যে কতটা বাস্তবিক ওমরের রচনা তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা আজ অসম্ভব। ওমর তাঁহার কাব্যসাহিত্যে জীবন সম্বন্ধে যে বিশেষ অনুভূতি এবং সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন সেই অনুভূতি এবং সেই সৃষ্টির ঐতিহ্যের পরবর্তী অন্য কবিরাও অনেক রুবাই লিখিয়া গিয়াছেন। আজ আর সেই গুলির মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। হয় তো তাহার বিশেষ প্রয়োজনও আজ নাই। ওমর খৈয়াম কবিতে আজ রসিকজনের চিত্তে যে চিত্র আঁকিয়া উঠে তাহা একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির চিত্র নহে। মানব-জীবনের অনন্ত বিচিত্র অনুভূতির ভেতর ওমর খৈয়াম জীবন-সম্বন্ধে একটি বিশেষ অনুভূতির প্রতীক্। এই কারণেই যদি রুবাইয়াতের সবগুলি রুবাই খৈয়ামেরও ওমর রচনা না-ও হইয়া থাকে তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।

আর বাস্তবিক ওমর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া বিশেষ কিছু জানিবার উপায়ও নাই। ওমরের এই যে

অপূর্ণ আবাসস্থল, এই যে তাঁহার দর্শনিক হওয়ার, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার মর্ম হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। জীবনে তিনি কোন্ কোন্ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনকে এমন করিয়া দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোনোই উপায় আজ নাই। অথচ ওমরের রুবাইয়াৎ পড়িতে পড়িতে এই হতাশ অনুভূতি ও দর্শনের পশ্চাতের মানুষটির কথা কেমনি মনে পড়িতে থাকে, সেই মানুষটির সুখ-দুঃখের বিচিত্র জীবন-কাহিনীর সহিত পরিচিত হইবার বাসনা চিত্তকে উৎসুক করিয়া তুলিতে থাকে। তাঁহার রুবাইয়াৎ-এর নানাস্থানে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের মানসলোকে ওমরের জীবনযাত্রাকে রহস্যাবৃত করিয়া তুলিতে চায়।

২

ওমরের দুরন্তযৌবনের কথা আজি আর একটি জ্ঞান-পিয়াসী তরুণমানসী মুকুরের মুখর ছবি চোখের সামনে আঁকিয়া তোলে। তরুণ তাপস, অন্তরে অন্তরে কবিপ্রাণ ওমর জ্ঞানী-গুণীদের চরণতলে বসিয়া বিশ্ব-রহস্যের অবগুণ্ঠন জানিবার আশায় কি ঘণ্টার পর ঘণ্টাই কাটাইয়া দিয়াছিলেন! সকলেরই মোটে-মনে একদিন যৌ মন-মন্থনের ফলির আহ্বান আসে, অনেক কথার কথায় আনমনের বেলা আসিয়া যায়। ওমর তুমি জ্ঞানের তুফানের সেই যৌবনকেও আর করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলে! পরে এমনিই তাই বোধ করি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ওমরকে বলিতে হইয়াছিল,—

যখন তরুণ সে একদিন ছুটেছিনু মসজিদে,
নিয়মিত সেখানেতে জ্ঞানীদের পাশে :
নিত্য তাদের সঙ্গে
তর্কের তোড়ে কী আনন্দে ঘটাতে আলোড়ন বাণী :
তোমার কৃপায় আজ যে তেমন তর্কে কি আর মতি! (৫৯)

* * *

সেই জ্ঞানীদের মহান সভায়
তাদের সেবার তরেও যবে গড়িয়েছিনু মন
আজিকে তাদের মহান নিলয়ের দিকে
তাকাইনে কভু ফিরে তাকাইনে কী যে! (৬০)

সেদিনে দেখিনি এরে তরুণ তুর্কির মত
হৃদয় কিন্তু মুকুল যে আজো তোমা প্রতি অবনত :
ভুল যা তোমা তরে তোমা, চিরদিনের মত যে
অবিশ্বাসের আবর্জনায় এঁকেছি তাহে কলঙ্ক! (৬১)

ওমর যে সংসারের ঘাতি-প্রতিঘাতকে মুগ্ধ করিয়া জ্ঞানের সাধনায় মগ্ন হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন তাহার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহাদের বিদ্যবন্ধুর গল্পে। বিদ্যবন্ধু যখন হৈৎসাবুরে জ্ঞানীগুরুর নিকট এক সঙ্গে শিক্ষালাভে করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনজনের যারা কেহেই ভবিষ্যৎ জীবনে সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন, অপর দুই বন্ধুকেও তাহার সমভাগ দিতে হইবে। যখন আলী ইবনে সাহলের ভাগ্যতারকা মহীয়ান হইলেন তখন ওমর এবং হাসান যেন্ সাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, আলী ইবনেও প্রতিজ্ঞা পালন করেন। ওমর, আলী ইবনের সম্মান, প্রতিপত্তি, সম্পদ, ঐশ্বর্য, কিছুই প্রার্থনা করিলেন না; আলী ইবনে বন্ধুকে কত অনুরোধ করিলেন, ওমর সেই বিষ বিষাক্ত ফেলেন না: তিনি প্রার্থনা করিলেন, গভীর জ্ঞানানুশীলনের জন্য নির্জিত অবসর। আলী ইবনে বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া বন্ধুর সেই কামনাকে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর আর ওমরের জীবনের বিশেষ কোনো কথাই জানিতে পারা যায় না। কেমন করিয়া জীবনের পথে কি কি সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া ওমর তাঁহার শেষ বয়সের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার একটুকু চিহ্নও কোথাও নাই। একমাত্র তাঁহার রুবাইয়াতের ছত্রে ছত্রে তাহার খোঁজ পাওয়া যায়। মনে হয়, কেবল শুধু তত্ত্বালোচনাতেই বলে ওমর এতবড় একজন কবি-দার্শনিক হইতে পারেন নাই।

(৩)

কোনো কোনো মানুষের মধ্যে একটি ওমরের তত্ত্ব-পিপাসা থাকে; বিশ্ব-রহস্যের সন্ধানে ইহারা পাগলের

হয় কি আটোর। বিশেষতিয়ো এই রেখার রহস্যজিজ্ঞাসুর সংখ্যা অধিক না হইলেও বিরল নহে। ইহাদের এই রহস্যজিজ্ঞাসা মিটিতে চাহে না, এই রহস্যজিজ্ঞাসা তাদের ইহাদের অন্তরতর অন্তরে। এই তত্ত্বই এই জিজ্ঞাসা ইহাদিগকে পাগল করিয়া তোলে, জীবনকে পরম অর্থবিহীন করিয়া তোলে।

এই জীবন-জিজ্ঞাসুর পথে যেতে যেতে ঘুরে ঘুরে কত মানুষ বাহির হইয়া গেল—কেহ গেল অমনি পাগল হইয়া গেল, কেহ নিরাশা ও হতাশায় নীরব হইয়া গেল, কেহ বা পাইয়াছি বলিয়া অহোরাত্র করিয়া গেল। পাওয়া-না-পাওয়ার কিছু দিয়া বিচার করিতে বলিয়া আমরা আজ তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি হয়ত, কিন্তু, প্রাণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সকলকেই একই পর্যায়ে না ফেলিয়া পারা যায় না।

ঘুরের কথা মনে পড়ে, বিবেকানন্দের কথা ভুলিতে পারি না; চৈতন্যের কথা জীবনের তীব্র আলায় সন্ধানের ছবি চোখে ভাসে, বুদ্ধের কত যত নিরাশ প্রাণের আলোর সাথে হইয়াছিলেন তাহার ভাবি। ওমরের ওমরের এইরূপ জীবন-জিজ্ঞাসুর সঙ্গে দেখিতে পাই, আর জীবন তাঁহার নিকট কোন্ সমস্যার সমাধান চাহিয়াছিল তাহার কথা মনে জাগে।

মানুষ এই যে তাহার জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের গণ্ডীকে ছাড়াইয়া একদিন পথে বাহির হইয়া যায়, সুদূরের প্রাণের ডাকবার এই যে সহ ভুল করিয়া চলিয়া যাওয়া কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এই অসীমের পথে ছিন্ন করিয়া এই যে-সব অপরিচিত অজানাকে চলিয়াছে তাহারা কেমন ছিলেন সুখী মন কেমনি বিশেষ সুখীও নয়। অকৃতি তাহাদের সকলেরই আছে, কিন্তু তাহাকে তাহারা আপনাদের কারাগার বলিয়া মনে করে না, এই অকৃতির এমন কোন বাহু নাই যাহাকে তাহাদের ছোট ছোট সুখ দুঃখের বাঁধন একেবারে জয় করিয়া রাখিতে পারে। কোন কবি ইহাদের সুখের অনুভূতি তীব্র নয় বলিয়াই দুঃখও মর্মান্তিক হইয়া উঠে না। যাহারা অত্যন্ত বেশি করিয়া চায়, তাহারাই আবার অত্যন্ত বেশি করিয়া দুঃখ পায়, ইহাই মনের ধর্ম। ওমর-জীবনে বাহিরের কিছু দিয়া তেমন কি তাহার তৃপ্তিহীনতা যে জানে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া তিনি যে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার কবিতার ছত্রেই পাওয়া যায়,—

কিছু আজ মোর চেয়ের সাথী
সঙ্গিনীরে সাধনের ধন,
যে আকাশ, সব যেন ঢেকে তারি
নিরাশ আকাশ খন!
যে ফুল্ল নিখিল পদ্ম,
ফুলদলী যে মধু জানে;
সেকিছু নিজের তেরে,
তুমি সব চলিয়াছ একা
আমায় বলিয়া যাহ—

[ছিন্ন-পত্রের এক অধ্যায় বিশেষ নয়। (১৯৭৭)]

সত্যকার মরমীয়া যদি তাহারা থাকে, তাহা হইলে সেই মরমীয়াকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কিছুতেই দেখা যায় না। বই-পড়া মরমীয়া অথবা বাক্-সর্বস্ব বৈষ্ণবী ধর্মন-করের সহিত জীবনের কোনো যোগ না থাকিলেও সত্যকার মরমীয়ের মধ্যে আমরা ব্যক্তির জীবনের সত্য ইতিহাস পাই। জীবনে যে জন কেবলি আনন্দ-বেদনার পান করিল তাহার সত্যকার মরমীয়া কখনো জীবনকে বৈরাগ্যময় করিয়া প্রচার করিতে পারে না। আমার জীবনে যে জন পরম মরমীয়া ভিক্ষুকার পাইল তাহার নিকট কখনো জীবন সম্বন্ধে আশা এবং উৎসাহের বাণী শুনিবার আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের অন্তরতর জীবনের মর্মমূল হইতেই আমাদের মরমীয়া উদ্ভূত হইয়াছে, আমাদের অতিক্রম হইতে নয়। এই কারণেই যুক্তির দিক্ দিয়া, বিচারের দিক্ দিয়া, কোনো মরমীয়া আজ হইলেও যে-জীবন হইতে ঐ মরমীয়া সমুদ্ভূত হইয়াছে, সে-জীবনের ক্ষেত্রে উহার মূল্য একটুকুও কমিয়া যায় না।

ওমরের জীবন-পথের সন্ধান লইতে গিয়া আমরা তাঁহার কবিতার ফুলনাতুলক সমালোচনা করিতে অগ্রসর

হইত না। তাহার এই মার্জিত মনোভাব জীবনের কোন্ অভিজ্ঞতার ফেরে অনুরিত হইয়াছিল তাহাই জানিবার প্রয়াস পাইব।

এই যে পরিপূর্ণরূপে ওমর আমাদের চোখের সামনে তাহার চিরন্তন অভিলাষের বেশে চলিয়াছে, ইহা তো আমাদের নিকট খোলস নহে। এই ওমর-সংস্কারের অধিকাংশ তো নিত্য নিয়তই প্রতি মানবের চোখে পড়ে। তবু এই পরিবর্তনশীলতা আমাদিগকে তো কিছুতে বিস্ময়ে বিমোহিত করেনা তো না। তাহার কারণ বিস্ময়ে বিমোহিত যে আমরা কিছুই হারাইতেছি না তাহা নয়। অনেক কিছুই হারাইয়া চলিয়াছি, "দিবসে দিবসে পথপ্রান্তে" কত-কি-ই ফেলিয়া চলিয়াছি, তবু দীর্ঘনিশ্বাসে সম্মুখের পথ ধূসরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে না। আমাদের এই সব ফেলিয়া যাওয়ার মাঝে আমাদের এমন কোনো পরম ক্ষতি হইতেছে না বলিয়াই এই সম্ভব হইয়াছে। যাহা পাই এবং যাহা হারাই, তাহার কোনোটির জন্যেই আমরা পাওয়ার মত কিছুই পাই নাই এবং হারাইও নাই। কিন্তু যেখানে এই চিরন্তন স্রোতের মুখেই পরম আনন্দের কিছু পাইল, তাহার হারানো তো যেমন সহজ ব্যাপার নয়। সে যখন তাহার এই আনন্দ-নিধিকে হারাইয়া বসে তখন তাহার সমস্ত জীবন মূক হইয়া যায়, সমস্ত বিশ্ব তখন তাহার চোখে ম্লান হইয়া পড়ে। এই ওমরের এই পরিবর্তনশীল অভিলাষ যে কত বিরাগ, তাহা শুধু সেই দিন সেই মানুষটির মর্মেই সত্য করিয়া প্রকাশ পায়, তাহার পূর্বে নয়।

ওমর তাহার জীবনে যদি পরম প্রিয় কিছু না পাইবেন কখনো তাহার দ্বারা জগৎসংসারের অধিকতার স্বাদ ও বিস্বাদ-এমন আমার হইয়া যাইত না। তাই মনে হয়, তিনি যাহাই প্রিয় কিছু জীবনে হারাইয়াছিলেন; হারানোর ব্যথা তাই ওমরের প্রাণে অত্যন্ত তীব্র হইয়াই বাজিয়াছিল!...কত মনে কত কথাই আসে! না জানি কোন্ গোপন-প্রিয়ার চিরতরে বিচ্ছেদে ওমরের প্রেমিক প্রাণ কাঁদিয়া গিয়াছিল। না জানি কোন্ সে প্রিয়ার কারণ সন্ধানে ওমর বিরহীর চিরন্তন ব্যথে ব্যথা পুঁজিয়া হতাশ হইয়াছিলেন যখন হয় তো এই হারানো প্রিয়ার বিচ্ছেদ-ব্যথা হইতেই ওমরের নূতন দর্শন জন্ম লইয়াছে—মৃত্যুর এই নিরাশ আঘাতেই বোধ করি ওমরের জীবন রসাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল এবং তত্ত্বান্বেষণের প্রতি অন্যথা আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

(৩)

ওমর তাঁহার এই হারানো প্রিয়ার কথা কোথাও বলিয়াছেন।

ওমর ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভালবাসা পাইয়া নিবিড় চক্ষে সেই ভালবাসার বাঁধনে ধরা দিয়াছিলেন। ভালবাসার স্পর্শে ধন্য এবং প্রত্যাবিত হইয়া আনন্দে ভালবাসাকেও মিথ্যা এবং ক্ষণিক বলিয়া প্রচার করিতে দ্বিধা করেন নাই। ওমর জগতের আর সমস্তকেই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভালবাসার কথা বলিতে গিয়া ওমর কোথাও এ কথা বলেন নাই যে, এই ভালবাসাই যা ক'দিনের, ইহার কোনো মূল্য নাই! এই ভালবাসাকেই শুধু ওমর জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন শেষ পর্যন্ত।

ওমরের ভাষ্যসাহিত্য নারী আর সুরার গুণকীর্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই সেই জন্য ওমরের ভাষ্যকে ভোগের গীতা বলিয়া মনে করেন এবং ওমরকে উদ্দাম ভোগ-জীবনের কবি বলিয়া মনে করেন। ওমর কিন্তু কখনো ইন্দ্রিয়-সম্ভোগকে এত বড় করিয়া দেখেন নাই। ভালবাসাকে তিনি নারী হইতে, দেহ হইতে, কখনো একার বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই সত্য, কিন্তু ভালবাসাকে তিনি কখনো পশুবৃত্তি বলিয়াও মনে করেন নাই। তিনি যার যার বলিয়াছেন,—

> ওগো যে তোমায়, সেও
> আর যদি আসে-ফিরে,
> ফেলিল সে এ ধরা
> আমি যে পশুবৃত্তি হয়। (২৭৩)
> এরে যে বিধি এত বিরহের অমৃত আজ
> ঢেলিলে দুই নর বিধিলে নারী, অকাল
> আজ যেন নিখিল নারীরই প্রাণে
> বসন্ত কিছু আর সে ও নারি মনে।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রেমের এত বড় মূল্য কিসে পাইয়াছিলেন বলিয়াই ওমর হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—

এ ধরণীর মাঝে শুধু পাত্র যদি কেহ প্রেম
যে প্রেমেরই তরে যেবা আপন প্রাণ করেছে দান
আর তুমি হয়ে তার প্রেমে, দিয়েছ যবে তব প্রাণ
প্রাণ করে দান তার লাগিয়া, তুমি আমি সমভাবে!
এস এ জনে প্রেমে মিলাই এ ভিক্ষা মাগে
তাহলেই প্রেমের তরে প্রাণ হয়ে যাবে সার্থক! (২৭৭)

ওমরের ভালবাসা সম্বন্ধে যাহারা কত উচ্চ ছিল তাহারা সমাক্ বুঝিতে হইলে এখানে নহিলে হইবে যে কত বড় ঘটনার পরও ওমর এই প্রেমেরই জয়গান গাহিয়াছিলেন।...অনধিক যৌবনের প্রথম উন্মাদের ওমরের আর নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছেদ আমাদের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের বিলাপ মধ্যে প্রেমের পায়ে অঞ্জলি ভরে যে অনেকখানি প্রেমের ঘনিষ্ঠতম তাহা সহজেই অনুমেয়।

ওমর নারীর গভীর ভালবাসা পাইয়াছিলেন, "অন্তর হ'তে আবদ্ধিনী প্রাণের অধিক প্রিয়তমা" (২৮৩) "একাধারে দেবী ও মানবীর" দর্শন (২৮৮) পাইয়াছিলেন বলিয়াই ওমর নারীকে কখনো হেলায় দূরীতে ঠেলিতে পারেন নাই। ওমর মুক্তকণ্ঠে তাই বলিয়াছেন,—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কে বলিবে, নিরবি ঘোর বেগে ওমরের প্রিয়তমাকে হরণ করিয়াছিল!...

নারীর যৌবনকে ওমর কখনো ছোট করিয়া দেখেন নাই; কিন্তু প্রেমহীন যৌবনকেও আদর ওমরের আদর করিতে পারেন নাই; তার চেয়ে তাঁহার হারানো প্রিয়ার মানসী-মূর্তিকে তিনি প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিতেন। ওমর শুধু বৈষয়িক ভোগ-সুখের কবি ছিলেন না, প্রেমের সহজ আনন্দ অন্তরের ভালবাসার সার্থক ও সুন্দরতম এই কথাই ওমর জানিতেন এবং তাই তিনি বলিয়াছিলেন,—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পথ-চলার সাথ মিটি যেন সবার
তব সকলি অসার! (৩৯)

সন্ধ্যাকার ভালবাসাকে তিনি ঘৃণা করিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতে পারিয়াছিলেন,—

শরম ভরম ভুলে যা
বেলি না আর লাজের জিরে,
তোমার জিল-করা মোহ
কে পরশ দিয়েছে ভুল জিয়ে?
তোমার মাঝে একটি অজন
আর-অজনার মেখেছে মোহে
তোমার চোখে একটি স্বপন
জিয়ে আছে সবার অলে!
নিঃশ্বাসেরে অমেয়তন জিয়ে
মেহে আছি আমি তোমা মেলে,
জীবনের সে আদি-মেহে
স্বর্গ তোমার ভরা দেখে?

(৮)

এই হাহাকার প্রিয়ার বিরহ কি ওমরকে দুর্বিষহ জ্বালায় দগ্ধ করিয়াছিল? জীবনে বিলাসকে এই ভাবনার মুখ ওমর জীবনের কোন্ সময়কে উপলব্ধি করিয়াছিলেন? ইহার পর কোন্ পথে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন?...

পূর্বেই বলিয়াছি, ওমরের জন্য প্রকৃতিগত একটি তত্ত্বপিপাসা ছিল; সেই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাক্যালাপের তত্ত্বালোচনার দৃষ্টিতে ওমরের পণ্ডিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। পণ্ডিত এবং দার্শনিক বলিয়া সমসাময়িক সমাজে ওমরের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল তাহা আমরা জানি। কিন্তু যৌবন অস্তি শেষকালে তাঁহার অন্তরে যে-প্রশ্ন অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, যৌবনে বর্ষন বিলাসেই তাহার সন্তুষ্টির সমাধান না পাওয়ায় শুরুমিরি করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। শুধু জ্বালাইয়াতে তিনি তাঁহার চিন্তা-রাশি লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।...

যারা প্রিয়, অন্তরে যাহাকে সব সময় আনমনের, তাহাকে হারাইয়া মানুষের মনে যে প্রশ্ন চিরকাল জাগিয়া আছে, যে প্রশ্নের যেমনার অন্তর হইয়া মানব চিরকাল নির্বাক্ নিষ্পলক নেত্রে মুটাইয়া উত্তর ভিক্ষা করে, ওমরের চিত্তে সেই প্রশ্নই বড় তীব্র হইয়া জাগিয়াছিল: এই যে যৌবন-জাগরে একদিন নানাবর্ণ পুষ্পরাশি সৌন্দর্যসম্ভারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এই যে নানাবর্ণ বিহঙ্গেরা মন-মাতানো সুর-ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়া যায়, এই যে দেহের ঘটে অফুরন্ত যৌবন উচ্ছলিত বিলাসে বিভোলিত হইয়া উঠিতে থাকে, ইহারা কেন আসে, কেনই বা চলিয়া যায়, কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়! ফুল দেখিতে দেখিতে ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়ে ধূলির পরে, পাখীর কল গান থামিয়া যায়, পাখী না জানি কোথায় উধাও হইয়া যায় চিরতরে, কিংবিহা-না-আসার অশেষ পথ-বাসি ধরিয়া, সারাক্ষণ তরুর সর্বসুন্দরতার মধুমাধুরী অন্তরের স্পর্শে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যায়, যৌবন-মধুরাত মাটির ধূলায় ধূলি হইয়া যায়! মাটির ধূলিকণায় সব শেষে লীন হইয়া যায়! সাধ্য নাই কোনো ধর্মগুরুর, সাধ্য নাই কোনো জ্ঞানীগুণীর এই ধরণীর ধূলি-কণা হইতে আর তাহাদের ফিরাইয়া আনে! (৪০) কারো সাধ্য নাই এই আসা-যাওয়ার রহস্যভেদ করিতে পারে! সর্বসন্দেহের প্রশ্নের কোনো উত্তর না পাইয়া ওমর তাই বলিয়াছিলেন,—

যুগ যুগ ধরিয়া মানব
শুধু যোগ আসিছে যাইছে,
কেহ কেহ না কেহো যে রয়ে ধূলিতল পর
দুদিনের দুঃখ সুখ নিয়ে।
অজানার যাত্রা আর অজানার আগমনিবাসন। (৪১)

নিত্যকাল নিরিবিলি আছ!
আছ সকলের তরে কেহ না কেহ উৎকণ্ঠী হয়ে,
ধূলির ধরায় তবি' তুমি তরে কে সুখে চিত্তে
রয়েছ কেহ জোগিতে বসে? (৪২)

তথাপিও পথে পথে
এ দুখ আসে
অ-আসন—
কোন্ দীন দুখে ব্যথা অন্তরালী নির্বাসিত পথ
এই ভীরু মানবীরে দিতে পুরস্কার!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(

তাই প্রথম যখন দেখিয়াছিলেন সংসারের মরুক লোক পরকালের ভয়-ভাবনায় দগ্ধিত হইয়া ইহকালের সর্ব প্রকারের ভোগসুখকে বর্জন করিয়া চলিয়াছে, আর মরুক লোক মিথ্যা মান প্রতিপত্তি এবং প্রকাশের দুরন্তর অন্তরের আনন্দকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তখন ওরও আশার ও ভরসার মূল বোধ করি এই হারিয়ের মাঝে!

পরকালের ভাবনা ভরে
মরণের পর পরে
আনন্দের যে সমাধিতল হতে,
ধরণীতলের আকাশেতে আলো যেমন ঢেউ
দুই পক্ষেই ধরণী যেমন
অকাতরে বিলায় যেমন
মুক্তাফলের তরে শুক্তির ঔদার্য।

দূর ভোগের এমন তরল দুঃখ দূরীভূত।

তখন যেখিয়াছিলেন এই ভোগের সম্মুখে যাহা আছে তাহাই প্রতি নিমেষে ফুরায় বিলীন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং যাহা ভোগের বাহিরে, যাহা অনিশ্চিত, তাহার সম্বন্ধে মানুষের তর্ক-বিতর্ক এবং বিশ্বাসের দৌরাত্ম্যকে দুর্ধর্ষ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তখন নিজের জীবনের অনেকখানি এই বাহ্য প্রাণের মধ্যে করিয়াছিলেন বলিয়াই আর সকলকে এই পথে যাইতে দেখিয়া তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন,—

অজানা, তব আশে, আর তরাসে
কিসের পূজার তরে এত ফুল আনে সকলে!
কিসে উদাসী হেসে নিত্য কিসে ব্যথা
যেন নিয়ে নিজ হৃদ স্বর্গ পাইবি কথা!
দূরে তব আর হেসে উপেক্ষা সাথে,
আছে যদি ভাগ্য-ফল আছে-আছে! (৫১)

কিসে আনে এই নিরালায় ঠাঁই,
একটি আমার শুধু ভিতে
ঐক্য-উৎসের যত রসের মেলায় যাই
শুধু হায় নিমেষের তরে!
সেথা এই এত এত আয়োজন সীমা ছিঁড়ে যায়
এ জগতে কোন্ সুখে কার কিসে ঠাঁই
হারালে হারাবে ঠাঁই।
আর কেহ তরে আর নয়! (৫২)

সেই ত সবই আছে সেথা
সকল সেথা রয়েই গেল,
এই যদি আজ কি-অজানা অভিযানে যাবে—
সেথা তবে যাই আমিও সেথা
দূর আর নিই জানিয়ে
এ ঐক্যের যে-সত্য নিয়ে সকলে আজও সবার!
যাদের সেই সাথীর সেথা সবাই আছে ঠাঁই,
মুক্তাফলের বিন্দুর মূলের এসে;
সব কি ফাঁকা—ফাঁকা—ফাঁকা—সকল পেয়েছির
আকাশ আজো ভরিল সেথা! (৫৩)

(৮)

যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মনোহর, রূপ-রস-গন্ধ-বিচিত্র যা-কিছু মানুষের প্রাণকে সরস করিয়া তোলে সব এই ধরণীর মৃত্তিকা হইতেই বিকসিত হইয়া উঠে যে! এই ধরণীর প্রতি ধূলিকণা কত রূপসীর পরশ-মাখা, কত যুগের স্বর্গ-সৌরভের স্মৃতি এই ধূলির বুকে মিলাইয়া আছে, কত অতৃপ্ত কামনা এই ধূলির বুকে অবলুপ্ত হইয়া আছে! কত লক্ষ-প্রাণের ব্যর্থ ব্যর্থতার ব্যথায় পরিপূর্ণ এই ধরণীর ধূলি, কত না অপরূপ বিস্ময়-সৌন্দর্যের অমর সম্ভাবনা এই মৃত্তিকার বুকে! এই পরমাশ্চর্য মৃন্ময়ী ধরণীর রহস্যময় মহিমাকে কবিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে! যে-আত্মার দর্শন যেহেই পাইল না তাহার কল্পনায় কত মানব কত না সুর বাজনা করে। এখো উপেক্ষিতা ধরণী, তোমার অবদান তো কেহই করে না!

এ যেন প্রমত্তা ধূলির তরণী
তব বুকে হয় অস্ত কবি,
দূরে সরে তোমারে ভোলে—
হারায় এ যেন কল্পনায়!

আমার বাঁশিটি তোর উৎসবের বাঁশি নহে ওরে,
আপনি খুঁজিয়া মরে তুই মোরে আপনার সন্ধানে,
সকলের চাঁদমুখ তাই বিষাদের আজ শূন্য চিত্র ;
আমি যে আমারে তোর খুঁজিবারে রহিয়া রহিয়া। (১১১)

এই আমি আজ-হেথা এই যে খুঁজিলা
আকাশ চলার ঠিক।
আজিকে এই খুশি যার ইতিহাস
সেই ওরে দূর হতে। আজো চিনিস,
আজিকার ছোট-বড় সব দুঃখ সুখ শুধুই—
সকলই খুঁজিয়া দূর হতে আমি ;
এই আমি বহুদূর
আজ আমি সুদূরের
দূরাহীন বেদনার মুকুল,
এই আমি ওরে তোর আশে-পাশে বাতাসে যে ঘুরিতেছি,
এই আমি যার তোরে ফিরে ফের বার-বারেক
সন্ধ্যাকাশ সমান আমার। (১১২)

ওই আকাশের প্রান্তরায় ফিরে আসে যেদিন সন্ধ্যে
একা ফিরে পাস তুমায় তখন কি আর তোরে আমি ?
তুমি আমি, আমি-আমি, তোমার তোমে তোমাই হয়ে
তখনো আমার বাঁধনে যে আজ সেই ফিরিয়ে আনিবে। (১১৩)

এই বাণীর গানে চাহিয়া চাহিয়া তখনের মন কি বলবেই কবিয়া উঠিবে,—

এই যে ফিরিয়া তোমার তুমের আমে আমেনিয়া—
তুমার আর তোমেরিয়া কাঁদে আজ পৌষ,
ফিরে-আসা আমার তুমে
তুমেরি আজ আমার তুমে
সকলের সেই আ তুমে যে আমার তোমের তরে
যে আমে তো ফিরিয়া তোমে তখন-তুমের আমে
আমে আমে আজ সকলের
উঠে ফিরে এই ফিরে
তুমেরেরি আমে। (১১৪)

আই তুমে-তুমারের গানে চাহিয়া তখন আজ তবে আমের তীব্র আমার তোর আমের তুমিরে গান আর সন্ধ্যাতুমিতে আমি তাঁর তোমের কবিয়া আমে,—

আমি তোর একদা তোমেরি আমে
ফিরিব এ আ—

এই তুমে আমি তুমার :
ফিরিব আমি তোর তোর
নদী আজ উঠিয়ে আমার
একলা যে ফিরে আমিরিব
আকাশ ফিরিবে এসে তোমে তোর ফিরে
তুমি আমি ফিরিব আমি আর
তুমি আমি তুমি আর আর
একদিন ফিরে, আর একা তোমার ফিরে আমার
ফিরে ফিরে আমির তুমে ! (১১৫)

সে একদিন সাঁঝ তোমারে
আমি তোমারে এসে,
ফিরে আমি আমার তোমি
তুমারে আর তোমে
ফিরে তুমারে
তোমারে আমার ;
তুমিরা আর ফিরে আমার তুমে চলেছে
আমার তো আমার আমার আমিরে আর তারে
ফিরে আমার তবু আজনীরে
"ফিরে, এ আমি ফিরে ?" (১১৬)

আমি তব তুমারের গানে আজ তুমি আমার
আমুমের এ তোমার আমিরে তুমিরার আমি
আমার আর আমিরিব আমিরেও তোমে তোমেরেরে
আমার কি তোমার ওই তুমারে তুমির তুমের
তুমার আমরি তব আমারের তোর আমার
আর যে আমির তবু তুমারে আমার আমার ! (১১৭)

(৩)

তুমারী রবীন্দ্র তুমের ফিরে চাহিয়া আমাকে তুমারে বিরোধাভাষী বলিয়া আজ তবিয়া লইতে পারেন, কিন্তু তুমার এই রবীন্দ্র আমিকে তুমারেরতা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারেন নাই। সমগ্র বিশ্বের আমার বৈশিষ্ট্যের মূলে তিনি এক মহাশক্তির সত্তা ও লীলা তীকার তবিতেন,—

আমার ফিরিয়ে যার
ফিরিয়ে তোমে তোমার

[illegible]

[illegible] (১২)

[illegible]

[illegible] (১৩)

[illegible] (১৪)

[illegible] (১৫)

অনন্ত জীবন-ধারার স্রোতে অনন্ত ব্যক্তি মুহূর্তের বুদ্বুদের মত ওঠে আর মিলায়, সাক্ষীর পায়ে ফোন ক্ষত হয় না, তাদের লীলায় ফোনো ত্রুটি হয় না। কিন্তু ব্যক্তির তাহাতে কি হয়? ব্যক্তি-জীবনের সমস্যার তাহাতে এক কণাও সমাধান হয় না যে। পাশ্চাত্য সাক্ষী সত্তেও অনন্ত ব্যক্তির আত্মাভিব্যক্তির জন্য আপনার লীলাকে বার বার অভিনব চলিয়াছেন, কিন্তু ব্যক্তির তো তাহা আনন্দলীলা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির এ যে বার-অভিযান, সেই কথাটি কবি এক নিমেষের তরেও ভুলিতে পারেন নাই।

[illegible]

[illegible] (১৬)

[illegible] (১৭)

[illegible] (১৮)

ওমরের আই-যাবের মূল কথাটিই এই লীলাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই লীলাতত্ত্ব আমার বৈষ্ণবলীলা তত্ত্বের অনেক বড় তত্ত্বের উপর (আই-যুগের অভিব্যক্তির উপর) প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিতে পারি। আর বৈষ্ণবেরা রাধা-লীলার বর্ণনা যে জীবও এই লীলাতত্ত্বের সহচরী হইয়া সমাজে লীলাসংগ্রহ হইতে পারে। তখন কিন্তু তাহা জীবাত্মার বন্ধের নাই যোগাও। বরং তিনি বলিয়াছেন, যতদিন তুমি 'তুমি' আছ ততদিন তুমি নির্বিকারে নিরুপায়ে লীলারসের অনাদি ধারার চালে চলিতে থাক, ততদিন তোমার কোথাও একটুকু স্বাধীনতা নাই, স্বতন্ত্রতা নাই!

[illegible] (১৯)

[illegible]

[illegible] (২০)

মানুষের এই স্বাধীনতা-দীনতাই ওমর খৈয়ামকে ব্যথিত করিয়াছে। মানুষ তাহার সমস্ত জীবনের প্রযত্ন দিয়াও যে ভাগ্যলিপির একটি অক্ষর মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না, ইহাই ওমর বিশ্বাস করিতেন। তাই ছোটো ছোটো পাপের জন্যই তিনি মানুষকে দায়ী করিতে পারিতেন না। ওমর একজন জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন, বোধ করি তাহারই ফলে ওমর আরো বেশি মাত্রায় অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই নিখিল ভাগ্য-বিধাতার পানে চাহিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

ওগো আমার সকল সাধে দুখি
কাদাল দুঃখে সকল সুখে
কীসের লিখন ভাগ্যে আমার
বলবে লিখন মুছি ?
কখন আমি ঠিক করি না তাহার পাছি লাগি,
লিখন শেষে তখন কিসের প্রয়োজন ওই লাগে
তখন এ ভাঙা মুকুর ভাঙিলেন—
পরম আমার ভাঙা কিসের লাগে ! (১১)

ওমর মানুষের হীনতা পাপ ও পতনের মূলে তাই দৈবনিয়তিকেই প্রেরণা যোগিয়াছিলেন, মানুষকে কিছুতেই সেজন্য দায়ী করিতে পারেন নাই,—

আমারে হীনতা দুখি তখন কেন,
তোমারই লিখন যা কপালিনু
আমারে তখন হীন ও অধম :
যা কিছু আমার কলঙ্কিত মানুষ মুখ
সে তোমারই ভুল :
আমি তার মানুষের নয়ে
আমি তখন তোমা হীন যা কিছু পাছি ! (১২)

নিজেই আমার সে যে আমারে এ যেন নিলাজ
আমি যেন তোমারই নিকটে যেতে চাই
তাহার তখন দীনী তোমা ?
যে আর পাছে না তোমার যেন
সে যেন তখন পাছে যেন তা নিয়ে সে তখন ;
এ তখন মুখের যে পাছ ?

নিজের মানুষকে তাহার ভুলভ্রান্তির জন্য অপরাধী করিতে পারিতেন না বলিয়াই তিনি বিশ্বস্রষ্টাকে যত-তাহার যেন করুণা করিতে পারিতেন না। তিনি দর্শনশক্তিমান তিনি অসহায় ভাগ্যতাড়িত মানবের উপর কৃপাপরবশ হইবেন, ওমর এটিই সমস্ত বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন, তাই তিনি বলিতেন, ওগো খৈয়াম, আমাদের প্রতিদানে আমার দেবতা কি তোমারে সাজে, (১৩) যারা আছ তাদের কি বলিয়া তুমি পাছি দিবে, খৈয়াম ! (১৪) পাপী বলিয়াই তো এমনে তাহাদের আরো বেশি অধিকার !

যে আমার মালাকেরা !
কি তার তোমার বলে
দিবে এই মুকুরে করিয়া নিজে ?
আমার আমার তোমার তোমা ভালো অসুখ মধু
তোমার কি অসুখ হয়ে পায় বধু ?

আমি আমি—এই বলে মুকুরে তো,
আমি আমি পাছি তোমা তোমার কি সাজে ?
তুমি যে সকল-পাত্র, তোমার নাম
আমার আমি যে তো মুকুর হয় সাজে ? (১৫)

মানুষকে বিধাতা আমার, দৈবের ক্রীড়নক যার মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই এবং তাহাকে বিধাতার ওপের বিধাতা অযোগ্য মনে করিতেন বলিয়াই মানুষের মানবনাকে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। আর, ওমর অন্য কারণেও মানব-ব্যক্তিত্বের চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যেই তাহার সুখের সেন্সেস আমর-সীমায় আসিতে না আসিতেই জড়িয়া চুরমার হইয়া যায়, তাহারি জন্য তোমো অজ্ঞাত লোকান্তরে, মৃত্যুর পরপারে বিশ্ববিধাতা স্বর্গচিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্যও ওমর কোনো সময়েই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। স্বর্গ নরককে তিনি মানুষের মনের খেয়াল মাত্র বলিয়া জানিতেন। তিনি জানিতেন, যেখানে আনন্দের অনুভূতি সেখানেই স্বর্গ, যেখানে দুঃখ অনুতাপ সেইখানেই নরক। বাহিরে সেই স্বর্গ-

এমন কোথাও নাই, যেখানে ভবিষ্যতে মানুষের অন্তরে, তার সুখ-দুঃখের অনুভবে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন,—

পড়িবে কিনু একদিন
আমার আসনে সেই পরিত্যক্ত
দূর অনুমেয় পথ—
অনিবার্য জীবনের ও-পারের দুর্বোধ তত্ত্ব ;
সেদিনি আর যেন আমা এসে নিয়ে
ফেরে মম ঘরে—
এত যে আমী
আর ও কাজ তব একান্তের আমি ! (১০৪)

দূর হতে অনন্ত পরিচয় যদি
মোছনির যেন নিরবধি
আমারে করিয়া রাখে-অন্বিত
আমারে না ঘিরিও মৌন.
হৃদয়ে যে স্বপনো নিবা যেন-মম—
সেই ছবি মোরার আর কাজ নাহি ;
আমারে দাও এই জীবনে আমার ধ্রুব
এই ও সত্য তব মর্মি ! (১০৫)

(১১)

পরলোকের সান্ত্বনায় যাহার চিত্তের পিপাসা শান্ত হইল না, বিশ্বরহস্যের চিরন্তন দুয়ারে যাহারা করাঘাত করিয়া যে জন ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিল, মৃত্যুর বিশ্বয় ঝুলিয়া যাহার অন্তর বিরহ-ব্যথ-বিষ হইয়াছিল, জ্ঞানবিজ্ঞান ও লৌকিকের পিপাসায় যাহার অন্তর খাক হইয়াছিল, যাযাবর বৃত্তি যাহাকে কেবলি লক্ষ্যহারা করিয়া বাহিরে টানিয়াছিল, সে জীবনকে কেমন করিয়া অনুভব করিল ?

এই বিশ্ব-সংসারের চিরন্তনত্বের মাঝখানে তাহার একটিমাত্র সত্তা অন্তরে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যাহা বিশ্বের নিয়মে লয় পাইয়া যায়, একমাত্র জীবনী-শক্তিরই জোরে এই পাষাণশালা বিরাজমান হইয়া রহিয়াছে।

যেন মোর এ জীবন সমস্তের তরে
নিত্য আর অটল তবু আমার দুটি হাত ;
আমার পায়ে রয়েছেনাকো যেন
একটুকু ও সংশয়
একলক্ষ বৎসর আমার
আমার বুকটি যেন অবিশ্বাস সন্দেহ-বাণী হেরে
ভয়ের সঙ্গে যেন সংকোচে আর
প্রতিটি মুহূর্তে যেন এ-প্রাণে আমার
মোর শেষে ফুরে যেন যায়
আমি কি ভেবেছ ? (১৮)

আমি অন্তের অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে এই যে পাষাণশালায় দুঃখের কালযাপন ইহার চেয়ে মানুষের বিরাট আর কি সত্য আছে !

হৃদয় যেমন হৃদয় খোঁজে যাই
আমি যে আর নাই ;
অন্তর তবু অন্তর মোর এমনি এই গানে
হয়ত হবে এ জীবনে কত ও কিছু আরো। (৩)

তাই ওমর স্বাক্ষ দিয়া বলিলেন,—

অন্তর আমার, তবে আমার ভরা সন্ধ্যার ক্ষণ
ফিরবে কি তব ;
জীবন-সন্ধ্যা মৃত্যু এখন আসে,
আমারেই যেন তবে সব কিছুর অনুভবে। (১)

সব-সখী আজ-শয্যা, আমার সাথীরাই যারা
জীবনী-ভোরে ধরা সকলেই আজ নিয়েছে,
আমি যদি আজকের দুঃখ এ ফেলে যাওয়ায়,
অন্তিম ভবে ধরা আমি আছি এ ধরার ধরা। (১০৬)

জীবনী-শক্তির এই ধ্রুব গান করিয়া ওমর জীবনের আর সব শোক দুঃখ ক্ষয় ভাবনা বিস্মৃত হইতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য এই পাষাণের ওমর জীবনী-শক্তিকে ধ্রুবার সহিত তুলনা করিলেও ওমর নারীকেই ধ্রুবতারাদিনী সাথী বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন।

জীবনের অন্তরাত্মার দুর্বোধ ভাষা
নিয়ে এসে এসে মোর দুয়ারে আজ
এসে পরিচয় দেয় আমি এ আজ
যে আমা অন্তিম আর দুর্বোধ দুঃখ সুখের।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

পাশ ফেরে হাত ধরি মুখে
দুটিতে হয়ে এক দেহ মিলায় সুখে। (৮৭)

বন্ধুপালের কাছ ওমর লোক-সমাজে মিশিয়া হইয়াছিলেন, এবং ওমর নিজেও অন্তরে অন্তরে একটু লজ্জিত হইলেন বলিয়া মনে হয়।—

দূর এ গান-গজল ছুড়ে ফেল সবই আজার
মাতিয়ে। দুখন-ফাঁদে
প্রমদ ফুলির পরিলোভ
বিলাস নিয়েই থেকে প্রমদের ও বিশ্ব দুখের। (৮৮)
তবু আর প্রমদের উপাসনা হায়
কবিতার তোমরা আরাধ্য
এই এর বিনে মোর
নিত্য নিত্য অন্তরাত্মা প্রবাসিনী হায়। (৮৯)

এবং ওমরের অন্তরাত্মা

প্রমদার
দুর্বলতা জানে—
এই মোর জিনি দুখের!
আমার তরে এ অন্তর।
এ বিশ্ব,
অন্ত অন্তর নহি আমার
এই হায়, দুরাইয়ে প্রাণ
পরমায়ু আমার প্রমদ
আমার-সুখ বহু প্রমোদের পরমে নহে!

এই অনুরাগ ওমরকে এক এক সময় খুবই বেদনা বিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, যদিও তিনি সুরাপানে জীবনের নিরাশ অনুভূতিকে বিস্মৃত হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন, তবু জীবনব্যাপ্ত অজ্ঞানের অন্ধকারে তিনি এক এক সময় নিরাশাই অন্তরে বলিয়া আপনাকে বুঝিয়ে পারিতেন। তোমরা সুরা এবং সাকীই যেন তাঁহাকে তখন আর পাছে ফিরিতে পারিত না। ওমরের চিরসঙ্গের যোগল বন্ধুবরটি যখন বলিয়া পঠিত তখন ওমর বলিতেন,—

এই যে তবু পাইনে খুঁজে
জীবনে মোর যেথায় যারে
অন্তরাত্মা বিমল সখী
একলা বেঁধে যেতাম তোরে।
বুঝি আজো সময় আছে
ফিরিয়ে মোরে আনতে।
দূরে গেলেও সখা তব
ফিরতে তবু দূরের ডাকে।

ওমরের জীবন-দেবতা বিশ্বরূপি কেমন করিয়া আসিয়াছিল যে বলিবে! ওমর জীবন ভরিয়া দুখের সন্ধান করিয়াছেন, এই পৃথিবীর ইন্দ্রিয়-সীমায় যতটুকু সম্ভব ওমর তাহাকে নিঃশেষে পান করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। জীবনের নিত্য বহমান যে প্রেম তাঁহার অন্তরে নিত্য অভিসারিণী রাধাকে তিনি পাস করিতে পারেন নাই। এই বঞ্চনার বেদনে হইতে নিজের সহিত চির অন্তরালে রাখার দিনে যত সাধ হইয়াছিল প্রিয়াকেও সঙ্গে করিয়া সেই অন্তরালের সাথী হইতে,—

ছিলাম আমরা সবে সাগর পরিমাণ জীব
বিন্দুর অন্তরে যদি কেহের অন্তরে
সেই কেন জীবনে দিব!
সদা সাথেরা মনে
যদি মোর তুমি সনে
পরিতাম পরিতে দুজনে
আমার বেদির আসি—ছিলিত যে মোর স্বপন
উদাস হইত আজ দুটি বাঁশি সুর
ঈর্ষা হত জীবনের সহিত বিলাস
সুখী হত আজ উভয়ে!

কিন্তু তাহা যে হইবার নয়! ওমর কিন্তু তা বলিয়া প্রিয়াকে সকল আনন্দ বিসর্জন দিয়া বঞ্চিত জীবন যাপন করিতে কখনো বলেন নাই। তাই তিনি তবু মিনতি করিয়া বলিয়াছিলেন,—তবুও প্রিয়া—

...এসো, দেখিব
দেখি যদি হয় মনে
জীবনের সাধিবে স্বপন
দেখে যদি আজানার-ধন
তোমার আসল প্রয়োজন,
যদি আমা ছাড়াতেও ছড়িবার আসনা আছে!
এখনি যদিও তোমা আজন বিদায় আজ দুখি
এস তবে ফিরে মোর
আসনে আমারি দুখি।
তবুও হয়তো দিন
বিদেশিনী সুখ আজ পাস। (৯০)

দুজনের আসনে তবু ঈশ্বরের আসন আজে
তবে তোমা তবে বাস দুখি তবে তোমারে আজ,
বিশ্ব দুখির চিত্রে আমিত্বের আজ-সত্য সুখ
দুখিনার আসনাতে বিশ্বে আজ দুখানুভূতি দুখ,
আমাদের আসনার দুজন আসনা আজি বিশ্বে
তবে আজ তোমাদের ও একটি আসনি আজার
আজ তোমে আজে আজে আসনে দিও, তোমে দিও
তোমাদের আজ তবে আজ-সত্য তোমে আজিও।

পারস্যালার পানের সাথীদের বিরহী ওমর চিরকালের জন্য এই বিদায়ের বাণী বাণিকা গিয়াছেন!

মানুষের মূল্য

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী—কলিকাতা

এই শুধু বলিবারে চাই—
সকলের মূল্য আছে, মানুষের মূল্য কিছু নাই।
কোন্ কবি বেয়ালের বশে, কবে হায়, গেয়েছিল গান—
"অমর মরণ মোরা অমর-সমান!"—
হায় কবি, নিদ্রাহীন চির-নিশি দেখেছ স্বপন—
মরণের পরপারে উজল ভুবন!
তার মনে জেগে ছেল চির-রাত্রি, কিবা জেগে রবে;—
দুঃখ দুঃখ চলে যায়, নব কবি গায় নব রবে
সেই পুরাতন কথা।...
রাত্রি নাহি শেষ হয়—না ফোটে প্রভাতি রাঙ্গিমা!

আমি আজ বলিবারে চাই,
পুরুষের মূল্যহীন এবা—মানুষের আর দাম নাই!
তাই তার এত হেলাফেলা
মানব জীবন নিয়ে চিরদিন ছিনিমিনি খেলা।
জীর্ণপত্রে পুঁথির বিধানে—
তারো মূল্য আছে, আছে তাহারো সম্মান!
কীট-খাই বস্তির পুঁথির আছে দর আছে ঘরিদার,
কোটি কোটি মানুষের জীবনে ব্যর্থতা ঘটিবার!
সুদীর্ঘ কালের নির্দেশের ফেরে
মানুষের প্রেম ভস্ম, প্রাণ ভস্ম, মতি ভস্ম—মানুষ না ফোঁকে মানুষের।

প্রত্যহের প্রাণের আবেগ—
আলোকের আনন্দের বেগে চঞ্চল চির-অস্থিরবেগ!
যৌবনের রূপে ভরে জেগে ওঠে যাহারা নারী,
জীবনে যেমন তারা এক ধারাধার হতে অন্য ধারাধারে পড়ে ঝরি!
সেই জীর্ণ পত্র মাঝে জীবনের ছন্দ নিয়ে চলে লুকোচুরি;
মানুষের জীবনের নব নব সুখস্বপ্ন এঁকে নিত্য নব চক্র নূতন আঁকনী!
মানুষের প্রেমের নিকটে মানুষের জীবনের দাম
প্রেম নিত্য অক্ষয়রূপে নব নব আসার ও জীবনস্বভাব।

বিশ্বিতারে বিশ্বমুখ করিয়া সাদর
রূপে রেখে পূজা হয় তার, খ্যাতি হয় নব অবতার!
রাষ্ট্র-ধর্ম-শাস্ত্র-গুরু-মন্ত্র-তন্ত্রে দিয়া সিংহাসন
ঘর-ঘরে গড়িয়েছে মানুষের শোক-শাসন!

আমি আজ চাহি তার মাঝ—
কোন্ সুখে মানুষের জীবনের কেবা দিল সায়?
কে রচিল উচ্ছন্নের ভাষি,
জীবন কেবল দয়া, নাই নাই সব কিছু বাঁধি!
জীবন ভরিতে হবে আলোকে পুলকে প্রেমে প্রাণে
জীবন-বিরুদ্ধ যাহা মিথ্যা তাহা নাই তার মানে!
শত শত পাপ চেয়ে একটি জীবন মূল্যবান!
রাষ্ট্র নাশি নয় কেহ, মানুষের নাশি তার প্রাণ!
সৌন্দর্যবোধে সম্পদের হর্ষটির যদি অবরোধ
জীবন জীবন নহে—শুধু প্রকৃতির প্রতিশোধ!
কোন্ দুঃখ লভিল, গুধাই?—
বিদ্ধ করি মর্ম করি নহে—পূর্ণ করি জীবনেরে চাই?
সুখে দুখে নব নব স্বর্গ-অধিকারী
মানুষেরে করিল কৃপাই—মিথ্যা তারে করিল ভিখারী;
ক্ষুদ্র দিন লোভাতুরি মাটির পুতুল
মানুষ তাহারো লাগে ক্ষুব্ধ, নয় সে তাহারো সমতুল!
জীর্ণ হাট-মাঠে-ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে—
করিল তাহারো লাগি, বহু যত্ন, বহু আয়োজন!
ওই বুঝি স্বর্গ গেল, মানুষের চোখে নাই নিদ,
দেখে না সে স্বর্গ তার জীবনের ছিঁড়ে ফাটে সিঁধ!
মানুষে মানুষে যদি স্বর্গ থাকে, হয় স্বর্গহীন;—
স্বর্গ ঠেলে নরকের পথে নির্মোহ দুর্বাসার ঋণ!
স্বর্গ? হায় নয় চোখে দেখি, দেখ তার তলাবহ রূপ?
জীবনের বক্ষ মাঝে সে যে—নরকের কঙ্কালের স্তূপ!
তার লাগি আত্মদান! বলিদান! স্বর্গহীন-যাগ!
জীবনের সাধ আজ জীবনে করেছে আগুসার!
ক্ষুদ্র দিয়া তারের কানুন—
মানুষ করেছে স্বর্গ, স্বর্গ করু নহেনি মানুষ!

কিছু এর চাহো মূল্য আছে—হাসে-কিরে দেখ করা চাই,
মানুষের কোনো মূল্য নাই!

মানুষের গড়া বিদ্যা জ্যোতিষ্কের সীমা
তারাদের বর্ণালী আজ, ওজনে মহিমা!
তারো লাগি নৈশাকাশ পুষ্ট হয়ে বড় দৃষ্টি তার,
লাখনের ভাল ছাড়ি ভাবারি পথে!
একদল মানুষের সর্বনাশে ভরিয়া ধরিত্রী
জীবন্ত অন্নের মত বেলাভূমে রাখে তুলসিত;
চিরবন্দী হিংস্র পশুগণ—
মানুষের মারিবার তরে তাহাদের জীবন কেবল!
দেশের সম্পদ ধন, সৃষ্টি ধন, ধন কিছু যত
সব ঘিরে চলে শুধু মানুষ-মারার আয়োজন!
মানুষের মারিবার তরে মানুষ জোগায় রাজকর,
মানুষে খাটায় মাথা,
ঘরে যদি হিংসা-পাপ, মানুষের জীবনের সাথে—
নব নব অস্ত্র গড়ি বিজ্ঞানের ছলে
মানুষের বানায় বর্বর!
পৃথিবীরে ভাগ-যোগ করি মানুষ রচিল নানা দেশ,
দেশে হতে দেশে যদি যাবে
কেন নাহি যায় বন্ধুভাবে—
কেন পরে ছাড়-পত্র-মাখা দেশভেদী জ্ঞানের বেশ!
পাশের বাড়িরে দিল কিনা মানুষ মারার বড় ঠাঁই,
বাড়িরো ঘরেছে কিছু দাম, মানুষের কোনো দাম নাই!

কখনো ওনেছ তারো মুখে—
মানুষে খেয়েছে বাঘ, ভালুক ভালুকে,
মানুষ মানুষ খায়, খেয়ে খেয়ে যাবে প্রতিদিন—
রক্ত খায়, মাংস খায়, খেয়েছে খেয়ে করে খুন,
খায় অন্ন-আত্মা, খায় জীবনের অন্তিম নিশ্বাস—
অবশেষে জীবন কঙ্কাল ফেলে যায়, তবু কি বিশ্বাস?
হাড় যেন যেন ক্ষয়—ভাঙাচোরা, ক্ষত প্রাণে প্রাণে
মানুষে প্রত্যয় কর মানুষের চেয়েছে নিশানে!

মানুষের জীবনের খেলাঘরে খেলা
খেলায় ভেঙেছে দুই বেলা!
যদি কেহ তুলি ঘরে দিয়ে থাকি অবহেলা ভাঙা—
আমি সাথে রহে যেন দুনিয়ার ঝিক্ক অভিশাপ!
তখন আসিয়া তারা বসায় সংসার
তার বক্ষে রহে যেন বিলাসের বিষম বহ্নি!
সে সংসার বিলাসীর নাহি মমতার রস যেন জানি,
নারীর নারীত্ব সেথা নাহি পুরুষের যেন অবমানি!
অন্তরের মুক্তপ্রাণ পুরুষ নাশ হয়ে নারীর পরশে,
দুর্বার জীবন মোর টেনে নিয়ে চলে যেথা মরু
ফুল ফুল ভরি নিয়া চুমে নারীর পদ-নিল,
নিয়া যেথা অত্যাচার,অনাচার ধরিত্রীর লীলা!
মমতার রস-হীন জীবন-যৌবন
বিশ্বাধিপ পায় যেন অধিকের তুচ্ছ প্রয়োজন!

আর যারা অগণিত নয় মর্মরোজ্জ্বল বন্দিতের দল
কোথা তারা সে সংসার কোথায় তাদের ঠাঁই বল্?
পথ-পাশে—সেই পথ নিত্য হয়ে অগণিত নিষ্পেষণ,
প্রাসাদের নীচে—অগণিত যা বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরি যায়,
সেথা ঐ দীনহীন দুটি আত্ম ভয়ে মারামারি
দুয়ারের আড়ি আজ—ওই তারা সমের ভিখারী!
সহসের রক্ত ঝরি একজন পুষ্ট করে দেহ,
ধনীর প্রাসাদ গড়ে আড়ি লক্ষ দরিদ্রের স্নেহ!
দৈত্য-জীর্ণ লক্ষ মাঝে প্রাণ-জীর্ণ মানুষের দল
জীবন্ত মরণে করে জীবনের সাধি কোলাহল!
তুমি যদি ইহাদের তরে আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
অন্ন চাই, চাই বাস্তু, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
ইহাদের মুকে ভাষা, মূক মুখে ভাষা দেওয়া চাই!
আমি বলি, ইহাদের জীবনের কোনো মূল্য নাই!
মানুষের মানুষ শিকারী—
নারীর করেছে খেলা, পুরুষের করেছে ভিখারী!

সাফল্যের কারণ

ঐহিক জীবনে যারা সফল হয়েছেন, তাদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে সাধারণ লোকের বুদ্ধির অথবা অসাধারণ কোন-কিছুর উপর তাদের সাফল্য নির্ভর করে না। যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁর কারণ, তাঁদের চরিত্রে এমন কয়েকটি গুণের বিকাশ হয়েছে যা সাধারণ লোককে আকৃষ্ট করে ও তাদের প্রীতি ও সহানুভূতি উদ্রেক করে। অপর কোন সাধারণ অর্থে আমরা এই বৃত্তিগুলিকে social intelligence বলতে পারি। এই বৃত্তির বিকাশ হলে আমরা অপর লোকের মন বুঝে চলতে পারি। সেই হিসাবে যে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হলে আমরা উচ্চ ও গভীর ভাব গ্রহণ করতে পারি তাকে abstract intelligence বলা যায়। Abstract intelligence থাকলে আমরা বিজ্ঞানের রাজ্যে অজানা সত্যের সন্ধান পাই, বাস্তবিক জগতে সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি। Social intelligence আমাদের কাছে ঐহিক জগতে সুখ সমৃদ্ধির পথ খুলে দেয়। অনেক অভিজ্ঞতার পর জানা গেছে যে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের চরিত্রগত পার্থক্য পরীক্ষোত্তীর্ণ অধিক পরিস্ফুট হয়। এই জন্য Washington Universityর কর্তৃপক্ষরা প্রতিবছরে নোতুন ছাত্র ভর্তি হবার পূর্বে নবাগত ছাত্রদের social intelligence নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন, ও প্রত্যেক ছাত্রের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের কি বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত তা স্থির করেন। ছাত্রদের social intelligence মাপবার জন্য University's Psychology Department কতকগুলি test স্থির করেছেন। এ বছরে যে সব ছাত্র Universityতে যোগদান করেছেন, তাঁদের সকলকেই এই পরীক্ষা দিতে হয়েছে। অপর কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরাও তাঁদের ছাত্রদের এই পরীক্ষাগুলি দিতে বাধ্য করেছেন। আমেরিকার কয়েকটী বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরাও দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য নোতুন কর্মপ্রার্থী নিয়োগ করবার সময় দরখাস্তকারীদের এই পরীক্ষাগুলি দিতে বাধ্য করেছেন।

যে শক্তিকে আমরা পূর্বে বোঝাতে চেয়েছি তাঁর চেয়েও ও বড় অর্থে তাদের ক্ষমতা social intelligence-এর একটি প্রধান লক্ষণ। যাদের এই ক্ষমতা আছে তাঁরা সহজেই অপর লোকের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারেন। এরই লোকের সঙ্গে তাঁকে আমাদের পরিচিত করে দেবার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ পরিচয়ের পর কোন লোক আমাদের মনে মনে দেখেছে দেখলে আমরা সকলেই খুশী হই। একজন বড় salesman আমাদের মনের এই স্বাভাবিক দুর্বলতাটুকুর সন্ধান জানে, তাই সে কোন স্থানে গিয়ে তার ভাবী ক্রেতাদের নাম মনে রাখতে চেষ্টা করে। প্রাচীন বিশ্ববাসীদের সময় থেকে রাজ-

বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এই দুর্বলতাটুকুর সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন।

নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি থেকে লোকের ভোরা আর বাঘ মনে রাখবার ক্ষমতা জানা যায়। যিনি ভোরা মনে রাখতে পারেন, তিনি প্রায়ই বাঘও মনে রাখতে পারেন। অনেক সময় দিন দেখা যায় যে ভোরা মনে আছে কিন্তু বাঘ মনে নেই। ১০০ জন লোকের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বাঘ মনে রাখার চেয়ে ভোরা মনে রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ। একটি দোষ ১২ জন লোকের মধ্যে ৩ জনের বাঘ দেখা যাবে। ভিন্নটি দেখে এই ১২ জন ও অপর ৬ জন লোকের ভোরা দেখা যাবে। পরীক্ষাকারীকে ভিন্নটি ছবি থেকে ৯ মিনিটের মধ্যে প্রথম ১২ জন লোককে বেছে বলতে ও তাদের নাম বলতে বলা হয়।

আমাদের বৈজ্ঞানিক জীবনে যে সব সমস্যা আমাদের মুখোমুখি আসে, দুর্ঘটনোত্তর পরিস্থিতি সেগুলির সমাধানের কথা বা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার ক্ষমতা social intelligence-এর আর একটি লক্ষণ। কোন ব্যক্তির এই ক্ষমতা আছে কিনা জানতে হলে তাকে অনেকগুলি situation ও প্রত্যেক situation-এর একটি করে সম্ভাব্য বা solution দেওয়া হয়। দুর্ঘটনোত্তর ও মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতা না থাকলে সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত। পরীক্ষাকারীকে এই ৪টি উত্তরের ভিন্ন থেকে একটি নির্বাচন করে দিতে বলা হয়। ৪ মিনিটের বেশি সময় দেওয়া হয় না। যেমন :—

I. While burying their uncle, Tom proposed to four of his cousins that each deposit $4 in their uncle's casket. When the other four had dropped $3o, Tom took $3o and put in his check for $100. Tom's conduct was due to (i) Craftiness, (ii) Ancestor worship, (iii) Devotion, (iv) Superstition.

II. The bodies of an unscrupulous politician and a woman (not wife) were found in a lonely forest. The man was shot twice, the woman three times. Prints of a sharp heel were found on the face of the murdered woman. The person who committed the murder was :—

(i) A lover of the murdered woman.

(ii) Wife of the murdered man.

(iii) A political opponent.

(iv) A fanatic reformer.

আমাদের মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তখন মুখে তার ছাপ পড়ে। মুখ দেখে লোকের মনের ভাব বোঝা social intelligence-এর আর একটি লক্ষণ। একটি দেখে হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষা, আশা প্রভৃতি আমাদের মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশক ১২ খানি ফটো যাবে। পরীক্ষার্থীকে প্রত্যেক ছবিতে মনের কোন্ ভাবটি ফুটেছে বলতে বলা হয়।

আমাদের কথা থেকে মনের ভাব নির্ণয় করতে পারাও social intelligence-এর আর একটি লক্ষণ। হতাশা, দুঃখ, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, ঘৃণা প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশক বক্তব্যগুলি ফোটোগ্রাফ তুলে নেওয়া হয়। একটি একটি ফোটোগ্রাফ মনের কোন্ ভাব প্রকাশিত হয়েছে পরীক্ষার্থীকে তাই বলতে হয়। যেমন :—

(i) He has a very ancient fish like smell.

(ii) Nay then, my last hope is gone—
I can fight no longer.

(iii) When I make up my mind to do a thing it gets done ; and this is one time that it is going to be done my way.

Washington University-তে ৫০০ জন ছাত্র ও ৫০০ জন ছাত্রী এই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ফলাফল থেকে দেখেরা এই পরীক্ষায় অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। Woman's intuition-এ যারা বিশ্বাস করেন, তাঁরা এই পরীক্ষার ফল দেখে আশ্চর্য হবেন না। Havelock Ellis ও "Greater affectability of the female mind" প্রভৃতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নারীর এই যৌবনের কারণ কি? অনেক গবেষণার পর Dr. Moss এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পৃথিবীর প্রথম থেকেই দৈহিক শক্তিতে নারী পুরুষের থেকে হীন। পুরুষ যা দৈহিক শক্তির সাহায্যে করে, নারীকে তাই করবার জন্য কৌশলের সাহায্য নিতে হয়। পুরুষ প্রবল, তাই নারীর পক্ষে পুরুষের আদেশ মেনে চলা ছাড়া উপায় নেই। পুরুষ অসন্তুষ্ট হলে জীবন-যাত্রা পরিচালনা করা চলে না, তাই বাধ্য হয়ে নারীকে পুরুষ যা চায়, ও তার মেজাজের সময় যা পরিবর্তন হয় তা মুখের মতো বুঝে নিতে হয়। পুরুষের বিরক্তি উৎপাদন না করে, তাকে দিয়েই নারীকে তার ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে হয়। খুব সম্ভব এই যৌনতার পরে নারী তার intuition বিসর্জন করতে বাধ্য হয়েছে।

(Scientific American).

অগস্ত্য—

বৈদিক ঋষি আর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চেয়েও আর্যধর্ম ও সভ্যতা ভারতবর্ষের বাইরে বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁরা যে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন, পথের নিশানাটিকে তার আগ দেবার জন্য তাঁরা সমুদ্র পার হতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। পঞ্চমের একটি সামান্য উপনিবেশ থেকে আর্যধর্ম অল্প কালের মধ্যে আর্যাবর্তে ও দক্ষিণাত্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। সত্যিকে কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসীরা আর্যদের প্রাধান্য স্বীকার করে নি। পরে পরে তাঁদের নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছিল। পুরাণে আমরা এই আর্য-অনার্য সভ্যতার সংঘাতের পরিচয় পাই।

বিদ্যা-পর্বতের পার হতে যাঁরা দক্ষিণাত্যে আর্যধর্ম ও সভ্যতা বিস্তারে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগস্ত্যকেই প্রধান স্থান দেওয়া যায়। অগস্ত্য নামে সত্যিই কোন লোক ছিলেন কি না, পুরাণের মতন কেন করে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে আর্যধর্ম ও সভ্যতা দাক্ষিণাত্যে ও ভারতবর্ষের বাইরে কি ভাবে প্রচারিত হয়েছিল, তার কাহিনী থেকে আমরা তা জানতে পারি।

অগস্ত্য কাশীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তিনি যে সময় বেদ প্রথমে বিষ্ণু-বাহনধারী লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন। এই প্রচারের জন্য তিনি বিদ্যা-পর্বত পার হয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন, তার পরে আর উত্তর-ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নি। খুব সম্ভব এই থেকেই "অগস্ত্য-যাত্রা" কথাটির সৃষ্টি হয়েছে।

অগস্ত্যের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান এক অবস্থাযুক্ত ছিল। তিনি সেগুলিকে মানবের বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। রামায়ণে অগস্ত্যাশ্রমে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র তাঁর কার্যকে অগস্ত্যের কার্যের সহিত তুলনা করেছেন। "অগস্ত্য যেমন দাক্ষিণাত্য আর্যদের বাসোপযোগী করেছিলেন, আমিও তেমনি নিজের সমর কর্মের দ্বারা লঙ্কাকে বাস করে যোগ্য উপায় করেছি।" (লঙ্কাকাণ্ড) দাক্ষিণাত্যে যাবার সময় তিনি অনেকগুলি আশ্রম স্থাপন করে গিয়েছিলেন। এগুলি থেকে তিনি কোন্ পথে গিয়েছিলেন জানা যায়। বর্তমান নাসিকের (Nasik) কাছে এই রকম একটি আশ্রম আছে।

অনার্য জাতিরা অনেকস্থলে আর্যদের বাসযোগ্যগুলি নষ্ট করে দিত। অগস্ত্য তাঁর তপঃশক্তির প্রভাবে মালদূরে (Malkut) দু'জন অনার্য বীর ইলবল (Ilavala) ও বাতাপিকে (Batapi) বশীভূত করেছিলেন। তৈলঙ্গিক বিবরণে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা অগস্ত্যকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের সাহায্যেই সেই দেশে আর্যধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল। দক্ষিণ দেশে তিনিই প্রথমে শিবপূজা ও আদুর্মের প্রচার করেন। তামিল ভাষায় ব্যাকরণ গ্রন্থ ও তমিল বর্ণমালাও তিনিই উদ্ভাবন করেন।

তাঁর ১২ জন শিষ্য ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁর নামে অনেকগুলি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানকার লোকেরা বিশ্বাস করেন যে মুদালিয়ার অন্তরীপের নিকটে পদিয়াই (Padigai) পর্বতে তিনি এখনও বাস করেন। তাঁর বংশধর লোকেরা এখনও জীবিত আছেন।

যবদ্বীপে বিষ্ণুপূজা ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রবর্তন অনন্তরে সেখানকার অধিবাসীরা ক্রমে দেবতার মতই পূজা করতে আরম্ভ করেছে ও এঁর অবতার Cucuএর সৃষ্টি হয়েছে। বেশীরভাগ এঁর মন্দিরে আজও অনন্ত মূর্তির পূজা হয়।

অধ্যাপক ও সন্ন্যাসী বিদ্যারত্নের জন্ম তিনি সমুদ্রপথে বিদেশে যাত্রা করেছিলেন। গুরু-মুখে পৌরাণিক বিষয়টি থেকে জানা যায় তিনি কম্বোজ দেশে (Cambodia) গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ঐহিত্রিক বংশের অধোষধীকে বিবাহ করেন, ও এঁরই সাহায্যে ত্রয়ীবিদ্যা করেন। তাঁর পুত্র নরেন্দ্র বলে এই রাজ্যের অধীশ্বর হন। কম্বোজের বিভাট শিবমন্দিরগুলি তাঁরি প্রেরণায় নির্মিত হয় ও তাঁর বংশধরেরাই এগুলির যাত্র-ভার নির্মাহ করতেন। তাঁদের মুখেই তিনি বিষ্ণুর কয়েকটী নব মৌর্তির কথা শোনা গেছে। এগুলিতে তাঁদের রাজার পৌরাণিক বিবরণ আছে। খুব সম্ভব দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও ভারতেতর যে সব রাজ্যের তিনি ও দক্ষিণ দেশের কোন অধিবাসীই এই মূর্তিগুলি শ্যাম দেশে (Siam) নিয়ে গিয়েছিলেন।

পুরাণের কাহিনী থেকে জানা যায় যে অনন্ত পৌণ্ড্রিক (Borneo) সুবর্ণদ্বীপ, (Sumatra) ও তাঁর মহারাজ্যের অন্য দ্বীপগুলিতে ধর্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। জাভাতে (Java) তিনি ভদ্রলোক (Bhadraloka) নামে একটী মন্দির স্থাপনা করেন। তাঁরা দ্বীপে অনন্ত পোত্রের ব্রাহ্মণেরা একটী উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের মতন জাভা দ্বীপেও তাঁকে দেবতার মত পূজা করা হয়। প্রথমে তাঁর মূর্তি চণ্ডল-আকৃতি নির্মিত হতো, পরে প্রস্তর-মূর্তি তৈরী করা হয়।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই জাভায় অনন্ত-পূজা প্রবর্তিত হয়। জাভাবাসীরা ভারতবর্ষ থেকেই এই পূজা-পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জাভা দ্বীপে এখনও অনন্তের অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অনন্ত মূর্তির সঙ্গে এগুলির বিশেষ পার্থক্য নেই। আকারে তিনি শিব-ও বা হরিহর-ও মনেই পরিচিত।

জাভার এই অনন্ত-মূর্তিগুলির মধ্যে Progo নদীর ধারে অবস্থিত Tjandi Banonএর মূর্তিটী সর্বাপেক্ষা সুন্দর। এই মূর্তিটিতে নিপুণ শিল্পী অনন্তদেব পাশে, লোল জিহ্বা চক্রমার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। Indo-Javanese ভাস্কর্যের এমন উৎকর্ষের সময় খুব সম্ভব এই মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল। Boro-Budurএর বৌদ্ধমূর্তির চেয়ে এ মূর্তিটি কোন অংশে হীন নয়।

অবশ্য দেশে আর্য সভ্যতা বিস্তারে তাঁর প্রধান শিষ্য ভগবান কৃষ্ণবিষ্ণুর অবতারের মধ্যেই সাহায্য করেন। দক্ষিণ ভারতবর্ষে ইনি কৃষ্ণমূর্তি নামে পরিচিত। তাঁর দ্বীপে ভগবান কৃষ্ণবিষ্ণুরও কয়েকটী মূর্তি পাওয়া গেছে। একটী মূর্তির গায়ে দেবনাগরী অক্ষরে তাঁর নামও খোদিত আছে।

Sir Stamford Rafflesএর মতে (১৮১৭) অনন্তই জাভার হিন্দু অধিবাসীদের প্রধান দেবতা। তাঁর পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পূজা পান। তাঁর সাহায্যে জাভা দ্বীপে আর্যধর্ম ও সভ্যতা প্রচারিত হয়েছিল বলেই খুব সম্ভব অনন্তকে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে।

জাভায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য তিনি ভারতবর্ষ থেকে অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণের সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। অনন্তের কথামত রাজা Aji Jaya Baya (জয়বাহু) মহাভারতের কথা সেই দেশের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। জাভাবাসীরা মনে করেন যে মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী তাঁদের দেশেই ঘটেছিল।

অনন্ত শুধু দক্ষিণাত্যেই আর্যধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার করেন নি, ভারতবর্ষের বাহিরে "বৃহত্তর ভারতের"ও সৃষ্টি করেছিলেন

—(O. C. Ganguly. Rupam).

শ্রীযামিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক

ভাবের অভিব্যক্তি

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—এলাহাবাদ

আতঙ্ক—

আর কথা শুনে হাসি পায় মনে।

দেখি সম্মুখে এ কি বিভীষিকা!

অনুশোচনা—

শেষে এ কি করলুম!

শোক—

হে ভগবান্! আর কি তাহারে পাব না জীবনে!

বৈষম্য

(উপন্যাস)

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—রাজশাহী]

(৯)

পৌষ মাঘের পর যায় অভিক্রম করিয়া সুখী চলল ধরিত্রীর মত ছুটিয়া চলিয়াছিল, যেন তাহার ভাবাবেগের বাষ্প তাহাকে এমনি করিয়া সজোরে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

গ্রাম যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার একটু আগে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, ওঁড়িটার কোন স্থানেই সিন্দুরের লেপ দিতে বাকি ছিল না। সুখী প্রণাম করিতে গিয়া বুঝিতে পারিল যে সে বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িল।

সেই গাছের নানা শাখা-প্রশাখে ছোট-ছোট ঢিল বাঁধা ঝুলিয়া রহিয়াছে, অথচ করিলে দুইশত পাঁচশত হওয়া বিচিত্র আশ্চর্য নয়। সুখী ভাবিল এক-একটি ঢিল এক-একটি অপূর্ণ মনস্কামনার নিদর্শন। যাহার মানত পূরিয়াছে সেই আসিয়া সিন্দুর লেপিয়া পূজা উদ্‌যাপন করিয়া গেছে।

সেও একটি ঢিল তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে একটি ডালে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, বাবা, তুই যদি আমার মনের আশা পুরিয়ে দিস্ তো—আমিও একদিন এসে তোকে খুসী ক'রে যাব।

তাহার পর সে বসিয়া পড়িয়া হাতের চাঁছির চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া ফেলিয়া বাঁ হাতে লাল সুতা বাঁধিল। যেখানে প্রণাম করিয়া বলিল, কি আর বলবো তোকে—সুখী বড় ছোট, বড় গরীব—তার কথা মনে রাখিস্।

হঠাৎ তাহাকে যেন কাহার উল্লাসে পাইয়া বসিল। বিদুরেই রোষের জন্য রোষ মানে না। নিজেকে শত প্রশ্ন করিল; কিন্তু বিদুরেই এই আকস্মিক আঘাত কারণ সে খুঁজিয়া করিয়া উঠিতে পারিল না।

বাসী সুখীকে বড় ভালবাসিত। সব কথা শুনিয়া তাহার আনন্দে দুই চক্ষু ভাসিয়া উঠিল। বলিল, দেখ সুখী, আমার নিজের আছে পাঁচ টাকা, দু'মাসে যতো যেটে জমিয়েছি—সেটা তুই নে, আর পাঁচ টাকা আমি যার ক'রে এনে দিচ্ছি, যেমে হাতের চুড়ি আমি দু'মাসের মধ্যে 'উদ্ধে' দেব; কেবল তুই লছমনকে বলিস্, মন থেকে তুলে দি ওটা তোমার ক'রে আবুক্তে। তাহাদের ওটি একটিতে তেমন যেলে না।

আশাতীত টাকা পাইয়া সুখীর পা দুখানি আনন্দে যেন বাইয়া চলিল। বাসীর সাহ্য মিষ্ট ব্যবহারটি মনের মধ্যে বার-বার চিন্তা করিয়া হৃদয়খানা তাহার ভরে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন না হইলে কিসের বাসী,—কেহই বা সে মার 'বহিন' হইতে যাইবে?

খানিকটা আসিয়া সে জঙ্গলের পথে প্রবেশ করিল। জন-মানবহীনতার শুরু-গাম্ভীর্য তাহার এলো মনটিকে চাপিয়া ধরিয়েছিল; যেন কেমন ভয়-ভয় করে। সেই ভয় দূর করিবার জন্য সে গুন্-গুন্ করিয়া গান ধরিল, কিন্তু তাহাতেও স্বস্তি বোধ হয় না, তাহেই, সে পলা ছাড়িয়া দিল।

প্রয়োজন হইলে সুখী গান চলা করিয়া গাহিতে পারিত। সুর তাহার জানা ছিল, পলাটি খেলোয়াড়ের শাণানো তরোয়ালের মত সব দিকে ইচ্ছামত ফিরিয়ে-ঘুরিয়ে। তাহাতে কথা বসাইয়া দিবার অমৃত শক্তি সুখী যে কোথা হইতে পাইয়াছিল তাহা সে জানিত না। যখন উপযুক্ত কথাটি হৃদয়ের দুয়ার ঠোকে-ঠোকে বাহির হইয়া আসিত—তখন সে বিস্ময়-ভরে সেদিকে চাহিয়া থাকিত,—এ তোমার

ভাল—আমার মুখ দিয়ে মানিক, তুমিই কথা কও!

সুখী যে কাণ্ডটি করিয়েছিল তাহার মূল বস্তুটি এই :—

ওরে বেহায়া, ওরে বাঙালের মানিক, তুই এই জনের মধ্যে একলা ব'সে করিস্ কি? আমি তুই কথা বলছি না, তবুও আমি তুই কি করিস্—তোর বরষার জলের ঘুন্-ঘুন্ শব্দ ভাল লাগে যে; তুই—সবুজ-পাতার আড়ালে লাল ফুল ফুটিয়ে রেখিস্ সে কত ভাল লাগায়!

হঠাৎ এতখানি হইতে একটা গোঙানির শব্দ শুনিয়া সে চম্‌কাইয়া উঠিল; এতো মানুষের আওয়াজ!

ফিরিয়া দেখে খাটিয়া উপর বুদ্ধুরাম অচেতন অবস্থায় পড়িয়া, তাহার নাক-মুখ দিয়া ফেনা বাহিরেছে। অদূরে ঘোড়াটা তখনো দাঁড়াইয়া আছে—পিঠে জিন ও লাগাম নাই।

অবস্থাৎ এই আপদে সে স্তম্ভিত-দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার পর, কেবল একটা ভয়ে তাহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া মনে হইল, সেখান হইতে পলাইয়া যাওয়াই ভাল বোধ হয়, কারণ মানুষ মরিলে শেষে পুলিস তাহার খোঁজই লাগাইবে। তাই, দুই-চার পা ছুটিয়া যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল, কিন্তু তাহাতে মানুষ মরা অবশ্যম্ভাবী। তখন সে সাহস সঞ্চয় করিয়া ফিরিল।

বুদ্ধুরামের মাথার কাছে বসিয়া নিজের কাঁচল দিয়া ধীরে ধীরে সুখী বাতাস দিতে লাগিল। এই অবস্থায় রোগের জন তাহার দুই ঘণ্টা কাটিয়া অতীত করিতে লাগিল।

ক্রমে গোঙানি কমিয়া বুদ্ধুরামের অবস্থা নিরাপদের মত শান্ত ভাব ধারণ করিল। সুখী মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইল এবং সে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঘটি বোঝাই করিল।

অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল, হয় ত' মাথায়-মুখে জল দিলে উপকার হইবে। বরষার ঘুন্-ঘুন্ শব্দও শোনা যায়—কিন্তু কিসে করিয়া জল আনিবে?

পাশ দিয়ার করিবার জন্য উঠিতেই দেখিতে পাইল যে একটি ছোট বেহুর মধ্যে একটা ভাঙ্গির হাঁড়ি ঝুলিয়া আছে। তাড়াতাড়ি সেটিকে নামাইয়া সে বরষা হইতে জল আনিয়া বুদ্ধুরামের মাথায় ও মুখে সেচন করিল।

চক্ষু তাহার দুই তিনবার পলক করিয়া চোখ খুলিয়া গেল। সুখী ব্যস্তভাবে চারিদিকে দেখিয়া সকাতরে বলিয়া উঠিল।

তাহার পিপাসায় গলার নাড়ি পর্যন্ত যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন, একটু জল দে—একটু জল—…!

সে-কথা শুনিয়া সুখী এবার খুশীতে হাসিয়া উঠিল;—সে জানিত, বুদ্ধুরাম তাহার ছোঁয়া জল স্পর্শ করিবেন না এবং কেমন করিয়া সেই জল তাহাকে স্পর্শাইবে জল, সেই ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করিয়া রেখে? সে অত্যন্ত আকুল হইয়া—আরো একটু নড়িয়া গেল।

সুখী, কই জল দিলি রে?

সুখীর মুখ কাঁপিয়া গেল, হাতে একটা ভাঙ্গির হাঁড়ি, আমার ছোঁয়া জল যে—

তাই তুই যে, কিন্তু সেবা হবে না—প্রাণ যে যায়!

ব্রাহ্মণ-সন্তানের পবিত্র মুখ-বিবরে অন্যান্য জাতীয় মানুষের স্পর্শ-দূষিত কোন কি নিম্নস্তরের প্রাণীর জল কখনো যায় নাই যে, আজও অন্তরের মতই মানুষকে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে পারে!

জল-পান করিয়া বুদ্ধুরাম অনেকটা সুস্থ হইয়া বসিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। সুখী—সুখী, আমার বাড়ী নিয়ে চল্।—তাহার দুই কপোল উজ্জ্বলিত অশ্রু-ধারায়-সিক্ত হইয়া গেল।…আমি আর বাঁচবো না…—…তোর জন্মের আবেদনটিতেই স্তীত-স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সুখের সুখীর মুখ যেন ফাটিয়া যায়। তাহার ইচ্ছা হইল যে, বুদ্ধুরামের মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলে, কথা, তার কি তোমার? এই আমি ত আছি। কিন্তু অন্তরের হইতে কিসে যেন সে-সব ভাব শিহাইয়া গেল!

নারী-হৃদয়ের কল্পনা-সংসারের মেঘ-কয়খানি ছুটে-ছুটে ছুটে, তবও ফুরিতে পারে না! এবি বিচিত্রতা! মানুষের পাশব লোলুপের ভাষার কতটা শক্তি ঈশ্বর করিয়া তাহারা দিয়া দিয়েছে!

দাম্পত্য-জীবনের ভালো-চামড়ার তলে যে তপ্ত কীট-সমূহটি আছে—তাহাকে টেনে উদ্ঘাটন পর্যন্ত-প্রমাণ! তাহারই উদ্ঘাসে সুখীর নাক-মুখের রঙ্গ-গুলি যন্ত্র হইয়া যায় আর কি।

সকালে জয়াবতী সুখীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। স্বামীর নিকট আসোপান্ত সকল শুনিয়া তিনি বোধ করি, সুখীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সুখী আসিলে, কয়েকটা হাসি আদু এবং অরি-পক্ষ সংহার ইঙ্গিতে পরিবে বলিয়া মনে-মনে ভাবিয়া লইলেন, হাজার হউক ভাত-কর্মের লোকই ত তাঁহার বটে!

অকলে একটা সিন্দুক থাকা ছিল, ঘাটে তাহা চলে নাই। সেটিকে নিজের কি না তোলা-পাড়া করিয়া জয়াবতী প্রায় সপ্তাহখানি হইয়াছিলেন। এমন সময় সুখীর হাতের ভাল সুতার উপর নজর পড়িতে—হাঁহাঁ, কেমন সিরিয়া উঠিলেন; ওকি গা, হাত-খানি ক'রেছিস কেন? —জামায়ের হাতে জয়তা করেছিস্ বুঝি?

সুখী একটু লজ্জিত হইল, কথার উত্তর না দিয়া—মাথা নাড়াইয়া জানাইল, না।

তবে?

টাকা কর্জ্জা করেছি।

মুহূর্তে জয়াবতীর মুখ উজ্জ্বলে ভরা হইয়া উঠিল। বিস্ময়-পুলকে তাঁহার অনেক উপর দিয়া বহিয়াছিল—সুখীর টাকা ধার করিতে আসা, তাঁহার ঋণ প্রত্যাখ্যানে। তাহার পর সরলা এতো-স্ত্রীর হাত-খানি ধরিয়া টাকা সংগ্রহ এবং সর্বোপরি মুক্তহস্তের মুক্তার দ্বার হইতে ফিরিয়া আসা—চমকিয়া বলিয়া ফেলে; জিজ্ঞাসা করার মনে-মনে যাঁচার করার অভ্যাস পর্যন্ত তাঁহার ছিল না—তাই মনের উদ্বেলতায় চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সুখ হতভাগীর অকল হইতে আজ মুক্তির কামনা অপূর্ণ রহিয়া গেল! জয়াবতী ভগবানে অন্তর নমন করিয়া রাত্রিদিনের অন্তর দুই হইতে আত্ম-রক্ষা করিলেন।

জয়াবতীর মনের মধ্যে সকল দিন ধরিয়া শুভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ চলিতে থাকিল; যে নারী সীতার মত সাধ্বী, সাবিত্রীর মত সতী—যাহার হৃদয়ে পতির দীর্ঘ পরমায়ুর নিত্য কামনা সদা-জাগ্রত,—কি অধিকারে তাহারই বিপদ পদে-পদে! আর যে পতির কোন মন্দ যোগে না, যে বিনা কলহে, সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গভাবে, হাত খালি করিতে এক দিন দুঃখ বোধ করে না—তাহারই স্বামী—অন্তর অব্যাহত থাকে পর বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে! এ যে ঘোর কলি!

ভাগ্য-দেবতার অবিচার বিচার! জয়াবতীর মনে বারবার প্রশ্ন উঠিল, এ কি? কেনই বা এমন হয়? মনের নিভৃততম কক্ষ হইতে বহু-যুগীর সুরে একই উত্তর ধ্বনিত হয়—অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট!

অভাবের ঘোরে কি মন্ত্র, মানুষ এমনি করিয়াই চিন্তা করিতে থাকে বটে! চিন্তার যোলক-বীর্যের অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে অবসাদের আর অবধি থাকে না, তখন ভাগ্য-বিধাতার চরণ-তলে আবেদন রেখা। নামাইয়া সে বলে, তোমার অসীম শক্তি, তোমার অব্যাহত প্রতিপত্তি, তোমার বিচিত্র বিধান, তুমি তোমার অন্যায়—অন্যায় যে আজও-অদৃষ্ট!—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক;—এই শুধু তার আমি আর বহন করিতে পারি না—আমাকে নিষ্কৃতি দাও!

অদৃষ্টের আবরণ, এমনি করিয়া কত ভাগ্য-মন্থন, দুঃসহ-দুষ্করের গাঢ়-আষাঢ়া, মানুষের অজ্ঞাতসারে বাড়িয়া উঠে! অথচায় পথ চলিতে অকস্মাৎ একদিন যেটা আমাদের গোচর হয়—তাহাকে লইয়া বিস্ময়ের অন্ত থাকে না! তখন আমরা তাহাকে জানা পাওনার জন্য আহ্বান করিয়া বলি, আহা, যদি তুমি আমারই হও ত' আমার কাছে কেন্দে জিজ্ঞে হও, আমাকে সার্থক কর। সে যদি আসিয়া বলে, উঁহু, তাই-বা কেমন ক'রে হয়!

বহু আলোচনার পর বিনায়ে অন্নদাসীর মন একটা নিরপরাধ নিশ্চয়তায় আসিয়া বিশ্রামের জন্য ঝোঁকিয়া পড়িল, সুখী আমাদের অন্তরের ভাইবোন হারে ঘোর চুকি বাঁধিয়া রাখিয়াছে !.....কিন্তু সে কেবল সহীর অপরিসীম স্নেহের জন্যই সহি সুদীর্ঘকাল পেরেছেন।

সহীর মাতে অন্নদাসী বর্ষ-চক্র প্রবর্তন করিলেন; লছমনের সংবিধানে তাল বজায় না রাখার জন্য—আদি ভাল-মন্দে কথা না।

সুখের ভিতরে "কেন ?" তুলিয়া অন্নদাসী দুই হাতে এমনি অন্ধ ঘাঁটা করিলেন—যাহাতে মুহূর্তমধ্যে ঐশ্বর্যের ঘরই ভাঙিয়া যাইতে হইল।

সুখের ঘোর-ঘোলানোর হইলেও নারী-বুদ্ধির ঐশ্বর্য আঁচড়ে ধরিয়া চলে। কোন সন্ধি-দিন সেই বঞ্চিতে নিজের ভাঁড়ার ভরিতে ইচ্ছুক নহেন! অন্নদার ধন-চিন্তিবার সেবারে বড় অন্ন হইল। কতকটা দুই-পুরুষের নব-চক্রের ফুরে তাহার আমার অন্নদার জোরে? তাই বধূমাতা বলিয়াছেন, চাচা,—আপন প্রাণটা ধরে।

মুহূর্তমাত্র প্রাণে-প্রাণে বুঝিলেন, আসল আমাদী লছমন নয়; সুখীর অন্তরে যে কি, তাহাও মন ভেদে তিনিই আবিষ্কার করিয়া! সুখীর প্রতি প্রত্যেক-রাত্রে অন্নদাসীর মনতা যে এই উপায়নার কারণ তাহা নির্ধারণ করিতে তাঁহার বড় বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় নাই।

তাকুরে মুহূর্তমাত্রে বকা-চকা করিতে রাজি করিয়া ছিলেন। ওইরা-তাইরা, দুই-একটা ভাইলে অন্নদার করিয়া বিদু দিন কয়টি না, যাই সময় জিনিকোটাকে গীত এক রহিত করিয়া আবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহার মনটা অনিশ্চয়নে ক্ষীণ হইয়া উঠিল। সন্ধাই কি একটা আন্দাজের পাত্র তিনি? মন কঠিন হইয়া উঠিল—মনে-মনে বলিলেন—ঠিক কথা বলেছেন কিন্তু—সত্য যৌবন যৌবনের—পত্র ত' নয়, প্রণয় নেন, চির-যৌবনে, ও ফেন যাবার নয়। অন্নদার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, বঁ, সতি পাগল মেয়েরা! আমার মাথা খাও বুদু!

অভিমানের ঘুম হইতে হঠাৎ ক্রোধ-বহ্নি মাথা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন অন্নদার মেউনি দিনের হাত পড়িল।

মেউনি দিয়া ঘোমটি অন্নদার দক্ষিণ হাত ঠেকাইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বহুত.....বহুত! মুখ কিন্তু বহুত তলিয়া গভীরে যাইয়া গেল।

একি? সেই নির্বাসন আজ্ঞা! প্রত্যেক, মাসের নয়—লছমনের!

সকলেই আশা করেছিল, সুখীর জন্যে একটা ছোট রকমের বন্দিনের বহুত আদি হইবে; কিন্তু একি! বিনা দোষে সাজাদান!

ক্রোধ রক্তের অন্ধ সন্ধান করিয়া মেউনি দিয়া অন্নদার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বহুতের বহুত আবিল হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

পরদিন প্রাতে লছমনের শিহনে শিহনে সুখী বধূমাতার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে পথে বাহির হইয়া গেল।

গাছ-পালাগুলাও যেন লজ্জায় মন বন্ধ করিয়া রহিল। একই কথা সকলের মনে জাগিয়া উঠিল, একি অবিচার, একি অন্যায়! কিন্তু তাহার মাথে দুইটা মাথা আছে, কে কথা কহিবে!

লছমনের মুখ গম্ভীর, চালের মত প্রশস্ত-উঁচু বুকখানা, দুই হাতের অবিচল আঘাত ধীরে ধীরে মনে হয়, এই সাধনার সংসারে সে চির-অভ্যস্ত!

সন্ধাই। এই কৃষ্ণকায় মাটি মুখ-মুখ ধরিয়া অন্নদার অন্নাগার ভরিয়া মুখ পাথর করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা জানে লছমনের সত্য-স্বরূপ কি! নিরীহের প্রতি উৎপীড়ন, দুর্বলদের পদ-দলিত করা, দীন-দরিদ্রের সর্বস্ব লুটন করিয়াও অন্নদার পুরুষত্ব কোন ক্ষুণ্ণ বোধ করে না!

সুখী! এই সন্ধাইয়ের ইতিহাস নির্মম আত্ম-প্রতারণার মর্ম-কাহিনী মাত্র! আসল অন্নদার মুখস, অন্নদার তাহার ক্রোধ-অন্ধ, অবিচার তাহার অধি-বস্ত্র!

কিন্তু এ-কথা প্রকাশের উপায় নাই। প্রথম প্রতিহিংসা পরায়ণ। তাহার আত্মবলিদানের কাছে অন্যের জীবন তুচ্ছের চেয়ে তুচ্ছ!

পর্বতের গুহা-কন্দরে, অরণ্যের নির্জন প্রান্তরে, মানুষের নিভৃত অন্তরে যে নিধি অন্ধ অন্ধকারে গোপিত রহিয়াছে, তাহা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস রচনা করিবার দিন এখনো সুদূরে, মানবজাতির এইখানেই সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য।

কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, কেন এই নিষ্ঠুর প্রাণিহত্যার প্রতি এই অহেতুক বড়াজ্ঞা হইল। শক্তিমানের শাস্তির বুদ্ধি বা এই নিয়ম, যে যত শান্ত সে তাহে না কি তাহার অপরাধ, কেন হত, কিসের হত, কি সে করিয়াছিল!

শক্তিমানের আদেশ পালন যাহারা করে তাহারা জানে প্রভু আমাদের প্রথম-প্রজাপালী, আমরা অন্ধ আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র; তেহু জানিবার অধিকার আমাদের নাই। জানিবার বাকীও সোল অনেক। প্রভুর নিয়ম যাই, তাঁহার ভুল নাই! মনের অন্ধকারে কাহার বা কি আসে যায়? কিন্তু একটুই, ইউক না কেন সে যত অবহেলার, যত কেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের—তবুও সে দুর্লভ, না জুটিলে যে সব অন্ধকার!

এ-ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো একটু বিচিত্র দাঁড়াইল যে, শক্তিমান্ মুহূর্তমাত্রও জানিলেন না—মহুয়া-সুখী কি দোষে বিষাক্তিত হইল!

মহুয়াকে শিকারের করিবার জন্য মাসের অন্তরের লজ্জা-ব্যাকুলতা কিন্তু ব্যর্থ হয় নাই! ইহাকে একটুর লাগলের ফলার দাগের তুলনা করিয়া দেখেন; যাহাকে উপর করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিলেই হইল! জীবন সাধনার ঘাত-প্রতিঘাতে সে কোন না কোন পথে নিশ্চিত সন্ধান পাইবেই পাইবে।

মুহূর্তের শৈথিল্য-চিত্ত অরণ্যের আড়ালে বসিয়া যেদিন প্রীতি-উৎসবে করিল যে, পিতা-মাতার সকল লাঞ্ছনার কারণ তাহাকেই নিয়াগড়ের ব্যাপারে, সেদিন যে অধির লজ্জা তাহার সমস্ত চিত্ত-মন ভুলিয়া ওঠানো কঠিন—তাহার তুলনা হয় না।

সেদিন মাঘেরী প্রথম-সময়ে নিজের যৌবনের ছবি চাহিয়া দেখিয়াছিলেন যে, বিশ বিবাহ তাহাতে একটি মুক্তমন্ত্র তার যোজনা করিয়া বিবাহিলেন; মেঘের ব্যবহার-মূর্ছনা অন্য কোনটির অপেক্ষা ন্যূন নহে! তাহার আরক্তিত যৌবনালায় সুখীর মুক্ত-ধন যে নূতন প্রেমোৎসাহ যোগ করিয়া দিয়াছিল—তাহার মূল্য-কলঙ্কহীন অমূল্য প্রভ!

অসমাপ্ত

জড়াও-মন্দিরে

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশী

১

ঢাকের বোলোয় শেষ চুমুক দিয়ে বন্ধু পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলেন। পাশে সেতারটা পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে বল্লেন—একটু বেহাগের আলাপ করা যাক্।

বন্ধু উস্তাদের সঙ্গীতের গান-বাজনার কথা হলে তাঁর আর জ্ঞান থাকতো না। সে সময় তাঁর চক্ষে যেন স্বর্গ-সঙ্গীতের আবির্ভাব হতো। তারতবর্ষের বিখ্যাত ওস্তাদ এহ্সান খাঁ, হসন পুত্র ইনায়েৎ খাঁ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আলাপকে, গায়োয়াজী মহলবাহার থেকে আরম্ভ করে মিঠাঞ্জির কন্‌ফারেন্স, ঠাকুর নবাব আলি চৌধুরী, চাতরতে ইত্যাদি মহাজনদের অদ্ভুত চরিত্র ও বিস্ময়কর গান-কলাপের বিস্তৃত বর্ণনা শুনতে শুনতে আমরা বিভোরা হয়ে পড়তুম। এর পর যখন আবার যন্ত্র-বাদিতের স্বরূপ ও নানা বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করে তিনি আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছিৎ জ্ঞান দেবার চেষ্টা করতেন, তখনও সময়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও অদ্ভুত বাক্‌চাতুর্য্য দেখে বিস্ময়ে আমাদের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হতো না।

সেদিন কিছুক্ষণ আলাপের পর সেতারটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ বন্ধু বল্লেন—কাল সকালে আমি আর আসতে পারবো না।

সকালের জমাট আড্ডা নষ্ট হবে ভেবে মনটা ব্যথা পেল। না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন—কাল স্নান-পূর্ণিমা। গঙ্গার ঘাটের উপর 'জড়াও-মন্দিরে' এবেলা থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকালে গানের আসর হয়। এবারকার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ও বাইজীরা এ কয়দিন সেবারায় মেতে গান জমাতে আসেন। আমি এখনিও এখান ছেড়ে যাই নি। কাল সেখানে-একবার যেতেই হবে।

আমরা সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। আমাদের সেখানে যাবার কোন সুবিধা আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় বন্ধু বল্লেন—হোটলার বারাণ্ডার টিকে কেলা—সেখানের জন্য অবশ্য সুবিধা আছে। শুনেই কাল সকালবেলার একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলা গেল।

পরদিন ভোরে উঠে ভোরের চা ও মোহনভোগ সৈরি করে প্রাতরাশের ব্যাপার সমাধা হলো। তারপরে সকলে প্রস্তুত হয়ে স্নানযাত্রার ঘাটে এসে উপস্থিত। নদী কৌতোর খোঁজে একটু এগিয়ে গেলেন। আমরা শীতলা ঘাটের চত্বরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ঘাটে তখন বেশ লোক জমে গেছে। মেয়েরা অনেকে স্নান সেরেছেন। দু-একজন পুরুষ স্নানান্তে সন্ধ্যাতপণ সেরিয়ে পূর্ণমুখ হয়ে তারস্বরে স্তোত্রপাঠ করছেন। একটিতে একখানা তক্তার উপর বসে একটি মহিলা বেশ নিশ্চিন্তভাবে স্নানান্তে কেশ শুকুচ্ছিলেন। আমার সঙ্গিনী একটু চঞ্চলপ্রকৃতি, বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা তাঁর ধাতে পোষায় না—তিনি মহিলাটির দিকে একটু অগ্রসর হয়ে গিয়ে জমাবার চেষ্টায় দাঁড়িয়েছিলেন—ইতিমধ্যে আর একজন বয়স্থা নারী এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন।

কিছুক্ষণ আমাদের নিরীক্ষণ করে তিনি বল্লেন—আপনারা স্নান করবার জন্যে আসছেন না কি?

সঙ্গিনী কথা বলবার সঙ্গী পেয়ে খুসী হয়ে বল্লেন—আমরা আজ বেড়াতে বেরিয়েছি। পরশুদিন ঘাটে ওই যে কি মেলা বসে—কি একটা যাত্রার আছে না? সেইখানে আজ স্নান-যাত্রা হবে—তাই দেখতে যাচ্ছি।

মহিলাটি এ কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। বললেন—ইস্কিন ত এখানে পথ ঘাটে কত্তাই না তাকি আছে—ঠাকুর-দেবতার ত একেবে লেখেই নেই—বলতে বলতে উঠানে যে ছেলেটি খেলা করছিলেন, তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়লো। সে দিকে একবার দেখেই তিনি চীৎকারে বলেন—দেখেন্! দেখেন্! এই সব মাগীরা ছেলেগুলির মাত্ত খেয়ে আমার ছেলে একেবারে মাটি করে দিলে! ঘরি আলা ওরে! বাড়ী থেকে এক পাবন্ বের হলেই ত হয়! আমরা ছোট আর কিন বছর ধরে এই কথাই ত বলে আসছি। তা নয়—ঘাটের মধ্যি দুবা দিদি করে যেন এসে পরার মানুষ হয়ে যেন আমা হচ্ছে! আজকালকার সব ফ্যাসন্! ফ্যাসন্!

মহিলাটি রাগের ভরে আর না থাকিয়ে হন্ হন্ করে জলের ঘাটে নেমে গেলেন। সঙ্গিনী আমার দিকে চেয়ে বলেন—ঘাড়াল্ কি না? ওরা একটুতেই খেপে একেবারে কাঁই! কলকাতায় আমাদের বাড়ীর পাশে এক ঘাড়াল্ বুড়ী থাকতো। তার এক এক দিনের ঘাত-ঘাতখানা যদি দেখতে—সে এক মহা ব্যাপার :—

ব্যাপারটা সত্যিসত্যিই মনুষ্যের আর সহ্য হলো না। পাশের ঘাট থেকে একটা ডুমুর গাছতলা ভরে আমরা চেয়ে দেখলুম—সেখানে পাকার সাহসে একটি বিধুমুখী বৃদ্ধ বসে আছে—তার সম্মুখে বড় একখানা পাকাকাঠাল উপরে কতকগুলি চাকা—আর কি কি সব উপকরণ, মাথাটি একেবারে মুড়িয়—মুখে খুব একটা ধীর অসহায় ভাব! তার পাশে আর একটি ছোকরা লোক—বুঝতে দেরী হবে—তার মুণ্ডিতা বেশ মাথাকোটা দিয়ে পরা—গায়ে একটা ধুতি ফোট—মাথায় টুপি, চোখাচোখা পাকার ঘোরের। তার পরে পাকা ঠাকুরের বিধান করা-কলাকলি সম্বন্ধে। আয়োজন বোধ হয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ছোকরা ও মাথন-ছোকরা সম্বন্ধে বৃদ্ধ কিছু বলতে হলো! বৃদ্ধের ছেলেটি বোধ হয় দুষ্টামির জন্য সব ব্যাপারটা দেখে নেবে চায়—পাকা তাকে উপর আসার ও অবশ্য এই ক্রিয়ার স্থানের ফলাফলের তারতম্য বিশেষভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। বৃদ্ধ আত্মহারা নিষ্পলক নেত্রে পাকাকাঠাল উপর রসধারা ফেলে চুপ করে বসেছিল—পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তির জন্যে উপস্থিত মাপার থেকে তার নিজের মুক্তি হলেই যেন বাঁচে—এই রকম একটা ভাব!

পাকা ঠাকুর উচ্চ রবের মৃদুস্বরে বিধির মুক্তি ও অনেক মুখাগ্নের অবতারণা করেও বিশেষ ফলিয়া করতে পারলেন না। বিশেষ বকাবকির পর অবশ্য পাঁচদিন! যৌ-হাল আর বাবা-আমা ছাড়ন-ছোড়ন এই যেটে মুখটাকেই বারি হয়ে খুব বিনীতভাবে বলেন—"আজে—ইদ্দে হামারা হয়লা তা হায়? হামরা বাল—ওইসা মুকল ভিলেজ—হামারা তা? হয়তাম্ লোগুয়া কলাপ তো ওয়াকে এনা মতি পাপ্তুয়া মাং মহুয়ারা—শুনো—যো মুহুয়ারা মরল—না শুনো মরি আছা! তারপর একটা মুখের মোড়া হাতে নিয়ে বলেন—যোলো—পিতা যাতা বাবামামী আউর যারা যৌন্ আছয়া মুখা পিয়াস মুহুয়া যায়—কাশীজী যে গয়াজীয় যে ছাড়ন তো হচ্ছে যে ইয়ে পিত্ আয় পাকোপর থেকে মুক্ত হো যাও—আপ্রে যেয়া কলাপ করো—মৃত তাঁর নির্দেশমত ফলাদাতা বিষ্ণু বিষ্ণু করে যত্ন পাই করে পাকাকাঠাল উপর মুখের মোড়া দিয়ে জল ঘুরিয়ে দিয়েই তিনি চীৎকার ছুটে। ছুলে নিয়ে অত্যন্ত ভক্তিভরে আর কতকগুলো মন্ত্র পাঠ করতে করতে মুখের পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে মাথন করে ওকাপাপে আছ করে ওপরে পড়লেন ও তাকে বলেন—যান্! যাও—যো পিয়া!

বৃদ্ধ ছোকরা খুব ভক্তি ভাবে দুজনে পালাপালিভাবে করার জন্যে তাদের দিয়ে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে এলো। মহাতীর্থে পিতার করে যে তার পূর্বপুরুষদের আত্মার মুক্তি সাধন করতে পেরেছে এই বিশ্বাসে তার মন তখন প্রফুল্ল—কথা তো ঠিকই—কাশীতীর্থে, গয়াতীর্থে ও সকলের উপর ত্রাহ্মণ ছাড়ন-যে এই মহা মহোপকার যোগ করে তোলা ও ক্ষেত্রে তখন আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে আর কি সন্দেহ থাকে?

মৃতের পূর্বপুরুষদের গতি সম্বন্ধে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা না থাকায় আপাততঃ তার মুক্তি হলো দেখেই

আমরাও বুঝ হয়ে গেলুম। সখীর বিদায় নেবে অন্যদের আমরা একটু এগিয়ে দেবো ঠিক করি—মোটা পাঁচ সাত বাড়ি ঠাঁকে ঘিরে আবছায়ে ঠেলাচ্ছে—কলকাতার বন্ধুর লোক দেখে তাদের হাড়ার মাত্রা অনেকটা বাড়ছিল। সখী বিদায় কাঁদায় পড়েছেন—তাঁদের বেটা না আমা ও হিন্দোস্থানের অবস্থিতিতার বন্ধ তাঁর অবস্থাটা সে সময় সত্যিকারের অভিযন্ত্রের মতই দাঁড়াচ্ছে হয়ে উঠেছিল। আমরা সকলেই হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, সেই সময় হঠাৎ পিছন থেকে আওয়াজ এলো। দাঁড়িয়েছি আওয়াজ—নাও কি হয়—বলছি কি হায়, ঘটনা বন্ধুর হোর হায় আছি সে আছে তো—বলতে বলতে একজন মাঝি এগিয়ে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

লোকটার চেহারা দেখে ও তার কথোপকথন আচার্যে মনে একটু ভরসা হলো। সখী বল্লেন—একখানা নৌকো ঠিক করা যাবে?

সে ব্যক্তি অত্যন্ত বিনীতভাবে সেলাম করে বল্লে—আপনারা যে মস্ত বোঝা ও হিন্দু নিয়েছে, উনি যে হায় খুশী হোয়েছে? তিনি যেখানে আছি আছি আপনি আছে তো উনুলাম্ব তা পুঁছ নিয়েছে কি বুঝ মাত্রা যে একটা নিলি সে হয়-হয়ার নিয়া কি দেবি?

দুর্বাসন্ধানে বুঝ কথিত 'আছি আপনি'দের মাঝিটার আমাদের জানা না থাকায় তার চরিত্র ও সততা সম্বন্ধে যাচাই করে নেবার সুবিধা হলো না—সে-ও আমাদের আবছে সময় না দিয়ে তাড়াতে আশ্বাস দিয়ে বলতে লাগলো—যে, বোড়াঘাটে তার বহুত হলেছ, 'বোড়া আম্ বাচ্চে' কোনো সে বহুত খুশে হাতের উপর 'খুশি' বিছিয়ে সব বন্দোবস্ত করে দেবে, 'আছি বোলতা' কোন কষ্ট হবে না, 'মনে মে' কোনো পার্বেন। কথা বলতে বলতে সে অগ্রসর হলো। আমরাও আমরা বিদায় নেবে পরিত্রাণ পেয়ে তার সঙ্গে বোড়াঘাটের দিকে অভিযান করলুম। নিকাশ হাত-ধাক্কা হয়ে নেবে আমরা মাঝিরা ঘর মাঝিরা খুব তাড়াতাড়ি তুলে করে দিলে। আমরা আর সেদিকে ফিরে চাইলুম না।

২

বোড়াঘাটে এসেই বুঝ কিপ্রহস্তে বন্দরের বড়ি খুলে বার করে বেলের ছোট্ট হাতের উপর রাখিয়ে দিলে। আমরা উঠে বসলে সে বিনয়ের আনাগোনা যে, তার মনে হচ্ছে আমরা তীর্থযাত্রী নই—বাঘী সহর দেখতে এসেছি।

সখী সে কথায় কর্ণপাত না করে আমায় বল্লে—বাঘী বড় 'পুরানা' সহর, এখানে দেখবার জিনিষ অনেক, আর সে সব দেখবার ও সন্ধান করে নেবার যথেষ্ট সময়ও আছে—অতএব আজ আমরা 'নয়া আদমী'দের কোন বিষয়ের চিন্তা নেই না। সে কিন্তু ও রকম লোক নয়। বড় বড় বড় সাহেব 'টাউরিষ্ট্ লোক্' (টুরিষ্ট) আসে সে তাদের এখানকার 'তামাম্ চীজের' খবর দিয়ে থেকে—এই কথা বলে যাত্রাপথের অন্ধ আমার চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে বক্তৃতা ভাসিয়ে দিলেন।

ঘাটের উপরেই একটা লাল ইটের প্রকাণ্ড বাড়ী—আমরা সেই দিকে চোখ রেখে বুঝ বল্লে—আপ্ ইধর দেখ্ সিধিয়ে—ইয়ুপুর কা মহারাজা মানসিং কা আবাসকিল্ আছেথে লোগ্ দিল্ কা বোলতা 'আপ্ আপ্ কোঠরি'।

বুঝের আশা ও বলবার কায়দা দেখে সখী বল্লেন—সে একেবারে আমাদের মাঝি ও গাইড্ দুইয়েরি কাজ করবে।

বুঝকে সে কথা বুঝিয়ে দেওয়ায় সে খুব খুশি হয়ে বলতে লাগলো—মহারাজ বাহাদুর ইস্ মঞ্জিল্ যে বড়া আদমি থাকিতিল্ তা কাহে বোলা যা—আইসা সব বড়া যা—কি উনুকা কিসুত্ সে থাকিতিল্ লোগ্ দিল্ যে কি আমা দেখলারা বহা—আপ্ উ সব্ দিল্ চলা গিয়া—খালি বাঘী পড়া যায়।

বিপুরা হৈহৈ ঘাটের অনেক বাঙালী মেয়ে আসা করছিলেন। বৌদ্ধ মেয়ে সখীর উপর তীরের খুব বড় কুকুর দেখায়—এখানে জলের ধার থেকে প্রকাণ্ড প্রাসাদ ও মন্দির যেন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—পর পারে বহুদূর-বিস্তৃত বালুকা চড়ায় দেখে সবুজ ঘাসপালার ফাঁকে-ফাঁকে গ্রামের আভাস—মনে একটা স্নিগ্ধ ধারণা হল—সামনে রাজঘাটের পোল যেন তাদের সীমা নির্দেশ করে দিচ্ছে।

ওরফে ক্রমেই কমে আসছে। ঘাটপাড়ার পাশ দিয়ে আসতেই দাদা একটা ঘাটটা দেখিয়ে বুড়ু বলে—বাবা ওখানেতেই না রাখেদি—সন্ধ্যে বা রাখাতো শুরু—উস্‌কা বদলে যে মহারাজ বেনারস কা মোকে-কি মতিন্—

আমরা চেয়ে দেখলুম, বেনারসের মন্দিরের মতন ছুঁচলো মাথার একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে এলে বুড়ু বলে—দেখী রাজেশ্বরী-কা মতিন্—দিন্‌দিন্ বাবা যে বাপনা কিয়া—

বুড়ুর বাক্যালাপে কথা বলবে না ঠেকে সঙ্গিনী হাসিয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন—ও দিন্‌দিন্ কি বক্‌-বক্‌ করছে তখন থেকে? একে থামতে বল না?

কিন্তু বুড়ুকে থামান সহজ হলো না। ঘাটের পর পেয়ে সে তার সমস্ত অভিজ্ঞতা অবিরাম আমাদের কানে ঢালতে লাগলো।

মনকর্ণিকা-ঘো-ঘাট আ গিয়া, জলদা ঘাট যেব্ দিখিয়ে—বলে সে তীরের দিকে দেখিয়ে দিয়ে চেয়ে দেখলুম—মণিকর্ণিকার মহা-শ্মশানে পাশাপাশি তিন চারটী চিতা জ্বলছে। পাটাতার উপরে মহারাজ আরও দুটি শব পড়েছিল। সঙ্গিনী সে দিকে চেয়ে সভয়ে বলেন—এখানে আসা বড় কষ্ট। উপরে দুটী মড়া পড়ে আছেন!

প্রভাতের স্বর্ণ-কোলাহলময় উৎসবের পাশেই এই নীরব কালের লীলা যেন কেমন বেসুরো বাজলো। বুড়ু বাঁয় ঘাটের বাইরে একবার সে দিকে চেয়ে মুখখানি খোলতর গভীর করে বলেন—এক্ রোজ সব্ কি বা এহি গত্ হোনা হায়! সো রোজ কা দুনিয়া-দারী সব্ ঝুটা—সব্ ঝুট ঝুটা—আর কথা শুনে সঙ্গিনীর চিত্তের কিঞ্চিৎ বৈরাগ্যের উদয় হলো—তিনি একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন—তা লোকটা বলে ভালো! ঐ যে সেদিন দুই গ্রামোফোনে কি একটা গান বাজাচ্ছিল—সেই আর কি! 'ওরে দু দিনেরি খেলা ০ ০ ০'

বয়সও হচ্ছে। এ সব ঘাটে বাঙালী আর দেখা যায় না। হিন্দুস্থানী মাঝারী তখনও স্নান করছে—পূজা পাঠ করছে, ছোট ছোট ছেলেরা মুখচোখ ঘোল জলে অভিষেক করাবার দেখবার জন্য হড়াহড়ি বাধিয়েছে। একটী শুকনাটি মেয়ে তীরে বসে মাটি দিয়ে মালা গড়ছিল—তার পাশে একটী ছোট ফুটফুটে মেয়ে আমাদের বজরার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা কাছে আসতে সে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে ছিপ্ ছিপ্ করে আমাদের সম্মান প্রদর্শন করলে।

ঘাটের উপরে একটী মন্দির—তার চূড়াটা সোনা-বাঁধান, তার পাশে তেমনি চারটে ছোট মন্দির। বুড়ু বললে—মহারাজ আহল্যা-বো-মতিন্—উস্‌কা বগল্ মে রাজা আলোয়ার মে মতিন বানায়া।

জলের উপর মস্ত বড় ঝুঁকে একটা রাজা ঘাট পাথরের মন্দির আর সব অনেক পাথরের ছোট ঘাট দুটি বসে গিয়ে জলের উপর হেলে পড়েছে—সেই দিক দেখিয়ে বুড়ু একটী দীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করলে। তার মর্ম এই—মহারাজ সিন্ধিয়া এ সব ঘাট বাঁধিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছিলেন। কাজ আরম্ভ হলো কিন্তু এখানে একজন 'বড়া ভারি সাধু মহাত্মার' আশ্রম ছিল। রাজার লোকেরা তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিতে বল্লে—কিন্তু তিনি তখন 'সমাধি মে' ছিলেন, কাজেই কোনও কথার উত্তর দিলেন না—আসনও ছাড়লেন না। অগত্যা, লোকেরা তাঁকে সেখান থেকে জোর করে উঠিয়ে দিলে। তারপর ঘাট মন্দির সবই তৈরি হল কিন্তু সাধুর অপমান করা হয়েছিল—কাজেই, সেই পাপে সব ধসে গেল।

গল্পটী শেষ করে উপসংহারে বুড়ু মন্তব্য করে—'সাধু মহাত্মা'দের 'অভিশাপ' বড় ভয়ানক জিনিষ—রাজা রাজড়া তাদের চালাকীই তাঁদের কাছে খাটে না। তারপর পাশের ঘাটটা দেখিয়ে সে বলে—মহারাজ অহল্যা-বা-মতিন্—

বুড়ুর বক্তৃতা চলছিল—সঙ্গিনী তখনও একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। সে থামলে তিনি বলেন—বড়নীর মরণটা দেখেছ? ওরা সব সমান! এই সেদিন মারলমাটে, এক ঝিনুকে বাণিজ, সে যা ভাত করলে! মণ্ডলো ঘাটেরো, তা বলতে একটু আমরা পাই নি, যে ফুলো, ঘাই বলেছি, ঘোমের মেপে

বড় ঘুলা যায়! এই আর কোথায় আছে? যেখে একবারে অবাক! বলে—বা! বা! আমার যেমে ঘুলো, কোথায় যেন বড় ভালো আছে! তার পর হঠাৎ কি যে বলুনী, আর তাই! বুঝতেও পারিনে ছাই! তা, রাজুরোর মেয়ে তো! কত আর ভাল হবে! চাচাই গলা ফেলে দিয়ে উঠে এলুম!

কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ একটা বাড়ী, খুব বড়—জমিদার খোয়াজিমার বা 'গদাইহন'—উনি বলে যে বাদপুর বা ফৌজদা সাহেব কো কোঠে—

আমরা সেই বিরাট প্রাসাদটির দিকে চেয়ে রইলুম। কিন্তু ঘরে আরও দুটি মন্দিরের ধ্বংসের চূড়া দেখা যাচ্ছিল, খুব সেইগুলি নিশ্চিন্ত ঘরে বলেন—ভৈরব লোক তা বলিল, বাবা নারায়ণ!

পঞ্চবটা ঘাট এসে পড়লো! অনেক মেয়ে-পুরুষ এই ঘাটে স্নান করছিল। জলের উপর বাঁধান ঘাট থেকে প্রায় তিরিশটা লম্বান ধাপ সাগরের সিঁড়ী উঠে গেছে, তার উপরে সিমিয়ার দেওয়ান স্থাপিত 'অষ্টাঙ্গ-মন্দির'।

এই মন্দির পাশে আর একটি বিশাল প্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল—তার চার পাশে আরো ছ-সাতটা অনেকটা জায়গা, আমাদের গাইড জানালেন, মারিয়াও সেপোয়ো এখানে এখানে 'বাগাজী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপস্থিত এ সব সিমিয়ার সম্পত্তি।

মজার ভীড় ছিলো! পঞ্চবটা ঘাটে বার্ষিকস্নানে বিশেষ মেলা। এ অঞ্চলের লোক মাস ছোট এই ঘাটে স্নান করে। তাতে আজ আমার পূর্ণিমা—গ্রামের আদর আজ বলে ঘাটে বিশেষ জনতা। স্ত্রী পুরুষ সকলেই গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে চলেছে। আমরাও মেয়ে পড়ে সেই পাষাণময় সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করে উপরে উঠতে লাগলুম।

৩

এ সব মন্দিরগুলি যেন বিভিন্নধর্ম বিশেষ। জলের ধার থেকে দু তিন তলা পর্যন্ত শুধু পাথরের গাঁথুনী, এই দুধারের সিঁড়ী ভেঙে উঠে যাবার পর একটি প্রশস্ত দালান, সেখান থেকে আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ী দিয়ে উপরে উঠে একটা বিস্তৃত চত্বর পাওয়া গেল। চত্বরের শেষ প্রান্তে মন্দির গাত্রে, তার দুধারে দুটি ঘরের প্রহরী মূর্তি, তাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও বাবরী ধরণের চুলের ছাঁদ যেন ঐতিহ্য যাদুর মনে হয় হয়। মাঝখানে পরে ছোট একখানি ঘরে মন্দিরের নিত্যপূজনের উপর থেকে পাথরের দুটায় লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তি,—নারায়ণের মাথায় সোনার কাজ-করা তাজ, লক্ষ্মীর গলায় মালা, চাঁদুর ঘরের প্রবেশ দ্বারে, নক্সা-করা মেঝের পাথরের উপর চুনি-পান্নার অলঙ্কার আজ, সকাল বেলার রোদের আভা অলঙ্কার-মণিদের উপর পড়ে সেগুলি উজ্জ্বল অনাবৃত আলোয় ঝলমল করছিল।

চাঁদুর দেখা শেষ করে আমরা পাশের সিঁড়ী দিয়ে দোতলায় মেয়েদের দর্শনার আসনার উঠে গেলুম। আরাকান ভিন্ন দেশ, মেয়েরা সবচেয়ে পাড়া, বিলুপ্তানী গুজরাটি, মারাঠী, বাঙ্গালী, প্রভৃতি নানা জাতীয় মেয়েদের সেখানে বিশেষ ভিড় দেখে গেছে। মেয়েদের ঘুলায় ঘুলর সকলেই এই মহিমাময়ের স্বর্গদ্বার পরিচ্ছি সন্ধ্যেবেলে মুখে ঘরে এঁদের পরিচয়ের বিশ্লেষণের সাধ্য ছিলিল। পরিবের বলনার মেয়েতে কাড়াকাড়ি বলা যায়। বিস্তর ঘরে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটু ফাঁকা জায়গায় সন্ধান করতে লাগলুম।

নীচের আসর থেকে তখন সারেঙ্গীর সুর বিহগের সঙ্গে বাঈজীর নিপুণ গানের সুর ভেসে আসছিল—

যব্ জাগো রে সাঁওলিয়া, যব্ জাগো রে সাঁওলিয়া—
যব্ জাগো রে—বাঁকেয়া!
সাঁওলি সুরত্ মোহনি মুরত্, জগো বীরো মে সাবারা,
সাবারা রে—বাঁকেয়া!

মুহূর্মুহু তালক-বিনিন্দিত 'বাহবা' 'কেয়াবাৎ' ইত্যাদি প্রশংসা ধ্বনির মধ্যে সেই সুমধুর সুর ওঠতে ওঠতে বারান্দার শেষ প্রান্তে সাবাস একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে আমরা সেইখানে বসে পড়লুম। মন্দির একটা নিবাস ফেলে তখন নীচের আসরের দিকে মনোযোগ দেওয়া গেল।

হলের বাসবাসে আসে, চারপাশের বারান্দায় যারে দর্শকদের বসবার স্থান আগে থেকে পূরণ করা হয়েছে। একজন মাঝে মাঝে বারেন্দ্রী বাজাচ্ছিল—আর পাশেই বসে থাকিয়া সিংহেশ্বরী বাই, পাশে এসরাজার অনাবশ্যক 'বীজ তবলচি' তবলায় সঙ্গত করছে।

এখানে এসে পর্যন্ত বীজর অসাধারণ গুণগ্রামের বর্ণনা বহুর কাছে বিস্তর শোনা গিয়েছিল, আজ সেই কণ্ঠবিখ্যাত গুণীকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে মন-হর মার্গের কথা মনে হল। তাঁর ছবিতের নিবর্ণন ধরণ ধরার মেজাজের হার খুলছে।

বিনের গণ্য-মান্য অতিথিরা এই আসরের জন্যেই স্থান সেরেছেন, অন্য সময়ে গুণীর গানে বারান্দায় ভেদাভেদি করে ঠাঁইয়ে থান গুনছিলেন।

হলের মধ্যে মোটামুটি ঘরিন্ আছে বুঝছে, যেখানে সেখানে লাবণ্যময়ী ছবিগুলার অধিক ছবি—আর বিশেষ কোন সজ্জার বালাই নেই। দর্শকদের মধ্যে অনেক সভ্য ভদ্রের বন্ধু ও তাঁরই দু একজন সখী ছাড়া আর কোন বাঙালী দেখতে পেলুম না। বাঙালী হিন্দুস্থানী এদেরই সংখ্যা বেশি একজন রক্তাম্বরধারী দুলভার সৌবর্ণ ব্রাহ্মণ সজ্জনের সঙ্গেই আমরা আসর অধিকার করছিলেন।

আমরা যেখানে বসেছিলুম, সেদিকে অনেকটা তাকানো ঠিক দেখা ছিল। কাজেই, আমাদের দেখতে পেয়ে নীচের দোতলাটি বিনীত বিস্ময়ে হাঁ করে উপর দিকে চেয়ে রইলো। একজনের ত এমন সাহিত্য অবস্থা হলো যে তার দুটী আর নীচে নামলোই না। একবারে 'উর্ধ্বমুখ উর্ধ্বেমরন্' ভাব! সিংহেশ্বরীর গান তখনও চলছে—

ঘন্ সে ঘন্ সে ঘন্ সে ঘন্ সে
আপার যে সাপার সাপার যে থাকেয়া?
ঘন্ ভারো যে গাঁজরিয়া!

হিন্দী ভাষা সাহিত্যে গানের স্থান বোধ হয় বড়ই হীন। বিশিষ্ট বছর পূর্বে ছোট বেলায় যে সব গান এখানে শুনে গিয়েছিলুম, আজও সেই সব গান সমভাবে আসরে চলছে! যা হোক বিশ্রী উচ্চারণ ও প্রণালীবদ্ধির মধ্যে সিংহেশ্বরী বাই যখন সমাপনান্তে সেবারার চরণে প্রণিপাত করে আসর থেকে উঠে গেলেন। তখন তানপুরা নিয়ে একজন নামজাদা গায়ক সভায় দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠের ঘটোর আলাপ ও ধরণাদি কায়দার হাত-পা ঢালার ধরণে আমাদের ভাল লাগলো না। অগত্যা আমরা সে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চারপাশের অপরিচিত মহিলা-সভার দিকে মনোনিবেশ করলুম।

তাদের মধ্যে অনেকেই বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল। বোধ হয় এখানকার গানের মজলিসে ইতিপূর্বে আর কখনো আমাদের মত অপূর্ব জীবের আগমন হয় নি। তারা কেউ আমাদের সঙ্গে কথা কয় না কিন্তু তাদের দৃষ্টি দেখে বোধ হল তারা যেন প্রশ্ন করতে চায়,—আমরা কে? কোন দেশীয়? কেনই বা তাদের মজিয়ে চলার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছি?

মেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধা প্রৌঢ়া যুবতী সব শ্রেণীই ছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও তার ভিতর ছুটোছুটি করছিল। অনেকেই গলা আমাদের উদ্দেশে উঁচুতে এসে বিশুদ্ধ গান শুনে বাহি দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের হাতে খাদ্য-অখাদ্য ভিন্ন কাগজ। অনেকজনের হাতে শিশুদের লাড়ি, তার জন্যে ঘুস-চমন-চাল দাজারো—এঁরা আমাদের মজিয়ে মজিয়ে দিয়ে যেবারার পূজা সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরবেন।

ঘরিন্ গাড়ী বাড়া দিয়ে পরা, বাঙালী মেয়েরাই চন্দন ও সিঁদুরের ফোঁটা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হিন্দুস্থানী মেয়েদের পা বাঁধা শোভাক সবই যেন কেমন অপরিচ্ছন্ন, সঙ্গিনী চার পাশে চেয়ে চেয়ে ফিস্ ফিস্ করে—এ মাগীদের কাপড়ে এমন চিমসে গন্ধ কেন, বল দেখি? সাত জন্মে কাপড় ছোপড় ধোপায় দেয় না, না কি? কি বিশ্রী দেশ বাবা!

আমাদের পাশেই একটী যুবতী মেয়ে বসেছিল, তার কোলে বছর পাঁচ ছয়ের একটী ছেলে, বা খুব ফরসা, বড় বড় চোখ দুটিতে খুব মোটা করে কাজল

টানা, গায়ে একটি ফ্রকের আধখানা, চোখে মুখে খুব একটা বদমায়েশ ভাব। মেয়েটি তাকে কোলের ভিতর শক্ত করে রাখতে চায়, সে কিন্তু এক সময় বাঁধন ফোঁস ফোঁস করে নীচে ঝিনুক ঝিনুক ছটোপুটি করে বেরোবে, এই মতলবে তার পিঠি সমে ঝিনুক লড়াইয়ে লাগিয়েছে।

শর্মিলীর এদিকে খুশি পড়বার্যাত্র তিনি সব ভুলে গেলেন। এতদিনের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর আর যা-কিছু বক্তব্য ছিল, আপাতত সে সব মুলতুবি রেখে তিনি উৎফুল্ল চিত্তে বলে উঠলেন—বেশ! বেশ! কি সুন্দর ছেলেটি, দেখ একবার!

তাঁর শৈশবাবস্থাটা ছিল অতি প্রবল, সুন্দর ছেলে-মেয়ে দেখলেই তাঁর বড় আনন্দ হতো, বিশেষ ছোট ছেলে হলে ত কথাই নেই. তাকে কোলে তুলে খুব চুমুখেয়ে আদর করবার জন্য তাঁর মন আকুল হয়ে উঠতো!

মেয়েটির সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্য তিনি তাঁর অপূর্ণ হিন্দী ভাষায় তাকে বল্লেন—এ লেড়কাটা তুমারা হ্যায়? বা তোর হয়?

মেয়েটি মহা এ রকম প্রশ্ন শুনে চকিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, খানিক পরে বল্লে—হামারা ছোটা ভাই হ্যায়।

শর্মিলী যখন তাকে কোলে করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন—আও, খোকাবাবু! হামকো কোলে এসো! ঐসা তুম্হারা মতলব আছে?

খোকাবাবু এবার তাঁর দিকে তাকাল, মেয়েটি তাকে শর্মিলীর কোলে নেবার জন্য যেমন তার বাঁধন একটু শিথিল করেছে, অমনি সে এক লাফে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দাঁ করে সিঁড়ীর দিকে ছুটে পালিয়ে গেল।

ভাইয়ের এই ব্যবহারে একটু অপ্রতিভ হয়ে মেয়েটি শর্মিলীর দিকে চেয়ে হেসে বল্লে—উস্কা বহুৎ গুস্সা (রাগ) হো গিয়া, বড়া বদমাস্ হ্যায়!

নীচে তখনও সেই ঝগড়ার তান চলছে। তবে সে তান কি অমৃত সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, তাঁর খুব জোর গলাবাজি, তপনের ও গলার জোরটা জোরা দিয়া

তুলে উঠেছে, 'টুকরোয়' যা 'টুকরো' দিয়ে তিনি খুবের মেলা মেলাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এমন উদ্যম ভাবে নৃত্যরত হয়েছিল, যে আশ-পাশের লোকগুলো সভয়ে তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়েছিল। বীর তখনও এ সমস্ত বিভিন্ন রস! বাম পিতামহের কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার আগে যেমন এ সেতে থাকে, সে ঠিক সেই ভাবে ওপাশের জুতোর দিকে চেয়ে সমস্ত মন দিয়ে শুনছিল, কোন শব্দ বাদ পড়ে, এই ভয়!

শর্মিলী এবার সে দিকে চেয়ে ওপাশের বৈঠকখানা ঘরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বল্লেন—বিনুদা যেন একটা কাণ্ড! খাঁ খাঁ করে চেঁচাচ্ছে যেন!

সে মেয়েটি তখন গান ধরেছে। তার গলা খোল হয়েছে। তবে, উচ্চাঙ্গ সৌষ্ঠবের, খুব জোর থেকে যেন খোলাই আরম্ভ হয়ে গেছে! বড় বড় টানা চোখ, বাঁশীর মত নাক, পাতলা লাল ঠোঁট! চমৎকার সুশ্রী! তার গায়ে হিন্দীর একটা ফ্রকের, অর্থাৎ ফুলোয় আর আধ-ঘেরা একটা হিন্দীর শাড়ীর উপর মন্দির ওড়না!

শর্মিলী তার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনেই বিনু বিনু করে বকতে লাগলেন, এমন যে সুন্দর মেয়ে, তাকে দেখেছ তোর! এমন ঠাকুর দেখে ত কখনও দেখি নি! যদি, একবারও কখনও কাপড়ের কি জোটে না ছাই! বদ্‌কারুরে আমাদের হাতে এমন মেয়ে পড়লে—

সেই সময় সহসা ঘরের দিকে মেয়েটির মাথার কাপড় সরে গেল—চুল নেই বল্লেই হয়, মাথায় কদম চুল একটা পোটলার মত গাদানো রয়েছে। দেখেই তাঁর শিউ উঠে গেল! বল্লেন—তোর! তোর! মাথায় দাদা তোর একবার! ছন্ন ফাঁদের চুল, যেন জোড়না জমছে। মাত্র ভয়ে যেন পড়ে না যাও হয়। মাথার ঘা নেই, মাথার ঘা নেই, সব যেন এক একটি ঝিনুক ঝিনুকবার! দোড়া বলা আর কি?

'আপ্ জোড়্ বাংলে জুতে তা হমনে আবাদে'! পিছন থেকে অতি মৃদু কোমল সুরে এই কথা শুনে ফিরে চেয়ে দেখি, একটি হিন্দুস্থানী ভদ্র মহিলা আমাদের দিকে চেয়ে আছেন।

আমি একটু বিস্ময়ে পড়লুম। বহুদিনের অনভ্যাসে এখন হিন্দী কথা কিছু কিছু বুঝতে পারলেও বলতে তেমন পারি না—এ অবস্থায় ওঁর ভাষায় কি করে কথা বলি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, 'জী' শব্দটা এরা বিশেষ সম্মানসূচক স্থলে ব্যবহার করে। আর কিছু না ভেবেই সেইটা লাগিয়ে দেওয়া গেল। বহুৎ—জী হাঁ? আপ্ লোগ্ কা মুহুল্লা কাঁহা?

কথাটা বোধ হয় আগেই বলা হয়েছিল—তাতে তিনি প্রসন্ন ভাবেই বললেন—মুহুল্লা তো হামারা বেশক্ বেশ—মগর বহুৎ রোজ যাবৎ মে ঔর্ বিবি—আর্ বিয়াকাই বাস্তি, ওয়াস্তে দক্কা।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন—ইয়ে সব ঔর্ আপলোক্ কা আচ্ছা লাগতি হায়?

মহিলা আলাপের সুযোগে উৎসুক হয়ে যে সব অপূর্ব কথার এ-যেনের আর সবকে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করলেন—তার সার মর্ম এই দাঁড়াল—যে ওই যে 'আগ্রাওয়ালে' তখন থেকে 'খাঁড়ু কা মালিক্' চীৎকার করে তাঁর হাড় মাস জ্বালা-কালা হয়ে গেছে—ও-রকম 'ঔর' ওয়ার চেয়ে একটু গল্প-সল্প করতে পেলেই তিনি বাঁচেন।

তার পর তিনি মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—মুহল্লেমে তো লাড়কা বালা বেয়া হোয়?

আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হল। চুপি চুপি তাঁকে বললুম—তুমি ও-সব কি বলেছ? দেখছ ত, উনি আমাদের আপনি বলে কথা বলছেন—ওঁর সঙ্গে অমন ভাবে কি কথা কওয়া চলে? তাছাড়া উনি হিন্দী ত তুমি জান না—একটু চুপ করেই থাক।

বাধা পেয়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন—আচ্ছা—তুমি থাম ত! আমি হিন্দী জানি না? হাজার হলেও কি জন্মে খিদিরপুর কলকাতায় ত একটা মোছলমানী আমাদের বাসন মাজে! তার সঙ্গে আবার কথা বলতে হয় না?

বেগতিক দেখে চুপ করে গেলুম। মহিলাটি সেই সুন্দরী মেয়েটির দিকে নির্দেশ করে বললেন—ইয়ে লেড়কী আওর ইস্কো সাথ হোনে লেড়কা যা—ঐ বাগানমে জায়—ওহাসে আপকো মোটো আচ্ছা জায়গে আয়া।

মেয়েটি তাঁরই ছেলে শুনিয়া অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন—তার বার বলতে লাগলেন—এ মুহল্লাস্ কা মেয়ে! বাঃ! বড়া খাপসুরত মেয়েটি! কিন্তু! তা, ইস্কো সাদি হয়েছে ত? দুঃ, লাড়কা বালা হুয়া?

মহিলাটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। তিনি বললেন—দুঃ, কি বোলি—সাদি কা বাত্ বাদ্ লেড়কী বেওয়া হো গিয়া।

আমি চমকে উঠলুম। এখন সুন্দর মেয়েটি বিধবা! সন্ধ্যের সোনার আলোয় হাসি-ভরা পৃথিবী হঠাৎ অন্ধকার কালো হয়ে গেল—মর্মাহত হয়ে আমি তার মুখের মত সুন্দর সুদূরের দিকে চাইলুম। সঙ্গিনীও অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলেন, মেয়েটি এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা বন্ধ দিয়ে শুনছিল—এখন দুইজন অপরিচিতার সহানুভূতির দৃষ্টিতে বিব্রত হয়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

সন্ধ্যের কর্তার বাসর ঐ মেয়েটির সংসারের আশা, সব সাধ ফুরিয়ে গেছে। জীবনের পথে চলতে চলতে কে কবে হয় ত দু'দিনের জন্য তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল—হয় ত তার সঙ্গে মালিকার ভাল করে পরিচয়ও হয় নি—তবু আজ তারই বিহনে সারা জীবন-ব্যাপী সুন্দর মিলন ভোগ করে তাকে জীবনে সবল করে নিতে হবে। সংসার-বনের এমনি করে কত ফুল ফুটছে না ফুটতে শুকিয়ে ঝরে যায়—কে তার খবর রাখে? তাকিয়ে তাকিয়ে অশ্রুসজল দৃষ্টি ফিরিয়ে মহিলাটির মুখের দিকে চাইলুম।

'মাতাজ-জীকা মরদী'—এইটুকু বলতেই তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। আমাদের চোখে অশ্রুর আভাস দেখে তাঁর চোখের জল আর বাধা মানলো না। তখন বেশ-বাস-পাশের মেয়েদের রোল শোনে সব একাকার হয়ে গেল। এই বেনারসী মহীয়ান মর্যাদার মাঝ-জায়গায় অবস্থান বেলা অর্ধে অর্ধে অনুভব করে আমরা তিন জনেই এক সঙ্গে জীবনে অনুভবশীল করলুম। পার্শ্ববর্তিনীরা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো।

হঠাৎ নীচে থেকে একটা প্রচণ্ড গোলযোগ উঠলো। 'হুঁ যাও' 'নিকলো' ইত্যাদি শব্দে বহুকণ্ঠের সম্মিলিত চেঁচামেচি শুনে ভয় হয়ে গেল। দেখলুম—অনেকগুলো লোক লঠন হাতে না নেমে আমাদের ঘরগুলো যাবার জন্য হুড়াহুড়ি করে ঢুঁকে পড়েছে—সেই দলপতিগুলি পুরোহিত, তিনিই বোধ হয় এখানকার কর্তা—তিনি তাদের অত্যাচারে ক্ষেপে বিরক্ত হয়ে পূর্বোক্তরূপ চীৎকার ও হুঙ্কার করতে করতে তাদের ধমকাতে লিগলেন—আরও অনেক লোক জমা ছুটে এসে তাদের ধাক্কা মেরে বের করে দিলে। তার পর বহুক্ষণ গোলমাল থামতে দেখা গেল সেই বিরাট ওয়াক আমরা থেকে অপসৃত হয়েছেন।

একটি কিশোরী—বছর চৌদ্দ পনেরো বয়স হবে—সেই তখন গান করছে ঘরের।

মেয়েটি বেশ ফরসা, বাংলাদেশ রঙের রঙিন শাড়ী ও ব্লাউজ তার বাহুর সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছিল। মস্ত দরজার ওপর উঠে এসেছে—পিঠ কালো চুলের খোঁপা মুখ ঘোরে এলো-মেলো হয়ে এসে পড়েছে।—কপালে চন্দনের ফোঁটা—ঠিক যেন দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই একটি নিখুঁত ফুল—সে তখন মেবারাগ মিশে মুখ নিচিয়ে গুনগুনিয়ে গাইছিল—

এ গোবিন্দ হামো শরণ—আব্ তো জীবন হামে
হামে রোচে বিনতি করো নন্দ কি দুলারে—
এ নন্দ কি দুলারে!

বৈষ্ণবীর করুণ কোমল সুরে এই একান্ত নিবেদন ও নিমগ্নিপূর্ণ ভজন গান শুনতে শুনতে মন যেন শান্ত ও সমাহিত হয়ে কোন্ অজানা উধাও হয়ে গেল। সভার সকলেই তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত মীরার গানের সুরে ও ভাবে তন্ময়—একটা গভীর ভক্তি তাদের হৃদয়কে যেন ধরের সবগুলি পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কতক্ষণ পরে গান শেষ হল। কিশোরী মেয়েটি বেরিয়ে। উৎসবে প্রতিপালক ঘরে আসন থেকে উঠে গেল। বেলা অনেক হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাড়ী ফেরবার জন্য উঠে দাঁড়ালুম। সেই ভদ্রমহিলাটিও তাঁর মেয়েকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বিদায় সম্ভাষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে দু চারটি কথার পরে নমস্কার করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

সন্ধিনীর উৎসাহ কিছুতেই কমবার নয়। বাইরে এসে তিনি প্রস্তাব করলেন—বিষ্ণুমন্দিরের মন্দির ও মন্দির খুব কাছে, অতএব ও দুটো দেখা সাঙ্গ করে তবে বাড়ী ফেরা উচিত। আমার আর যেন ভাল লাগছিল না। আমার অসম্মতিতে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে গাড়ীর উপর উঠবার উদ্যোগ করে অবশ্য বিষ্ণুমন্দিরের মন্দির বর্ণন করতে লাগলেন। আমি একা গাড়ীতে একটা প্রবল চক্রের উপর ওঁদের অপেক্ষায় বসিয়ে রইলুম।

সন্ধ্যের মুখপাঠে এই যে দুটি বিশাল বাসিকার জীবন বন্দিনার হলো সেই কথাটাই কেবল ঘুরে ফিরে মনে আসতে লাগলো। একজন কিছু জানবার বা জীবনে কিছু উপভোগ করবার পূর্বেই সংসারের সঙ্গে সব যেন-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে! আর একজন সব উপভোগ আনন্দের হয়ে গেছে পর্যন্ত যৌবনের মধ্যে ডুবে থেকেও নিজে কি অসহায়-নিরুপায়! কি দারুণ তার জীবন! সংসারে সকলকে সে আনন্দ দেবার ভার নিয়েছে—নিজের সমস্ত সত্তার বিসর্জন দিয়ে—তার মীরাকে—তার ঘরখানা—তার বিভব সব-কিছুর বিনিময়ে যারা কলাক্ষী মীরার মূর্তিলাভের সে তোর মুখকে সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে পূর্ণ করে রাখতে পারবে—মুখের ঘরে আর তাদের স্থান নেই! কালের বিধানে তাদের ডাক যে এ জীবনে নিশ্চিত হয়েছে সে কথা তারা জানে না—জানবার যে অধিকার বোধ থাকতে পারে এ জ্ঞানও তাদের নেই! তারা শুধু জানে, এই তাদের অদৃষ্টলিপি—এ থেকে তাদের মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই! মেয়েটার চরণে ভক্তিভরে প্রণামরতা পুলকিতীর মত সেই পথিক কিশোর মূর্তিখানি বার বার মনে পড়ছিল—কানে যেন তখনো তার গানের সুর ভেসে আসছিল—

এ গোবিন্দ হামো শরণ আব্ তো জীবন্ হামে—

নবোঢ়ার কলমুখরমন তোমার চরণে এ নিবেদন পৌঁছবে কি?

মনটা যেন বেদনাতুর হয়ে উঠলো! উৎসবের আসরে তখন সন্ধ্যারতি আলাপের আলাপ সুরু হয়ে উঠেছে—কিন্তু সে সুর তখন আর ভাল লাগলো না! সন্ধ্যার ঘাট তখন জনবিরল—প্রায় শূন্য। নিরন্ত্র অন্ধকারের ছায়াহীন বৌদ্রে বিজন সন্ধ্যাতীর যেন খর উদাস, খর কঠিন মনে হল। কপালের বিস্তৃত চরের সেই নিরালম্ব ধূসর ছায়া—প্রভাতের প্রথম অরুণ-রাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিস্তৃত ভূমি যে আনন্দ-উৎসবের কলরোলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল—মধ্যাহ্নের প্রখর আতপ-তাপে সে সব যেন নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে!

অকস্মাৎ পিছন থেকে উচ্ছ্বসিত উচ্চ হাসির শব্দে ঘাটের সে স্তব্ধ ভাবটি গাম্ভীর্য ভেঙে গেল। ফিরে দেখি, সন্ধিনী সকলকে হাসিয়ে। কোথা থেকে এক ঠোঙ্গা রেউড়ী সংগ্রহ করে এনে তাঁর মনটা তখন খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন—বলি—দুপুর রোদে কি এত ভাবা হচ্ছে? ছুটো রেউড়ী খেয়ে দেখ দেখি? কেমন মচমচে আছে! বলে নিজে মোটাসোটা মুখে ফেলে চর্বণ করেন—আ মরি মরি মাধু—বেহুলাবাসরী জলো রেউড়ীটা করে তাও!

ঝড়ু-মঙ্গল

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঝড়ুর—ঝড়ুর মঙ্গল কই। আজ রাজা ঘোড়ায় আজ বিজয়ে। ঘোড়সওয়ার ঝড়ুসওয়ার হাঁ। আজ ঘোড়া, দুজনার মাথায় আজ আজ আজা, দুজনাই সাজে নিজে নিজের আজ ঘোড়সওয়ার পরে।

ঘোড়সওয়ার ঘর ঘোড়া, আজিজ আজ হাঁ! ঘোড়া আজার ঘোড়ায় এজনার নিজ আজিজ ঘোড়া, নিজনা আজার ঘুজনার আজা আজা। নিজুনা আজার—আজ ঘোড়ার ঘোড়সওয়ার আজার আজা। আজার আজ আজা ঘোড়-নিজ আজার ঘোড়া আজ নিজ।

আজ আজে আজার ঘোড়ার—আজ নিজের আজ ঘোড়া আজা, আজার আজা, নিজুনা নিজ, আজ নিজে আজিজ আজা আজ ঘোড়সওয়ার আজা। আজা আজিজ, নিজে আজ আজিজ আজা আজ আজা আজা আজা।

আজা আজিজ—আজা আজা আজা

[illegible] [illegible] [illegible] [

গান ও স্বরলিপি

আভাস

কথা, সুর ও স্বরলিপি :—শ্রীদিলীপকুমার রায়—কলিকাতা।

মন্দ—কাফী।

আজ ঘাসের অধর ভরে
তোমার সৃষ্টি-গান!—
ওই জলে ফুলে পাতায় ফুলে
তোমার আঁখি-তারা!
প্রিয়, পাশে তুমি নাই যদি আজ অন্তর উদাসি'
প্রাণে তোমার আনন স্মরণ, বাজে তোমার বাঁশি বাঁশি!
দেখি দীঘি-পুকুরীর আলোয় তোমার বেণু বিষাদ-বাঁধা
যখন আবছা আঁধার ছায়া-আঁচল বিছেয়ে চলে চাঁদে—
তখন খোপার ধারে দিয়েছিলে গুঁজি' মিথিল লাজ।
বুঝি তোমার পরশ-সুখে তাই আজ ধরণী রাঙোয়ার!

+ 0 ৎ ৎ
II পা পা-া। পা-া মা-া। I-মা মা-া। মা-া র্সা-া। মা-া র্সা মা। ধপা-া-া পা ধা। মা মা র্সা। র্সা মা র্সা র্সা-া
এ ই আজ ঘা • • সে • ঘ • র ভ • রে • • • তো মার সৃ ষ্টি • গা ন •
[পা পা • া]
(মা ধপা পা I-া-া মা মা। র্সা র্সা র্সা র্সা। মা র্সা পা মা I-া মা মা পা। পা মা পধা পা। মা পা মা র্সা।
ওই • • • • জ ল ফ ু লে • পা • তা য় • ফু লে • তো • মা • র আঁ খি •
মর্সা মা পা ধা।] II II II
তা • রা •
পা পা-া I-া-া মা পধা। পা মা পা-া। মা মা-া পা। পধা পা পধা-া। পধা পা পধা পা I-া ধপা মা-া।
প্রি য় • • • পা শে • তু মি • না ই য দি • আজ অ ন্ • ত • র উ দ্
পধা পধা মর্সা না। র্সা মা র্সা
বা • • • সি •

---

* এ অংশটি গান হিসেবে আজকাল গাওয়া হয় কি—এবং সেইজন্যে উদ্ধার করা হল।

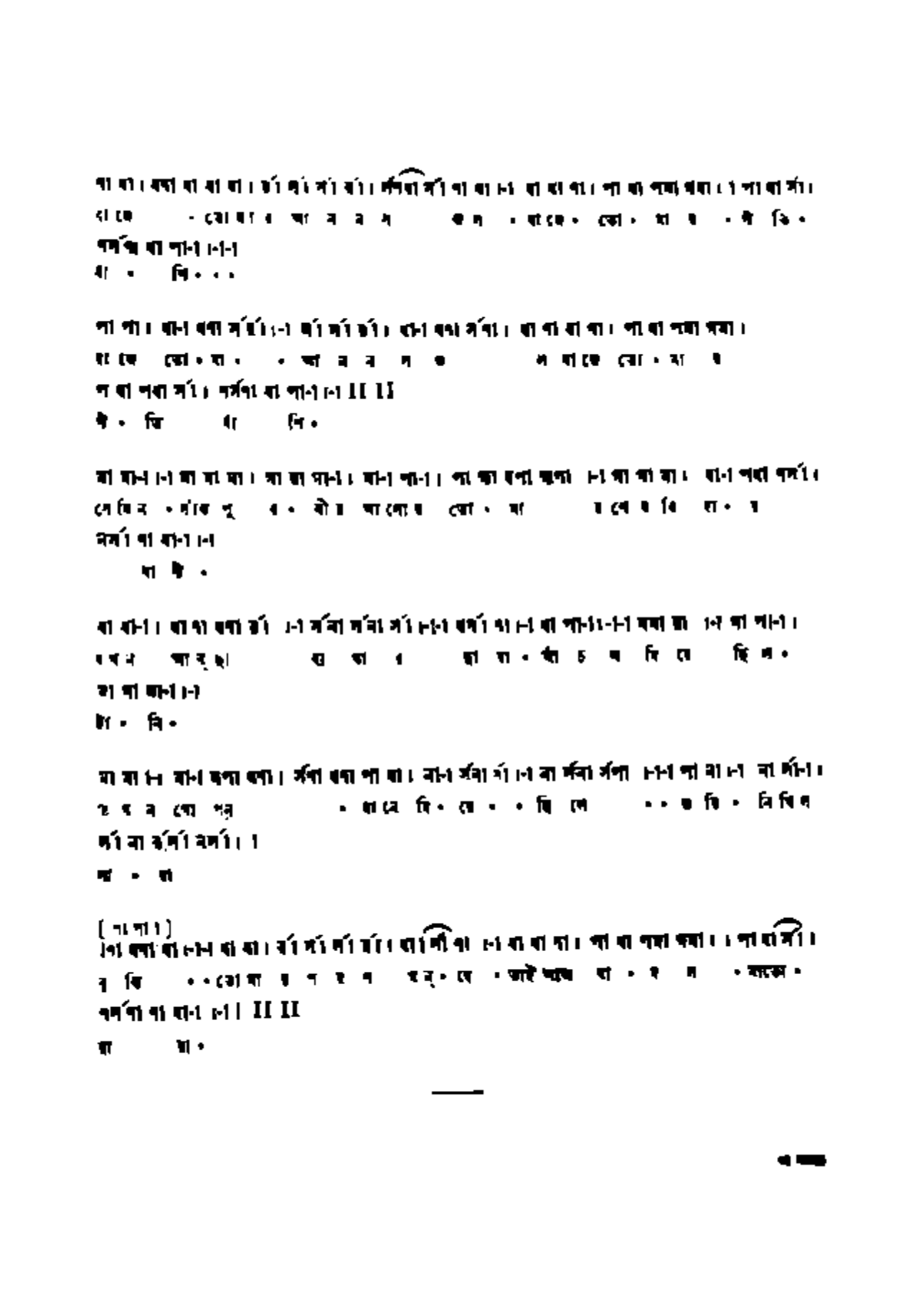

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন

পঞ্চম অধিবেশন

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর জন্ম-মৃত্যু ও পরিণতি আলোচনার দিন শেষ হইয়াছে। সে আর এখন ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষা রাখে না; আশা করি, সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। গত কয় বৎসরের অধিবেশনগুলি এ-প্রদেশের বাঙালীদের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, ইহার উদ্যম ও উৎসাহ এতদঞ্চলবাসী বাঙালী মাত্রেরই অবিদিত নাই বলিয়াই মনে করি। সুতরাং সে সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

একটি অনুষ্ঠান যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে যত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়াই আসে, তাহা অল্পবেশেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, যাহা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহার অন্তরীণ যেমন আবশ্যিক নহে—তাহার শৈশবের যত্ন বিনোদ রস চিন্তা, চর্চা ও সূচনা অবশ্য তাহাকে প্রবাসের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তেমনি তাহার সমগ্র-সিদ্ধির বা উদ্দেশ্য সাফল্যের পথও পরোক্ষে অধিকতর। উৎসাহ উদ্যমই সে পথের পথিকারা।

শৈশবাবস্থে শতবার বালকের বিপ্লবাত্মক হইয়া থাকে। "সম্মিলনীর"ও পঞ্চম অধিবেশন আসন্ন, এইবার তাহার শৈশবকাল পূর্ণ হইতে চলিল—এইবার তাহার কর্মাঙ্গনের রাস্তে-ঘাটে।

প্রবাসী বাঙালীর নিজেদের একখানি বাঙলা মাসিক পত্রিকার অভাব ছিল, যাহাতে তাঁহাদের অভাব, অভিযোগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবাসাদি প্রকাশ পায় এবং যশ-সাহিত্য-চর্চার সুযোগও হয় এবং এ প্রদেশের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির আলোচনা ও অনুধাবন আমাদের সাহিত্যে সঞ্চিত হয়। গত পূর্ব সপ্তম অধিবেশনে সম্মিলনী তাঁহাদের মুখপত্ররূপে 'উদ্ভাসা'র প্রকাশ অনুমোদন করেন। 'উদ্ভাসা' আজ বৎসরাধিক সে উদ্দেশ্য সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়া আসিতেছে।

ইহাই সম্মিলনীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রকাশ। কিন্তু এ প্রদেশে প্রবাসী-বাঙালীর সংখ্যা দিন-দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, জীবন-সংগ্রামেই তাহাকে সচেতন হইতে ইঙ্গিত করিতেছে। ভূমই তাহাকে ঐক্য-বোধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতেছে। আমাদের কোন একটি সম্মিলিত ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নাই। এই সম্মিলনীকেই কেন্দ্র করিয়া সকলবদ্ধ-ভাবে সমস্যা সমাধানের সন্ধানে উদ্যমের আবশ্যক বলিয়াই মনে হয়। আশা করি আগামী অধিবেশন সে সম্বন্ধে অবহিত হইবেন ও কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন।

"সম্মিলনীর" পঞ্চম অধিবেশন এবার আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ বিহারে হইবে। সম্ভলপুর-নিবাসী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ চৌধুরী বার্-এ্যাট্-ল মহাশয় সভাপতি হইয়াছেন।

স্বাগতম্ ভজ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এ, আই, ই, সি, বি, ই, মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং

মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ বার-এ্যাট্-ল মহাশয় সহকারী সভাপতি।

অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইতেছে। আগন্তুক প্রতিনিধিগণের সুবিধা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং তাঁহাদের আমোদ-বিধানের জন্য তাঁহারা যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছেন। তবে কথা—অধিবেশন-দিন কয়টিকে যাহাতে সকলে অবসরোৎসবের কাল করিবেন ও উৎসোগ করিয়া ফাটাইতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

সকলকেই তাঁহারা সবিনয় ও সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। যদি কেহ তাহা না পাইয়া থাকেন তবে তাঁহাদের এতদ্দ্বারা নিমন্ত্রণ-পত্রিকাখানি সে ত্রুটি পূরণ করিবে বলিয়াই আশা করি।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন

পঞ্চম অধিবেশন—দিল্লী

নিবেদন

আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ দিল্লীতে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হইবে। সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহোদয় সম্মিলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব, মাননীয় স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, কে, সি, আই, ই, সি, বি, ই, মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস, বার-এ্যাট্-ল মহোদয় সহকারী সভাপতির পদ আমোদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্যভাব স্থাপন এবং বাংলার ভাবধারার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর সতত অবিচ্ছিন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে এই বাঙ্গালীসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মিলন যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সার্থকতামণ্ডিত হয়, সে জন্য আমরা সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর শিক্ষাপ্রচার ও জাতীয় ঐতিহাসিক বিষয়ক কোন ঐতিহাসিক প্রস্তাব, এবং সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে মৌলিক ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ এবং কবিতা সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীর এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে সকলে অকুণ্ঠচিত্তে যোগদান করুন, এই প্রার্থনা।

প্রতিনিধিগণের জন্য ফী ধার্য্য ৫৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাঁহাদের বাসস্থানের ও আহারাদির সুবন্দোবস্ত অভ্যর্থনা সমিতি করিবেন। মহিলা প্রতিনিধিগণের জন্য পৃথক্‌ভাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিনিধিগণের প্রত্যুত্তরদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা টেশনে উপস্থিত থাকিবেন।

কার্য্যালয় :—
বেঙ্গলী ক্লব,
কাশ্মীরী গেট, দিল্লী

বিনীত
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সেন,
প্রধান কর্ম্ম-সচিব

একাকী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়—কাশী

এ বিরাট ধরণীর বুকে,—
লক্ষ কোটি মরনারী নিজ সুখে-দুখে
আপন জীবন-পথে ফেরে
চলিয়াছে ধেয়ে।
এ চঞ্চল জীবনের স্রোতে,—
বহু যাত্রী দূর হ'তে দূরে
এসে কি না মেশে না ও মিশে;
কিছু দূর একে অন্যে জীবনের বেলা-ভূমি দিয়ে।
এ বিরাট জন-সমাজে,
এতের পিছনে আর যত বহু যাত্রী এসে জমে,
এই জন-সমুদ্রের মাঝে
নিশ্চিত অস্থির মনে কেবা হায় কোথায় মিলাবে!
কারো তরে কেহ যেন রয়ে না যে। জানি।
চঞ্চল নয়নে দুটি খুঁজিয়া ফিরে না কারো বাণী;
কারো মুখখানি,—
অফুট গুঞ্জন-ভরা মরমের বাণী
ক্ষণেক রহে না বাঁধা মিলনের তরে;
কত যায় যাহোক প্রতি ঘরে ঘরে!

জনতা-বরণ এই ধরা—
লক্ষ কোটি মানবের ভরা।
তার মাঝে ক্ষুদ্র আমার নিবাস
কত ক্ষুদ্র; আমার বিকাশ
ঈষদ্ ইঙ্গিত হাসে চোখ ভরিয়া।
উঠে নি ত ফুটি, তারি আমার লাগিয়া
কারো চোখে কারেনি বিস্ময়;
রচি নি নিজের তরে কারো মনে দুটি-বিনিময়।
এ বিরাট জন-ভূমি মাঝে
নিরাশ একাকী আমি;—মোর কোনো কাজে
পড়ে নি কারোরো ছায়াপাত;
জীবনের পথে কারো নাহি নাই সাথ।

হৃদয়ের বেদির তোমা হতে,—
বলিতে পারি না তাহা ভয়ে কি না ভয়ে বলা নাহি
আমারে বেষিয়া। তবে মোর হাতখানি
ধরে ছেয়ে তবে না যে।—তবুও বাণী—
"তোমারে যে ভালোবাসি!—"
সহজ বিনয় প্রেম-ভরা মৃদু হাসি
ফুটিয়া উঠে না চোখে—
উজ্জ্বল আবেগভরা হর্ষের আলোকে।
আমার লাগিয়া কোনো ঘরে
কারো হিয়া কাঁদে নি যে; যাওয়ার পথের
কারো দৃষ্টি রেখে নি যে বেঁধে;
এসা যাওয়া দুই হ'ল, সাথ হবে একা।

এ চলার শেষ আছি কি না
বুঝিতে পারি না।
জানি না পথের বাঁকে বিজন সে ছায়-বীথিকায়,
সবুজ-ঘাসে ঢাকা কোনো কুসুমের ছায়,—
অপেক্ষিছে কি না মোর প্রিয়তম ধন;
বসি' সারাক্ষণ,—
দুটি চোখ নিদ্রাহীন
বিজন পথের পরে রয়েছে বিলীন।
সাথ হইয়াছে বহুজন
মোর আতিথ্যের আয়োজন।
চিরন্তনী সে প্রিয়ার লাগি,
বিরহে রজনী জাগি জাগি,
পরতি-অতীত যদি তার—
একাকী চলেছি বীথ পথে আপনার।
জানি না এ যাত্রা-শেষে পথ-পীযানায়
সাথক হইবে কি না একাকী পথের চলা
প্রেম-মুগ্ধ মিলন-বেলায়!

নিবেদন—শ্রীসুধাংশুকুমার বসু, ইণ্ডিয়ান মেশে মিউজিক, বেনারস-ব্রাঞ্চ—বেনারস।
সংগীতিকা—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি এ-এল, বেনারস—কলিকাতা।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর মুখপত্র

[চিত্র মাসিক পত্রিকা]

দ্বিতীয় বর্ষ]

সম্পাদক— শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, বার-এ্যাট্-ল.
ডাঃ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি
সহ-সম্পাদক— শ্রীযতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মন্ত্রণা-পরিষদ

শ্রীসরলা দেবী বি-এ, অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কবিরাজ এম্-এ, ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পি-এইচ-ডি,
ডাঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ডি-এস্-সি, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ।
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর,

পরিচালক
প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী
উত্তর অফিস, লক্ষ্ণৌ।

কলিকাতার এজেন্ট
কলিকাতা বুক ডিপো।
১০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

[প্রতি সংখ্যা ১০ আনা

উত্তরার সূচি

পৌষ—১৩৫০

সম্পাদক :—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

সহ সম্পাদক : শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী

লেখ সূচি

ধান—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন…	
চিত্রার দৃষ্টি—শ্রীবাণীকেতন মুখোপাধ্যায়	
পতিত ভারতের ও তাঁহার সভ্যতা-প্রতিষ্ঠান—শ্রীনিলীপকুমার রায়	
সঙ্কলন :—	
(১) কবির বিদায়ী সম্মান—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন	৮৮১
(২) সাহিত্যিক—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৮৯১
বিদায়ী (গল্প)—শ্রীমতি: চৌধুরী	৮৯৫
রবীন্দ্রনাথ ও বলাকা—শ্রীযোগীনাথ সমাদ্দার	৯০২
প্রবাসী বাঙালী :—	
(১) প্রবাসী-বঙ্গসন্তানদের শিক্ষা-ব্যবস্থা—	৯০৮
(২) বিলাতে বাঙালীর কীর্তি—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৯১১
(৩) প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, পঞ্চম অধিবেশন	৯১৯
বৈষম্য (উপন্যাস) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় …	৯২৩
আমেরী—শ্রীবাণীকেতন মুখোপাধ্যায়	
(১) সুদূরের ডাকে-পরিষদ	৯২৩
(২) অভিনব প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	৯২৮
বিদেশবাসীর পাশ্চাত্য অধ্যাপক ও সুহৃদ-মণ্ডলী—শ্রীরানিদাস রায়…	৯২৯
কবি দেবেন্দ্রনাথ—শ্রীযোগিন্দ্রলাল মজুমদার	৯৩২
গান ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়	৯৩৪
পাখাদের কথা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য	৯৩৯
প্রবাসী (কবিতা)—শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার মল্লিক …	৯৩৫
টুটা-ফুটা (গল্প)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯৪১
বিদায়ের সান্ধ্য (কবিতা)—শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	৯৪৯

চিত্র-সূচি

পরাজিত (রঙিন) শ্রীবীরেশ্বর সেন	(মুখপত্র)	মিঃ এন্‌ড্রুজ্ ও মিসেস্ আর, টমা	৮৮৯
পতিত ভারতের	৮৯৪	মিস্ রোজা আর্থনিক ও তাঁহার কার্যপ্রণালী	৮৯৫
বিদেশবাসীর পাশ্চাত্য অধ্যাপক ও সুহৃদ-মণ্ডলী :—		কবি দেবেন্দ্রনাথ (যৌবনে)	৯৩২
মসিও রোমাঁ রলাঁ ও মিসেস্ রলাঁ	৮৯৫		

উত্তরা

([illegible])

[illegible]

দ্বিতীয় বর্ষ | পৌষ, ১৩৩৩ | চতুর্থ সংখ্যা

গান

সুর—কীর্ত্তন

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে—
যে-পথে আসিবে তরুণ প্রভাত, অরুণ-তিলক মাথে ;

যে-পথে কাননে আসে ফুলদল
যে-পথে কমলে পশে পরিমল
যে-পথে মলয় আনে সৌরভ, শিশির-সিক্ত প্রাতে।

যে-পথে যমুনা বহুনার কূলে
যার ফুলহাতে প্রেমের খেউলে,
যে-পথে বন্ধু, বন্ধুর বেশে, চলে বন্ধুর সাথে—
যে-পথে পাখীরা যায় গো ভুলায়
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায়—
সে-পথে মোদের হ'বে অভিসার, শেষ তিমির-রাতে।

ভিক্ষার ঝুলি

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা

সম্মিলনের অধিবেশনের সময় আসিল। প্রবাসী বাঙালী আবার বসেছে তাঁহাদের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করিতে। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, অর্থ—সকল বিষয় সম্বন্ধেই আলোচনা হইবে। প্রবাসীর জীবনে যত কিছু অসুবিধা, অসম্পূর্ণতা আছে, সবগুলি আমরা বিশ্লেষণ করিতে চাই। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বাংলা ভাষা-রীতির অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। উচ্চ শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কাশী ও লক্ষ্ণৌতে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চ শিক্ষার প্রবেশিকা ভাষা শিক্ষারই ব্যবস্থা হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু করিবার সময় আসে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অসুবিধা ঘটিয়াছে নিরক্ষিতার ক্ষেত্রে। বোম্বাই বা মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীর জন্য বাঙালী স্কুল করিয়া, বোম্বাই বা মাদ্রাজ বিদ্যালয়ে বাঙালী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া প্রবাসী এ সম্বন্ধে যত্নবান হইয়াছে। কাশী ও এলাহাবাদ এ সম্বন্ধে পথ-প্রদর্শক। কাশী ও এলাহাবাদের বাংলা-স্কুল প্রবাসীর গৌরব। এই সময় এলাহাবাদের বাংলা-স্কুলটি কলেজে পরিণত হইয়াছে। ফলে, তিনটি বিষয় লইয়া সেখানে inter-mediate class খোলা হইয়াছে। বাঙালী অধ্যক্ষ ও বাঙালী অধ্যাপকমণ্ডলের পরিচালনায় কলেজটি উন্নতির পথে চলিয়াছে। প্রবাসী বাঙালীর শিক্ষার দিক হইতে ইহা কম গর্ব্বের কথা নয়। সম্মিলনীর প্রস্তাবে সকল কলেজের মত শুধু Intermediate বা বি, এ, ক্লাস খুলিলেই যে সকল দিক রক্ষা হইবে, আমরা তাহা মনে করি না। কারণ, কলেজটিকে যে বাঙালীর জাতীয়তার প্রতীকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় বা পাঠ্য পুস্তকগুলির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও বাংলার অতীত ইতিহাস, বাংলার ভূগোল, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার দেশনায়কগণের বাণী, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কলেজে যাহাতে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে বাঙালী-যুবক যেমন আবহাওয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও আপনার সত্যরূপ খুঁজিয়া পাইবে।

কর্ম্মকুশলতা

কলেজ সম্বন্ধে বাঙালী যুবকদের শিক্ষা যাহাতে আরও কার্য্যকরী হয় সে সম্বন্ধে প্রবাসের বাঙালী অধ্যাপকগণ যদি মনোযোগ দেন তাহা হইলে ভাল হয়। আমাদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী ছাত্র লইয়া ক্লাস খোলা উচিত। মামুলী ধরণের লাইব্রেরী বা ল্যাবরেটরী দ্বারা বাংলা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। এগুলি চাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী যুবকদের চরিত্র বিকাশের জন্য বাস্তবিক কর্ম্মনিপুণতা অর্জ্জনের পরিচয় দিতে হইবে। বেশীর ভাগ অভিভাবক আমরা, সেবা-সমিতি প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম-বিভাগের সভ্যরা বাঙালী যুবক বা আর্য্যসমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত। বাঙালী ছাত্রদলকে কর্ম্মকুশলতা শিখিতে হইবে, কলেজে পড়িবার সময় বাস্তবিক সেবাকার্য্যে নামিয়া। বাড়ীটি না হইয়া যদি প্রবাসী বাঙালী ছাত্র বন্যা হইয়া গড়ায় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হইবে।

সকল বাঙালীকেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের নিকট ঘুরিতে হইবে তাহা বলিবার কোন কারণ নাই। এমন অনেক অনেক বাঙালী যুবক আছেন যাঁহারা কলেজ-ফেল অথচ ধারণাশী ও অধ্যবসায়ীশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফোঁয়ার মাথা না খুঁড়িয়া যাঁহারা অর্থের খুলি লইয়া ব্যবসায়ে নামিতে অগ্রসর পাইবেন না। বড়-বড়লির বিজ্ঞাপন না দেখিয়া যদি তাঁহারা কোন প্রকার ব্যবসায়ে হাত দেন তাহা হইলে অচিরেই সফলতা লাভ করিবেন। বিভিন্ন সহরের প্রতিনিধি বিলিয়া প্রবাসে কোন্ কোন্ ব্যবসায়ে বাঙালীর সুবিধা হইতে পারে তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। রাজসেবায় সকলের অধিকার নাই। তাহা ছাড়া বাণিজ্যেই লক্ষ্মী। একটা কথা বলিয়া রাখা হইবে যোগ্য যুবকগণকে কিছু কিছু মূলধন বাঁচিয়া দিলে বঙ্গ হইবে না। পশ্চিম রাজ্যের সহরে যোড়াগণ কত মূলিয়া অপেক্ষাকৃত সহীন ব্যবসায়ীর মূলধন যোগাড় করিয়া দেয়। বাঙালীকে এ দেশের লোকেরা clannish সাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে। অবশ্যে, আমোদ-প্রমোদের লক্ষ্যেই বাঙালী দল-ছাড়া হইতে চাহে না। বাঙালী দল করুক, বহিরের সুবিধা বিচারের ভার, বাঙালীর ব্যবসায় উন্নতির ভার। এ হলে, দেশে বলাবলি থাকিবে না।

ব্যবসায়

এটা নিশ্চিত যে, এদেশবাসীর অন্নাধিকার ছোটো-খাটো ব্যবসায়। ওকালতী যদি একই প্রকার হয়, বিশ্ববিদ্যালয় যদি একই মার্কার দুইজনকে ছাপ দেয়, এদেশবাসী তাদের প্রতিযোগী বাঙালীকে ঠোস মারিয়া বলিতে পারে, 'এ আমার অন্নাধিকার, তুমি পূর্ববিকে যাও,' ইহাতে উত্তর দইবার কারণ না থাকিয়া সেই প্রতিযোগী বাঙালীকে এক ফেঁড় থাকিয়া লইতে হইবে যেখানে সে পরিবার নয়। রাজসেবায় অধিকার-লাভ রাজার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাণিজ্যে অধিকার-লাভ স্বোপার্জিত। যে মূলধন হতে বিক্রয় করিবে সে-ই এ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট পাইবে, সেই হউক, যা সহযোগীই হউক। স্বাধীন ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালী দাঁড়াইতে পারিলে প্রবাসে সে স্বীয়তনকে অনন্ত লাভে চলিতে পারিবে।

মুদিখানা ও মনুহারী বাণিজ্যের উপর আমীর অত্যধিকার আছে। কিন্তু মাড়োয়ারী যদিও মুর্শিদাবাদ হইতে বেশভী কাপড় বন্দালীর ভার লইয়াছে। এমন বাঙালী আমীরে আছেন, যেন কি এই ব্যবসায় কিছু অংশ আয়ত্ত করিতে পারেন না? এমন আরও কত দিকে যে বাঙালীর ব্যবসায় সার্থকতা নিশ্চিত তাহার ইয়ত্তা নাই।

সমবায়

যে সব স্থানে বাঙালী মুষ্টিমেয় সেখানেও তাহারা যদি আপনাদের আবশ্য-বস্তাদি সম্বন্ধের তাদের ক্রয় করেন তাহা হইলে পাইকারী দরে অনেক সুবিধা হইবে। Co-operative Stores খুব কম মূলধনে চলিতে পারে। শুধু সাবধান হইতে হইবে, ক্ষুদ্র পল্লীর প্রত্যেক বাঙালী Stores দ্বারা অল্প দোকান হইতে সাধারণ দ্রব্যাদি কিছু ক্রয় করিতে পারিবেন না, এবং কেহ কখনও ধার পাইবেন না। দশ বারজন বাঙালী প্রবাসে একত্র থাকিলেই একটা সমবায় দোকান Stores খোলা যাইতে পারে। বম্বেই-বাজার মুদিলে তাহার লভ্য অর্থে কতকগুলি বই কেনা অসম্ভব নয়। একটা চলন্ত পুস্তকাগার (travelling library) কিনা অর্থে কতকগুলির পল্লীর স্ত্রী-পুরুষের বিদ্যার ভার লইতে পারে। পুরাতন কলকের হয়ত একজন শিক্ষক পল্লীতে পল্লীতে সপ্তাহ বৈঠকে বসিয়া বিষয়ের অবতারণা করিতে পারেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যোগ দিতে পারেন।

বাঙালী বন্ধুপ্রিয়। একটা বড় ছেলেমেয়েদের খুন, একটা প্রকাণ্ড নাটাঘর, একটা বিপুল পাঠাগার—এ-সব কিছু না একটা সঙ্ঘ হইলে সে একেবারে নিরুপায় ও নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া থাকে। স্থানে স্থানে বাঙালী

সংস্থার এত কম যে একদল বড় বিদ্যু একটা ধরা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত। দুর্বলদিগের একমাত্র সম্বল—সংঘবদ্ধ। পাঠ্য পরিষদ এখনি অর্থে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে, তাহাদিগের পক্ষে একদল শিক্ষক ও একদল চিকিৎসক নিযুক্ত করা অতি সহজ। একটী ক্ষুদ্র নৈশ বিদ্যালয় ও পাঠাগার—যাহাতে তাহাদের শিক্ষা প্রয়োজন নিয়ে নিযুক্ত থাকিবে তাহার সম্বন্ধে-প্রণালীতে মধ্যে তুলা কঠিন নহে। বাঙ্গালী কৃষকদের কাজ করিতে শিখে নাই। অতি নীচ আদর্শে তাহার তৃপ্তি হয় না। তাই তাহার পক্ষে পথ দীর্ঘ।

সঙ্কীর্ণতা

কৃষ্ণ কৃষকের মধ্যে একটা প্রকৃত ভবিষ্যতের সম্বন্ধতা বহন করার ক্ষমতা প্রবাসী-বাঙ্গালীকে অর্জন করিতে হইবে। সকল বিষয়ে ও অনুষ্ঠানে তাহাকে অর্থ-নিরপেক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। বিচিত্র কর্ম-ক্ষেত্রের অভাবে বাঙ্গালী প্রবাসে শুধু আপনার জাতীয়তার বড়াই করিতে শিখিয়াছে, আপনার মনোমত অনুযায়ী প্রবাসে কিছুই কর্মকুশলতা দেখাইতে পারিতেছে না। এদিকে বরাই সে অন্যের অপেক্ষা এ-দেশবাসীর অন্তরিবাসের সাথে অধিক মেলিয়াছে তবুই তাহার জীবন ভিক্ষুকের বিলাস হইয়া উঠিতেছে। তাহার জীবনের বিলম্বকে কৃষকদের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক আত্মসচিবতা ও অনুযায়ীতার পরিচয় হইতেছে। ইহার ফলে বাঙ্গালীর মন একদিকে যেমন প্রয়োজন সম্বন্ধে ও সমাজ হইতে আহার্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া উপবাসী থাকিয়া যাইতেছে, অন্য দিকে এ-দেশবাসীর বাঙ্গালীকে ক্রমে হেয়জ্ঞান করিতেছে। বাঙ্গালী যদি কর্মকুশল হয় তবে সে এ-দেশবাসীর অন্ধ আকর্ষণ করিবে এবং নিজেও সে শক্তি পাইবে। রাষ্ট্রনীতিক বাঙ্গালীর বর্তমান এইমাত্র যে, সে এখনি মনে আপনার সম্বন্ধের ভবিষ্যতকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, নিজেও সঙ্কীর্ণতার জাল বুনিয়া আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছে। রাষ্ট্রনীতিক জীবন এখন নেশার মধ্যে—ক্রিয়ার জীবন। এ সময়ে চিরকাল সেই কথাই প্রযোজ্য—ক্রিয়ার নৈব নৈব চ।

কর্মের শক্তি

যে জাতি ক্রিয়ার পুঁজি লইয়া অপর দেশে ঘোরায় তাহার চিন্তা, তাহার সাহিত্য, তাহার আইনে যে সমান করিবে! প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্ন-বস্ত্রসংস্থার অভাব বলে বাঙ্গালীর জাতীয় সাধনা উপযুক্ত ভাবে আবদ্ধ করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালী কর্মকুশল, অবেশ-সেবক, ব্যবসায়-চতুর হইয়া প্রবাসে অন্ন-প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে বাঙ্গালী জাতিরই গৌরব। বিদেশে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে একটা নূতন শক্তির আসে। প্রত্যেক কর্ম শুধু তাহার নহে, তাহার জাতির চরিত্রের পরিচয় দেয়। প্রত্যেক প্রবাসী এই শক্তির অনুভব করুক, ইহাতে তাহার জীবনে একটা নূতন প্রেরণা আসিবে। শুধু আপনার জীবিকা বা স্বজনের জীবননির্বাহ লইয়া থাকিলে কি দেশে, কি প্রবাসে কেহই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যে সমাজ যত বেশ তাহার সাধী নিজ পোষ্য বা জাতির সাধী অপেক্ষা কম নহে। এ দেশের সাহিত্য, আমোদ-প্রমোদ, আহার-ব্যবহার এখনকার সাধীর মেজাজ-বিকৃতির অনুকূলে নাবাবিক হইয়া যোগদান করিয়া প্রবাসী তাহার কল পরিমাণ করুক। ইহাতে তাহার জাতিত্বাতির ক্ষয় নাই বরং ইহাতে তাহার জাতির প্রতিষ্ঠা, নিজেরও গৌরব।

উৎসর্গ—

পরিত্র ভারতবর্ষে

[বঙ্গে ও বোম্বাইয়ের নবীন-শিক্ষিতদের প্রতিনিধি]

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ও তাঁহার সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান *

শ্রীদিলীপকুমার রায়—কলিকাতা

Man approaches nearer his perfection when he combines in himself the idealist and the pragmatist, the originative soul and the executive power... But the greatest men of action who were endowed by nature with the most extraordinary force of accomplishment, have owed it to the combination in them of active power with an immense drift of originative thought devoted to practical realisation. They have been great executive thinkers, great practical dreamers.

Progress and Ideal.... .Aurobindo.

এবার তবে পিয়ার চুঁচি ও ঐরূপ বন্দোবস্তের যেরূপ বিস্তৃতে গিয়ে সঙ্গীতের বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে হ'য়েছিল। সে সময়ে প্রায়ই সঙ্গীতের নব-প্রতিষ্ঠার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের মহাপ্রাণ পণ্ডিত ভাতখণ্ডের নাম শোনা হ'ত। তাঁর নামের উচ্চারণ অনুত্ত কথাবার্তা পাল করতে করতে উপরোক্ত কথাগুলি মাঝে মাঝেই শুনে হ'ত। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা ছোট মনের মধ্যে ছবির মতন ছবি উঠত যে এতবড় একটা মানুষের মতন মানুষ —এ যুগোপযোগী, মনস্বিনী দৃষ্টিশক্তি, ভগবানের আশীর্বাদ আমাদেরই মধ্যে হ'য়েছেন!...

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে এঁর সম্বন্ধে একটী কথা ব্যবহার করেছিলেন—"ভগদ্ভক্ত"।...

বাস্তবিকই তাঁরই! একটি মাত্র ছোট কথায় বোধ হয় এই অদ্ভুতকর্মা মানুষটীর এর চেয়ে ভাল বর্ণনা সম্ভবপর নয়।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের আর একটী কথা, যাদবজীর মধ্যে বিদ্যে ব'লে কোনও জিনিষ ছিল বোধ হয় না। আমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম যে, বিদ্যে যাদবজীর কত আছে? তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। "কেন, যাদবজীর?" সেদিন এ সঙ্গীত-তপস্বীকে অন্তরের নমস্কারটীর অন্তরালে একটী পুলকাঘাত বেজে উঠে মনে হ'ল, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নি।.....যাদবজী, বিনয়ী, গোছালো, পরোপকারের সহযোগীবলম্বী ঘটে—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ন্যায়ে।

মনে হয়েছিল কোথায় এ মানুষের মূল—সুদূর বরোদায়; আর কোথায় তিনি তাঁর বাড়ী-ঘর ছেড়ে বন-গীত সঙ্গীতের একটী ধারা ধরে রাখার একটী সরস্বতির উপর ব'সে এ বিরাট সাম্রাজ্য প্রয়োজনীয় একটী বাহিনীর গুরু গীতবিদ্যাপন করছেন! উদ্দেশ্য—যেমন নয়, যাচ্ছেতা নয়, বিলাস নয়; উদ্দেশ্য—শুধু সঙ্গীত সম্বন্ধের যোগ্যপন্থাটী প্রকৃতরূপে বেঁধে দিয়ে যাওয়া। অর্থ নেই, কৌত, আরাম-বেরাম ও দূরের কথা—টেবিলের মতন একখানি টেবিলও নেই। যাদবজীর আছে দু-তিনটী বিরাট সাম্রাজ্য চেয়ার, দুটী ঘরির পাটিয়া, একটী আয়না, একটী চেয়ার ও দু-একটী সাধারণ জোয়ার। একটা ঘর—তাতেও আবার পণ্ডিতজী একা থাকেন না, তাঁর প্রিয় শিষ্য ঐরূপ বন্দোবস্তের থাকতে হয়। কারণ, অন্য সব ছাত্রটি বিদ্যার্থীদের থাকা-খেতা প্রভৃতি বাবা তাঁদের অন্তে বন্দোবস্ত হয়।...

* পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর অন্তরালের অনুত্ত জীবনযাত্রীর মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দান—তাঁরা এ প্রবন্ধটী তাঁর সম্পূর্ণ পূরক বলেছেন না। "আমাদের বিশ্বাসিকা"র পরি তাঁর যে বাস্তবিক জীবনী লিখেছি সেটী পড়া থাকলে এ অনুত্তি বোঝা সহজ হবে।

এ বয়সে যেদিন পণ্ডিতজীর সঙ্গে এই বাড়ীতে আমার প্রথম দেখা হ'ল, সেদিন তিনি মোরাদাবাদ থেকে আসছেন। বয়সের ভারে ন'ুয়ে এ অঞ্চল অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে মোরাদাবাদে ঘুরতে হয়—তাঁর বিদেশ-যাত্রার পথ সারের সঙ্গীত-বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে।—অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, এ কাজ তিনি স্বেচ্ছায় ক'রে এসেছেন—এর জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে কোন দাবি-দাওয়া রাখেন না, এবং তাঁর অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হওয়া সত্ত্বেও। যেদিন তিনি লক্ষ্ণৌয়ে ঠিক একটি অঞ্চলে ঘুরে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়েছে—কত দিন কত বছর এখানে থাকতে হ'তে পারে সে কথা একবারও না ভেবে। নতুন সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে সকলেই দায়িত্বহীন ছেলে—কেবল পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ছাড়া। এঁর কাজ শুধু কলেজটিকে প্রতিষ্ঠা ক'রে যাওয়া। সে জন্য এ দুর্বলহীন বৃদ্ধ দেহ জীবনে যুদ্ধের অজস্র আঘাত-অবসাদের মোচড়ের আঘাত হ্যাচ ক'রে বহুবাহুবর্ষিত এ নতুন ছাত্র-জীবন সঙ্গীতের এক আনন্দলোকে হাত ধ'রে নিয়ে যাবেন শুধু এই উদ্দেশ্যে—তবে কোন্ দূর অতীতের কোন্ কৈশোরে তাঁর সংস্কারের সঙ্গীত-শিল্পী মনোযোগের চেতনা ও জীবনীশক্তির রসে পূর্ণবয়ব লাভ করে উঠবে

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মোরাদাবাদ খুব অবশ্য এখন পূর্ণ সাধারণ অবস্থায় পৌঁছেছে। কিন্তু যখন যে বয়সে আগে তিনি সেই ছোট প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স এদিকে যেমন কলাম-সম্প্রদায় বেছেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁকে একটা 'ছদ্মনাম' বা 'পাগল' ছেলে উপেক্ষা করেছিলেন। সে সময় পণ্ডিতজী তাঁদের বাড়িতেই নিজের মনে উপেক্ষিত সর্বস্ব বুদ্ধির খেলার ঘরে তার ঘরে বক্তৃতা দিয়ে বক্তৃতা হ'ন নি, অথবা কোনও আজ কলম ফলিয়ে দেশবাসীর চমক লাগিয়ে দেবার প্রয়াস পান নি।—তিনি তখন শুধু নিজে-পরে মনের অনেকটা না থেকে তাঁর উদ্ভাস আদর্শবাদের অঙ্কন শিষ্যাটুকুকেই সবল ক'রে তাকে নিজের নিহিত বিশ্বাসের মন্ত্র দিয়ে আশিষে রেখে চ'লেছিলেন। তিনি একলাই চ'লেছিলেন—তাঁর আজ তখন কেউ আসে কিনা দেখবার বা চিন্ত তাঁর ছিল, বা চিন্ত তাঁর অবসর। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তাঁর বিদ্যাপদ্ধতি, অদ্ভুত সংগ্রহ, অপূর্ব ব্যাখ্যাশক্তি ও অন্যান্য অধ্যাপকদের গৌরব সঙ্গীত-রসিকদের অন্তরে আজ অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু যে বয়সে আগে তাঁর সাধে কে ছেয়েছিল—তখনকার কাগে তাঁর ধর পৌঁছেছিল? বাইরে থেকে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে বটে যে লক্ষ্ণৌ মোরাদাবাদ, বরে প্রভৃতি সবত্রে পণ্ডিতজীর বাস্তু-উক্ত সঙ্গীত-ধীর যেন অনেকটা ব্যাবলেই ছড়িয়ে বিশাল বন্দনাবিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বয়সের এ বয়স বাধের কি উদ্যম ও জীবনব্যাপী সাধনার ফলেও উর্ধ্বাবাপক্তি লাভের হ'তে পেরেছে? বস্তুতঃ যাঁরা একটু বয়স রাখের এতজনের ঘুমাতে ভিত্তি করা তত সুবিধান, তত্ত্বাবধি সাধনা-সাধেষ—তাঁরা পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মোরাদাবাদ ঘুমের যখন ছাত্রাবস্থার অন্যান্য সঙ্গীত-সাধকদিগের থেকে প্রথমে বিশিষ্ট না হ'য়েই পারবেন না। কিন্তু পণ্ডিত ভাতখণ্ডের অন্তরঙ্গ সম্পর্কে এসে এক মুহূর্তেই বোঝা যায় কেমন ক'রে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।...

সেদিন লক্ষ্ণৌয়ে আমাদের এক বন্ধুর বাড়ীতে ভাতখণ্ডের মোট শিষ্য মুখর ঠিক্ষক বজনজনকের অঙ্গনের খেয়াল ও ঠুমরি শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল যে, অতখানি অধ্যবসায়ের ফলে না জানি এদের একটি শিষ্য ক'রে তোলা যায়! মনে হচ্ছিল—অতখানি ঘুমের অন্যে এতখানি জ্ঞান ও শিক্ষার প্রেরণা যে দিতে পারে সে মানুষটির মহত্বের পরিমাণ করতে যাওয়াও যেন এক বিড়ম্বনা! মনে হচ্ছিল—এ একটা সৃষ্টি! ও যেটা সবচেয়ে বেশী মনে হচ্ছিল সেটা এই যে, যাঁর বিশ্বাসে আঘাত যায় যায় ও যে বিশ্বাসকে সৃষ্টি দেবার অন্যান্য সাধনা থাকে তা হ'লে সংসারে যোগ হয় সব যাযাবরদেরই জীবন-বিধাতার বাহু-বন্ধের স্পর্শে আশ্রয় হ'য়ে যেতে যায়। কারণ পণ্ডিতজী নিজে জানি যাইতে না পারা সত্ত্বেও তাঁর শিষ্য ঠিক্ষক আজ যেমন ক'রে এই বয়সেই

ভারতের শ্রেষ্ঠতম 'খেয়ালী'দের সম্রাটের অধিকার ক'রে ব'সলে এ প্রশ্ন প্রথমটায় মনে হওয়াই উচিত হয়। খুব বড়লোকদের তবু যে একজন খুব উচ্চশ্রেণীর খাদক তাই নয়—তাদেরকিনী সম্বন্ধে তাঁর পুঁথিগত যেমন বিস্তৃতজ্ঞান, বাস্তবিক বিশ্লেষণ-ক্ষমতাও তাঁর তেমনি দুরন্তরী। আর তাঁর মনের যেটা সব চেয়ে বড় সম্পদ, সেটা হচ্ছে তাঁর সহজ সৌজন্যবোধের সৌরভ ও নিরভিমান দুষ্টে তাঁর মৌখিক। এত কথায় তাঁর মনের জন্য ঘাবড়াবার তাগিদে নয়—তাঁর মনের মাত্রার উন্নয়—তাঁর আত্ম-বিকাশের প্রয়োজনের অনুযোগী হ'তে। অথচ এই বড় একজন মানুষ ব'সে উঠে ন আজকাল, অন্যায়ে, আমাদের মধ্যে, উজীর খাঁ প্রভৃতি বড় বড় ওস্তাদের বিদ্যা-প্রেমাণ্য নয়, এ অসাধ্য-সাধন হ'ল কি না পণ্ডিত ভাতখণ্ডের হাতে—যাকে ঠিক ওস্তাদ বলা চলে না! এ অযোগ্য প্রশ্নেরও সমাধান যে করবে।

বস্তুতঃ এটা প্রশ্নেরও নয়। আমাদের সঙ্গীত বর্তমান সময়ে অধিকির ওস্তাদের হাতে প'ড়ে যে কি সঙ্গীর্ণ মোহমোহীন অবস্থায় পৌঁছেছে, তার পোষকীয়রা বিনে যিনিই একটু মাথা খাটিয়েছেন তাঁরাই মনে হ'তে বাধ্য যে আমাদের সঙ্গীতের এ দুর্দশার জন্যে ওস্তাদের সঙ্গীত-সমন্বে অজ্ঞতা বড় কম দায়ী নয়।

ভারতের মহাজনোপাধ্যায় ওস্তাদজন—যারা আজীবন রাগরাগের চর্চায় ডুবুক, রাগ-জ্ঞ, সঙ্গীত, বিষয়ক্তের হারিয়েছেন, তাঁরা—সঙ্গীত-সমন্বে অন্ত এ কথা বলার বলল যে আমি আমার ওস্তাদবিষয়ের অধিষ্ঠাত্রীতে ভগবান হ'ন এ কথা আর যারই অযোগ্য থাকুক না কেন আমার অযোগ্য নেই। (আজ আমি ভুক্তভোগী)। তবু নিতান্ত প্রয়োজন-বোধেই সত্য কথাটি আমার বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। এবং এর জন্য একটা অভিযোগ ওস্তাদ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আনার বাহির সম্বন্ধে যে আমি পূর্ণভাবে সচেতন সেটা প্রকাশ করবার জন্যে উপরের আর মহাত্মাগণ সঙ্গীতবিদ্যায়ের পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ওস্তাদজন উল্লেখ ক'রব। আর প্রথমতঃ তাঁর বিশ্লেষণপদ্ধতি আলোচনা উপলক্ষে আমাদের ওস্তাদদের সঙ্গীত-সমন্বে প্রবৃদ্ধ জ্ঞানের অভাব সমন্বে আমার অভিযোগ-ব'লে-ব'লে-ওঠা ব্যবসায়িক মূলে নিবেদন করব।

পণ্ডিতজীর কাছে একদিবসার অভিযোগ—"যার মহাশয়, যদি আপনি কোন ওস্তাদপুত্রকে দুষ্টী গাইতে বলেন ত তার ত 'তুমি বুল মত্ত কেন গাইবেন ও যদি কেন গাইতে বলেন তবে দুষ্টী গাইবেন। কিন্তু যদি তাকে কেন দুষ্টীর যে কোনও একটী গাওয়ার পর অপর দুষ্টী গাইতে বলেন তবে পরক্ষণে নিশ্চয়ই তার ওস্তাদ আপনাকে বলবেন যে সেটা তিনি আর একদিন গাইবেন"—ব'লে তিনি হেসে উঠলেন।

আমি আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"বলেন কি পণ্ডিতজী? বড় বড় ওস্তাদেরা যদি কেন দুষ্টীর সুরে প্রভেদ না জানেন, তবে কে জানবে? Who shall decide when doctors disagree?"

পণ্ডিতজী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-হাসি হেসে বললেন—"আমি সমস্ত ভারতবর্ষের বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেই এ কথা বলছি, রায় মহাশয়। এবং জেনে রাখবেন যে আমি আমাদের সঙ্গীতের দুরবস্থার সম্বন্ধে ওস্তাদদের কাছে সমাধান না পেয়ে তবেই সেবটায় নিজে ভাবতে বাধ্য হয়েছি। তখন দুঃখে প'ড়ে আমি আমাদের সঙ্গীতের যাবতীয় সেবাকে thankless ভাবে হাত দেই নি। তাই আমার এ দাবী আপনি অবিশ্বাস করবেন না যে খুব কম ওস্তাদেই রাগ-রাগিণীকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে তাদের বিস্তার ক'রে থাকেন।"

—"তার মানে?"

—"আমি অনেকবার কণ্ঠসঙ্গীত প্রবৃত্তিকে ওস্তাদের ছেলে তাদের সাথে মেলার জন্যে এ রকম সুযোগ দিয়েছি—কিন্তু তারা বলতে গাবে না কেবল ক'রে ও কেন যে রাগগুলির উৎপত্তি হয়।"

—"সে কি বলুন!"

—"তা হ'লে আপনাকে আরও একটু shock ক'রে দিই, রায় মহাশয়। শুনুন। খুব কম ওস্তাদই আজ

যারা আমার আগে যে-সব বাদ্য বাজাতে কি কি সুর লাগে। ধরুন, একজন অর্কেস্ট্রাবিশারদ যদি বাইরে (আলো-দেখে আমরা যাকে বলি আলেয়া)—তাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন সে কোনদিন কি বাজাবার জন্যে কি না তা হ'লে সে হয় ত বলবে যা কিছু না। যদি আপনি তাকে প্রতিবাদ করেন না হ'লে সে বলবে 'হো সকতা সাব্, যা কিছু পাওয়া যে কেন নিজিয়ে কোনদিন বিবাহ লাগতে কি না।' (আমি আমার বাদ্যি দেখে নিন্ কোনদিন বিবাহ লাগতে কি না।)

—"তা হ'লে তারা বড় গায়ক হ'ল কেমন করে?"

—"খুব সহজে। যার তারা যায়—তাদের অসাধারণ অভ্যাস-বলে অর্থাৎ তাদের গলা সুরের মৌড়-ঝাঁপে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে ব'লে, আর কিছুই না। বিশেষ তারা জানে না একেবারে। অবশ্য, যু একজন ব্যক্তিত্বের কথা ছেড়ে দিতে হবে—যেমন উস্তাদ্‌জীর ওস্তাদ আবদুলীন খাঁ।"

—"যদি তাদের ছাড়া যাওয়া যায় তবে বিশেষ কিছু যায় আসবেই না কেন, শিক্ষিতা?"

—"হায় মহাশয়, নিজে ভাল গাওয়া যায় আর ভাল শেখান বিশেষ খুব আর না আসলেও চলে। কিন্তু যদি অপরকে নিজের আয়ত্ত বিদ্যা কিছু ফল দিতে হয় তা হ'লে অবশ্যকের বাদ অমূল্য। এরে যে ভাল জানে তাকে যা তা আমি ভুল বলতে দিয়ে সাধারণ উপলব্ধি করেছি। তুমি আমার মোসাহিবের ভুলের দল যারা বছরের এমন কয়েকটি ছেলে দেখ যি কি যারা দু'শ তিনশ গান ও একশ বেহাগ বেলাগ কিছুদিন গাইতে পারে? তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তুমি না গাইবে খুব কঠিন স্বরবিন্যাস, মইলে গাইবা যায় স্বরলিপি ক'রে নিতে পারে। ওস্তাদেরা শুধু মৌড়টা কেতে কেতাবে দেখে ও শেখায় তাকে ক'রে আমিনে এক সন্তোষজনকভাবে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।"

এ কথা আমারও অনেকবার মনে হ'য়েছিল যে ওস্তাদেরা শুধু যে শেখাতে চায় না তাই নয়, তার শেখাতে জানেও না। তা ছাড়া সবের তাদের কাছে কোনও দুষাই নেই—তাদের বর্তমান মূল তারা সত্যিই একটা anachronism—তাই তারা কখনও ভেবে না যে বিশ্বের অন্যান্য তাদের সঙ্গীতবিদ্যার কতটা বিকাশ হ'ল ও কতখানি অগ্রসর হ'তে পেরেছে সঙ্গীত ক্ষেত্রে বিশে তারা হ'ল। বর্তমান যুগে মানুষের উপর এমন বিচিত্র ভাবের ও কর্তব্যের দাবী-দাওয়া নীচে নীচে তাদের অধিকার বিস্তার করার ফলে শিল্পীর একাগ্রে নীচ পেশার প্রয়োজনও ক্রমেই কমছে ও চলতে যাবে। ওস্তাদের একটী বাদ্য দু'ঘণ্টা আসর ভরে চলতে পারে তাদের অন্য কোনও কাজ নেই—কিন্তু সভ্য মানুষকে সভ্যতার দাবী-দাওয়ার মর্যাদা রাখতে হ'লে রাত্রিদীর দার্শন ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ে নিপুণ হতে হয়। পরিবর্তনীয় পদ্ধতিতে বাদকেরা যে কি আশ্চর্য রকম সহজ উপায়ে অনেক কিছুই শিখতে পারছে সেই সুযোই তাঁর পদ্ধতির সারবত্তার মন ছেড়ে অবশ্য যাবে। তাই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের অগাধ জ্ঞান ও অদ্ভুত শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে একটু পরিচিত হ'লে আরও বেশী ক'রে মনে হয় যে, মামুলি ওস্তাদি শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন না ক'রলে আমাদের দেশে সঙ্গীতের বহুল প্রচার 'বৈদ বৈদ ন।' এক কথায়, আমাদের উচ্চসঙ্গীত শেখাবার সব চেয়ে যোগ্য লোক হবেন আজ তাঁরা, যাঁরা আমাদের সঙ্গীতের technique-টী সম্বন্ধে একটী স্বাধীন ভাবে ভাবতে শিখেছেন।—অর্থাৎ যাঁরা ওস্তাদদের কাছ থেকে রাগরাগিণি নিয়ে নেবেন আজ কিন্তু তাদের classify করবেন—নিজেরা প্রযুক্তভাবে। এই প্রযুক্ত classification-এর ভার পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতন প্রতিভা ও অক্লান্ত শ্রমের মূর্তীয় প্রয়োজন অতীত। তিনি যাদের মুখে মুখে সঙ্গীতগুলিকে আজ ওস্তাদ সম্প্রদায়ের বিভীষিকাময় ঘোরাক-বাঁধার অনুকূল থেকে যে প্রাণপাত পরিশ্রমে বাহিরে টেনে এনেছেন ও বীর চল্লিশ বৎসর ধ'রে তাদের বেতারে মুক্ত আলো-হাওয়ায় আয়হাওয়ায় এবে বাড়ন ক'রে এসেছেন, তার জন্যে ওস্তাদ-প্রতীক্ষিত, পথাভুরা বীণাপাণির আসন মানুষের নিকটই তাঁর কাছে চিরকাল থাকবে। তাই

আমার মনে হয় অরবিন্দের অনুসৃত কথাটি যে মানুষের ক্ষেত্রেই বিশেষ হয় তাহা নহে, যখন তার মধ্যে সৃষ্টিপ্রতিভা ও আদর্শবাদের সঙ্গে মিলিয়া ও সাধনশক্তিরূপে অধিকারও লাভ হয়। তিনি আরও বহু কথা ব'লেছেন যে—when the idealist is liberated, when the visionary abounds, the executive worker is uplifted, finds at once an orientation and tenfold energy and accomplishes things which he would otherwise have rejected as a dream and chimera, which to his ordinary capacity would be impossible and which often leave the world wondering how work so great could have been done by men who were in themselves so little.

পণ্ডিতজীর সাধনকর্মের (practical ability) কিছু পরিচয় বোধহয় লোক সংগ্রহ করতে পারছি না—পাঠকপাঠিকাবর্গের ধৈর্যচ্যুতির ভয় সঙ্গত। তবে এ বিষয়ে আমার justification এইটুকু যায় যে একজন একটা মানুষের সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনেক কথা অনেক সময়ে বীজন বোধ হয় না। তাই এখন আরও কয়েক পণ্ডিতজীর সঙ্গে যে সব কথা ব'লেছিলাম একটু বিস্তারিত ভাবেই সে সব কথা উদ্ধৃত করতে চাই।

সংঘ সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিতজী বলেন—"হাম অনেক দেখেছি যব যবাসব, তারা খাটতেও বটে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানেন?—তাঁরা প্রায় সকলেই কালেজের ছাত্র, তাই কেউ এক বছর, কেউ দু বছর কেউ বড় জোর তিন বছর থাকবে। তার উপর তারা কলেজের পড়ায় বেশী অতি করতেও পারে না। কাজেই, তাদের দিয়ে বেশী কাজ পাওয়া যাবে ব'লে ভরসা হয় না। মোটামুটি আমার স্কুলে আজ দু'শ ছেলে গান-বাজনা শেখে—তারা প্রায় সকলেই স্কুলের ছাত্র, কাজেই, তাদের আমি একাধিকবার পাচ বছর ক'রে পাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"তা'হলে উপায় কি?"

—"উপায়?" ব'লে পণ্ডিতজী একটু হেসে চিন্তিত ভাবে বললেন—"আমি এখানকার সব স্কুলের হেডমাষ্টারদের অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছি প্রতি ক্লাসের অন্ততঃ একজন ক'রে ছেলে আমাদের কলেজে পাঠাতে—যাতে আমরা তার মধ্যে থেকে পরীক্ষা ক'রে বেছে নিতে পারি। আর এখানকার অনেকগুলি তালুকদার রাজা প্রকৃতিতে ব'লেছি এই ব'লে যে, তাঁরা যেন মাঝে মাঝে কিছু কিছু ক'রে টাকা না দিয়ে—প্রতি তালুক থেকে দু' একজন ক'রে একটু-আধটু সঙ্গীতজ্ঞ যাতে হয় সে-চেষ্টা করা। ক'রে স্কলারশিপ দিয়ে এখানে পাঠালে কলেজের বেশি উপকার হয়।"

—"তাহলে তোমার?"

—"তাহ'লে একটা মোটা রকম টাকা ক'রেছি। সেখানে আমাদের এই কলেজের একজন অধ্যাপককে পরিদর্শন ক'রে দেব। দেখি এ প্রস্তাবে তালুকদারেরা রাজি হ'ন কি না।"

—"রাজি হবেন কি?"

—"বলতে পারি না। অনেকটা নির্ভর করছে আমাদের এডুকেশন মিনিষ্টার যদু বাবুদের একাধিকার উপেক্ষণে সাফল্যলাভ করার উপর। তিনি যদি এবারও ইলেক্টেড হ'ন তা'হলে তিনি আমাদের এ কলেজের জন্যে আরও বেশী করবেন। তাই আমরা বিশিষ্টির প্রার্থনা করছি—যাতে যাহা-করতক তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ করেন।"

আমার সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভজনলালজীও হেসে উঠলেন। আমি বললাম—"আপনি সাহেব আপনাদের অধ্যাপক মোহনের ব্যবস্থাও বেশ করছেন।"

পণ্ডিতজী বললেন—"এখানে আপাতঃ দু'জন মুসলমান ওস্তাদ নিযুক্ত করা গেছে ও আমার দুটী ছাত্রের কাছে পাঠিয়েছি—ভজনলালজী ও বাবু।"

(বাবু পণ্ডিতজীর মোহনিয়ার স্কুলের ঠিকানা হয়। প্রায় পাচশ একর বেয়ারে আছেন, বলা বাহুল্য—পণ্ডিতজীর পদ্ধতিতে অতি সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষিত, অতি সুব্যবহৃত, যদিও শ্রীযুক্ত ভজনলালজীর সঙ্গে তুলনায় নয়—তবুও শ্রীযুক্তের তুলনা এক শ্রীযুক্ত।)

—"এরা ত সব খায় দেখছি।
দেখবার ব্যবস্থা করেছেন ত বুঝি!"

—"অবশ্য তাই কি! তবে আমি চাই দেখাক, এরাও, যাঁরা দেখবার আগে বাজ-বিচারটার একটু ফয়সালা করা।"

—"কিন্তু খাইতে যদি সে না পারে!"

—"বাজ-বিচারটার ভার যারা ন'য়ে ন'য়ে একথা কে বলছে? তারা খাইতে নাই বা পারল, কিন্তু কিছু ত পারবে? এবং এই কিছু বলার আগে করতে হয় অনেক—তাদের তার সব বাজনা ঠেকে সাফ হ'য়ে যায়। নইলে প্রথম দেখেই দেখার, এরাও দেখতে খেতে ভাল হয় না—সে স্বাদেই শৈথিল্যহীন ও অলস হ'য়ে পড়ে, দেখা যায়। আর তারা সেখানের ভার দিয়ে ফেলে, তার তারা একটা ছুরি নিয়েই ফিরা ফিরা ক'রে দেখটা হাই তুলতে থাকে, পরক্ষ তারা যাথা ব্যথা ক'রে পড়ে—এই রকম অবস্থাপিত যারা এসে সব সব ক'রে দেয়, তার মহাশয়—এ আমি দেখেছি।"

শ্রীকৃষ্ণ বরদরাজন আবার হেসে উঠলেন। আমিও সে হাসির রোল দিয়ে বললাম—"একথা খুবই ঠিক পণ্ডিতজী, তবে তাদেরি প্রথমটায় সমাধানির ভেতে কঠিন বটে—অসাধ্য বটে। কিন্তু সে কথা যাক্। আপনি যে চারজন শিল্পক এনেছেন তারা ত সবলেই 'ভেজিটে'। 'ফলহী'র কি ব্যবস্থা করেছেন?"

পণ্ডিতজী বিষণ্ণ স্বরে বললেন—"ঐখানেই ত মুস্কিলে প'ড়েছি, তার মহাশয়—কথন যাকে যে রোগ পেয়ে বসে। আমি ভেবেছিলাম যাদের বেশ ভেতে একজন কাটেক থাকবে, কিন্তু পোলাই ত মনে কিছে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আর কোনও ফল কলহী বাজনা-ভেদে আছে কি এখন?"

—"কৈ আর ভেবেছে ত' পারি না।"

—"সেই ত রোগ। কি করি বুঝতে পারছি না। মহাদেবে একজন যৌনা-বন্ধু ছিলেন—ঔরঙ্গ আনুর জবরদ্দিয়ার—কিন্তু তিনি বাদ-বিচারে ন'স মারা গেছেন।"

—"ঐযোগ থেকে অজ্ঞাতসে যাঁর ছেলে 'ফলহী'র নাদিরউদ্দিন খাঁকে আনা যায় না?"

পণ্ডিতজী হেসে বললেন—"সে কথাটা আমার তেমন আমি ক'রেছিলাম, তার মহাশয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় কোথায়? তিনি ত' বলে পাঠালেন—আমার বিরুদ্ধে তিনি ত আসতে পারেনই না, আমাদের একজেকশন বিভিন্নাবের কাছে যাবেই যোগ্য নয়। যাঁদের ইন্দোরের সেলিব্রিটার এক্সেটার ধরে আমাদের লাই সাহেবকে দিয়ে ব'লে পাঠাতে হ'বে যে, লাই সাহেব ইন্দোর বাজনার বন্ধ-ধরে। তবে যেই 'ভেজিটে' ধরে ধা-দিয়েছে ব'লে ব'লে আসেন তবে তিনি আসতে পারেন। আমরা কে? লাই সাহেবই ধরতে একবারে বোধা নিয়ন্ত্রণ-কর্তা।"

আমরা হেসে উঠলাম।

পণ্ডিতজী বো-বো ক'রে তার আসবের ধরন তাঁর শুভ-দাঁতি বুলিয়ে দিয়ে বললেন—"আরও আছে, তার মহাশয়। আমাকে সরীফ-খাঁ ব'লে পাঠিয়েছেন যে, যদি তিনি আসেনই তা'হলে এটা যেন আমি জেনে রাখি যে, তিনি সরীফ সম্বন্ধে কোনও প্রকারের মন্তব্যই মানুষের না, কোন ঘাইয়েই তার থাকবেন না, কোন পত্রিকাই তাঁকার করবেন না, কোনও রাগ করবার ধরন দেখাবেন না—এমনকি ইচ্ছে একটা বাজনা দেখাবেন তাতে শিকাগোর ইন্দোরাই হোক বা অন্যিয়ার শুভ হোক।"

হেসে বললাম—"তা'হলে কি রকম বিষয় অনুসারে তিনি চলবেন?"

পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বললেন—"কেন?—তার বিষয় উদ্ভাবিত বিষয় অনুসারে! তিনি ত সব ক'রেই দিয়েছেন যে, তিনি বিষে নানারকম অবেষণপূর্ণ যাই বিষয়ের ও সেই সব আমাদের এখানে পাঠানুক্রম করবেন। আর ভাবনা কি?"

—"আপনার পত্রিটা তা'হলে—"

—"আমার পত্রিটা তার মহাশয়? আমার পত্রিটা সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বিষ্ণ করবার প্রকাশ করে ফেলবেন? আমার সঙ্গে কথা নয় তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু তাঁরা আমার সম্বন্ধে অনেক 'চিন্তা ও চেষ্টার ফলে

আমে মাঝে প্রকাশ হয়েছে সেটা অবশ্যিক সমালোচকের কাছে এক মুহূর্তেই চিত্‌চিত্‌ হ'য়ে যায় কেমন ক'রে তাই সময় সময় ভাবি, আর মনে মনে হাসি।"

—"কি রকম?"

—"শুনুন তাহ'লে। "এবার মোহালিয়ের এক বেদম সাহেবের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। তিনি বললেন, —'পণ্ডিতজী, আপনার ছাত্র-টাত্র ক'রে সকলকেই এক রকমের একঘাঁয়ে শিক্ষা দেওয়াটা হচ্ছে আধুনিকতার বিরোধী।' আমি বললাম,—'তা'হলে কি রকমের শিক্ষাটা আপনার বিবেচনায় এবার দেওয়া যায় বেদম সাহেব!' বেদম সাহেব হেসে বললেন,—'খুব সোজা। সকলেই কিছুই একরকম করবে, দেখাবে, চাওয়া হবে না। কারুর কারুর পক্ষে বিশেষ ক'রে রসায়নের উপযোগী, কারুর কারুর পক্ষে বেহালার উপযোগী, কারুর কারুর পক্ষে টেনিস-ফুটবল। তাই ঠিক শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা—যাতে শিক্ষক প্রতি বালকের অধিকার বুঝে নিয়ে সেই অধিকার অনুসারে তাকে ক্লাসে বা খেলাতে বা ফুটবলে তালিম দিতে পারেন। বুঝলেন ত বেদম সাহেব?' আমি বললাম—'বেদম সাহেব, মাফ করবেন, আইডিয়াটি ত খুব পরিষ্কার বটে—কিন্তু তাকে কাজে লাগানোটা আমার কাছে ঠিক তরটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে না। তাই যদি সে বিষয়ে আমায় কিছু সাহায্য করবার দিতে পারেন তা'হলে বড় বাধিত হব।' বেদম সাহেব অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন,—'এর আবার শক্তটা কোথায় পণ্ডিতজী, আমি দেখাতে পারি—' আমি বাধা দিয়ে বললাম—'বেদম সাহেব, আপনি চলুন একদিন আমার ইস্কুলে ও সেখানে একটি মাত্র ছোট ছেলে আপনার সামনে ব'সে থেকে। তারা যেন বুঝে। যার সঙ্গেই। আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না শুধু তাদের প্রত্যেকের কথা শুনে ব'লে দিতে হবে তাদের মধ্যে কার কার কথা বিবাহ একদলের হাতে পড়েছেন, আর কার কথা বেহালের হাতে ও কার কার কথা টেনা-ফুটবির হাতে। তা'হলেই আমি বার কেন তাদের অভিপ্রায়ে আলাদা আলাদা শুধু একা, খেলা, খেলা, দু'টি খেলাব। আচ্ছা কবে আসছেন?' বেদম সাহেব এ নিমন্ত্রণে কেমন যেন একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বললেন—'তা কখনও বলতে পারি আমি? ছোট ছেলেদের মনস্তত্ত্ব একবার শুনেই কেমন ক'রে আগে থাকতে বলা যাবে তার কথা কোনের জন্য তৈরী, আর তার কথা খেলাব, টেনার জন্যে উপযোগী?' আমি বললাম—'একবার শুনে আপনাকে বার দিতে কে মাথার দিব্যি দিচ্ছে বেদম সাহেব? আপনি তিনশ' ছিলাকের বার শুনুন না।' "

ব'লে পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বললেন—"বেদম সাহেব তখন রোধ হয় একটু বুঝতে পারলেন যে বাইরে থেকে সমালোচনা করা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে নেমে কাজ করাটা ঠিক তত সহজ নয়। এই কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, তার মানেই। তাই আমার যার সেখানের পদ্ধতির ব্যবস্থাবলম্বনে এর নিন্দা ও আমার যাদের শ্রেণীবিভাগের রীতির এর ভুল বোঝা।"

ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে বললেন—"কিন্তু যার মানে, বেদম সাহেবের যুক্তিটি সম্পূর্ণ মানের নয়, সত্যের খানিকে একটা আমি মানতে যাব। তাঁর কথার মধ্যে এইটুকু সত্য আছে যে, কারুর কারুর পক্ষে বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কেবল আমার বলবার কথা হচ্ছে শুধু এইটুকু যার যে সেটা ধরা যায় পরে,—যখন শিক্ষার্থীদের খানিকের একটা বিকাশ হয়। কিন্তু তা যতদিন না হয় ততদিন একটা সাধারণভিত্তি পদ্ধতি অনুসারে তাদের ফোরার খানুনিটা পাকা ক'রে দেওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া অবশ্যকের মাস্টার-পণ্ডিত-অথম শিক্ষকের আর কি করতে পারে বলুন? তারা ত আর প্রতিভার সৃষ্টি করতে পারে না? তাই আমি চাই যে, মাষ্টার্ড শাপ করবার আগেই আমি প্রতি বালককে পাঁচ বৎসর বিশিষ্ট দেব—(১) অবধান, যাতে ক'রে তারা যা যা পাইবে সে সমস্ত তাদের ৫ পর্যন্ত-আবহের সময়ে বেশ সহজেই হ'তে পারে। (২) কণ্ঠ ও বেহালের; মন দেবে তাল ছন্দের তিন তালম' যায়। যাতে ক'রে-তারা বুঝতে পারে কি রকম ছন্দের গানকে সঙ্গিতের

উচ্চ-সঙ্গীত বলা যায়। এর ফলে পরে তারা ভাল ভাল গানের আসরও হয়তো বা বিভাগ করতে পারবে ও ভাল গায়কের পৃষ্ঠপোষকও হ'তে পারবে। আর (৩) মানে গানের অর্থ ও ভাব ভাল। কেন না আলাপে তা হওয়ার হয় না বটে, কিন্তু আলাপকে একটা পদ্ধতি অনুসারে সেখানে হ'লে যায় নয় না থাকলে চলে না।"

—"কিন্তু আলাপ—"

—"আমি আলাপের বিরোধী নই। জানেন ত আমি ইন্দ্রপুরের বিখ্যাত 'আলাপী' ৺রাজকালীন খাঁর কি রকম ভক্ত ছিলাম! আমি বলতে চাই, কেবল এই কথাটি যায় যে, প্রথম থেকেই আলাপ দিয়ে শিক্ষার্থীকে গানের দীক্ষা দেওয়া যায় না। যেমন, প্রপদ গানের দুরকম ভাগ আছে, এক ডাগরবাণীর ভাগ, ও আর এক গায়কীর ভাগ।"

—"ডাগরবাণীর ভাগ আপনি কাকে বলছেন?"

—"কেন? আপনি কি উস্তাদ ফৈ-এজমুদ খাঁ সাহেবের বীণায় ধ্রুপদ বাজানো শোনেন নি?"

—"শুনেছি। উস্তাদ খাঁ সাহেবই আলাপ করেছি, তাঁরা যেন যেন আলাপ করেন। সিধাই তাঁদের প্রধান সম্বল।"

—"ঠিক্, সিধাই তাঁদের প্রধান সম্বল। তাঁরা যদি ধরবাড়ী-ঘরানা মানতেন, ডাগরবাণীর মধ্যে যাদের যা ঘরে করের তাহ'লে কলতেন কি জানেন? তাঁদের পূর্বে যেখানের ধ্রুপদ গানির যেন আর ফুরোতে চাইবে না। এতে ক'রে ধরবাড়ীর মিঠাই ও প্রপত্তি যাতে মাটি কিন্তু সেটা দেখানো যায় না। সেটা ধরে আপনিই আসে—যাদের ছবি একবার চিত্রপটে আঁকা হ'য়ে গেছে।"

ব'লে একটু থেমে বলতে লাগলেন—"আমি চাই যায় ঘরানা—যাতে ক'রে সঙ্গীত শিল্পিটা অনেকের অন্তে প্রবাহ হয়। আমি উচ্চ সঙ্গীতকে আসরের ধ্রুপদ পঞ্চাশীন ক'রে রাখার বিরোধী। অনুষ্ঠানক্ষমতা হ'লে বাহীর গৌরব যাবে কি না সেটা বলতে পারি না—কিন্তু সঙ্গীতের যে সর্বনাশ হয় এটা নিশ্চিত।"

—"কিন্তু যাদ করবেন পণ্ডিতজী—উচ্চ সঙ্গীত ত সকলেই এখনি বুঝতে না—"

—"তা অবশ্য মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ত সত্যি যে আজও সঙ্গীতপ্রিয় লোক আছেন—যাঁরা উচ্চ সঙ্গীতের সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল অথচ কোথাও সমাজের উচ্চ সঙ্গীত শুনতে পান না—কালোয়াতির সংস্রবে নিরাশ হ'য়ে ফিরে আসেন এই বলতে বলতে যে, যাঁপাপাপি উচ্চ সঙ্গীত তাঁদের জন্য সৃষ্টি করেন কি? আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, উচ্চ সঙ্গীতকে মিলিয়ে যাও—তার ফুয়ার খুলে যাক, তার মহিমা শুধু ধ্রুপদ-রাজদের একচেটে ক'রে রেখো না। গানে যে মহিমা অনির্বচনীয় অনন্তরূপের সূত্রের স্পর্শে অমহিম হয় এই ভয়ে মহিমে বিশ্বাসের বাদ্যযোগ কোরো না। উচ্চ সঙ্গীতের মধ্যে যদি কোনও সত্য মহিমা থাকে তাহ'লে সে মহিমা অল্প প্রয়োগের অবজ্ঞায় ক্ষুণ্ণ হবে না। কিন্তু সত্যিকার সঙ্গীতানুরাগীকে অবিশ্বাসের চোখে দেখাটা কেবল সঙ্গীতের অন্তোষ্টিক্রিয়াই সহায়তা করতে পারে, নয় কি? বাস্তবিক পক্ষে উচ্চসঙ্গীত অনেকটা পর্দানশীন হওয়ায় ক'রেই আজ এমন রক্ষণীন বিবর্ণ হ'য়ে পড়েছে। শিল্পিক-সম্প্রদায় এখন উচ্চ সঙ্গীতের চর্চা না করলে তার নবজন্ম দুরূহপরাহত। আজকের দিনে উচ্চ সঙ্গীতকে আসরের মঞ্চে রাজসভায় যেমনা দিলেই কাজের আলমারীতে বন্ধপণে আজন্ম বাস্তুল চলবে না। এইটেই হচ্ছে 'এখনকার' দুরূহ একথা বুঝবার সময় এসেছে। এর একটা কারণ এই যে, তান চঙের সঙ্গীতকে বাঁচাতে হ'লে তান ভঙ্গিকে বাঁচতে হবে। এখন তান ভঙ্গিকে বাঁচতে হ'লে গায়কদের পৃষ্ঠপোষকতায় অপেক্ষা বাঈজীরা তাতেই হবে—যেহেতু রাজারাজড়ারা প্রায়ই সঙ্গীতবিলাসী হ'য়ে পড়েছেন—এবং গায়কদের যদি তান জিনিষের পৃষ্ঠপোষক হ'তে হয় তাহ'লে তানের তানের সময়ে গানের আগে একটু ঢোল ও ঘোঙা চাই? তানটা কি সে সময় এ ঢোল ছুটবে তানের কেমন ক'রে, ছুটবে যদি আবহমানকাল তানের সময় তানের আগেই ঢোল ঢোল হয়—যেমন আজকের

দিয়ে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রয়েছে। দু একটা উদাহরণ দেই তবে। আপনি যদি আজ গোয়ালিয়র অঞ্চলে যান ত দেখতে পাবেন সেখানে খেয়াল ছাড়া আর কিছু লোকে শুনতেই চাইবে না। তাই সেখানে খেয়ালীরা খুব আদর। তবে অঞ্চলে শুধু বাঈ আদরের মেয়েরা আছে। এ আছে অবশ্য ব'লে যদি খেয়াল গাইতে বাঈজীরা বেনারসের বা গোয়ার ঐ অন্তঃপুরেই অন্তরালবর্তিনী বধূদের মত বিলাসে ভরে নিশ্চেষ্ট ও অকর্মণ্য হ'য়ে পড়ত। তাই সঙ্গীতকে যেন এ পঙ্কি সঞ্চয় করতে হ'লে অন্তঃপুরের বিলাস ছেড়ে বাইরের আলো-হাওয়ায় যথা আসর পাততে হবে—অনেক বড় আসর পাওয়ার সম্ভাবনা হবে—তাই আমি এবারকার অধিবেশনে গুটি পনিবারে সঙ্গীত demonstration class খুলেছি। সকলেই সেখানে আসতে পারে ঐক্যতান শুনতে। তুমি এতদিন এসে যেতো এর মধ্যেই এ গানে কি রকম জিনিষ হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে।"

মনে পড়ল একজন বড় ফরাসী লেখক একবার আমাকে একটী চিঠি লিখেছিলেন—"তোমার যা দেবার আছে মুহূর্তে বিলিয়ে যাও। দেখাই তোমার এ কথা ভেবো না, তোমার শ্রোতা তোমার গান গ্রহণ করবার যোগ্য হ'য়েছে কি না। তোমার মধ্যে সত্য যা, সুন্দর যা, চিরন্তন উপলব্ধি যা—তা মানুষ বুঝবেই, এ বিশ্বাস হারিও না।" রবীন্দ্রনাথও আমাকে এইরকমই একটি কথা লিখেছিলেন যে, সাধারণকে অন্তর দিয়ে ভাল জিনিষ কখনও দিতে থাকলে তারা ক্রমে ক্রমে সে ভাল জিনিষটীর মূল্য দেবার উপযোগী মনঃ অর্জন ক'রে থাকে।

পরদিন সকালে আবার পণ্ডিতজীর কাছে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন আমার সঙ্গীত সহযোগী একজন বন্ধু। তাঁরও আগে পণ্ডিতজী একটী সঙ্গীত-সম্মেলন পরিচালনা ও শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃতের প্রচার করিছিলেন—অক্টোবরের প্রতিষ্ঠা ঠুংরি গাহিয়া সবার শেষে নিজের সুরের ঘরে ঠুংরি নিয়ে যাবার জন্যে। আমার সঙ্গে ঐক্যতান ছিল—এবারে তার নিজের ঠুংরি নিয়ে যাবার।

পণ্ডিতজী আমাদের দেখে তাঁর উদ্ভাসিত উচ্চ হাস্যের রাশি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন—"আসুন আসুন বসুন বসুন! বড় প্রফেসর—।"

আমরা দুজনেই আমি বললাম,—"পণ্ডিতজী, আমি কাল আপনার সঙ্গে কথাবার্তাগুলি রাত্রী রিকর্ড দিয়ে নিয়ে গেছলাম—আমাদের একটী মাসিকীতে ছাপাবার জন্যে। আপনার কালকের ভবিষ্যৎ আমি—কি ভাবে ছাপা পড়তে চান—তাহলে কেন সেখানে পাঠে না—আপনার এইসব মতামত আর কি।"

পণ্ডিতজী বললেন—"আপনি আমাকে বড় বেশি বাড়িয়ে বলে ফেলেন—"

—"সে আমাদের বিবেচ্য পণ্ডিতজী, আপনার নয়। আমি আমার এই বন্ধুটিকে আপনার সঙ্গে গানের কথাবার্তা সব বলছিলাম ও আপনি গোয়ালিয়রে এবার ওস্তাদখাঁর গান শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন, বলছিলাম।"

পণ্ডিতজী আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন—"গোয়ালিয়রে এবার আর একটী বাইজীর গান শুনেও বড় খুশি হয়েছি।

বন্ধু বললেন—"কে পণ্ডিতজী?"

পণ্ডিতজী বললেন—"কে একজন নতুন বাইজী সিন্ধিয়ার চাকরি করেন—দু শ' টাকা ক'রে পান।"

আমি বললাম—"কি নাম ওঁর?"

পণ্ডিতজী বললেন—ইশ্বর বাই। চমৎকার ঠুংরি গা'ন। শুনেছেন ওঁর গান আপনারা কেউ?

বন্ধুবর উৎসাহিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—"ইশ্বর বাই! শুনেছি ওঁর গান। বিশেষ ওঁর গানের ঘরে ওঁর খুব সুখ্যাতি করেছেন।"

ঠিক বছর আষ্টেক আগে সঙ্গীতের একটী ঐতিহাসিকের বাড়ীতে ৺কালীপূজার দিন আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাদের ইশ্বর বাইয়ের গান শুনতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার 'আমাদের বিনপত্রিকা'য় আমি এঁর খেয়ালের

প্রকাশ করতে না পারলেও [illegible] ও পরমের খুবই ঘনিষ্ঠতা করেছি।

পরিচয়ী বললেন—"তাই নাকি! সত্যি তবি তাহলে [illegible] এই ঈশ্বর যাইছেন।

[illegible] একটা ইঙ্গিতে প্রকাশ পাওয়ায় পরিচয়ীর মনের পরিচয়ের বাকে তাদের একটু আশঙ্কা হ'লো ভাবনা করলাম—"আপনার কি সত্যিই [illegible] বেশ ভাল লাগছে বা'লে মনে হয়, পরিচয়ী?"

পরিচয়ী বললেন—"নিশ্চয়ই—যদি [illegible] ভাল ক'রে থাকতে পারা যায়। তাই ত আমি আমাদের বলেছে [illegible] বেড়াবার বন্দোবস্ত ক'রেছি। তবে [illegible] প্রায়ই লোকে থাকতে পারে না।"

বন্ধু বললেন—"এ কথায় নিশ্চয় খুব খুশি হবে পরিচয়ী। আমরা যে [illegible] তাবি বন্ধু।"

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললাম,—"ঠিক কথা পরিচয়ী। আমার মনে হয় [illegible] বিলাপ আরও হবে যদি আমরা [illegible] ছেড়েদি যান ও সাত সকাল হ'লে অবস্থা না করি। তাই আপনার কাছে আমার এ মনের সন্দেহ প্রকাশ খুলি না হয়েই আমি পারি নি। তবে খুশির হয় কি জানেন, [illegible] ফেলা ক'রে রাখলে এত সহজ—ও রাতে শুধু মেয়েদের অনুকরণে পারীদের পরার এত খারাপ দোষারোপ—"

পরিচয়ী বললেন—"একথা খুব ঠিক। তাই আমি আমার ক্রমিক পুরুষদলিলকে নিয়েছি যে, [illegible] রাখলা মোটেই সহজ নয়। এই দেখুন না—"

ব'লেই তিনি তাঁর পুরুষের একখানি খুলে প্রায় হাত পাঁচ তিনেক ক'রে তাঁর [illegible] উপর মন্তব্য প'ড়ে শোনালেন। তার তাৎপর্য এই যে, [illegible] মানের বিলম্বিতার ফেরে অভিজ্ঞতাকে বড় ক'রে দেখা হয় ব'লে [illegible] ওজন-মাপকে অবজ্ঞা করা, কিন্তু ঠিক মত [illegible] পারিতে পারলে তা অতি সুন্দর গতি হ'য়ে ওঠে। তবে খুশির হচ্ছে এই যে, [illegible] রাখলা সহজ নয় ও উচিতমত শিক্ষা-সাপেক্ষ।

প'ড়ে শেষে বললেন—"তাই ত আমি ঠিকমতে বোঝ নবার বলে নিজের প্রতিদিন [illegible] পিছনে তাঁর মেয়ের কাছে পাঠাই। ঠিকমত মত মনের মানের অথবা অনেক-গুলো [illegible] দিয়েছে, শুনেছেন কি—"

আমি বললাম—"হাঁ, তাদি খুবই গা'ন ঠিকমত। তাঁর [illegible] অতি উচ্চমনের। তাই আমি খুব খুশি না হ'য়েই পারছি না যে ঠিকমত আপনাদের বলেছে [illegible] খেলাবার ভার দিয়েছেন।"

পরিচয়ী বললেন—"হাঁ, আমার ভারী আছে ঠিকমত ভালই খেলাবে। উপস্থিত আমাদের অনেকের বিশেষী অবস্থানের জন্যে আমি একটু ভাবিত আছি। (১) মাঝের খেলাবোর মনোযোগ করা, (২) ছোট ছেলে-মেয়েদের মোগাড় করা ও (৩) মহিলাদের ভার খোঁজা।"

বন্ধু বললেন—"মেয়েরা ভার তবু আপনার কিছা বয়স্কদলদের কাছে দিতে [illegible]।"

পরিচয় আরম্ভে বললেন—"সেই ত মুস্কিল। আমার মনের বললেন কাজের ভাগিয়ে দিতে যে মেয়েরা ভালে মুসলমান ওস্তাদের কোনও হাত থাকবে না। কিন্তু সে রকম কোনও বিজ্ঞাপন আমাদের দিই কেমন ক'রে বলুন ত? তা'লে ত বিশ্ব-মুসলমান-সমস্যা আবার এখানেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না কি?"

আমি বললাম—"কিন্তু অশিক্ষিত মুসলমান ওস্তাদের কাছে কেমন করা করা কথা শুনতে যাওয়া—"

পরিচয়ী হঠাৎ খুব একচোট হেসে ব'লে উঠলেন—"না বলেছেন ভাল মনোগত। দু একটা গল্প আমি পড়ুন—এবার মোগাদিনের একজন ওস্তাদের মুখে শুনে আমি উপভোগ ক'রে এসেছি। ওস্তাদের করা করা কথা কিন্তু বড় সুন্দর শুনতে লাগে আমার।"

বন্ধু বললেন—"কি রকম?"

পরিচয়ী চৌকির হাতলে সেই রকম খোলা হাসি হাসতে হাসতে বললেন—"রকম কিছু নতুন নয়। ওস্তাদদের সেই চাচা-ভাতীয় আদি করার গল্প—তাদাদাদের অতি বিশ্বাসযোগ্য পরিচয়ের কাহিনী, অতীত গৌরবকে বলপ্রয়োগ দিয়ে উঁচু ক'রে ধরার সেই চিরপরিচিত প্রাণপণ প্রয়াস। —এই আর কি।" ব'লে খুব হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম—"আপনার কি পরিচয়ই ?"

পরিচয়ই বললেন—"এবার একজন মোগলিদের ওস্তাদের মুখের মতন কথা বলিয়াছ। তিনি গাইছিলেন—'পিয়া মুখের আদর কিত ঔনা'। কিন্তু তিনি খাঁসাসাহিব মুখ দিয়ে যে বেরোবে বলছিলেন তাকে আমার খোকার সঙ্গে মিলিল, তিনি সহিত কথা বলছেন কি না। যাক্ ; তাঁর একার ঔনাসী ভাবের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া শেষ হ'লে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সে দৃষ্টির অর্থ অবশ্য এই যায়—বেয়াদব ও আপদ থাক্ বাবাজানী একবার ? আমাকে ও' কিছু বলতে হয়। কি করি ? বললাম—'যাং, খাঁ সাহেব, যে ভাব তুমি ভরালে ওরে অমৃত বরিষাদের অমৃত বেগালে —তাতে স্বয়ং তানসেনেরও মাথা হ'য়ে যেত, আমি ত ছোক্‌রা।' খাঁ সাহেব পরম খুসি হ'য়ে বললেন—'পরিচয়ই আপনি লক্ষ্ণৌয়ে সাধুপুরুষ বটে—কিন্তু দুঃখ রইল আপনি আমার ওস্তাদ 'হোসেনাত খাঁ'র আওয়াজ তানসেনের নোবেল নি। হায় কিছুদিন আগে যদি ওস্তাদের—'

আমি এ কথায় আমার অমার্জনীয় অপরাধের জন্যে সলজ্জ প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—'সে আপনার ও তানসেনের কি রকম ছিল ?' তাতে ওস্তাদ বললেন—'সে আর বলব কি পরিচয়ই—সে অবস্থা নয়।—বরং যেন গুরুতে চাইছেন তখন যদি গুরুন। আমাদের মোগলিদের মহারাজার বৈঠকখানায় তান কেতেছেন ত ? কত উঁচু বিলকাই আসেন।' আমি বললাম—'না খাঁসাহেব, অবাক লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আমি না। আমি ছেলে না বেলে বড়ই অন্যায় করেছি।' ওস্তাদজী বললেন—'তা— হোক্ সে। কিন্তু সে তানখানি যে অতি প্রকৃত উঁচু তান একটা মানেন ত ?' আমি বললাম—'যেমন ?'

—'আহলে মুখুন আমার ওস্তাদজীর তানের কথা-তানখানা একবার—তিনি যখন তাঁর বক্তব্যগুলিকারী তান ছাড়তেন তখন সেই অত উঁচু তানের পাশবর্তনাও —সা মুখে উঁচু— সবলেই বেতেন।'

—'বটে ! ! ! বেশ আচ্ছা !'

—'আচ্ছা ! এবার আশ্চর্য্যের হয়েছে কি ?'

—'আরও আশ্চর্য আছে না কি ?'

ওস্তাদজী বললেন—'তব্ বেশ ?'

—'কি বলছ ?"

ওস্তাদজী বললেন—'শুন তবে পরিচয়ই। মহারাজ সিন্ধিয়া আমার ওস্তাদজীর প্রতি এমনি সদয় ছিলেন যে তাঁর প্রাসাদের ছাদের পাশে উপরে বেশ ঘর করা আছে। আমার ওস্তাদ সেই ঘরে রাত্রে থাকে তবু বললেন যে—এ ত কি ব্যবস্থা, আমি এমন তান ছাড়তে পারি যে তার রাজীপালের বিরাটত্বের রাজীর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। মহারাজ সিন্ধিয়া অবিশ্বাসের হাসি হেসে তখনি রাজী আসালেন। ওস্তাদ হোসেনাত খাঁ তান ছাড়লেন, পাথর ফুলে উঠল—রাজী উপরাপুল হ'য়ে পড়ে গিল ও সিন্ধিয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ সে রাজী ওস্তাদজীকে বখসিশ দিলেন। বুঝলেন পরিচয়ই ! এরই বলে তান। আর এরই বলে শোনা। আমেরিকার মুখে যেমন ছিল ওস্তাদ—যেমনি ছিল গান ও যেমনি ছিল সব সিন্ধিয়ার মহারাজের মতন শ্রোতা। আমার ওস্তাদের কাছে শুনেছি যে তান সহজে আসে না। আমেরিকার মুখে শোকে প্রথম বৃদ্ধি বয়স শুধু না যে গা যা সাধতে। তারপর পঁচিশ বৎসর আলাপ সাধতে। তারপর তিন বৎসর হ'য়ে শুধু তান সাধতে—তবে তানের সাধার কিছু আসত—অতি সাধারণ—যৎকিঞ্চিৎ আর কি। বুঝলেন পরিচয়ই—এই আর আপনার গানের কথা। ওসব নদীতে ফেলে দিন যে যান। একবার দিনে যা হয় সে গান বন্ধ পরিচয়ই—গান, আকাশ, তান ? সে সব ছিল আমেরিকার দিনে—যখন লোকে এক একটা তানের জন্য দেওয়া জান দিত।'

আমি শিউরে উঠে বললাম—'জান দিত ! কি খাঁ সাহেব ! ! দিতের জান ! ! !'

ওস্তাদজী অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন—'তব্ বেশ ? নইলে কি আর তান হত পরিচয়ই, হয় কেবল আপনাদের ঐ বয়লিপি। হনুমান খাঁ কেমন ক'রে গাইতেন জানেন ?'

আমি বল্লাম—'কেমন ক'রে আমার ওষ্ধটা খাবে, বলুন না, তুমি ও শিখি।'

ওস্তাদজী বল্লেন—'এ পত্র থেকে আমার ওষ্ধটার কথা লেখো। বল্লুম যা এখন একটা গাছে তিন প্রকারের ফল ধরেছে যে তার একটা ফলের পাকা প্রকরণের আর একটা পাকবার পথায় ঢ'ড়ে বল্লে।'

—'ফলের কি!' এমন!!!'

—'হয় বেল্লা! বৈদ্যে আর জ্ঞান ধ'রেছে যেন—পরিচয়ই। কিন্তু পাকার স্থানটা বলে হবে কি? লোকের বিশ্বাস আছে যা ধ'রেছিলেন যে। তিনি ত আর ছাড়বার নয়—তিনি বল্লু ধ'রে হয়ার থেকে থেকে বল্লেন—আর একটা ফলের পাকার অঙ্গ একটা পাকবার ফল ঢ'ড়ে হ'য়েছে ব'লে হয়েছে কি। তাই ব'লে জান না' আর অসম্পূর্ণ ভাষা চল্তে পারে না। ব'লে তিনি ওস্তাদজীর ঘাড়ে বল্লেন—'বেশ না বল্লু ধ' ভালটা শেষ কর; যাও, কিন্তু মর্যাদা ছেড়ো না। মনে রেখো, দুটি কথার ও যা ছাড়ক লেটা আমি। আর তাতে যার বুদ্ধি কি হবেন? বল্লু ধ' মহিমা হয় তবে শেষ করবে'—পাকার কিন্তু আর বাকল না—আমার উঠে গেল ও বল্লু ধ' সেই ঘরেই চোখ বন্ধ ক'রে চুপ্‌লেন।'—ব'লে পণ্ডিত বিষ্ণুবাবাকে তাঁর উপর হাসির কৌতুকে মেলিনের অকপেক্ষা প্রকরণকে আরও মুখরিত ক'রে দিলেন।

ব'লে আবার পত্রে ক্রমাগতই মনের সঙ্গে মেলে উঠ্‌ছিল বিষ্ণুবাবার ভাবতরঙ্গের লক্ষ প্রতিফলিত-উচ্ছল আমের প্রতিচ্ছবি, আর চিত্রপটে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল তাঁর অতীত আত্মবিস্মৃত-উৎসুক বর্ণচ্ছটার বিলাসোল্লাস। মুহূর্ত মধ্যে মনের মধ্যে জাগরিত উঠ্‌ছিল যে, একটা আইডিয়া যদি আমাদের হাতেখড়ির একবার তার নিজস্বভাব করতে পারে তা'লে সে কি আশ্চর্য উপায়েই না সে আমাদের সমস্ত জীবনখানিকে এক মুহূর্তে না এক সময়ে তার ফলে-ফুলে-পাতায়-শাখায় ভ'রে দিতে পারে! নইলে কি আর আমাদের মতন জীবন্ত, শিল্প-উদাসীন দেশের সঙ্গীতের মতন এমন একটা অমেয়ে মন এমন একজন দেশসী অতের আত্মীয়ন একাকিত্বের গৌরবযুক্ত ও সুন্দর ক'রে তুলতে পারত!.....

সব চেয়ে বেশী ক'রে মনের বিস্ময় লেগে উঠ্‌ছিল—পণ্ডিতজীর বর্ণচিত্রটি—যে এই ক্ষুদ্র প্রবিষ্টাটি কেমন ক'রে অমূল্য উদ্ভিদের ধীরে ধীরে তাঁর বৃহৎ ঘোষালির অনেকের মতন হয়ে উঠ্‌বে, ও তার পূর্বের তাদের প্রতি বছরে সঙ্গীত-বিজ্ঞান মত মত গাছের মতনই সহজ প্রেরণায় ফুটে উঠ্‌বে। তাই মনে হচ্ছিল যে, পণ্ডিত তাদেরও মতন একজন সাধারণ-পরিচিত হীনবেশ লোকের এমনি প্রতিভা ধরাটা হয় ত অনেকের কাছে আজকের দিনে অসম্ভবি মনে হ'তে পারে,—কিন্তু যেদিন অদূরে তাঁর মহাসীমিত ভবন ঐতিহাসিক বল আমাদের মুহূর্ত সলিতকলাকে ওস্তাদের স্থায় আমেরিকার সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত না রেখে স্বাধীন-চিত্ত ও আন্তরিক প্রেরণার মুখাগমে নবজীবন দান করবে, যেদিন আমাদের সলিতকলার অতীত ঐতিহ্যটি আজকের মতন আমাদের আওয়ার অন্তঃশিলা না থেকে সৌন্দর্য ও সৌমুদ্যের মতনপথে চারিদিকে তার মনোমোহন পরিমল ছড়িয়ে দেবে; যেদিন আমাদের অপূর্ণ মতনপথ অহমার আবহাওয়ার আজকের মতন খানেকের অপেক্ষায় ফেলে না থেকে আর ঘরে ঘরে ছাত্র-ছাত্রী বিলিত সঙ্গীতটার আবৃত্তিতে ভাষর হ'য়ে উঠ্‌বে; এবংবার যেদিন আমাদের সঙ্গীতের সহজ সুন্দুমার প্রতিভার ও সহজ সাধনার বাহুস্পর্শে সহজেরা লক্ষের কোটিরে হ'য়ে বিদ্যুদ্বিকের আর অপূর্ব সৌরভটি বিছিয়ে দেবে,—সেদিন আমরা মুহূর্ত সঙ্গীতের নবজন্ম এই বাঙ্ময় একনিষ্ঠ পূজারী, দেশের অনন্তচিত্ত সাধক, তাদের আত্মবিস্মৃত তপস্যার ধ্যানের মূর্তি করতামি! সে দিন কি আমরা রবীন্দ্রনাথের শিবাজী-বর্ণনের সুরে সুর মিলিয়ে এ সঙ্গীত-তপিতকে সম্বন্ধে বিশ্বিত অন্তরালে এই ব'লে তর্পণ করব না?—

অজ্ঞাত অখ্যাত রবি হীনবাস
হে রাজেশ্বরী গিরিবরী-তলে
ধরার নির্ঝর যথা বৈদল বিবাসিয়া
উঠে জাগি' পরিপূর্ণ জলে—
সেই মত বাহিরিল, বিশ্বলোক
জাগিল বিস্ময়,—তাহার পতাকা
অমর আত্মার মতে' এতকাল
এই ক্ষুদ্র হ'য়ে রেখো ছিন্ন তারা!

কবিবর বিহারীলাল

শ্রীযদুনাথ পাল

হিন্দী ভাষার কবিদের যেমনটি দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা ভাষার পাঠক জানেন কম, কিন্তু তার সবচেয়ে কবিদের বাংলা ভাষায় পাঠক বাংলা ভাষায় বিহারীলাল (বা বিহারীলাল) একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। তিনি বেঙ্গলীদের নিকট কেবল গানে রস দ্বারা পরিচিতিলেন, ও তাহাদিগকে সাধারণ বিলাসিক করিয়াছিলেন। তাহার কোনও বিষয়ে কোন কবিতা পাঠক বাংলা বাংলা তিনি মনে মনে আমাদের উদ্দেশ্য এক একটী কোনোরূপ প্রকাশ করিতেন, সেই কোনোরূপ সর্বদাই উচ্চাঙ্গ কবিতাবলী। তিনি যখন আমাদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন তখন কবিতা বিহারী সভার (মাসিক) সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাস্থলে তিনি তাহার বিরোধীদের এই সভায় উপস্থিত থাকিতে বলেন। আমি সভার এই সভায় বর্তমান সময়ে কবি টিকা লেখা হইবার ও একজন লেখক নির্বাচিত হন। তাহার আমি কবিতার এক কবি টিকা লেখা হইবার কথা তাহি আমি। এই কবিতা সম্বন্ধে তিনি যা বলিয়াছেন :—

সব-শ্রীরাজ তোমার, তিনি সাধক যে হয়।
তোমাদের তোমরা সবে, যাও কবি আমার।

—সভাস্থলে কবিতাটির টীকার আবশ্যক নয়, তবে তো এত কিছু (পড়িবার ও শুনিবার প্রয়োজন) কবির মন কবিতা যে।—তার কবি আমার বিহারীর কবিতা পরিবর্তে আর কাহারও তাহার আবশ্যক নেই। এই সভায় তারা আর সাধারণী তোমা তাহার কবির কবিতা আলিয়া, কিন্তু তাহার বিরোধীরা তাহার মনে কম যায় না।

বিহারী আমাদের কবিতাকে কিন্তু পরিচয় সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ভাবপ্রধান প্রধানত কবিতা করে কবিতার মত করিয়াছেন :—

তার নিজের বিচারের মূল, প্রথমে তাহার মন পায়।
তাহে হয়ে আসল মন, কেবল, কেবল মন।

কিন্তু তবে তবে ইহাদের আসল তাহার, আসল, ইহা বিশ্লেষণ করি যায়, তাহা পরিচয় নয়। তাহারা বলেন, বিহারীর অর্থ "মন"। তাহার অর্থ—"যে প্রধানত ভাবপ্রধানী তাহাকে কেবল, আমার তাহা মন হয় না।" তাহা হইল, ইহা হয় তাহার সকল আর কিছু বলা নাই। তিনি আমাদেরই কিন্তু তাহা আমিলেরও আমাদের কবিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তুমি যার তার সমালোচ, যদি কবিতা তাহার।
তবে বিহারী সভাই, যদি সাধক সবার।

—(সভাস্থল—পাল) তাহা তাহারও এই সভায় তাহিলের সভার বিচারে।

আমার সাধারণত দুই তার কবিতা ইতিহাসে কবিতা, বিশ্ব তাহা কবিতার ভাষা, ও সভাই কবিতার বিচার। আমি বিহারীলাল বিহারীর পুরস্কার ছিলেন।

আমাদের আলোচনায় আমাদেরই তাহাদের (বিহারী সভা) আমাদের তাহাদের করিয়াছিলেন। তাহার পুরস্কার আমি যেন তাহার তাহা আমাদের সভার সভার তাহা ইতা ও পরিচালনায় আমাদের ছিলেন। তিনি পরস্পর, আমাদের এক আমার পুর

অধিকারে যোগদান করে আসছেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময় তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তিনি ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৪৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৫৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৫৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৫৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৭৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৭৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৮১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৮৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৮৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৮৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৮৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৯১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৯৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৯৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৯৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০০০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০০১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০০২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০০৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০০৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০০৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০০৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০০৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০১০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০১১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০১২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০১৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০১৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০১৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০১৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০২০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০২১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০২২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০২৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০২৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০২৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০২৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০২৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৩০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৩১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৩৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৩৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৩৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৩৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৩৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৩৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৩৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৪০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৪১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৪২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৪৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৪৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৪৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৪৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৪৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৪৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৪৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৫০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৫১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৫২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৫৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৫৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৫৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৫৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৫৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৫৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৬০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৬১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৬২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৬৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৬৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৬৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৬৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৬৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৭০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৭৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৭৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৭৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৭৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৭৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৭৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৮০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৮১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৮২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৮৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৮৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৮৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৮৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৮৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৮৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৮৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৯০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৯১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৯২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৯৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৯৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৯৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৯৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২০৯৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ২০৯৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ২১০০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।

অধিকারের বিনিময়পত্রে (মার্চ ১৮৮৩) তাঁর স্বাক্ষরের নিম্নে ১৮ বৎসরের বালক বলে উল্লিখিত হওয়ায় বোঝা যায় তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ও অন্যান্য আত্মীয়দের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

> আমার মাতা পিতা জননী বিনি, যাঁ বিনি আমার ধন।
> তৈল বাস পাক চুল যাঁ, মুখে আমার ধন।

[১৮ ৯ পাঠ ১, জননী ৯, বিনি ১ । ১৮৮১ (আমার বাস বাঁধা) । ৩ যাঁ । আমার—আমারের—আমারের ইত্যাদিরূপ চুল পাক এই আমার-ধন পূর্ব হইল ।]

আমার মাতার অকালমৃত্যু তাঁর বালকের মনে কিরূপ লেগেছিল। সেকথা লিখেছেন. সকলেই মাতার অধিক স্নেহের উপযুক্ত আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়াছে। তিনি আর বালকদিগকে বিনা আদরের অধিক স্নেহের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। অবশেষে দুঃখভরে তিনি অবশেষে লেখা লিখিয়াছেন :—

> পিতার স্নেহের স্নেহের, পাত্র আমি ছোট।
> আমার, পাত্র অধিক যু, হয় অন্যে আছেই।

[স্নেহে—আমার অধিক, আমার—হাত, আমার ইত্যাদির আমার বাদে অন্য বাদ দিলে পাঠ পাওয়া যায়। অধিক—অনুরূপ। আছে—আমার-আছে। আছেই—নীচে আছে] ভৈরব আমার বিবাহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে আমার বালিকা বধূ ভৈরব পিতার গৃহে ফিরে যায়। আমার বালিকা বধূ ভৈরব পিতার গৃহে ফিরে যায়। তখন তাহার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। [আমার সেবা আমার যা আমার আমারের কথা, এখন তাহার যা আমার পক্ষে সেবা হয় না। আমারআমারের ইত্যাদির আমার ও আমার বালিকা আমার বধূ। (আমারআমার)

কবি আমারিকার বাঁধন পরিবেশ. আমারআমার চুল-বেশের উপযুক্ত বর্ণনা দিলেন ও চুলের চুল বর্ণনা করিলেন। তিনি বালক বয়স সেকথা আমার যা আমারের সেইরূপ বিবাহের চুলের বাস দিলেন। আমারিকার চুলের পক্ষে আমারের আমারিকার কথা আমার যা. সেকথা আমারের আমারও তিনি আমারের আমারিকারিলেন যা. তখন কথা আমার আমার আমার আমারের আমারিকা। ৩১২৩ সালে যা বলিলেন আমার আমার বর্ণনা আমারিকা. আমারআমার আমারিকা বাস। কবি আমারিকার ইচ্ছা আমারিকা :—

> ইচ্ছা আমার আমারিকার আমার, আমি আমারের চুল।
> আমার আমি আমার যা, ইন চুলের ৩১৩ চুল।

—আমি এই বাস আমারিকা সেকথা নিজে আমার আমার মনে আমার বাস যা আমারিকা. যে আমার আমার চুল চুলিবে।

আমারিকার কবির বাস আমার আমার আমার ইচ্ছা আমার (১৮৮১।৮৮) ইত্যাদি লেখাগুলি। যে আমার আমি আমার আমারিকার লেখা লিখিয়াছেন। আমার বাস আমার আমারিকারিকার আমি আমার যেন. আমারিকার লিখিবার আমার আমিরও আমিলাম (১৮৮৮) তখন তিনি লিখিবার আমার আমারিকা আমিলেন। তিনি আমারিকার আমি. কিন্তু তিনি ১৮৮৮ খৃষ্ট — আমার আমারিকার আমি ১১ ৩১৮১ আমি (ইত্যাদি। আমারিকার আমার যাইয়া আমি ১১ আমারিকা আমিলে ৩৮৮ ১১ আমারিকা। ইত্যাদি আমি তিনি আমি আমারিকার আমিলিকারিলেন এবং আমিরি ও আমি লিখিবার আমিয়া লিখিয়াছিলেন। এই আমার আমি লিখিবার আমিয়া লিখিয়াছিলেন আমারিকার লেখা আমিয়া চুলিবার আমার আমারিকা নিজের। তাঁর যে তিনি আমি আমিলিকারিলেন ১৮৮৮ আমারিকার লিখিবার আমারিকার চুলের আমার ১৮৮১ ও আমার আমারিকা আমিয়া আমি। লেখা—

> আমি যাঁর লিখি লেখা আমি আমারিকার যাঁর।
> যে আমার যিনি চুল আমি, লেখি আমার চুলার।

—এখানে যাঁহার আমিয়া যাঁর, আমারিকা লেখা যাঁহার আমার ৩৮৮ আ. আমারিকা আমারিকার আমি. তাঁহার আমার আমিলিকা আমিলে এই। এখানে লেখার আমার ও চুলারিকার আমি আমারিকা. তাঁহারিকা আমারিকা আমিলিকারিকার আমি। —এ লেখা আমারিকার চুলের আমি আমারিকার আমার আমিলিকা আমিলে হইবে। আমিলেন—

> আমি চুলে যিনি আমি আমি আমিলে আমি বিনিয়ে।
> আমার আমি বিনি আমিরিকা আমি, আমিলে আমি বিনিয়ে।

—আমি চুলে ৪ আমার আমিলে আমারিকার আমারিকার আমিলিকারিলেন। ১৮৮১ আমিলিকার আমার আমিলিকা আমিলিকারিকার আমিলিকারিলেন। আমার আমি আমারিকার আমার আমিলিকা আমিলিকারিলেন। তিনি আমার আমারিকার ১১৮১ আমি আমি আমিলিকারিলেন আমার ৮৮।৯১ লেখা লেখা আমিলিকারিলেন বিনি আমিলিকা আমার আমার আমার। আমিলিকা ৪৮ ৮৮৯ লেখা ৪৮ ৮৮৯ আমারিকার চুলের আমার। লেখারিকা তিনি আমারিকার বিনিময় আমারিকারিকার আমার ৮৮৯ আমারিকার লেখা আমারিকার বিনিময়।

বিনিময় আমিলিকা আমি চুলিবার বিনিময় আমারিকার চুল. বিনিময় আমারিকার আমার. লেখার তিনি আমিলে আমারিকা আমা আমিয়া আমিলিকারিলেন. যে আমারিকার আমার আমিলিকা আমি. চুলে আমার৩ বিনি বিনি

[illegible] ও, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

বিজয়ী

শ্রীঅমিয়া চৌধুরী—কুমিল্লা

(১)

পরদিনের সন্ধ্যায় শৌভ্র অভিযাত্রীর সৌম্যমূর্তি গতি-পথের দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ বাড়ীগুলির উপরে একটা মধুর উজ্জ্বলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছিল।

সীতানাথ ঘোষালের অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে বসিয়া পুরাতন দাসী জানকী বঁটির সঙ্গে মাছিতে মাছিতে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, "ওলো বাদু—"

প্রথম ডাকে কেউ উত্তর দিল না। কি মনস্থ করিয়া আরও একটু উচ্চে চড়াইয়া ডাকিল, "বাদু, ও বাদু, মা ডাকেচে, যাবে এসো।"

একটি ঘরের কি ভেতরে অন্ধকারের ঘুটঘুটে ভেতর হইতে বীণা বাহির আসিল, কিরূপ দিকে চাহিয়া কহিল, "ডাকচো কেন?"

"যাবে না? মা যাবার বিয়ে বলে আছেন যে?"

"আমি পড়ছিলাম।"

"যা একঘরে এসে ঘেরে থেকে কি হয়। সেই যোন সকাল হ'তে যা ডাকচেন—তোমার আর আসাই হয় না! কি এত পড়া!"

"যে তুমি বুঝবে আর কি! আজ বুঝি মেজাজটা ভাল নেই মাসি, তাই সকাল থেকে ঝগড়াঝটি সুরু হয়েছে?"

জানকী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "এর বেন্ত তোক, কিন্তু বাসনি—বাই, বাইলে তোকে বকব!" অমনি এক ঠোকা অন্ন মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, "এই হাতে আমে তোর মাকে মানুষ করলুম—অমনা তোকে। এই হাত ক'খানার মন্তে সব লেখা আছে বাদু—আমি তো আর আজকের নই!"

বালিকা সহসা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা মাসি, আমার মা কি বিবিমার চেয়েও সুন্দর ছিলেন?"

"সুন্দরের কথা আর বলতে! মাকে আমার যখন ঘাটে তুলে ফুল-চন্দন-সিঁদুরে সাজিয়ে দিলে তখন যেন লক্ষ্মীর মত দেখাচ্ছিল,—সে একদিন গেছে—"

"আর আমার বাবা! বিবিও কি খুব—"

"বিবিও খুব সুন্দর ছিলেন। সবাই তবে বলত লক্ষ্মী-নারায়ণ—এখনি জোড়া ছিলেছিল, আমারই কপালে সুখ নেই: তাই খাইলে না।"

"আমি তো মাকেও পাই নি, বাবাকেও না। বাবা আমার দু'বছর বয়সে মারা গেছেন, কিন্তু আমার একটুও মনে পড়ে না। মাকে যা আজলে দেখে ছিলে?" বালিকা যেন নিজেকে সান্ত্বনাদানের জন্য অত্যন্তই আগ্রহান্বিত হইয়াই করিল, "তা হোক্, আমার তো ছিলো, সত্য হয়েছে—অনেকের তো তাও থাকে না। পরের বাড়ীর খুঁটীকে দেখো তা! তার কত কষ্ট! হয়তো কেউ নেই বলেও হয়, বিমাতার হাতে কত জ্বালা পাচ্ছে—"

"রাখারাণি—"

দুইজনেই ফিরিয়া চাহিল। প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে পূজার দালান। বাড়ীর কর্ত্রী ভূপাদেবী সেখানে দাঁড়াইয়া-ছিলেন। "এখন বিবিমা" বলিয়া ক্ষুব্ধ শিশুর মত ছুটিয়া গিয়া মাতাকাকী তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল।

বিবিমা কহিল, "একজন কি হচ্ছিল বিবিমণি! আওয়া হ'বে না?"

"চল মেজে, আমি পড়ছিলাম কি না।"

বিবিমা তাহাকে আদায়ভাবে লইয়া ফেলেন। শিক্ষ-দীক্ষাহীনা এই যৌবনোত্তীর্ণা বিবিমা ও বালিকা বড় আদরের, তাঁহাদের পোকার্ত-জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। সীতানাথ উহাকে একমাত্র সন্তান ঈষাকে মহাসমারোহ-এর সাথে বিবাহ দিয়াছিলেন; সেও এক ধনিসন্তান, কিন্তু রূপে-গুণে জামাতার মত উজ্জ্বল। অবাধের মাতুলালয়ে পালিত

হইয়াও অন্যান্য আত্মজের মত তাহার দীর্ঘ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির প্রাথমে, বিদ্যার গৌরবে ও চরিত্রের মহত্ত্বায় ঘটিয়া পড়িতেছিল। এই বিদ্যার সকল দিক বিহারী সুখের হইয়াছিল। কিন্তু সুখ সহিল না। দুই বৎসরের মধ্যে উমা ও তাহার স্বামী চলিয়া গেল। তাহাদের ভালবাসার ধন—একটী শূন্য বালিকা দীতানাথের স্নেহার পূর্ব উজ্জল করিয়া রাখিল।

দীতানাথ নিজে নিশ্চিন্ত ও সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন; দৌহিত্রীকে শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করিয়া তুলিতে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। রাধারাণী এখন বেশুনে পড়ে।

সে দিন রবিবার ছিল; সকালের খাওয়া সারিয়া রাধারাণী জল লইয়া সেলাই করিতে বসিল।

দুর্গাদেবী রন্ধনগৃহে নৈবিদ্য ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিলেন; এমন সময় বহির্দ্বারে দীতানাথের গাড়ীর ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। দীতানাথ একটা আমের অচ্ছাদো পুঁটলী হাতে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী আসিয়া স্বামীর নিকটে দাঁড়াইলেন। দীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি কোথা?"

"সে উপরে সেলাই করছে। তুমি সকালবেলাই কোথা বেরোলে—ব'লে ক'য়ে হ'ত, বাদুর জন্য আমি—"

"সে তো আমি এনেছি—" বলিয়া দীতানাথ কাপড়ের আবরণ উন্মোচন করিয়া একখানি রক্তবর্ণ বেনারসী শাড়ী ও সেই রংএর এক টুকরা কাপড় বাহির করিলেন। দুর্গা বিস্ময় আবেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি—এই ত! তুমি এর জন্যেই এতদিন কি ক'রে!"

"বাদুকে যাতে বাদু আমার চুপি চুপি বলেছে। এই টুকরোটা দিয়ে নিজেই জামা সেলাই ক'রে নেবে, কেনা জামা ওর তো পছন্দ হয় না।"

"তোমার বিবি-বিবির কি-ই বা সবদে পছন্দ হয়!"

"যা হোক্, এর যা খুসী পছন্দ—সব তো ওরই জিনী—"

"যা নৈ কি!" বলিয়া দুর্গার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। দীতানাথের কণ্ঠস্বর বিজয় গর্বের পৌঁছিয়াছিল। রাধারাণী নাচিয়া আসিতে আসিতে কহিল, 'দাদু, আমার জামা এসেছে।"

দীতানাথ কহিলেন, "তাই এসো দিদি, দেখ তো পছন্দ হয় কি না।"

শাড়ী ও জামার কাপড় পাইয়া রাধারাণী সত্যই খুসী হইয়া উঠিল। কহিল, "দাদু, আমাকে সেলাই করে ফেলি তো, পুজোর তো আর বেশী দেরী—"

"ইস্স বড় আর হ'তে হবে না?"

"এই দোসরায়; এবার কোথাও বেড়াতে যাওয়া হ'বে না দাদু?"

"দেখি ত' দিদি, আজাদী যদি হ'লেও হাঙ্গামের হাত যে ছাড়াতে পারি নে।"

"আমি আলাদা যাবে।"

দীতানাথ হাসিয়া উঠিলেন। "তা যাবে দিদি, কিন্তু টাকাও পয়া দেবে যে। নইলে যেতুম কি।"

"না, তা দিয়ি—" বলিয়া বালিকা একটী দুঃখ নিশ্বাস ফেলিল। তাহার উদারহৃদয় স্নেহের দাদু যে ঐ চক্ষুশূল অফিসারের দেওয়া টাকা ছাড়া যাইতে পারিবেন না, এ ব্যবস্থাটা অন্যায়ের অবিচার বলিয়া তার মনে হইল না।

৯(২)

পূজার মধ্যে কোথাও যাওয়া হইল না; কিন্তু রাধারাণী সহরের উপরেই খুব বেড়াইয়া লইল। বায়ুঘর, চিড়িয়াখানা, গড়ের-মাঠ, গঙ্গেশবাগ, শিবপুর অনেক স্থানেই বেড়াইল। শিবপুরের বাগানে তাহার একটি নূতন বন্ধু লাভ হইল। সে একজন বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টারের কন্যা; রাধারাণীরই সমবয়সী, কিন্তু বুদ্ধি ও ব্যবহারে তাহার চাইতে অনেকখানিই পাকা। আপনার বৈদেশিক অভিজ্ঞতার ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মল্লিকা বন্ধুদের অজ্ঞতায় বন্ধুবর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিল; নানা বিষয়ে সে অনর্গল গল্প করিতে পারিত। ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া এই বয়সেও তাহার বয়স রাধার চেয়ে বেশী। রাধারাণী বন্ধুর নিকট আপনাকে বড়ই খর্ব অনুভব করিত। একদিন বিকালে মল্লিকা রাধারাণীর সঙ্গে খেলা করিতে

আসিয়াছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দুই বন্ধুতে হাতে ধরিয়া পথ হাঁটিতেছিল।

মল্লিকা কহিল, "আমি তো ভাই, এই নিয়ে তিনদিন এলুম, তুমি তো একদিনও আমাদের বাড়ী গেলে না।"

"এইবার একদিন যাব।"

"আর কবে যাবে? তোমার তো ইস্কুল খুলে যাবে।"

"না, তার আগেই যাব, ইস্কুল খুলবে আরো দেরিতে পরশু।"

মল্লিকা সবিস্ময়ে কহিল, "দেরিতে! তোমাদের কি হাফ্‌ইয়ার্লি হচ্ছে? অর্ধেক বছর হয়েই আছে। আমাদের পরশু খুলবে—" রাধা মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিল, "তোমাদের ইস্কুলেই আমার পড়বার ইচ্ছা করে।"

"তা তোমার পড়বে বলে ভর্তি হ'লে না কেন?"

"কি করে হ'বে ভাই? লিখিয়া তো এই স্কুলেই আর পড়তে দিতে চায় না।"

"তবে, পড়বে না আর? কি করবে তবে?"

রাধারাণী সখীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "লিখিয়া বলেন, আমার মামি নীলির বিয়ে হ'বে।"

মল্লিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "ওমা গো! এইটুকু মেয়ের বিয়ে! শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি ক'রে থাকবি?"

"আমারও বড্ড ভয় করে—"

"যাবার সময়ে কেন ভাই?"

"বিয়ের বিয়ের বেলা কোন কথা বলতে নেই। তা'হলে সবাই বলবে—এরা কি বেহায়া মেয়ে!"

মল্লিকা তাহার গালে চাপিয়া কহিল, "তোদের ঐ সব মনে বুঝি? আমাদের অমন নয়, বাবা বলেছেন, আমাকে বি, এ, পাশ করাবেন।"

রাধারাণীর মুখে অবিশ্বাসের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কহিল, "সত্যি—"

মল্লিকা মেয়ে মেয়ী ভুলাইয়া কহিল, "হাঁ, হাঁ মেয়িস্ সময়, খুব ভাল মত।"

"তবে বিয়ে করবে না?"

মল্লিকা খুব গম্ভীর হইয়া বিজ্ঞের মত কহিল, "সময় বৈ কি! আমার হাতে খুব্বী আছেই সময়।"

মল্লিকার স্বাধীন জীবন-চিত্র রাধারাণীর কোমল হৃদয়ে আপনার অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, সম্ভবতঃ মায়োমিনের স্কুলে ভর্তি হইতে পারিলে সেও এমনি স্বাধীনভাবে অধিকারিণী হইতে পারিবে।

৫

আট বৎসর কাটিয়াছে। রাধা বয়সের রাধারাণী আজ বিংশতিবর্ষীয়া তরুণী। সে আজও অবিবাহিতা। রাধা বহুর আশে সেই পূজার ছুটিতে মল্লিকার অনুরোধে লাভ করিয়া সে তাহারই স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল; বালা মহাশয় ও লিখিয়ার বিরুদ্ধে অনেক কান্না-কাটা করিয়া সে মল্লিকাদের স্কুলের ছাত্রী হইয়াছিল। কেবল মিস্ মল্লিকা আপনার মত বজায় রাখিয়া সেইখানে-বিভিন্নটে পাশ করিয়াছে। সম্প্রতি সে আসন্ন বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

অগ্রহায়ণ মাস; অবাধে শীত পড়িয়াছে। সকাল বেলা বিছানার ধারে বেড়াইয়া বেড়াইয়া রাধারাণী ইতিহাস পড়িতেছিল। সে বেশ মন দিয়াই পড়িতেছিল; কিন্তু জানলার কবাটের ফাঁকে অন্যমনস্কিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। জানলা পশ্চাৎ হইতে কহিল, "রাধু, মাথা ধিকে একটু সরত দেখো, আমি এবার নীচে চলাম, বড় ভাত পড়ে আছে।"

রাধারাণী ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লিলিয়া কি করছেন মামি?"

"এই খুব ঘুমোন, আহ্নিক করেন, তুমি যেয়ো একটু পরে—" বলিয়া সরল অন্তরের স্নেহটুকু, মুখ দুইবার আবরণ, গামছা প্রভৃতি লইয়া জানলা নীচে নামিয়া গেল।

রাধারাণী চিন্তিত ভাবে আস্তে আস্তে পড়ার দিকে চলিল। আজ বৎসরখানেক হইতে দুর্বা কোষ্ঠ-পরিষ্কার পাইতেছে। সময় মুখে বেদনা ও প্রবল কাশি। এর উপরে দুই তিনদিন পর-পরই জ্বর আসিত। চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু সম্প্রতি উপসর্গ বাড়িয়া যাওয়ায়

ঔষধের স্থায়ী উপকার হয় না। দুর্গা বিছানায় পড়িয়া; তাই সীতানাথের ঘর সংসারে একটা মান-ভাঙা পড়িয়াছে। চাকুর-বাকরে কাজ করে, আনাজ দর দেখে-শোনে, তবু কিছুই যেন আগের মত হয় না; গৃহিণীর কর্তাপ-রত্বের অভাব পদে পদে গৃহবাসিগণের মনে আঘাত দিয়া যায়।

পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির সীতানাথ পারিবারিক কাজ-কর্মের ত্রুটি সহজে সহ্য করিতেন। মায়াময়ী সহ্য করিতে পারিত না। আজকাল তাহার খাওয়া আজ হয় না, খাইতে বসিয়া অভিমানে ফুলে তাহার এই বয়সেও চোখে জল আসিয়া পড়ে। সে জানলার দিকে মুখ করিয়া গায়ের আলা মিটাইতে চাহে। তাহা কোন পক্ষেই সামান্য চিত্ত-দাহের সৃষ্টি করে না। মায়াময়ীর মনখানি যদিই কোমল হইত, তাহার অধিক ব্যবহার কিছু বিদ্রোহকরই হইত। কেবল দুর্গাদেবীই তাঁহার শান্ত স্নেহের স্পর্শে তাহাকে শীতল করিয়া রাখিতে পারিতেন। আর কেহ তাহাকে ভুল করিয়া বুঝিত না। সেও কাহারো প্রতি মন খুলিয়া দিতে পারিত না। তাহার স্বভাবের চতুর্দিকে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ছিল।

লিখিমার শয়ন-কক্ষের দ্বারে গিয়া মায়াময়ী দাঁড়াইল। লাল কম্বলের আসনে বসিয়া লিখিমা মুদ্রিত চোখে মনে মনে জপ করিতেছিলেন। তাঁহার শুভ্র দীর্ঘ পক্ক চুল বাহিয়া কাঁধ অলঙ্কারা ঝরাইয়া পড়িতেছে। মায়াময়ী রুদ্রাক্ষটা এক হাতে ধরিয়া অপলক চোখে এই পবিত্র ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বোধ করি একটু পরেই পাইয়াছিলেন, চোখ খুলিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন, "মায়াময়ি—"

"কেন লিখি-মা!"

মায়াময়ীরও চোখে জল আসিয়াছিল; সে কাছে আসিয়া দুই হাতে লিখিমার গলা জড়াইয়া চোখের জল মুছ রাখিল। দুর্গা স্নেহময়ী দীর্ঘ হস্তখানি দৌহিত্রীর গায়ে বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "কীরের জন্য মায়ে একটা ধরম জায়া পরনি কেন লিখি!"

মায়াময়ী শান্তিমুখে শাড়ীর আঁচলখানি তুলিয়া মাথায় দিতে দিতে কহিল, "আমার তো কীর করে না লিখিমা!"

লিখিমা তাহার চিবুকে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া চুমা খাইয়া কহিলেন, "কীর ঘর করে কেন্তে! কি রকমটা করতো মায়ি!"

মায়াময়ী লিখিত স্বরে কহিল, "রকমটা তো বুঝিনি লিখিমা!"

"রকমটা করতো যই কি মায়ি! তুমি যে আমার মায়াময়ী—মায়াময়ের গুরু তো তোমার রকমটাই করতে হ'বে, নইলে তাঁকে পাবে কোথায়?"

মায়াময়ী অনেকক্ষণ নীরবে রহিল, তার পর আস্তে আস্তে কহিল, "লিখিমা, তুমি কি বলতো। বুঝেছি, কিন্তু আমার তো বিয়ে হ'বে না লিখিমা!"

লিখিমা চমকিয়া উঠিলেন, "আচ, মায়ি, ওকি কথা মায়ি, তোমার বিয়ের আমি সব ঠিক করচি যে।"

"না, লিখিমা, না—" বলিতে বলিতে মায়াময়ীর শুভ্র মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

"সে কি! কেন লিখি?"

"লিখিমা, আমি তোর পুরুষ মানুষকে বিয়ে করতে পারব না।"

"পাগলি! তবে কি মেয়ে মানুষকে বিয়ে করবি?"

"তোমার কুল রয়েছে লিখিমা, মোট কথা আমি বিয়েই করব না। আমি তোমাদের কাছে থাকব!"

দুর্গা নির্নিমেষে নাতিনীর উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এই কথাটা শুনিয়া যেন একটু আরাম পাইলেন; হাসিয়া কহিলেন, "ও, সেই কতে! আমাদের ছেড়ে স্বামীর ঘরে যেতে তোর কষ্ট হ'বে? বুঝি মায়ি! কিন্তু মেয়েমানুষ যখন দুরো-দুরীয়ে চৌদ্দ যেতে তখন কি করে ঠেকাবে মায়ি! সেই হাকতেই তো হ'বে!"

"না লিখিমা, শুধু স্বামীর কথাও নয়, পুরুষমানুষকে আমি মোটেই সহ্য করতে পারি নে, তাই—"

"সহ্য করতে পারিসনে! হায়, তুই পাগল মায়ি রে! ইংরাজীস্কুলে তোকে এই বিদ্যে শিখিয়েছে মায়ি! তোর বাবাও যে…"

"যাক্, যাক্, সে ভাবনা তুমি ভেবো না দিদিমা; সংসারে দেবতা কিছু পথে-ঘাটে পাওয়া যায় না।"

দুর্গা হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "তোমারও যে অদৃষ্টে দেবতা নেই তা কি করে জানলে দাদু?"

"জানি না দিদিমা, কিন্তু অদৃষ্টে যে দেবতার বদলে অসুর ঘরে নেই, তাও তো কেউ জানে না। অনিশ্চিত সুখের আশায় নিশ্চিত দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরখ করবার দরকার কি? আমি তো বেশ আছি।"

দুর্গা সহসা কোন প্রতিবাদ-ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। নীরবে চাহিয়া রহিলেন। রামরাণী হাতের বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "পরীক্ষা এসে পড়ল, কি রকম পাশ হব মনে হচ্ছে?"

দুর্গা প্রসঙ্গান্তরে গিয়া খুশী হইলেন। কহিলেন, "পাশের জন্য ভাবনা কি দিদি? কোনবার তো ফার্স্ট সেকেণ্ড ছাড়া নি তুমি।"

রামরাণীর মন প্রফুল্ল হইয়া গেল। দিদিমার মুখের কথা কখনও মিথ্যা হয় না।

রামরাণী পরিয়া দিদিমার সম্মুখে উপবেশন করিল। দুর্গা রামরাণীর এরোখানা বাঁধিয়া শাঁখা সিঁদুর মুখের উপর রাখিলেন। রামরাণী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ দিদিমা?"

দুর্গার মুখ অবয়বে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। মৃদুস্বরে কহিলেন, "দাদু, আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে,—কিন্তু তোমার রামরাণী আমি যে ফাঁকি পাখি পাব না ভাই!"

রামরাণী বুঝিল, কহিল, "কি রকমে তুমি পাখি পাও, তাই বল।"

দুর্গা আবার হাসিলেন, এবার বড় পাখি ও বিচিত্রতার হাসি, সঙ্গে সঙ্গে নেত্রদুটি লৌহিত্যের মুখের উপর রাখিয়া কহিলেন, "তোমার রামরাণের সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দিই দিদি, তাহ'লে খুব পাখিয়েই যেতে পারব।"

রামরাণীর সমস্ত দেহ বিবশ হইয়া গেল। দুইটী শুভ্র দেহবর্ণ শঙ্খের হইতে সে যেন প্রাণহীন মুখে আপনার মৃত্যুবাণী উচ্চারণ করিল, "তাই কর দিদিমা—আমার বিয়ে দিলে যদি তোমার পাখিপড়া হবে তাই দাও।"

ইহার চারি-পাঁচদিন পরে একদিন রামরাণ-রাণী উপস্থিত হইয়া দুর্গা মুখের কাছে নিশ্চীব হইয়া পড়িলেন। রামরাণীর পরাণখানা খুঁজিয়া গেল। সে দিন-রাত দিদিমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। একদিন সন্ধ্যার পরে জন্মের শয়ন-অন্তে দুর্গা শয্যায় শুইয়া ছিলেন; তাঁহার দুই চোখ বন্ধ, হাতদুটি বুকের উপর অঙ্গলিবদ্ধ, বোধ হয় মনে মনে আহ্নিক করিতেছিলেন; আজকাল তাঁহার উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই। রামরাণী দিদিমার পায়ের কাছে স্থির হইয়া বসিয়াছিল।

দুর্গা চোখ মেলিয়া ডাকিলেন, "দাদু—"

"কি দিদিমা?"

"উঠে আমার সামনে এসে বসি—"

আহারান্তের এক ঘোরঘোরাণী যামিনে সব জীবলোকের শক্তির সঞ্চয়গুলি রামরাণীকে অনধিকার এক ব্যক্তির হাতে হস্তান্তর করিয়া যান তখন হইল। রামরাণী অনুষ্ঠানিত প্রতিমার মত যথাকর্তব্য সম্পন্ন করিল; কিন্তু তাহার মনের মধ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহের প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। আজ তাহার জীবনের সকল উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সমাধি—সকল স্বাধীনতার শেষ। ইহার পরে আর একজনের পথানুসরণ করিয়া সে চলিবে, চিরজীবন আর একজনের সংসারে দাসীত্ব না করিলে তাহার নিস্তার অবধি থাকিবে না, আর জীবনেও কোন সুখ হইবে না। তন্দ্রাহীন নয়ন চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে দুইটী উজ্জ্বল নির্মল বেত্র দেখিল, কিন্তু তাহাকে আর বিদ্রোহী করা সাধ্য হইল না।

রাধারাণীর শ্বশুরালয় পশ্চাতীরে এক ক্ষুদ্র গ্রামান্তরে। কিন্তু তাহার শ্বশুর বুরড়ীর ডাক্তার; সেইখানে সপরিবারে বহুকাল যাবৎ বাস করিতেছেন। বিবাহের পরে রাধারাণী বুরড়ীতে আসিল; তাহার সুন্দর সুস্বভাব ও নবযৌবনে সহজেই নবপল্লিবাসিনীদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইল। শ্বশুরালয়ে নববধূর আদরের সীমা রহিল না, কিন্তু রাধার মন কলিকাতার সেই পরিচিত পুরাতনি স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নূতন আত্মীয়জনের স্নেহে রাধারাণীর তাহার মন প্রসন্ন হইল না; কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহারা জোর করিয়া তাহাকে এই সংসার-কারাগারে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে; ভালবাসায় ও বিশ্বাসের স্নেহের কোল হইতে ছাড়িয়া আসিয়াছে, আর সর্বোপরি তার উচ্চ আদর্শ হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিয়াছে। তাই সকল স্নেহ-ভালবাসার চিত্ত হইতে তাহার মন বিমুখ হইয়া থাকিত। ভালবাসা দান করিয়াও সে কাহাকেও ভালবাসিতে শিখিল না।

একদিন রাত্রে নিভৃত শয়নাগারে অনিল পত্নীকে ডাকিয়া কহিল, "তুমি ঘুমোচ্ছ নাকি?"

রাধারাণী স্বামীর সহিত বাক্যালাপমাত্রই করিত না। অনিলও বিমুখী স্ত্রীকে সাধ্যসাধনা এড়াইয়া চলিত। রাধারাণীর ঘুম পাইয়াছিল, কিন্তু স্বামীর আহ্বানে ঘুমটাকে চোখ হইতে দূর করিয়া ঈষৎ বিরক্তিভাবে কহিল, "কেন?" অনিল উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া রাধারাণী অধৈর্য্য হইয়া কহিল, "কোন কথা না থাকলে ডাকবার কি দরকার ছিল?"

অনিল কহিল, "আর আজ জয় হয়েছে—" বলিয়া থামিল। রাধারাণী কহিল, "হুঁ, তা আমি জানি।"

অনিল প্রশ্ন করিল, "আর তাতে আমি দিয়েছিলে কি?"

রাধারাণী কহিল, "না।"

"কেন যাওনি।"

বৈজ্ঞানিক চাহিবার এই নূতন ছলে রাধারাণী কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিল; তবু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "সেখানে তিনি ছিলেন, ঠাকুরঝিরা ছিল, আমি আর গিয়ে কি করব?"

"একটু হয় নিলে না খুব খুশী হ'তেন।"

কথা যে সত্য, সে বিষয়ে রাধারাণীর এতটুকু সন্দেহ ছিল না। হিমের মধ্যে আজ শরতের তার কোমল মন পাণ্ডুর রোমশবাসপার্শে ছুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অনিলের সম্মুখে নিজে যাইতে পারে নাই, কিন্তু অনিলের উপদেশ তাহার সহ্য হইল না। তাই রুক্ষ স্বরে জবাব দিল, "উপহারটা আগে দিলেই পারতে।"

"তোমাকে উপহার দেবার স্পর্দ্ধা রাখিনে"—বলিয়া অনিল একটু সরিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রাধারাণী আর কথা কহিল না। কিন্তু নিজেকে বেশ কতকটা পরাজিত বোধ করিল।

ইহার দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন সকালবেলা কি কাজে আপনার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়া অনিল দেখিল রাধারাণী নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে একখানি বই পড়িতেছে। নীচের তলায় সাংসারিক বাজেকথার কোলাহল যেন তাহাকে স্পর্শও করিতেছে না।

অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে চুপচাপ যে?"

রাধারাণী চোখ তুলিয়া কহিল, "কি করব?"

"কেন, নীচে যাও না, সবাই কাজ করছে—তুমি—"

"আমাকে কেউ কাজ করতে বলে না।"

"সেটা সুখের কথা: তোমার করবার তুমি করলে।"

"যদি না করি—?"

"নিজে হ'বে যাবে।"

"হ'লেই বা।"

অনিল হাসিয়া কহিল, "সে কথা বলা চলে যদি তুমি একলা হ'তে। সংসারে থাকতে হলে নিজের ভার অন্যকেই হ'বে।"

রাধারাণী তীব্রস্বরে কহিল, "সংসারে আমি থাকতে তো চাই নি, আমাকে শুধু জোর ক'রে—"

অনিল বাধা দিয়া কহিল, "আমি তো তা জানি না, তোমার আত্মীয়রাই যদি'ল আমায় করেছেন, তাঁরা তোমায় বিয়ে দিলেন কেন?"

"তাদের সমালোচনা কোরো না।"

"সমালোচনা যে করছে! কিন্তু তোর জন্যে এই বিশ্রী ঘটনার তারা আমার সর্বনাশ করলেন কেন?"

এই স্নিগ্ধ উক্তিতে রাধারাণীর মুখ লাল হইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে বলিল, "সর্বনাশ কি তোমার একলার?"

অনিল বক্রদৃষ্টিতে কহিল, "আমারটাই আমি জানি। অন্যের সর্বনাশে কিছু আসে যায় না।"

রাধারাণীর চোখে কান্না উথলিয়া উঠিল। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। কথা বলিল না। অনিল একবার মাত্র স্ত্রীর পর চোখদুটির দিকে তাকাইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রাধারাণীর পাল্কী তাহাকে করে রাখিয়া বলিল, "বৌমা, তুমি না হয় এ মাসের বাকী ক'টা দিন নিরিমার বাড়ে থেকে এসো। পৌষমাসে মায়ের কোথাও যেতে আসতে নেই। একেবারে মাঘের শেষ তারিখে খাসিয়ে নেব।"

রাধারাণী কহিল, "আচ্ছা—"

হাতে পায়-ওকে ঝাড়ি-ঝুঁটির সাক্ষাৎ ঘটিল। অনিল কহিল, "তোমার থাকা ঠিক হচ্ছে তো? আমি যাকে বলেছিলাম তোমার পাল্কি দিতে।"

রাধারাণী কহিল, "আমি তো তোমাকে বলিনি বলতে—"

অনিল সংক্ষেপে কহিল, "না, আমি নিজের ইচ্ছাতেই বলেছি।"

জিজ্ঞাসা করিবে না জানিয়াও রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "তোমার তাতে কিসের?"

অনিল উত্তর দিল, "তোমার মন তো এখানে টিকছে না, দরকার কি!"

উত্তরটা রাধারাণীর অন্তরে গিয়া বিদ্ধ হইল। পরদিন সে কলিকাতা যাত্রা করিল।

দুর্গা তখনও ষোলআনা-খাসিকা। খাসিমুহ-প্রত্যাগতা পৌত্রিণীর মুখখানি মুখে হাসিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। সেই স্নেহশীতল অঙ্কে মুখ রাখিয়া রাধারাণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। যে স্বামীর দিকে সে ফিরিয়া চাহে নাই, যাহাকে সাগ্রহে হৃদয়ে বরণ করিয়া লয় নাই, আজ হৃদয়ে আসিয়া তাহারই নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া চোখের জলে তাহার মুখ ভাসিয়া গেল। দুর্গা তাহার অশ্রুধৌত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কেমন ছিলি বাছা! বল্, তোর কেন চিঠি? ঘরের জন্যে মন কেমন করছে নাকি!"

রাধারাণী কহিল, "উঁহু!"

বিদায়ের কালে স্বীকার করিল না বটে, কিন্তু নিজের কাছে সে অস্বীকার করিতে পারিল না—স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া চলিয়া আসাটা তাহার ঠিক কাজ হয় নাই। কি অসহায় তাহার। এখন কখন তাহার গুণবান স্বামী কমলদের চিঠিপত্র পাঠাইবে! তাহার প্রতি কোন্ দুর্ব্যবহারের জন্য তাহার প্রথম হইতেই বিরাগ হইয়া রহিল। অথচ সে বিরূপতা যে কিসের আকর্ষণে নষ্ট হইয়া সে আসিবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বুঝিতে পারিল না। এখন আবার সে মুখ মনে পড়ে কেন! প্রকৃতির হাত তো কিছুতে ছাড়ানো যায় না!

দিন কাটিয়া চলিল। স্বামীর একখানি চিঠি পাইবার জন্য মন ভিতরে ভিতরে উন্মুখ হইয়া উঠিল। কিন্তু পত্র আসিল না। এই পত্রহীনতায় তাহার অন্তর পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও মনের দুঃখ জানানো যায় না। বরং হিসাব ও লাভে সুখী করিবার জন্য বাহিরে তোষ করিয়াই হাসিমুখে থাকিতে হয়। রাধারাণী মনে মনে পরাজয় স্বীকার করিল। সে বুঝিল, অনিলচন্দ্রের ও অজ্ঞাতসারে স্বামীকে সে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু প্রতিদানে নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও অবহেলা ভিন্ন কিছু পায় নাই। এই লজ্জা বিদ্রূপসহ অনুভব করিয়া আঘাত তাহার অন্তর দুর্বল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, পরাজয় কখনও স্বীকার করিবে না। স্বামীর ভালবাসা না পাই, সে জন্য দুঃখ করিয়া জীবন নষ্ট করিব না। সংসারের জীবনের ক্ষুদ্র সুখকোণে যদি আমার সুখ লেখা না থাকে, উচ্চতর সাধনায় এ জীবন সমর্পণ করিয়া দেখিব—সুখ হয় কি না।

রাধারাণী রাশি রাশি পত্রপত্র কিনিয়া সতীশচন্দ্রের পাঠে অনোনিবেশ করিল।

সৌখনাদ দুই পত্রিকে শেষ হইয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী হইতে সইয়া যাওয়ার কোন কথা আসিল না। রাধারাণী অস্বস্তি হইয়া ভাবিতে লাগিল, স্বামী না হয় ভালবাসেন না, কিন্তু আর সকলে তো তাহাকে খুবই ভালবাসে—তবে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহে না কেন।

মাঘের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালবেলা দুর্গা একখানি পত্র হাতে লইয়া রাধারাণীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাপু, তোমার পরিচিত পত্র ছেড়ে এইবার পড়ো—তার এসেছে।"

রাধারাণীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, বুক ধরিতে পারিল। কম্পিত স্বরে কহিল, "তার পত্র কিসের!"

"শাশুড়ীর, পড়ে দেখো—" বলিয়া দুর্গা চিঠিখানা তাহার হাতে দিলেন। রাধারাণী চিঠি হাতে লইয়া বসিয়া রহিল। খুলিয়া পড়িবারও তার ইচ্ছা রহিল না।

আবার শ্বশুরবাড়ী, সেই দুই দিনের পরিচিত ঘর। সবাই এক রকম আছে। প্রভেদের মধ্যে স্বামী ঘরে নাই। তিনি কেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া রংপুরে গিয়াছেন।

সকলের আদর, যত্ন, ভালবাসা, মাতাপ্রভাবের দুঃখ-যাতনা কিছুই রাধারাণীর প্রাণস্পর্শ করে না। যদিও সে আদর দিতে চাহে না তবু স্বামীর অভাব অনেক অংশে দুর্বহ অনুভূত হয়।

ফাল্গুনমাসে তাহার নয়ন, তারা শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিল। কেহ কিছু জানিতে পারে নাই, কিন্তু তারা আসিয়াই আবিষ্কার করিল, রাধারাণী সন্তান-সম্ভাবিতা। যথাসময়ে সময় সে তাহার এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল, সকলেই জানিল। আসন্ন শুভসম্ভাবনায় মাতৃত্বের পরিচর্যায় সমুদ্যত হইয়া উঠিল। শুধু তাহাকে উপলক্ষ করিয়া আনন্দের সৃষ্টি হইল তাহার মনেই কোথাও একবিন্দু সুখ রহিল না। সে রাধারাণী। একদিন সন্ধ্যাবেলা শয়নকক্ষের বারান্দায় বসিয়া রাধারাণী তারার সহিত কথা কহিতেছিল। গল্প সে বেশী করে না। সে একটী সদ্যপঠিত বইএর আলোচনা করিতেছিল।

সহসা সময় পুস্তিপ্রসঙ্গের মধ্যখানে তারা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বৌদি-বৌদি—একটা কথা বলব!"

রাধারাণী কহিল, "বল না—"

"মনে তুমি রাগ করবে।"

"না, করব না, বল।"

"তোমার খুব আনন্দ হ'চ্ছে না!"

রাধারাণী বুঝিতেও প্রশ্ন করিল, "কেন!"

তারা সানন্দ ঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ব্যথা নেই কি!"

রাধারাণী উত্তর দিল না। শুধু গম্ভীর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

তারা কহিল, "বাপ করলে বাকি বৌদি-বৌদি!"

রাধারাণী আস্তে আস্তে কহিল, "রাগ করি নি—"

"তবে গম্ভীর হ'লে যে!"

"সে অন্য কথা ভেবে।"

"কি কথা!"

"শুনে কি হ'বে! হয় তো তুমি হাসবে।"

তারা সাগ্রহে কহিল, "না, হাসব না, বল, কি ভেবে তুমি গম্ভীর হ'লে!"

রাধারাণী ঈষৎ সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে কহিল, "আমার আনন্দ হয় নি কি-না—তাই—"

"আনন্দ হয় নি! সে কি! ছেলে হ'বে তাতে—"

"আমি ছেলে তো চাই নি—"

"কেন চাও নি বৌদি!"

"কারণটা যে আমার ভাল লাগে না, তাই।"

রাধারাণীর কণ্ঠস্বরে তাহার বাথিত হৃদয়ের দুঃখ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তারা আর কথা কহিল না। স্বামীর সঙ্গে যে বৌদির একটা কিছু গোলযোগ আছে তারা তারা কেমন করিয়া যেন একটু বুঝিতে পারিয়াছিল। সে জানিত, রাধাকে আনিবার জন্য পত্র দিবে।

রাধারাণী বলিল—"যদিও আমি তোমাদের মতলবের মধ্যেই আছি, তবুও একটাকে আরও আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু এর পরে আমি সংসারে টিকিয়ে রাখব—"

তারা কহিল,—"সংসারে থাকবে ছেলে আর না টিকিয়ে উপায় কি!"

"কিন্তু রাতে ঘুম-টুম আসবে না। আমি অনেক ভাবও পড়েছি, আর আমার বিশ্বেস অনেক এই রকমে পাওয়া যায় না। পরিণামে দুঃখই এসে জোটে। তবে এই দুঃখটা আমার কপালে না জোটে সেই চেষ্টাই আমি করছিলাম। তখন জানি কি ভগবানের মনে আরো হাড়াহাড়ি চলছে—"

তারা মনযুগবৎ রাধারাণীর এই নূতন সুরের কথা শুনিয়া গেল। তারপর কহিল—"সংসার ছেড়ে দূরে যাবে ভাবছ বৌ তো জানলে, এখন আর তবে মন খারাপ কোরো না; ছেলে কোলে করলেই দেখো মন বদলে যাবে!"

"তা কেন যাবে!"

"কি করে জান যে যাবে না!"

"আমি জানি।"

"কি জান! ছেলেকে মানুষ করবে না!"

"নিশ্চয় করব। কিন্তু সেটা তো অর্থহীন মায়া, তার সঙ্গে মায়ার সম্পর্ক কি!"

তারা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"নিজের রক্ত-মাংসে গড়া একটা আপনার জীব—তাকে মায়া হবে না!"

"না।"

"দেখো তখন। তুমি যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ যে, মায়া হবেই দেবে না; ভগবান তোমার দর্প চূর্ণ করেন।"

রাধারাণীর ঈষৎ হাসিল, কহিল—"তুমি ভুল বুঝেছো। এ আমার দর্প নয়, চেষ্টা মাত্র।"

(৬)

আশ্বিনের এক দিন প্রত্যুষে সন্তান রাধারাণী আপন মাতৃত্বের গুরু-ভোগ অহরহ করিয়া তৃপ্তির হইয়া গেল। তাহার সকল স্নেহ-অনুরাগ এমন অবলম্বন অধিকৃত করিয়া বিসবার মত অপর যাহা তাহার জীবনেও কোনদিন ছিল না। ইহার প্রথম আকস্মিকে সে ভয়ে আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া গেল। সন্তিকা-সূতে প্রবেশ করিবার মুহূর্তমুহূর্তে সে দুই বাহু দিয়া জীবনে এই প্রথম তারাকে জড়াইয়া ধরিল, অবরুদ্ধ স্বরে কহিল—"ঠাকুরঝি, আমি আর বাঁচবো না আই!"

তারা বিস্ময়ে বাণিয়া গেছিল, কিন্তু রাধার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল—"ভয় কথা বৌদি! কিছু ভয় নেই, সবকিছুই যা হয়!"

রাত্রি প্রায় আটটার সময় সন্তোষের শিশুর কান্নায় বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল। অনিলের মাতা পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া অবনত মুখে দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মৃদু কহিলেন—"অনেক কষ্টই পেয়েছ মা, মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখো।"

রাধারাণীর প্রাণ ভরিয়া সেই মুহূর্তে ইচ্ছা করিতেছিল, পাতকীর কথা ভুলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া চাহিবে।

এই তাহার ছেলে! এত সুন্দর! এত আপনার! রাধারাণীর এতক্ষণের সকল যন্ত্রণা যেন জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

খোকাকে মায়ের বুকের কাছে শোওয়ানো হইল। মুখ তুলে দুইবেলার মধ্য নিশ্চল একটিই শিশু; চোখ দুটি বন্ধ, হাত দুখানি মুষ্টিবদ্ধ। যেন অমৃত স্বর্গলোক হইতে পৃথিবীর মাটির বুকে ঝরিয়া পড়িয়াছে, এখনো তার কাটে নাই।

পরদিন ভোর না হইতে তারা দুটির খুকিকণ্ঠে প্রবেশ করিল। রাধারাণীকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মনে হচ্ছে বৌদি-বৌদি?"

রাধারাণী মৃদুস্বরে কহিল, "কিছে কথা বলবে না, কালরাতে খোকা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল—মায়ারাত ঘুমোইনি, একটাকে বাঁচিয়ে তবার চেষ্টা করেছি, আর আর একটুও দুর্বলতা নেই।"

"যীশুমন্ত্র আর কি!" বলিয়া তারা মুখর খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। কহিল, "এই রক্ত-বিদ্যুটিকে ছেড়ে তার থাকা না হয় সে হল, না রাধারী!"

"আমি যাচ্ছি—, পাদুকা বাবু, তুমি নিয়ে যাচ্ছ কর—"

"যাক্—আর বলে বোঝানো। প্রাণ ধরে দিতে পারবে কি না! সে কথা যাক্—একটা খবর শোন, মেজ-দা আসছেন।"

যাযাবরীর পাণ্ডুর কপোলে ঈষৎ লোহিত-রেখা দেখা দিল। সে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না।

যাযাবরী শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখে আর ভাবে, কই অনুযোগ তো মায়া হইতেছে না। আমি কি একে ভালবাসি! শিশু চোখ বুজিয়া অচেতন হইয়া বুকের দুধ খায়, যাযাবরী তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। কেবলই মনে হয় ছেলের জন্য তার মনে একবিন্দু মোহ জন্মে নাই। নিজের এই নির্লিপ্তায় অনুযোগে তার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পাঁচদিনের দিন খোকার একটু শর্দিকাশির মত হইল; বাড়ীশুদ্ধ সকলের ভাবনার অন্ত রহিল না। কেবল যাযাবরীর মনে হইল খোকা মরিয়া গেলেও তাহার শোক মাতৃহীন অন্তরে একটু রেখা পড়িবে না।

কিন্তু খোকা ভাল হইয়া উঠিল। পরদিন রবিবার; শিশুকে সারারাত্রি কোলে লইয়া জাগিয়া থাকিতে হইবে। অনিলের মামা অনেক রাত্রি পর্যন্ত গাহিকে লইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর তাহাকে মায়ের কোলে দিয়া কহিলেন, "এবার খানিক তুমি ঘুমো, এর পরে রাই উঠে দেবে। কিন্তু ঘুমিয়ো না যেন।"

যাযাবরী শিশুকে কোলে লইলে তাহার শাশুড়ী শয়ন করিলেন; তাঁহার আর সে গাঢ় নিদ্রায় এলাইয়া পড়িল।

মেঝেতে সতরঞ্চি বিছাইয়া রাই নাসিকাধ্বনি করিতেছিল। ঘরের কাঠের আগুন মৃদু জ্বলিতেছিল। যাযাবরীর চোখও ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল। আর যেন বসিয়া থাকিতে পারে না। ঘরের বাঁশের বেড়া একেবারে সন্ধ্যাকাশ, যাযাবরী একটু সরিয়া বসিয়া বেড়ার গায়ে মেরুদণ্ডের স্থাপন করিল। এবং সেই ভাবে থাকিয়া কখন্ তাহার চক্ষু শরীর মুদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সহসা কোকড়িত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দনে তাহার নিদ্রা টুটিয়া গেল। চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল সমস্ত ঘর তীব্র আলোকে পরিপূর্ণ; কাঠের আগুন কেমন করিয়া বেড়ায় লাগিয়া হাউ হাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যাযাবরীর শয্যার অতি নিকটে অগ্নির লেলিহান রসনা। যাযাবরী চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "মা"—শাশুড়ীকে এমন প্রাণ খুলিয়া "মা" বলিয়া ডাকিবার মত প্রাণের দায় ইহার পূর্বে কখনও উপস্থিত হয় নাই।

অনিলের মাতার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। যাযাবরী মর্মন্তুদ্রাহীনার মত খোকাকে এক হাতে বুকে চাপিয়া কম্পিত পদে শয্যা হইতে ভূমে নামিয়া পড়িল। অন্য হাতে রাইকে ঘুমিতে ঠেলা দিয়া আর ঘুমিতে পারিল না। সেই খানে বসিয়া পড়িয়া মূর্ছিত হইয়া গেল। খোকা তখনো বুকের দুধে একহাতের নিবিড় বেষ্টনে সুরক্ষিত।

• • •

যখন জ্ঞান হইল তখন সে আর সেই সূতিকাগৃহে নয়। অনিলের মাতার শয়ন-কক্ষে তাঁহার শয্যায় সে শুইয়া আছে। যাযাবরী চোখ খুলিয়া ডাকিল, "মা, খোকা"! "মা অজ্ঞান,—খোকাকে এই যে তোমার কাছেই"—বলিতে বলিতে অনিল তাহার ললাটে হস্তক্ষেপ করিল। প্রদীপের আলো সবটাই তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া যাযাবরী আজ তাহার জীবন-দেবতার দর্শনলাভ করিল। ভয়ভর করিয়া তাহার মঙ্গল করিতে লাগিল। সেই পাষাণবিদারী হর্ষবাষ্পকে অনিল বাধা দিল না, শুধু তাহার মুখের উপর নত হইয়া কহিল, "যাকে যাযা বলে না, তাকে বাঁচাবার জন্যই প্রাণ দিতে গিয়াছিলে!"

রবীন্দ্রনাথ ও "বলাকা"

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ—কাশী

অনেক দিন হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। বাল্যকালেই তাঁহার কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে চক্ষু-বিহ্বল হৃদয়ের পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলাম। অন্তরস্থদয়ের সে বীরস উচ্ছ্বাস বীরসে উঠিয়া বীরসেই বিলীন হইয়াছে। মন পরিণত আর সে রস বৈশেষের কথা—যেন বাল্যকাল অতীত হইয়াছে. কিন্তু যৌবনের সঞ্চার হয় নাই, সেই অন্তরস আবেশময় আধ-আলো আধ-ছায়ার রহস্যস্নিগ্ধকালে রবি-কবির কল্পনাবিলাসে, সন্ধ্যালোকে রাগরক্ত আকাশ-তলের ন্যায় জীবনের আদর্শধারা বিচিত্ররঙে রঞ্জিত হইয়া পরিচায়িত। তখন কি দেখিতাম, কি বুঝিতাম, কি ভাবিতাম, এখন তাহা ঠিক কেমন করিয়া অনুভব করিবার উপায় নাই। তবে এটুকু মনে আছে যে রবীন্দ্রের কাব্যমুকুরে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট বেদনা ও আনন্দে-ভরা রহস্যপূর্ণ জীবনের প্রতিবিম্বগুলি প্রতিফলিত দেখিতে পাইতাম। তাই প্রাণে জাগিত জিজ্ঞাসা—হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশ হইতে কি এক বিচিত্র প্রভাব প্রাণের স্পন্দন ফুটাইয়া উঠিত। যে অনন্তভাবের খেলা দেখিতে দেখিতে এখন প্রাণ আত্মহারা হয় ও সময়ে সময়ে যেন মহাভাবে মগ্ন হইয়া সকল ভাবের অতীত পরম অব্যক্ত পদে স্থিতি লাভ করে, তাহার প্রথম উন্মেষ তখনই অনুভব করিতাম।

যাঁহার করস্পর্শে হৃদয়-তন্ত্রী এই ভাবে ঝঙ্কৃত হইত, যাঁহার সহিত একটু ভাব করিয়া পরিচিত হইতে অনেক সময়েই ইচ্ছা হইত। ইচ্ছা হইত, একবার সেই শিল্পীর প্রকৃত স্বরূপ নিরীক্ষণ করি—যাঁহার যেমন প্রতিভা তাহার ঐ প্রকার স্বভাব ইতিহাসের অবতারণা করে। যে বিশুদ্ধ চেতনাস্তর হইতে এই বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টির ধারা স্বাভাবিক উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে সেই মর্মস্থান দেখিতে সাধ যাইত। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের জীবনালেখ্যের উপর চোখার এক একবার তাহা অবলম্বন করিয়া বাহির করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। সাহসের অভাব ও অবসরের অসঙ্কুলতা উভয়ই প্রধান। এখনও সেই কারণে রবীন্দ্রের কাব্য সমালোচনা করিবার গুরুভার আমি নিজের উপর গ্রহণ করিতে সাহস পাই না। যাঁহারা যোগ্যতর তাঁহারা যে ঐরূপ কর্তব্য অবশ্যই সম্পাদন করিয়াছেন এবং করিতেছেন আরও অনেকে করিবেন। তাই আমার পক্ষে সে ভার গ্রহণের প্রয়োজনও অনুভব করি না।

তবে আমার কোন কোন বেহাগাদি বন্ধুর পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহা কাব্য-সমালোচনা নহে। রবীন্দ্রনাথের বর্তমান কাব্যপ্রয়াসকলীতে—বিশেষতঃ বৈশেষের পরবর্তী কাব্য-সাহিত্যে, তাঁহার যে বিশিষ্ট ভাবসৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। তাঁহার 'বলাকা' নামক কাব্যখানা অবলম্বন করিয়াই আমি তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রথমতঃ মূল বক্তব্য পদার্থের পরিস্ফুটতা সাধনের জন্য প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য গ্রন্থেরও উল্লেখ থাকিবে।

১

মানুষের পূর্ণ ইতিহাস কি? যে আদিম আত্মার ভিতরে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা বিকাশোন্মুখ

হইয়াছে তাহার প্রথম উন্মেষণ যখন সম্ভিত হয় তখন সে কোথায় ছিল? সেটা কি অবস্থা? তাহার স্বরূপ কি? ঋষি বলেন—সেটি অব্যক্ত পদ, সেখানে আমি-তুমির ভেদ নাই, অহংকার নাই, সেখানে আলো নাই, আঁধারও নাই, কোনও প্রকার দ্বন্দ্ব নাই, তাহাকে মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সেই অনন্ত অজানা, সেখানে আপনাকে আপনি জানা—জ্ঞেয়ের তীব্রতার অতীত, সংজ্ঞাপ্রকাশের উর্দ্ধে, শুভাশুভের উপরে সেই বিরাটপূর্ণ সনাতন মহত্, যাহা বিরাজমান। সেখানে দুঃখ নাই, আনন্দও সেখানে খেলে না। মাত্র সেখানে রহে না, কালের স্রোত সেখানে বিরত, আয়ুঃশক্তি সেখানে বিলীন। 'নাহি রাত্রি দিনমান আদি অন্ত পরিমাণ, সে অতলে ঠাঁই পান কিছু নাহি যাহে'। সেই চিরনীরব গভীর প্রশান্তি সম্বন্ধে কি এক অনির্বচনীয় ব্যবধানের প্রেরণায় এক দৈব মুহূর্তে স্পন্দন উঠিল।

সেই স্পন্দন উঠিল, আমি অব্যক্ত পদ হইতে 'আমি'র উদ্ভব হইল। 'আমি' উঠিল, 'তুমি'ও উঠিল—অব্যক্ত অনন্ত সত্তা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া 'আমি-তুমি' রূপ ধারণ করিল। অব্যক্তরূপে তমসাবৃত, অপ্রকাশ, আত্মিবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বপ্রকাশ হইলেন। যতক্ষণ তিনি আপনাকে আপনি তুমিয়া একাকী থাকেন ততক্ষণ তিনি নিজেকেও দেখেন না, চিনিতে জানেন না। এইটি একত্বাত্মীয় বিদ্যা ('ঘুম')। ইহার ভাষা ঠাঁহার আত্মপরিচয় বা আত্মবোধ—অর্থাৎ 'আমি'র উৎপত্তি। সঙ্গে সঙ্গে মহাসূত্রে আনন্দময়ী জ্যোতির্ময়ী সত্তার ধারা বহিতে থাকে।

> যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা,
> আপনারে ও ছিলে যেমন কেহ।
> . . . .
> আমি এলেম, তাহার প্রেমের দূত,
> মুক্ত পুরুষ মুক্তি আনিল অমৃত ভুবন।

সুতরাং এক হিসাবে বলা যায় যে 'আমি'ই ঠাঁহার পরমপদে বিরাজমান আত্মানন্দের সাধক। মানুষ মাত্রেই থাকিলেও যদি তাহার সন্ধান না হয় কিংবা হইলেও সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে ইহাকে মৃত বলিয়া বিশেষিত করা বিসর্গক। তখন সেই অনন্ত ও পূর্ণ বস্তু আনন্দস্বরূপ হইলেও যতক্ষণ সে আনন্দের আস্বাদন না হয় ততক্ষণ তাহাকে রসময় বলিয়া বারবার করা চলে না। উপনিষদে আছে—"স একাকী ন রমতে। তস্মাৎ দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ, ইত্যাদি"। এক অনন্ত অদ্বিতীয় সত্তার যতক্ষণ অনন্ত হইতে দ্বিতীয়ের ভূমন না হয় ততক্ষণ ঐ সত্তা নিজের কাছে নিজে পরিচিত হইতে পারে না, ততক্ষণ ইহা চৈতন্য নামের অযোগ্য। আমি তুমির সহিত এই মহাদ্বিত্ব দ্বিতীয়ের যে লীলাবিলাস তাহাই আনন্দরূপা সত্তীমাতার উৎস। ইহাই সংক্ষেপতঃ সচ্চিদানন্দ ভাবের তত্ত্ব। এই যে মহাদ্বয়ত্ব 'দ্বিতীয়' তাহার ভাষায় ইহাই 'আমি'। ইহা দ্বিতীয় হইলেও অনন্ত হইতে উদ্ভূত বলিয়া তাহা হইতে অভিন্ন। তাহার সেই পূর্ণ বা অনন্ত সত্তাই 'আমি' ভাবে প্রকাশমান—'আমি' তাহারই আত্মপ্রকাশ। এই অনন্ত বিরাট 'আমি'র নিকটে পূর্ণ-সত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া যেরূপে প্রকাশিত হন তাহাই 'তুমি'। অনন্তই 'আমি' রূপে আবির্ভূত হইয়া 'তুমি' রূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করেন। তখনের হয় 'আমি' সব এই 'বিরাট আমি'রই মাঝিরূপ। তদ্রূপ 'তুমি'ও অন্যত্র বস্তুতঃ একাধিক বর্তমান নাই। সমস্ত দৃশ্য ও জ্ঞেয় পদার্থের অন্তর্দেশে সেই এক মাত্র অনন্ত 'তুমি'ই বিরাজমান রহিয়াছে।

'আমি' জীব, 'তুমি' ঈশ্বর,—উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ। যখন আছে তখন দুই-ই আছে। না থাকিলে কেহই নাই। একমাত্র অজ্ঞাত তত্ত্ব আপনার মধ্যে আপনি গোপনে আছে।

অব্যক্তরূপ মহাসূত্র ধ্বনিত হইয়া যখন এই প্রকারে জীবেশ্বর বিভাগ হয়, তখন সত্তীর বিকাশ হয়, পৃথিবীতে স্বর্গের কথা হয়; এই শুভ মুহূর্তে অনন্তের পূর্ণ হইতে অনন্তনিহিত পূর্ণ সৌন্দর্য ও পূর্ণ আনন্দ রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এখের ভাষা আনন্দাত্মক কথা, নবজাত জীবকে ঈশ্বর কথা, নবজন্মের ধ্বনিরা স্পর্শে তাহার প্রাণমন আকর্ষণ করিয়া নিরন্তর বিচিত্র করা।

এস তব আলোক ধরি
ভিন্ন হয়ে অন্তিমের আঁধারের তরী
নিয়ে যায় প্রলয়ের দিকে,
দুঃখের তমস রাত্রে অন্তরের পূর্ণিমা প্রকাশে,
নব-রক্ত নিঃশ্বাসে চেতনায়,
নিরাশার চৌরাস্তা পারে।

কিন্তু হইতে বাহিরে মেলিয়া আঁখি নিজে হারাইয়া ফেলা যাইবে আমি। এই সৌন্দর্য স্বর্গের অমরা, বিশ্বকামনার প্রেরণা। বিশ্বাসের আমি বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপে ফুটাইয়া আমা এবং সৌন্দর্যের মরমময় স্পর্শে হৃদয়কে সাহস ও নির্ভয় করিয়া জীবের সফলতা ও শান্তি দান করা ও অন্তরের সঙ্গে তাহার আনন্দময় সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠান্বিত করা। এই মহত্ত্বপূর্ণ সকল বিশ্বের জননীত্বের, স্বর্গের অধীশ্বরী। ইহারই কল্যাণময় প্রভাবে জীব জীবন-মরণের অতি পবিত্র সঙ্গম স্থলে অমরের পূজামন্দিরে স্থান লাভ করে।

সব ভয় নিশ্চিহ্ন যায়
অন্তর নিশির প্রায়ে
নিত্য পরকাশ ;
সেখানে প্রেমময় সকল শক্তির পূর্ণিমা ;
নিশ্চিন্ত অন্তরে
নিঃশ্বাসে অমৃতাকাশ পরে
অন্তরে অমরের নিত্য প্রাণ ছন্দে মধু।

সৌন্দর্য হইল সোপান, কল্যাণ স্থির লক্ষ্যস্থল, সৌন্দর্য উৎস, কল্যাণ স্থিতি, সৌন্দর্যে বাসনা ও কামনার উদ্দীপন হয়, কল্যাণে তাহার উপলব্ধি—একের প্রবাহ অন্তর হইতে বাহিরের দিকে, অন্যের প্রবাহ বাহির হইতে অন্তরের দিকে, অন্যের প্রবাহ বাহির হইতে অন্তরের দিকে, ভেদ হইতে অভেদের দিকে। বহির্মুখী শক্তির টানে জীব ক্রমাগত বিক্ষিপ্তভাবে দিকে ছুটিতে থাকে, অন্তর্মুখী শক্তি তাহাকে কোলে আনিয়া প্রশান্তি ও সিদ্ধি দান করে। উভয়ই অন্তরের শক্তি—অন্যকরণ যোগনিদ্রার ভঙ্গে যখন অন্তরস্থা বিশ্বাই মহাশক্তির বিকাশে ও ক্রমন হয় তখন 'আমি-তুমি' রূপ অন্তরাত্মার দীনতায় ভেদজ্ঞানের ভাবের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মহাশক্তির অন্তর্মুখি ও বহির্মুখি অভিব্যক্তি লাভ করে। তবে প্রথমে স্বভাবের বিষম বহির্গতিই আসে, তার পর অন্তর্গতি বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

অন্তরস্থ জীব যখন জীবরূপে আসিয়া উঠে তখন হইতেই ভগবান্ হইতে তাহার বিচ্ছেদের প্রারম্ভ। এই বিচ্ছেদই সৃষ্টির আদিম রূপ। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে অন্তরের বিশ্লেষশক্তি হইতেই 'আমি' ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়। তাই যখন ভাব-স্রোতে সর্বপ্রথম 'আমি'তে অস্ফুট আলোকে জাগিতে দেখি তখনই হৈতের আভাস ও বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। অবশ্য তখন সে বিচ্ছেদ অনুভবযোগ্য ও বিচ্ছেদ সজ্ঞানে সজ্ঞাত হয় নাই। জীবের এই বিচ্ছেদও অতি বিচিত্র ব্যাপার। ইহা ঐকান্তিক নহে। কারণ ভগবান্ আত্ম গোপন করিয়া জীবের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান আছেন। সুতরাং ইহাও বলা যায় যে অন্তরের বিশ্লেষশক্তি হইতেই 'আমি' বা জীবভাবের উদ্ভব হয়। প্রকৃত কথা এই যে, বিশ্লেষশক্তি ও মিলনশক্তি কিছু পৃথক্ নহে। অব্যক্তাবস্থায় আত্মিতের যেন ঠিক ছিল না, তাই তখন মিলন বা বিরহ কিছুই ছিল না। যখন সেখানে 'আমি'র উদয় হইল তখন এমন এক অবস্থার অবিরাম হইল যাহাকে বিরহও বলা চলে, মিলনও বলা চলে। বস্তুতঃ উহা উভয়ের যৌগভাব মাত্র। জীবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ভগবান্ রহিয়াছেন, কিন্তু তাহার বোধ জীবে নাই।

এই বোধের আবির্ভাবই জীবের ক্রমবিকাশ। জীব-ভাব সমস্ত বিশ্ব জুড়াইয়া রয়। তবে প্রকারান্তরে, ভাবে প্রকারান্তরে, সকল বৈচিত্র্যের ভেদ করিয়া তাহাকে মানুষভাব পর্যন্ত উঠিতে হয়। সমস্ত বিশ্বই জীবের উত্থান-সোপান। তবে মানুষভাবে না আসা পর্যন্ত 'আমিত্ব' পরিস্ফুট হইয়া ব্যক্তিরূপে পরিণাম লাভ করে না। ব্যক্তিত্ব আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য, অজ্ঞাত স্বরূপ ভগবানের সৃষ্টি আসিয়া উঠে। মনে পড়ে, কি যেন তাহার ছিল, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে, যেন তাহারই অন্বেষণে সে

অনাবিষ্কার হইতে বিরতির অবকাশ দুটিয়া বাহির হইয়াছে।

তাই মানুষমাত্রেই জীবনে প্রথম বিরহ আসে। অবশ্য প্রথমেই যে আসে তাহা নহে। কত কাল কাটিয়া যায়, কত অবস্থার পর অবস্থা অতিবাহিত হয়,—এক দিন হঠাৎ দিগন্ত-মণ্ডলে আবছায়ার পরাণে বৈরাগ্যের বাঁশরী বাজিয়া উঠে, চিরপরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের আবছায় প্রকাশ হইয়া দেখা দেয়, সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যেও চিরকালের পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। অমূল ঐশ্বর্যের উপকরণ তখন মুগ্ধচিত্ত মানব-হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় না। এই অবশ্য সুষমাপূর্ণ ধরণীর সাজল সোনা, আকাশের অমলীন নীলকান্তি, প্রেমিকের উচ্ছলতা, পরাণের সূর্যোদয়, বসন্তের পূর্ণিমা নিশীথ—সবগুলি তাহার হৃদয় অজানা জাগাইয়া বোলে, সকলেই তাহাকে গান শুনাইয়া যেন যে সে প্রিয়-বিরহিত। প্রকৃতির বিচিত্র সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্ত উদাস হইয়া উঠে। এই ভাবে তাহার বিরহ বোধ প্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু কিসের বিরহ তাহা সে বুঝিতে পারে না। ফলতঃ এই বিরহ-বেদনা সঙ্গীত হইতে সঙ্গীতরূপ আকার ধারণ করে, কিন্তু বিরহের বিষয় তখনও ধরা যেন না। 'অচিন পাখী' অচিনই থাকিয়া যায়—সহস্র পরিচয়ের মধ্যেও যে অপরিচয়ের অবশেষ একেবারে উদ্ভাসিত হয় না। তত রাত তত ভাবে তত রসের মাঝখানে বিরহের আবশ্যিক চমকের মতন জীব কখনো কখনো তার অবসরের দর্শন পায় বটে এবং বলিয়া যায়—

> মোরা নিশিদিন দূর পথিক
> মেরেই মোরা মেরেই পথিক
> ধরিবে পরাণ মেরেই মোরা
> ধরিতে।

কিন্তু মুহূর্ত পরেই সে বুঝিতে পারে যে অবসানে ধরা যায় না, ধরিবার চেষ্টা বৃথা—

> শুধু মনের মাঝে আর দূরে
> নিয়ে যি।

সকল বুঝিতে যাহার আবির্ভাব হয়, সকল ফেলিয়াই তাহার বিরোধাভাস ঘটে। জীব অবশ্য অন্তরালে আবার ফিরিয়ে বলিয়া যায়। এই ভাবে বড় বাথার মধ্য দিয়াই তাহার বিরহের বিকাশটি একে একে ফুটিয়ে থাকে।

এই যে বিচ্ছেদের কথা বলিলাম, ইহা যে শুধু জীবই অনুভব করে তাহা নহে। ভগবানের হৃদয়েও এই বিচ্ছেদের তাপ স্পর্শ করে। কেবল তাহাই নহে। তাঁহার বিচ্ছেদ আরও মর্মান্তিক। জীবের আদিম-সুপ্তির যখনি অস্ফুটভাবে কোরকাবস্থায় ছিল, যখনি তাহার ব্যক্তির স্পষ্টরূপে উদ্ভূত হয় নাই, তখনি সে ঐ বিচ্ছেদ অনুভব করে নাই, নানারূপের লীলার মধ্যে তাহার সে জীবন একরূপের অনাদিই কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগবানের হৃদয়ে ত আর সেরূপের অটৈতন্য নাই। তাই সেখানে আত্মরীতি যা জীবরূপে অনুবিদ্ধ হইবার পর হইতে সকলেই জীবের বিরহ সাধিয়া আছে। যাবিবের তত্ত্বদিন, যতদিন জীব তাঁহাকে পাইয়াছি বলিয়া বরিতে না পারিবে। জীবের প্রতি ভগবানের এই আন্তরিক আকর্ষণ যদি না থাকিত তাহা হইলে জীবের পক্ষে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য পথের পথিক সাজা প্রকৃতির একটি বিকট পরিহাস বলিয়াই পরিগণিত হইত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

> বলা হয়, একদা আদি আদ
> এই যে প্রেমের অন্ধ পাত্র ধরে।
> শুধু মধু, আর কিছু
> শুধু কেবল আমার এ কি?
>
> এর সমস্ত যে রেখেছ আজ লোভে।
> তবু ত রেখেছ এক ভরা আশা,
> আমার মধ্যে যাহা অসম্ভবের।
> সইতে না যে, সইতে না যে,
> টানছে আমায় হয়ে পাগল,
> একলা তুমি আছ একলা বসে।

জীব তখনও, সন্ধ্যার অধীর, আবছা-মুগ্ধ, আটপাশে আবছা, তাহার মেঘ অন্তরিক্ষ, যখন ভগবানের স্বরূপ সে আজ দেখিতে পায় না। সব সাজা। সে সব বৃথাকে

পড়া বিচিত্র, তাহার অধীনতা করিবার উপায় নাই। শুধু এই জীবকে দেখিবার জন্য, পাইবার জন্য, বশে আনিয়া রাখিবার জন্য ভগবানের হাতুড়ারা সীমা নাই।

> আমরা চোখে দেখা যায়, আমার মুখে আঁ,
> আমার মুখে তোমার পড়ে না,—
> তবুও তোমার কাছে আমি আছে তোমার ঋণ ;
> আমি আমার প্রভু,
> তবুও আমি তবু
> আমার তোমার আমি তোমার কাছেই কৃতজ্ঞ,
> এইজন্য এই সুখ এবং আমি নিজের।

এক কথায় বলিতে গেলে, যে দিন অব্যক্ত পর্ব হইতে এই আশ্চর্যতম জীবরূপে অবতরণ করিয়াছে সেই দিন হইতেই বিশ্বনাথ যেন তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে মহাশক্তির উপরে আসন ও বেতনের পদে চলিয়াছে, তাহার সকাশে প্রাণের উৎকর্ষ সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, সংক্ষেপতঃ, অমন অতল 'আমি'-রূপে সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব দিয়া নিজের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

> আমি এসেছি পৃথিবী তোমার দূত,
> আমি এসেছি, এ তোমার দূত,
> আমি এসেছি এ তোমার সাধনারই সাধনে,
> জীবন তবে দুঃখ-তোমার আনন্দ আজ।
> আমি এসেছি, আমি তুমি এসে
> আমার মুখ তোমে
> আমার পানে চেয়ে
> আমার পানে চেয়ে।

মানুষের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য অমন ঐশ্বর্যের অধীশ্বরকেও তাহার নিকট ভিখারী সাজিয়া হাত প্রসারণ করিতে হয়? মানুষের প্রকৃত গৌরব কোথায়? হীন হীন অস্তিত্বের এমন কি 'তত্ত্ব মন' আছে যাহার সন্ধান পাইয়া সমস্তই তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন? সত্য জীবে তাহা আছে কি? ইহার উত্তর এই—জগতের সকল জীবের মধ্যেই যদিও আদিম বৃত্তাবিক পরিবারে বর্তমান আছে, তথাপি তাহা বিশ্লেষণের বেগ অতিক্রম করিয়া পরিস্ফুটিত অবয়বে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় নাই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই উহা ব্যক্তিত্বরূপে বিকশিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। যে দিন মানুষের সেই স্বতন্ত্র যোগ্যতা প্রকটই বিকাশ প্রাপ্ত হয় সে দিন মানুষের বড় শুভ দিন। সেইদিন হইতেই তাহার নব জীবনের সূত্রপাত হয়।

এই যে ব্যক্তির ইহাকে ভগবানেরই দান। অন্য জীবকে তিনি ইহা দেন নাই। অবশ্য, তাহাদিগের অন্যে সকলকেই তিনি কিছু না কিছু দান করিয়াছেন। এক জনকে যাহা দিয়াছেন, অন্যকে তাহা দেন নাই। যাহাকে যাহা দিয়াছেন সে তাহাই লইয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। অন্যথা করে না, করিতে পারেও না। কিন্তু এ সেবাতে ভগবানের তৃপ্তি নাই। কারণ, ইহাতে স্বাতন্ত্র্য নাই, শুধু অন্ধ নিয়মের অনুবর্তিতা মাত্র আছে। একমাত্র মানুষই ভগবদ্দত্ত ব্যক্তিত্বের মহিমায় এই নিয়মের শৃঙ্খল কাটাইয়া উঠিতে পারে। তাহার ইহাই গৌরব যে সত্য সত্যই সে ভগবানকে এমন কিছু দান করিতে পারে যাহা তাহার নিতান্তই নিজস্ব, যাহা তাহার প্রাণপণ অপেক্ষা অধিক। যাহা পাওয়া যায় তাহাকে আপন করিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহাকে সমর্পণ করা—ইহাদেরই পাওয়ার সার্থকতা। অন্য কোন জীবের এই ভাবে 'মমত্ব' যাহা নিজস্ব করিবার ক্ষমতা নাই, তাই আর তাহারও নিজস্ব নাই। তাহারা যাহা পায় ঠিক ঠিক তাহাই ফিরাইয়া দেয়—তাহাকে বাড়াইতে কিংবা কমাইয়া বিশেষ কিছু দিতে পারে না।

পাখী গান গাইয়াছে, তাহাই সে ভগবানকে দান করে। অন্য পাখীর গলায় গান গায় নাই, সুর পাইয়াছে, কিন্তু সেই সুরকে জাগিয়া সে গান রচনা করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করে। যাহাকে স্বাধীনতা পাইয়াছে, সে স্বভাবতই তাহার মূল্য। মানুষকে সে স্বাধীনতা অর্জন করিয়া লইতে হয়।

তাহাকে তিনি পত্র লিখনে ব্রত করিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর লগ্ন দিয়া এই লিখন-ভার একটি একটি করিয়া সে তাহা করে ও অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে এমন দিন আসে যখন সে লিখনহীন বলিয়া বিবেচিত হয়,—মুক্ত হয়। তখন তাহার স্বাধীনভাবে দেয়া করিবার অধিকার জন্মে। এই স্বাধীন দেয়াই প্রেমের দেয়া—ইহাতেই মানুষের গৌরব ও ভগবানের তৃপ্তি। পৃথিবী হাসময়, সুখ স্বপ্নময়—তাই তাহার স্বভাব, সেই জন্য সে আনন্দময় স্বভাবতঃই বিরাজ করে। কিন্তু মানুষকে তিনি দুঃখ দিয়াছেন—কাঁদিতে কাঁদিতে মানুষ সেই দুঃখকে আনন্দে পরিণত করে ও বিলয়ের লগ্নে সেই আনন্দ ভগবানকে নিবেদন করিয়া জীবন সার্থক করে। এ সংসার স্বভাবতঃ সুখ-দুঃখময়—মানুষের এই কর্তব্য যে এই সংসারকে সে ভগবানের জন্য স্বর্গরূপে গঠন করে। তাহার হাত মুক্ত বটে, কিন্তু সে মুক্তভার অন্যস্থানে প্রত্যর্পণে ভগবান্ দায়িত্বমুক্ত। এই মুক্তত্বেতেই মানুষ স্বর্গসন্তার সমর্থ হয়!

বড় দুঃখের ভিতর দিয়া মানুষের বাক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। সে যাহা দুঃখন পায় তাহার ভিতরে নিজেকে বিশিষ্টরূপে গঠন করে। তখন সে স্বাধীন হয় ও স্বাধীন ভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসা দান করে। এই ভালবাসা অমূল্য—এই উপহার একমাত্র মানুষের কাছেই তিনি পাইতে পারেন। ইহার জন্যই তিনি কাঙাল। ইহাই মানুষের 'জীবন'। তিনি অতুল সম্পদের অধিকারী, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহার অনুগ্রহরাশি অনন্ত প্রাকৃতিক বিধান রূপে অপ্রতিহতভাবে বিরাজমান, যাহার নিয়ম মুহূর্তের এক একটি ক্ষণ হইতে সংখ্যাতীত চন্দ্র-সূর্যের উদয় হইয়া যাচ্ছে, যাঁহার কটাক্ষপাতে কত কত জগতের সৃষ্টিসংহার কাল-সমুদ্রে বুদ্বুদের উত্থান-পতনের ন্যায় অবাধ-গতিতে নিয়ত চলিতেছে, বিনিও আপন বক্ষ স্থিত দায়িত্বিহীন পরিবার কথিয়া ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম কক্ষের দ্বার মানুষের জন্য পর্যন্তমিনে অতিথি ভিখারী বেশে দাঁড়িয়া আছেন।

আমি এ ও আমার তোমার
আমি নাথ ও তোমা।
নিয়ে যাও যা আমার ধরে
তবে তবে তবে। (রবীন্দ্রনাথ)

আমি সকলের তুমি নাথ।
শুধু মোর আমার তুমি নও;
যেথি যত নিয়ে আছি আপনার মোহে,
নিয়তির হাতে মোরে
যেথি ক্ষুদ্র অংশ ক্ষুদ্র নও।
মোর ঘরে যত নও
মোহের আপন মোর ভরে মেলি নিয়ে তুমি নও; (অজ্ঞাত)

—ভগবান।

প্রবাসী-বঙ্গসন্তানগণের শিক্ষা-ব্যবস্থা

[এখানে প্রবাসী বিভিন্নদেশে অবস্থিত প্রবাসীর শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি 'আদর্শ-পরিকল্পনা' ও তার ছক দেওয়া হইত :—

উদ্দেশ্য :—(১) বিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তুর নির্দ্ধারণ।

(২) পাঠ্যবস্তুর জন্য পুস্তকাদি নির্দ্ধারণ।

উদ্দেশ্য বেলেঘাটা হৃষিকেশ ইন্সটিটিউশন (বেসরকারী), হাওড়ার শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য যে সকল বিদ্যালয় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের নিকট উহার উদ্দেশ্য ও ছাত্র-বিভাগ উল্লেখ করিলাম।"

একটি-বিদ্যালয়-পরিচালনের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা উহার উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী নির্ব্বাচনের নিয়মাবলীর কথা বিশদ করিয়াছেন। এ সমস্ত উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি না। কেবলমাত্র ছকটির নমুনা দিলে আমরা পাঠকদের কাজ অনেক সহজ করিয়া দিব।]

ভূমিকা

১। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের শিক্ষা-মূলতত্ত্বসমূহের মধ্যে এই যে বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা শিক্ষার্থিগণের শুধু পারীক্ষিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের অনুশীলনোপযোগী হইলেই চলিবে না। তদ্দ্বারা তাহারা যাহাতে নিজেদের প্রধান প্রয়োজনগুলি (primary needs) অর্থাৎ আহার, আচ্ছাদন এবং আবাস, এইগুলির আয়তন ও যথাযথ ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় তদ্বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করা উচিত। সোজা ভাষায়, প্রত্যেক বিদ্যার্থী যাহাতে ১৭।১৮ বৎসর বয়সেই প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জ্জন এবং তাহার উচিত ব্যবহার করিতে নিজে সক্ষম হয় তদ্ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

২। এই ব্যবস্থার ভার শুধু রাজশক্তির উপর ন্যস্ত করিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর অভাব বাঙ্গালীকেই দূর করিতে হইবে। রাজশক্তির নিকট সে কিছু সাহায্য যাহা আশা করিতে পারে।

৩। প্রবাসী বাঙ্গালী ইচ্ছা করিলে অনেকাংশে পরাধীন শিক্ষা ব্যবস্থার বাহিরে স্ব-পরিচালিত শিক্ষা-প্রণালী চালাইতে পারে। যদি একেবারে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া এবং পরানুমতিক্রমের অপেক্ষা না করিয়া চলিতে সে না চায় যা নিজেকে অক্ষম মনে করে তাহা হইলেও প্রচলিত সপ্তম শ্রেণীর পূর্ব্বে বালকগণকে বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিতে প্রেরণ করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

৪। বাঙ্গালী ধনকুবেরগণের বিশেষ অর্থ-সাহায্য (endowment) ভিন্ন প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বারা প্রবর্ত্তিত কোন প্রকারের স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বা সফলতা সম্ভব নহে।

৫। শুধু অর্থ হইলেই চলিবে না। উপযুক্ত শিক্ষক ও কর্ম্মী প্রস্তুত করিবার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।

৬। কোন স্বাধীন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে প্রবাসী বাঙ্গালীগণের সমস্ত মূলতত্ত্বগুলির মধ্যে যোগসূত্রপাত ও সকলের একমত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

৭। প্রত্যেক অবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির শিক্ষার ব্যবস্থা করা চাই :—

(ক) লেখাপড়া।

(খ) গৃহ বা পরিবার-সংক্রান্ত কার্য।

(গ) শিল্পকার্য (হাতের কাজ)।

(ঘ) ব্যায়াম।

(ঙ) সেবা।

৮। ৫।৬ বৎসর (শিশুকাল) বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম চারি বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে হইতে পারে। তাহার পর (প্রয়োজন হইলে) এক বৎসর বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া বালকগণকে স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে অনায়াসেই পাঠান যাইবে।

৯। কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় Technical কাজ আছে যেগুলির শিক্ষা বিশেষ ব্যবস্থা (ব্যাপকভাবে) বাংলা হাই-স্কুলগুলিতে থাকা উচিত। তাহারও একটা নক্সা দেওয়া হইল। (অষ্টম ও নবম বৎসরের) নক্সার অন্তর্গত (ঙ) দ্রষ্টব্য।

(প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য)

১০। শিক্ষার স্থান। একই সহরে একটি বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপনার কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক পাড়ার ২০।৩০টি ছাত্র লইয়া একটি বা দুইটি ঘর শিক্ষার কার্য্য চলিতে পারে। সহরের জন্য একটি কমিটি থাকিবে এবং প্রত্যেক পাড়ার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করা, তাহাদের কার্য্য নির্দ্ধারিত করা এবং পরিবর্ত্তন করা প্রভৃতি কার্য্য ঐ কমিটি করিবে।

এই ব্যবস্থায় সুবিধা—

(ক) একটি বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপনা করিবার ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে।

(খ) ছোট ছোট বালকগণকে অনেকদূর হাঁটিয়া যাইতে হইবে না।

(গ) হিসাব করিয়া ব্যবস্থা করিলে সকাল ও বৈকালে বিদ্যালয়গুলির কার্য্য হইবে এবং বিদ্যালয় ও গৃহ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সংরক্ষিত হইবে। আমরা সকাল ও বৈকালে বিদ্যালয় হইবার বিশেষ পক্ষপাতী।

(ঘ) অভিজ্ঞতাবলম্বন অনায়াসে বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(ঙ) বিদ্যালয়ই পরীক্ষাগার কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারিবে এবং বৃহৎশিক্ষক রাখিবার কোন প্রয়োজন হইবে না।

১১। শিক্ষার সময়—

সকালে ৩ ঘণ্টা— { গ্রীষ্মকালে ৮।০—১।০ / শীতকালে ৯—১।০

বৈকালে ৩ ঘণ্টা— { গ্রীষ্মকালে ৪—৭ / শীতকালে ৩।০—৬।০

১২। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা—বিদ্যালয়ে পুস্তক অথবা বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম বা নীতি শিখান যায় না। উহা কেবল অভ্যাসে বা দৃষ্টান্তের দ্বারা দেওয়া যায় এবং অভ্যাস না থাকিলে শিখিল হইয়া যায়। "সেবা" নামক বিষয়টীর উপযুক্ত শিক্ষা হইলে—অর্থাৎ শিক্ষক ও অভিজ্ঞাবলম্বন যদি বালকগণকে সঙ্গে লইয়া অনাথাশ্রমের কার্য্য, হাসপাতালে রোগীর পরিচর্য্যা, যুদ্ধে এবং পাড়ার রোগীর সেবা, রাস্তার পরিষ্কার অসহায় বৃদ্ধ ও দরিদ্রের সেবা, মেলা, দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর সময় স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্য, প্রভৃতি নিজেরা করেন এবং বালকগণকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা যথার্থ ভাবে হইবেই।

এই জন্যই "সেবা" নামক বিষয়টীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ব্যায়াম ও সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহা হইলে আমাদের এই শিক্ষা-প্রকল্পের প্রয়াস ব্যর্থ হইবেই।

শিক্ষা-ব্যবস্থার নক্সা।

প্রথম দুই বৎসর

১। ভাষা—বাংলা পুস্তক পাঠ ও লেখা। [বর্ণ-পরিচয় (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) ১ম ও ২য় ভাগ। হাসিখুসি—১ম ও ২য় ভাগ। পত্রমালা—১ম ভাগ]

২। ইতিহাস ও ভূগোল —বাঙ্গলা ও মুক্ত-প্রসঙ্গের (মৌখিক) প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাস। (পত্রমালে)।

৩। গণিত —বর্তমান তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পর্যন্ত। ধারাপাত।

৪। বস্তুপাঠ —ঋতুর লক্ষণ ও বনস্পতি পালন।

৫। চিত্রাঙ্কন ও মোটা কাগজের কাজ (Drawing and card-board work)

৬। দৌড়াদৌড়ি ও খেলা।

তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর।

১। ভাষা —(ক) বাংলা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

(খ) হিন্দী, পুস্তক পাঠ ও লেখা।

(গ) ইংরাজী, ঐ

[(ক) পত্রমালা ২য় ভাগ। পত্রপাঠ ২য় ভাগ (মুক্ত-যোগাস) ঈশানবোধ ভূত বিভীষণের, ঘরের-ছেলে। ইনীতিসোপান (পরশুরাম রায়)। সরল ভূবিদ্যা (যোগীন্দ্র) অবর।]

২। ইতিহাস —পত্রমালে ভারতের ও ইংরাজের ইতিহাস।

৩। ভূগোল —এসিয়া ও ইউরোপ।

৪। প্রকৃতি শিক্ষা ও স্থানীয় দ্রষ্টব্যগুলি দর্শন।

৫। গণিত —বর্তমান পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য পর্যন্ত। (শিক্ষকের পাটিগণিত ১ম ও ২য় ভাগ।)

৬। চিত্রাঙ্কন ও কাঠের কাজ (Drawing and Manual Training)

৭। ক্রীড়া ও ব্যায়াম।

৮। সেবা।

পঞ্চম বৎসর।

১। ভাষা —(ক) বাংলা, রচনা ও সাহিত্যালোচনা।

[ভারতপাঠ ১ম ভাগ (অক্ষয় সরকার)। পত্রপাঠ ৩য় ভাগ। ছেলেদের মহাভারত। শিশুবোধ ব্যাকরণ (কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন)। Childs' Easy grammar in Bengali by J. N. Banerjee]

(খ) হিন্দি, বর্তমান ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য।

(গ) ইংরাজী ঐ

২। গণিত —হিসাব ও জ্যামিতি। ঐ

৩। ইতিহাস ও ভূগোল — ঐ

[প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস (অক্ষয়কুমার মিত্র)। ভূ-পরিচয় (যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়)।]

৪। নিম্নলিখিত ৩টি হইতে একটি—

(ক) বিজ্ঞান। (জগদানন্দ রায়ের "প্রাকৃতিকী" হইতে বিষয় মৌখিক শিক্ষা দিবেন)।

(খ) চিত্রাঙ্কন।

(গ) কাষ্ঠের কাজ।

(ঘ) সংস্কৃত। (বর্তমান ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য)

৫। ক্রীড়া ও ব্যায়াম।

[রচিত সরল পরীক্ষা পালন (জীবেন বন্দ্যোপাধ্যায়)]

৬। সেবা।

ষষ্ঠ ও সপ্তম বৎসর।

১। প্রচলিত সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য।

২। ব্যায়াম ও ক্রীড়া [স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা (যোগেশ রায় ও পাং ইন্সপেক্টার)

৩। সেবা।

৪। বাংলা রচনা ও সাহিত্যালোচনা।

[কবিকাহিনী (S. N. Bhaumic)

সাহিত্যসন্দর্ভ (অক্ষয়কুমার রায়)

কথা ও কাহিনী (রবীন্দ্রনাথ)

ছেলেদের রামায়ণ।

শিক্ষাবোধ আবশ্যক।

বাংলার ইতিহাস (সতীশচন্দ্র মিত্র)

সংক্ষিপ্ত-ভূগোল (রবিদাসরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়) ১ম ভাগ।

৫। কারখানার কাজ।

বাইসিকিল মেরামত, ঘড়ি মেরামত, ছোরাছুরি মেরামত, ছবি বাঁধান, বই বাঁধান, জলের কল মেরামত প্রভৃতি প্রত্যেক বৃত্তিরই অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলির অন্ততঃ তিনটী কাজ প্রত্যেক বালককেই শিখিতে হইবে।

অষ্টম ও নবম বৎসর।

১। প্রবেশিকা হাইস্কুল পরীক্ষার পাঠ্য।

২। ব্যায়াম ও খেলা।

৩। বাংলা, সাহিত্য পরিচয়।

[আর্ট সাহিত্য সংগ্রহ (P. N. Sen)

মহাভারত।

স্বপ্নপ্রয়াণ ও নবকথা।

আর্য্যকীর্ত্তি (যজ্ঞেশ্বর গুপ্ত)

সাহিত্য প্রবেশ আমাদের (কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন)।

আটটী গল্প (রবীন্দ্রনাথ)

কবিতা (রবীন্দ্রনাথ)

উক্তিনি (মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি)]

৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির মধ্যে যেকোন একটী—

(ক) বাগানের কাজ ও কৃষি।

(খ) বয়ন ও সেলাই।

(গ) কাঠের ও বাসুর কাজ।

(ঘ) চরকা ও তাঁতের কাজ।

(ঙ) ছাপাখানার কাজ।

(চ) চিত্রাঙ্কন।

(ছ) Shorthand. Type-writing, Book-keeping and accountancy.

এই কাজগুলির ব্যবস্থা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে (ক) বালকগণের স্বাভাবিক উদ্ভাবনী বৃত্তিসমূহের পরিস্ফুটনের উপায় হইবে এবং (খ) ভবিষ্যৎ অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে। একেবারে সবগুলির আরম্ভ করা অসম্ভব হইবে না কিন্তু অন্ততঃ তিনটী আরম্ভেই প্রকাশিত হইতে পারে। (৪) সংখ্যক বিষয়টীর প্রতি যেন প্রথমেই দৃষ্টি না পড়ে, সেদিকে বিশেষ ব্যবস্থা হয় পরে করাই উচিত।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীমন্মথনাথ রায়।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নৈনীতালে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,—এলাহাবাদ

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যোগ নাথ একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক নৈনীতাল মিউনিসিপিলিটীর মেম্বর করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ডায়মণ্ড জুবিলী" উপলক্ষে উক্ত যোগ নাথের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে অন্যান্য বাঙ্গালী ও পাহাড়ী ভদ্রলোকদের সহানুভূতির ফলে ১৮৯৭-৯৮ সালে "ডায়মণ্ড জুবিলী হাই স্কুল" নামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার পরলোকগত পিতৃদেব অধ্যাপক পণ্ডিত অযোধ্যা নাথের মুখে শুনিয়াছি যে উক্ত যোগ নাথ তাহার বাঙ্গালী বন্ধুবর্গকে লইয়া নৈনীতালের পাহাড়ীগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া ছেলে সংগ্রহ করিতেন ও সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেন। যোগীজী ঐ বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং পরে ঐ স্কুলেই শিক্ষকতা করিয়াছেন।

প্রথমে শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়টীর প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নামক আর একজন বিশেষ

বিষয়ের আর্থ করিতেন। ঘোষ মহাশয় প্রথম Secretary বা কার্যাধ্যক্ষ হন এবং পরে বৈদ্যবাটীর প্রসিদ্ধ উকীল দেবকুলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ গাঙ্গুলি ঐ কার্য্য করিতে থাকেন। স্বাধীন ও স্বাধিক ভাব প্রচার করাই বাঙ্গালীর এই বিদ্যা-প্রচেষ্টা বৈদ্যবাটীতে কি পরিমাণে সাফল্য করিয়াছিল তাহা আজও বঙ্গীয়-জীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

১৩১০ সালে উক্ত বিদ্যালয়টি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পুরীত হয় এবং আজ উহা "গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, বৈদ্যবাটী" নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত স্কুলটীর ঘোষক শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় বা তাঁহার জীবনী নাম বা প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটের কোন কোন বাঙ্গালী কেরাণীর মুখে ও পত্রিত অধ্যাপক জোষীর নিকট এই বিবরণটি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলাম।

আমরা সম্মিলন হতে ঘোষ মহাশয়ের পুরিবারের কোন বিশ্বাবিদ্যালয়ের ভাইরেক্টর মহাশয়কে অনুরোধ করে তাহা হইলে বাঙ্গালীর একটী কীর্ত্তি রক্ষা পাইতে পারে।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

পঞ্চম অধিবেশন

দিল্লী

১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ—১৩৩৩

["প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী" পঞ্চম অধিবেশন প্রবাস অধিবেশন-সমাচার ... দিল্লী সহরে হইবে, আজ সেই ... এ প্রবাসে প্রবাসী বাঙ্গালী যাহারা আছেন ... এ সময়ে মূল সভার বিশেষ কিছু সময় সভার সময় হয় নাই ... সময়ের মধ্যে এই ... সময়ে ... সময়ে ... প্রবাসে সকল প্রবাসী বাঙ্গালী এই মিলন-মেলায় যোগদান করেন। এই যোগদানে ... সময়ে ... সময়ে ... প্রবাসী বাঙ্গালী একটী বড় মিলন-মেলা—প্রবাস ... সময়ে মিলন-মেলা ... সময়ে ... সময়ে ... নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন সভাপতি ... সময়ে ... সময়ে ... সময়ে

বৈষম্য

উপন্যাস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—তাজপুর

লোক-চক্ষুর অন্তরালে জমজমাট কোয়ার্টার্স-পুর এই অনাথা শিশুটী শুভদিন বিনয় বেয়ারাকে কিনা প্রলোভনে দাদুরূপে পরিচালিত হইয়া কি ভাবে যে বিজয়ার দুর্গম পথে পাঁচ-সাতে অগ্রসর হইয়েছিল, সে সংবাদ কেহ এখনও রাখিত না।

অকস্মাৎ একদিন ফেরেটের পৃষ্ঠায় স্বামীর অক্ষরে সর্বাগ্রে মঙ্গলাকে মাথির মার মূর্ত্তিত দেখিয়া অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কেহবা আনন্দিত হইয়াছিল, কেহবা বিরক্তিভরে বলিয়াছিল, সাংঘাতিক মার হয়েছে দুর্গা;—এইবারেই পতন।

সুখী যখন শুনিল যে মাসে ছাব্বি টাকা করিয়া মঙ্গলা বৃত্তি পাইবে—তখন তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া আনন্দ গলিয়া পড়িল। কি সুখের জমজমাট অবসানে সুপ্রভাতের মিষ্ট আলোক! পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া সে বার বার বলি করিয়া বলিল, বালিক, এই তো অনেক, আর কি বলবো, তুই মঙ্গলাকে বাঁচিয়ে রাখিস্। আর কিছুই চাইনা তোর কাছে, কেবল তাকে বাঁচিয়ে রাখ!

লছমন মাথা নাড়িয়া বলিল, তাই কি হয়রে সুখী? তবে সংসার পড়তে দিলে—পাঁচ গণ্ডা টাকা রোজগার করতে যে।

সুখী দুই চক্ষু তাহার করিয়া মঙ্গলার মুখের দিকে চাহিল, যেন প্রশ্ন করিতেছে, সত্যিরে মঙ্গলা, সত্যি?

মুটিয়ার মুক্তি-আদেশ এবং বেকারী পরিধান করিয়া কালো পায়ে এক-হাঁটু ধূলা মাখিয়া যে দিন মঙ্গলারাণি সংসারের স্কুলে চরী হইতে আসিল—সেদিন ছেলেদের মধ্যে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। তবে লছমনও আসিয়াছিল।

পরিচালকের লালমোহন বিদ্যাবিনোদ। টিফিনের ঘণ্টা দুই ঘণ্টা বেলা বাড়ার সময়ে স্কুলে আসিতেন। লাইব্রেরি ঘরের টেবিলের উপর চক্ষু-পত্র রাখিয়া তখন তিনি ঊর্দ্ধ-মুখ-নয় ছিলেন।

আদালতের পাশে কোয়ার্টার্স বিষ্ণুর বাস, একখানা মোটা কিতাবে টাকের পালকের কলমটী সজোরে ঘোরাতের মধ্যে ডুবাইয়া ডুবাইয়া মস্তকে অতের গতিতে লিখিয়া চলিয়াছেন! অক্ষরের ঠ্যাঙ ঠ্যাঙ পরে এবং বিভীষণ মসীর লেপ-কলঙ্কে সেই খানটী যেন যা লছমনীর বাবরিকাবার আকার ধারণ করিয়া আছে!

বিষ্ণুর ছাত্রটী সেকেণ্ডের আঙ্ক ইয়াকিবে কলা টিপিয়া রাখিতে হইয়াছিল, কারণ মাসের প্রথম দিনে হেডমাষ্টার আসিবার পূর্ব্বেই কতো কাজ শেষ না করিতে পারিলে একাজ বিপদ। তাই বেচারী মোটেই ছবিধার নহে।

লছমন এবং মঙ্গলাকে সঙ্গে করিয়া মাষ্টারখানে আসিয়া সেলাম দিল। চশমার উপর দিয়া প্রখর দৃষ্টিতে দুইজনের চেহারা নিরীক্ষণ করিয়া কোয়ার্টার্স বলিলেন, আর্টি নেহি, আর্টি নেহি, ওয়াক্ত নেহি হ্যায়।

লছমনের এটী একটী সুপরিচিত কথা। হায়! মাহারের ভাগ্য-দোষে দুনিয়ায় কাহারো সময় নাই। প্রতিকার স্বরূপ সে মরে ঘর বসন করিয়া বলিল, হুজুর এটী আমার বেটী, মঙ্গলারাণ মা—

বিষ্ণুর এবারি একটা মাষ্টারী চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে পণ্ডিত মহাশয়—একেবারে সোজা হইয়া

বলিলেন। কাঠামুখের অক্ষরগুলি চক্ষু মেলিয়া দাঁওয়াল দেখিয়া আবদ্ধ হইয়া বলিলেন, বিয়ে বিয়ন্তর, আর বাজার চৌকি দেবার জন্যে এদের রাখছ বুঝি!

লছমন পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া পূর্ববৎ জোরগলায় বলিল, এদে আমার বেটীটাকে ভাঁটি বলছো.....

পরিচারী বিস্ময়ের সহিত পণ্ডিত বলিলেন, তা তো বলেই থাকবে, এই তো বয় বিয়ে—তা ইহাকে তোমার ধারে তোমরা পাবে?

কর্তা একটু চুপিয়া বলিলেন, এ-বেটারা ভীষণ-রকম ভুতে. ঘরে-বাহিরে বেড়িয়ে, মাংসের কল-মূল খেয়ে—ছিল এত বড় ভালই—হঁ:, দেখছি এদেরো ব্যারামে ধরেছে।

উচ্চ কণ্ঠে লছমনকে লক্ষ্য করিয়া মাথা উপর নীচে নাড়িয়া বলিলেন, লেখা পড়া ক'রে হবে কি, আমা?

অত্যন্ত বিনয় সহকারে লছমন বলিল, আজ্ঞে, আপনারা যা করেন.....

চমৎকার!

পরাধীন জাতির মূল-মন্ত্রটি উচ্চারিত হইবামাত্র লছমনের ক্ষুদ্রত্ব উদারে যেন নাচিয়া উঠিল, এক-গাল হাসি দেখা দিল।.....সেও মাথা নাড়িয়া সোৎসাহে সায় দিল, হা হুজুর, বটেতো!

তখন লালমোহন বিয়ন্তর কেয়ারির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, মুকুন্দ বিদা বিয়ন্তর, সেই যে একটা কথা আছে:—

"যব ছিল বাচ্চাকুল নবাই চ'ল কীর্তনে।
তামক ছাড়িয়ে সব গড়ায় কড়ুয়ালে।..."

দেখছি লড়িয়া হয়ে চ'ললো! একেবারে ঘোর কলি! হেন অবাধ্যতা শেষ পর্যন্ত কি—অবাধে অত্যাচারের কাছ করছে! সর্বনাশ, অসহযোগ কিং ভবিষ্যতি!

বিস্ময়ের ঘোর এই অপূর্ব বাণিজ্য শুনিয়া যখন অবাক্ হইয়া গেল। লছমন পত্র হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইতে গেলে পণ্ডিত তাহার পায়ের জোরের তলে টানিয়া লইতে লইতে বলিলেন, আরে করিস্ কি! মুখে এখনো দুধ-গন্ধ আছে—দুঁধুনে আমাকে.....তাদা বলায় বলিলেন, বেটারা হাতে যাই যেন না। লছমন নিরুপায় হইয়া তাহার ধুলা হইতে পদধূলি সংগ্রহ করিল;

যখন শিস্তার কাপড় ধরিয়া সিহন হইতে টানিল।

লালমোহনকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাবিনোদ বলিলেন, যা ওদের তরকারি বাইরে দিয়ে যা—হেরম্বাইর এসে আনিস্।.....তাহারা বাহিরে চলিয়া গেলে বলিলেন, হেরম্বাইরের দু'চোখে ধারা বইবে...এদের বেলায়—বুঝেছ বিয়ন্তর! বিয়ন্তর কিছু না বুঝিয়া বলিল, হুঁ।

বাহিরে আসিয়া লালমোহন লছমনের কাছে তার আনা পয়সা আনার কথা বলিল, তার নাই—বড় মাইর আসিলে তাহার দুপাসিল তাহাদের কাছ বিক্রয়ে উধার হইবে।

ঘড়িতে ঘণ্টার উপর ঘণ্টা বাজিয়াই চলে-মাইর আসিলেন।

তখনকার দিনের সাধুদের মত চুল রাখিতেন না; মাথার উপর লম্বা চুল উল্টাইয়া পিছনে দিকে ফেলা। চুল ঘাঁটাইতেন; কিন্তু চেহারা বিরোধী ছিলেন। পিছনের কেশরের মত তাহা আপনি দুইভাগে ভাগ হইয়া পড়িত। তাঁহার চক্ষুদুটী ছিল ঘোর-ঘোরাল, তাহার উপর নিবিড় ঘন এক জোড়া ভ্রু। নাকের গঠনে কোন খুঁতরা নাই। নীচের ঠোঁট, গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা।

চোখে দেখিয়া তাঁহাকে প্রতি ভক্তি ফুরে যায়, ভয়ানক ভয়াকুল হইত!

ঘরে পদার্পণ করিতেই মাইরমান ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। এই ঘণ্টা পড়ার পর আর কাহারো বাহিরে নির্দিবাদে থাকিবার উপায় ছিল না। যে যেখানে থাকে বাহিরে যাওয়া চাইত—কাহার ও' লাইবার অবধি থাকিত না, সমস্ত ক্ষণ শিক্ষকের বৈকিন্তের ভূর্তাগের একশেষ হইত।

ঘোরাদি-জাতি ঘুরার গুরু-গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে ভবনমোহন ঘরের চতুর্দিক পরিদর্শন করিয়া

আসিয়া বিশ্বম্ভর কেরানিকে হাত দিলেন। সেই হাতে—নবদ্বীপধামে গাঁয়ের ঘরে বিশ্বম্ভরের সর্প-পরীক্ষা ইত্-ইত্ করিয়া কাঁপিতে থাকিল।

সে দিন এই নিয়মিত কাজ শেষ হইতেই ভগবতীচরণ লছমনকে হাজির করিল।

ভগবতীচরণ লছমনকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বসিতে আজ্ঞা করিলেন। লছমন জীবনে এই ব্যবহার কখন পায় নাই। সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, হুজুর, মাপ করেন, আমি এ কাম কখনো বেটে নিয়েও, করতে পারবো না।

ভগবতীচরণ মৃদু হাস্য করিলেন: মানুষের সহজ অধিকার, যে সাধি জন্মের সঙ্গেই লাভ করা যায়, সেই সহজ সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইতে তাহার যেটুকু পর্যন্ত কোমল অবশিষ্ট হইয়া যায়—এই কথা ভাবিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন!

তিনি লছমনকে দেখাইয়া বলিলেন,—লছমনজী আছি? এ তোমার বেটা আছে?

লছমন জানিল, বড়া-বাবুর মৈথিলিকিশলয়। তিনি সর্পজ্ঞ; কিছুই তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় না। এই সময় নিশ্চই যখন পাঠ-প্রণে করিয়া ভবিষ্যতে যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া সে আনমনে অঙ্ক বিলম্বন করিতে লাগিল।

পিতার সহিত কথা বলা বৃথা বুঝিয়া ভগবতীচরণ ডাকিলেন,—লছমনজী, এদিকে এসো।

লছমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে জোড়করে একটী আকৃতিহীন মূক নমস্কার করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মুখে ভয়ের একটী রেখাও নাই!

তুমি ইংরিজি আছে প'ড়েছ?

পরিষ্কার বাংলায় যখন উত্তর দিল, পরীক্ষার পর অঙ্ক ছিলে, মানের ঘরে বড় বাবুদের আগে পর্যন্ত প'ড়েছি!

বিষে নিয়ে?

লছমন মাথা নীচু করিল।

ভগবতীচরণ বলিলেন, তবেতো তুমি মাহে পাঁচ শত রুপেয়া পাবে? তোমাকে এত বড় চাকরি প্রয়োজন নিয়েই হবে? পারবে?

সে কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শিক্ষকের মুখের উপর হইতে দৃঢ় স্থির দৃষ্টিখানি ধীরে ধীরে নামাইয়া পদ-সেবার মাটিতে রাখিল। সে যেন নীচুস্বরে বলিল, আপনাদের আশ্রয়ে আমার কোন-কিছুরই অভাব হবে না। আমার বিদ্যে বিদ্যালয়ের ছেলে যেন বাঘ-ভৈরো নিয়ে খেলে থাকে, এই আশীর্বাদ করুন।

প্রসন্নতায় ভগবতীচরণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার মন যেন দুই হাত দিয়া এই বালকটীকে স্নেহ-লিঙ্গনে বাঁধিতে লাগিল।

কোথায় থাকবে তুমি?

তাদের কিছু ঠিক হয় নি?

বাড়ী কত দূরে?

এখান থেকে আড়াই ক্রোশ হবিবে।

সেখান থেকে রোজ আসতে পারবে?

লছমন এইবার কথা কহিল, উহাতে মোকের বড় লাই।

ভগবতীচরণ হাসিলেন; আচ্ছা তবার আগে পর্যন্ত এই চলুক—পরে একটা কিছু ব্যবস্থা হ'তে পারবে।

লছমনজী মাথি উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিল।

ক্রমশঃ

বৃহত্তর ভারত-পরিষৎ—

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ তার ধর্ম আর সংস্কৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। এই থেকেই উপনিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে ভারত প্রবে বিস্তারলাভের দুটি পথ ছিল। সপ্তম শতকে ভারতের দুটি ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম অধিকাংশ আর বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান আর হিন্দু ধর্মের দুটি সম্প্রদায় বিভিন্ন রূপে পূর্ব প্রবে। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজার পূর্বে সম্রাট অশোক ভারতবর্ষে একটি সাম্রাজ্য স্থাপনার সংকল্প করেছিলেন। অশোকের সাম্রাজ্য কালের পরিবর্তে লয় প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাঁর চেষ্টায় যে সব রাজ্য ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তারা তাদের কাছ থেকে প্রেরণা অথবা প্রাণ লাভ করেছে। তাঁর সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার পশ্চিমে গ্রীস্ ও পূর্বদিকে চীন জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ভারতবাসী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের এই কাহিনী আজ বিস্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। ভারতবাসীরা এতদিন পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের এই গৌরবের অধ্যায়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এ বিষয়ে যা কিছু অনুসন্ধান, আলোচনা, যা কোতূহল তারা আবিষ্কৃত হয়েছে সমস্তই ফরাসী, ওলন্দাজ ও ডচ্ পণ্ডিতদের অধ্যবসায়ের ফলে। ভারতের এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য অধুনাতন এদেশীয় অধ্যাপক ও পণ্ডিতের উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় "বৃহত্তর ভারত-পরিষদের" উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন ও French Indo China, Dutch East Indies প্রভৃতি স্থানে ভারতবর্ষের সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখে এসেছেন।

পরিষৎ Seriodia (Central Asia) (2) India Minor (Afganistan etc.,) (3) Indo China or Burma Siam, Laos, Cambodia, Champa, (4) Insulindia or Sumatra, Java, Bali, Madura and the islands of the Malay Archipelago (5) China Korea, Japan (6) Iranian Western Asia, প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সাধনার বিস্তারের ইতিহাস সঙ্কলন ও প্রকাশিত করবেন। তাদের এই উদ্যম সফল হোক্, এই আমাদের কামনা।

জাপানে শিংহই পরিবার—

জাপানের সিংহইদের অনেক সময় এশিয়ার Realm childs বলা হয়। ব্যবসা, শিল্প ও আন্তর্জাতিক ব্যাপার থেকে তাঁরা অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

ব্যবসার নানা ক্ষেত্রে তাঁদের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। কেবলমাত্র মিৎসুই পরিবারভুক্ত লোকদের দ্বারাই এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে।

সম্প্রতি চৌত্রিশ সালে তাঁদের ব্যাঙ্কি বিভাগের একটি বৃহৎ বিভাগ বিশ্বে স্থাপিত হয়েছে। কেবলমাত্র একটি কোম্পানীর এত বড় আফিসগৃহ জগতে আর কোন স্থানেই নেই। এটি নির্মাণ করতে তাঁদের প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হয়।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে মিৎসুই পরিবারের দ্বারাদেশেই জাপান ও আমেরিকায় বাণিজ্য-দপ্তর স্থাপিত হয়। যখনতাঁর পেরি বোম্বে জাপানে প্রবেশ করেন, তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মিৎসুই পরিবারের উৎসাহে জাপানে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে আমেরিকার বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

বহুদিন থেকে New York নগরে Mitsui and Co. Limited আফিস আছে। তাঁদের New York এর পণ্য দ্রব্য বিভাগের ম্যানেজার, চাকরী শিল্প ও অন্যান্য বিভিন্ন বণিক বিক্রী হয়। New York নগরে Mitsui Bank-এরও একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে।

পূর্ব এশিয়ায় ও জাপানে তাঁদের বহুলার খনি আছে। তাঁদের নিজেদের খনির কয়লা থেকে তাঁদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির বহু শক্তি উৎপন্ন হয় ও তাঁদের লৌহকারখানাগুলি পরিচালিত হয়। জাপানে তাঁদের একটি বৃহৎ Steel Works আছে। এই Worksটিতে অনেক আমেরিকান টাকা খাটছে, কিন্তু পরিচালনার ভার মিৎসুই কোম্পানীর হাতেই আছে। জাপানে মিৎসুই কোম্পানী কাপড়ের ব্যবসায়েও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। অনেকগুলি কাপড়ের মিল তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বড় বন্দরগুলিতে মিৎসুই কোম্পানীর জাহাজ মাল আর যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে মিৎসুই কোম্পানীর ব্যাঙ্কিং বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। জগতের বড় বড় নগরগুলিতে তাঁদের ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত রয়েছে।

মিৎসুই কোম্পানীর শাখা আফিস জগতের সমস্ত বড় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেক দেশে এঁরা যা ব্যবসার আমদানি ও অন্যান্য দেশের অনেকগুলি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে মিৎসুই কোম্পানীর যোগ আছে। এই সব কোম্পানীর ডিরেক্টারের বোর্ডে মিৎসুই কোম্পানীর প্রতিনিধি আছেন।

বর্তমান সময়ে Baron Mitsui মিৎসুই পরিবার ও এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি। প্রায় ৩০ বছর পূর্বে আমেরিকার ব্যবসাবাণিজ্যের হাতে-কলমে কাজ করে তিনি আমেরিকার বাণিজ্য-নীতি শিক্ষা করেন। Mitsui পরিবারের অনেকেই আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে ও আমেরিকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষালাভ করেছেন।

Baron Mitsui মিৎসুই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান ব্যক্তি হলেও প্রকৃতপক্ষে Dr. Tokuma Dan-এর কৃতিত্বের ফলেই মিৎসুই কোম্পানীর এত বড় সমৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমান সময়ে তিনিই Mitsui Gomei kaisha'র Managing Director, Dr Dan ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও মাত্র বছরেই Boston Institute of Technologyতে Minning Engineering শিক্ষা করবার জন্য গমন করেন। এখান থেকে তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন।

দেশে ফিরে এসে তিনি Government Meteorological Observatory ও পরে Mike Coal Mine এ Technical Officer নিযুক্ত হন। Mike Coal Company. পরিচালনার ভার মিৎসুই কোম্পানীর হাতে এলে তিনি মিৎসুই কোম্পানীতে যোগদান করেন। মিৎসুই গোষ্ঠী বর্তমান সময়ে একাধিক পরিবারে বিভক্ত। প্রত্যেক বোর্ডের মিটিংএ একটি করে ভোট দেবার অধিকার আছে। জাপানে অন্যান্য দেশে মিৎসুই কোম্পানীর শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার একটি Board of Directorsএর উপর অর্পিত আছে।

বিভিন্নদেশের মিৎসুই প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনেক সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত আছে। এদের সংখ্যা আশি হাজারের

কম হবে না। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই আশিস বিভাগে কাজ করে। অবশিষ্ট দুই তৃতীয় বিদেশী কোম্পানীর তৈরার কাজ করে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও দিনমজুরদিগের কাজ করে। বিদেশী কোম্পানীর বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় কর্মচারী সংখ্যায় বেশী। স্থানীয় লোকের দ্বারা কাজের সুবিধা হয় বলে কোম্পানীরা এই সব বিদেশী কর্মী নিযুক্ত করতে চাহেন।

(Mysore Economic Journal)

অভিনব প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—

ওয়েলস অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ কিছুই হয় নি। দুঃখের বিষয়, আজ কাল আমাদের দেশে এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে ও শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টাও আরম্ভ করা হয়েছে। শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত পুরাতন ধারাই চলে আসছে। ইটালিতে ও আমেরিকায় কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নিত্য নোতুন নূতন পরীক্ষা করা হচ্ছে। ইটালিতে একজন মহিলা একটি নোতুন উপায়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

১৯১১ খৃঃ অব্দে মিলানে La Scuola Elementare Rennovata Secondo il metodo Superimentale o London's Coudecell Community দুটি প্রাথমিক শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হয়। প্রথমটি ইটালিয়ান গবর্মেণ্টের ও Milan-এর Municipality'র সাহায্যে স্থাপিত হয়েছে। London-এর Coudecell Community কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে স্থাপিত হয়। দুটি স্কুলেরই অধ্যক্ষেরা অল্প শিক্ষার প্রচুর উৎসাহ আমাদের জীবন-যাত্রার উপযোগী ক'রে তোলা। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁরা অভিনব উপায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন।

La Signora Giuseppina Pizzigoni ইটালিয়ান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনা করেছেন। ইটালিয়ান গবর্মেণ্ট তাঁকে নিজের উদ্ভাবিত প্রণালীতে শিক্ষাদানের অনুমতি দিয়েছেন ও আর্থিক সাহায্যও করেছেন। Milan নগরের উপকণ্ঠে বিস্তৃত মাঠের মধ্যে স্কুলটি স্থাপিত হয়েছে। স্কুলের সহিত সংযুক্ত একটি কৃষিক্ষেত্র আছে। সকাল ৯-টায় স্কুল বসে, বিকেল ৫-টায় ছুটী হয়। মাঝখানে ১-টা থেকে ২৷৩০-টা পর্যন্ত স্কুল বন্ধ। ছেলে-মেয়েরা বিকেলের দিকেই স্কুলের সমস্ত কাজ করে। দুপুরবেলা আহারের পর ছেলে-মেয়েরা বিশ্রাম করে বা খোলা-মাঠে খেলা করে। বিকেলের দিকে সঙ্গীত, ব্যায়াম, ধূলিকর্ম ও বাগানের কাজে অতিবাহিত হয়। আমাদের দেশে ছেলেদের নিজেদের সাহায্যে কিছু শিক্ষা করবার সুবিধা দেওয়া হয় না। শিক্ষকের সাহায্যে তাদের সব বিষয় জানতে হয়। শ্রীমতী Pizzigoni স্থাপিত স্কুলে ছেলেদের নিজেদের উদ্যোগেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করতে হয়। ছেলেরা বাগানের শাক-সব্জী ও ফল বিক্রয় করে ও তার হিসাব রাখে। মাঝে মাঝে তাদের অঙ্ক শিক্ষা করতে হয় ও তারা অঙ্ক শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝতে পারে। এইভাবে এক একটি কাজের সাহায্যে তাদের এক একটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিহাস শিক্ষার জন্য তাদের নগরের আশেপাশে ঐতিহাসিক-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভূগোল শিক্ষার জন্য তাদের মত ইত্যাদি কৃষিক্ষেত্রে দেখা। এই জন্য শ্রীমতী Pizzigoni তাঁর স্কুলে প্রথম থেকেই কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। স্কুলের সম্মুখে আধ বিঘেটাক জমিতে ছেলেরা কৃষি-বিদ্যা শেখে। ইটালির সর্বপ্রথম এই স্কুলটিতেই কৃষি-বিদ্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুলে একটি বন্য-বিড়ালও আছে। এই বিড়ালের স্বভাব, orchestra, বৃদ্ধি ও অভিনয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

মফস্বলে ছ-মাস ছাত্রদের শিক্ষাদানের একটি Festa di Lavaro'তে বিধান করা হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই বিভিন্ন ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা ও আহারের ব্যবস্থা করে। এইভাবে স্কুলটিতে একটি Communal atmosphere তৈরী করা হয়।

১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত ইটালিয়ান গবর্মেণ্টের মতে সকল ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া ও তাঁরা স্কুলটির উন্নতির জন্য যথেষ্ট অধিক অর্থ সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রথমবারের ৭টি ছেলে নিয়ে Coldorell community তাদের স্কুলটি আরম্ভ করেন। গবর্মেণ্টের কাছ থেকে এ পর্যন্ত তাঁরা কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নি। প্রথমে তাঁরা Boston Road-এর পার্শ্বে Bloomsbury'তে তাঁদের স্কুলটি স্থাপিত করেন, কিন্তু কিছুদিন পরে স্কুলটি এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন স্কুলটির ছাত্র-সংখ্যা মোট ৬০ জন। ছোট ছেলেদের শ্রীমতী Montessory ও বড় ছেলেদের Dalton প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইটালিয়ান স্কুলটির মত এখানেও ছেলেদের নিজেদের হাতেই সমস্ত কাজ করতে হয়।

(The Journal of Education).

শ্রীবাসবীকান্ত মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক

বিশ্বভারতীয় পাশ্চাত্য অধ্যাপক ও সুহৃদ্‌মণ্ডলী

চিত্রশিল্পী :—শ্রীঅমিতকুমার হালদার—লণ্ডন

পরিচয়-লিপি :—শ্রীকালিদাস নাগ—কলিকাতা

সিলভাঁ লেভোঁ

ইনি ফরাসী-ভাষী সুইস্‌; জেনিভার বিখ্যাত অধিবেশন ও ইউরোপের নানা স্থানে—সমবায়ভিত্তিতলে পল্লীর শিক্ষকতা করিয়াছেন। ইনি ফরাসীতে কবিতাদি লিখিয়া থাকেন এবং বিশ্বভারতীর ফরাসী অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে বাস করেন।

ডাক্তার মরিৎস্‌ ভিন্টারনিট্‌স্‌ (Dr. Winternitz)

ভারতের প্রাচ্যবিদ্‌গণের অন্যতম; ইনি Max Muller-এর Sacred Books of the East Series-এর বিষয়ী (Index) প্রস্তুত করেন এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া প্রভূত যশ অর্জন করেন। ১৯২২-এর শেষে ইনি বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় পরিষদ অধিবেশনে শান্তিনিকেতনে আসিয়া অধ্যাপনা করেন। ইহাঁর পত্নিও ভারতবাসীর প্রতি অমায়িক প্রীতি সকলের চেয়ে অধিক চোখে পড়িয়া গিয়াছে। ইনি ঔপনিক প্রাগের (Prague) আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন।

উদয়—

মিঃ এল্‌মহার্ষ্ট (Mr. Elumhirst)

বিখ্যাতনামা শ্রীনিকেতন কৃষি-বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পরিচালকরূপে ১৯২১—২৪ সাল পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা শ্রীনিকেতনের কৃষি-বিভাগে নবযুগের সূত্রপাত হয়। অসাধারণ বিদ্যা ও পরিশ্রমে তিনি শ্রীনিকেতনের ভিত্তি পত্তন করিয়া যান। অতঃপর তিনি পশ্চিম ইংলণ্ডে ডেভন নামক (Devon) আর একটি কৃষি-প্রতিষ্ঠান গড়িতেছেন।

মিসেস্ আর উল্লা (Mrs. R. Ullah).

ইনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষার অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

উদয়া—

মিস্ (জেলা) ক্রাম্‌রিশ্‌ (Stella Kramrisch)

একজন বিদুষী ইহুদী মহিলা। শান্তিনিকেতনে কিছুকাল শিল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উপস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলা-বিভাগে' অধ্যাপনা করিতেছেন। ভারতীয় শিল্প-সম্বন্ধে ইনি অনেক প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন।

আঁদ্রে কার্পেলেস্ (Andrée Karpelès)

প্যারিসবাসিনী ইহাঁর মহিলা। ইনি চিত্রকলার আধুনিক বিকাশ-সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন কলাভবনে আলোচনাদি করেন। ভারতীয় শিল্পে ইহার গভীর অনুরাগ। ইনি প্যারিসে থাকেন।

উদয়া,

কবি দেবেন্দ্রনাথ

শ্রীযোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার—কলিকাতা

দেবেন্দ্রনাথ যে মূলের কবি সে মূল এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যিক বিচারপদ্ধতি ও রুচির এমনই পরিবর্তন হইয়াছে, যে দৃষ্টিতে এককালে অতীতকালে আমাদের কবিগণ-সমাজে যে কবি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা সাহিত্যিক-মণ্ডলীর মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি তাঁহার কবিপ্রতিভার সম্বন্ধে যা তা কিছু পরিচয় রাখেন,—ইহা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জানি। তাঁহার প্রথম ও প্রধান কাব্য, যাঁহার কাব্য-গুলি যেমন মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। পুরাতন 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকার পৃষ্ঠা-গুলির অন্তরাল সে কবি ধূলিলিপ্ত হইয়া আছে; এবং শেষ বয়সে তাঁহার যে সকল কবিতা সাময়িক মাসিক পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইত, সে গুলিতে তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ দীপ্তির পরিচয় মিলে না। দ্বিতীয় কারণ, আমার ইহাই মনে হয় যে, যে মূলসত্যকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমাজ, তথা সাহিত্যের আদর্শ নির্মিত হইয়াছে, এমূল প্রকৃত সাহিত্যরস আস্বাদনের প্রবৃত্তি ও সুযোগ কমই আছে। আজকালকার অধিকাংশ কবিতা—যাহা সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গ হইতে তাহাদেরই যা কবিত্বটুকু মৌলিকতা না থাকাই ভাল, কারণ তাহাতে সাহিত্য-রস ও বসন্তবাবের প্রয়োজন নয়; পাঠক চায়—অতি সাধারণ হাস-বিলাসের আস্বাদনের এবং তাহার সুখে দার্শনিকী অথবা দুঃখ-চীৎকার। এ অবস্থায় আধুনিক পাঠক সমাজে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যসুষমার মূল্যনিরূপণ যোগ্য করিবার প্রয়াস যে কতখানি দুর্বুদ্ধির কাজ তাহা জানি, তথাপি এ দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মত একজন অকৃতী লেখককে দেবেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার ওকালতি করিতে হয়, এ কথা জানিয়া আমি বেদনাবোধ করিতেছি—আমি যাহা আমাইয়া জ্যোতিষ্কশ্রীতি দেখাইতে চাই! অতএব এ প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যরসনার যেটুকু যোগদান তিনার অবশ্যকারী তাহাই আমার মূল্য বলে। মনে রাখিতে হইবে, আধুনিক পাঠক-সমাজে যাঁহারা প্রকৃত কাব্যরস-পিপাসু তাঁহাদের মনে এখনও বিস্মৃত-প্রায় কবির নূতন করিয়া পরিচয় লাভন করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। এ জন্য এই প্রবন্ধে কবির পরিচয়-

কবি দেবেন্দ্রনাথ (যৌবনে)

বিষয়ে অনেক কবিতা উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইবে—আমরা করি, সেই নিদর্শনগুলির সাহায্যেই পাঠক বাঙালী-চরিত্রে কবির পরিচয় গ্রহণ করিবেন, আমার মন্তব্যগুলি এই কবিতাগুলির রসে যাহা মনে করিবেই আমি চরিতার্থ হইব।

কবিবর বিহারীলালের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাংলাকাব্যে যে নূতন সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় তাহাতে সমস্ত ইংরেজীশিক্ষিত কবি-প্রকৃতি বহির্মুখী ও ঘটনাচক্রের অনুকূল, অন্যটির বন্ধন মূলতঃ অন্তর্মুখী, আত্মনিষ্ঠ ও দীর্ঘসূত্রক। বাঙালীর কাব্য চিরদিন দীর্ঘিকায়—বিশুদ্ধ ইংরেজী ও তথা য়ুরোপীয় আদর্শের অনুপ্রাণনায় এবং অধিকন্তু শিক্ষা ও সাধনার সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যেই বাঙালীর ভাবসাধনায় যে বিপ্লব বাধিল, তাহার প্রভাবে জীবন ও জগৎকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রেরণা বাঙালী কবিকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, তাহারই ফলে বাংলা কাব্যে এক নূতন সাধনার সূচনা হইয়াছিল। এই সাধনক্ষেত্রে প্রথম বিহারীলাল এবং দ্বিতীয় সাধক রবীন্দ্রনাথ। আর যে দুইজন কবি রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্তী ও সহযোগী, তাঁহাদের একজন দেবেন্দ্রনাথ এবং অপর জন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু বাকীরা কাব্যরসিক তাঁহারা স্বীকার করিবেন, বড়াল-কবির শক্তি অধিক ছিল না, কিন্তু সাধনা ছিল; এই সাধনার ফলে তিনি কিছু রাখিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মনে হয়, তিনি অধিকার মৌলিক ও বিশুদ্ধ কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলির অনেক এমন একটি প্রবল ও স্বাভাবিক রসবাতুর্যের উল্লাস আছে—এমন ঔজ্জ্বল্যময় মাধুর্যরস আছে, যে বোধ হয় তাহা যেন সাধনাসাধ্য—তাহা যেন অন্তরিন্দ্রিয় প্রাণেরই রস সঞ্চার করে। আমার মনে হয়—দেবেন্দ্রনাথের এই কবিত্বের মূল হইতেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' বলিয়া খুব অল্পকাল উপরার করিয়াছিলেন। এ মূলের সন্ধান তাঁহারা যে ভাবরিয়ন ও সমাজ বাকি-ধারণা সাধনার পরিচয় পাই, দেবেন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে তাহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি নাই। তাঁহার প্রতিভা আত্ম-মুখ। তিনি আপন হৃদয়ের ঘরোয়া ভাব-নির্ঝরিণীর মধ্যে আপনাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আপনার অন্তরে যে স্বর্গ-মর্ত্য সাধিয়াছেন তাহার স্বর্গে ও মর্তকে সোনায়-সোনা করিতে চাহিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতের শব্দ-ঐশ্বর্য আনিয়া অবাধিলা প্রীতির মধ্যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন ও কোন প্রকার চিন্তা বা বিচারকে তিনি যে পূজাপুরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বিহারীলালের যাহা ছিল, দেবেন্দ্রনাথের তেমন আসন্তি। এই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির সৌন্দর্যসাধনার একটি নূতন দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে—নবত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব, এই দুইয়ের পরিচর্যায় সর্বেন্দ্রিয়ের উল্লাসময়ক এক নূতন ব্যাকুলতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে! সে কথার বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমি কাব্যপরিচয় যাদুর হইলাম।

কবিমানসের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যকলারও পরিণতি হইয়া থাকে, এই সূত্র ধরিয়া দেবেন্দ্রনাথের অপরিণত কবিতাবলির কথা দিয়া তাঁহার কবিশক্তির বিকাশ একটু ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করাই সঙ্গত। তার আর একটি কারণ এই যে, রচনার এমন অসমতা আর কোনও কবির কাব্য-সাধনায় লক্ষিত হয় না; চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণহীন কবি-প্রতিভা উচ্চ-নীচ ও সমতল ক্ষেত্রে সমানে যেন অবাধ অবহার ছড়িয়া দিয়াছে। অথচ, এই দুইয়ের অপরূপ রচনার লীলা স্থানে স্থানে এমন কমল কলাইয়াছে যে তাহা চিরদিন রস-সাহিত্যে সোনার ঘরে বিরাজিবে। মনে হয়, তাঁহার কবিতাগুলি যেন আপনারই আপনাকে লিখিয়াছে! ভাবাবেগের সাচ্ছন্দ্য, অতি সহজ সৌন্দর্য-বোধ, বাহ্য স্পর্শমাত্রে হৃদয়ের বিচ্ছেদ কম্পনে প্রকৃতির সমস্ত রূপ কবি-হৃদয়ের বিক্ষেপ—তাঁহার রচনায় যেমন লক্ষ্য করা যায়, এমন আর কোথাও নয়। ইহাই দোষ এবং গুণ, উভয়ই তাঁহার কাব্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এজন্য তাঁহার কবিজীবনের অন্যেক্ষণ যা কবিশক্তির ক্রমবিকাশ

তাহার ভাষাতত্ত্বের সঙ্গেই চিহ্নিত হইয়া আছে এবং সেই কবিকে এখিয়ার একটা ভুল-বুঝ পাওয়া যাইবে, এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে,—এতদ্ভিন্ন, প্রথম বয়সের রচনা, মধ্য বয়সের রচনা ও শেষ বয়সের রচনা—এরূপ শ্রেণীবিভাগে বিশেষ কোনও বাধা নাই।

প্রথমেই, কবি তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে নিজেই যেরূপ যে স্বাধু-পরিচয় দিয়াছেন তাহারই একটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

নিশিদিন নিরবধি আমার পুরাণী পুথি—
আমার পুরাণী।
নানা সঙ্গে নানা রঙ্গে ছন্দ-প্রবন্ধে গাঁথি
লিখেলাম লোক যারি, আমার মোহারি।
আমার মনের বাণ বিদ্যুতের সমান,
দেখেন যাহে পায় সাহে পুরাণী।
আমারী প্রেয়সী-সঙ্গে একটি রহিবা সাথে,
সেহে মুখে আছে আমার বাণী।
আমার লেখন দেখে আমার কবিতা দেখে
কবিত্ব আমার আমা উদারি—
কবি যে আমার নি আমি কবি আমির
আমারো আমার নিশিদিয়ারী।

আমি আমারী।

নিশিদিন নিরবধি পুরাণি পুরাণি আমি,
পুরাণি পুরাণী।
নিশি-আমারাতে সেহারী আমারী হই,
আমার মোরি মুখের নিমন্ত্র নিয়ারি—
হই আমি সোর সোর আমার সোর আমার
পুরাণির—মুখ আর নিমন্ত্র আমারি
কি আমার! এমি মোরি আমি নিয়ারি!—
আমি আমি নীতি আমি পুরাণ আমারি।
মুখ আমি নিয়ে আমার আমারি।
আমার মোরি মুখ নিয়ে এমি মুখে—
উমারি, আমার, আমি—মুখ পুরাণী।—
আমার পুরাণী আমার আমি আমি।

সৌন্দর্য-সাধনার নিশিদিনে এই যে স্বাধিকারের উল্লেখ—ইহাই তাঁহার সর্বশেষ আমরা। কিন্তু, 'মুখ-পুরাণ' নামক কবিতায় এই নিধি যে এমনভাবে মধুর মুখর পরাণত, তাহাও নিম্নের কবিতাংশে দেখিবেন।—

কবি! কবি!—নিধি কবি, যে আমি পুরাণ
আমি আমি মুখ আমারাণ,
আমার পুরাণ আমি একটুই পুরাণে
নিশিদিন নিশিদিন নিয়ে আমার আমি!
আমার যে আমারো আমি, আমারো আমি আমি—
আমি-নিধির আমি আমারাণে আমি!
আমারো আমি নাই আমারাণে আমি নাই,—
নিধি নিধি-নিধি-আমি মুখে আমি আমি!
আমার আমার আমি, মুখ মুখ আমি আমি
আমাদের! আমার আমি এই যে আমি,
আমি আমি মধু মুখর!

আমার—

আমারো আমারাণে আমার, আমার নিধির
মুখির আমি মুখ।
মুখ আমি আমি আমি আমার আমারি-আমি।
আমির আমার আমি আমিরার মুখ।
—আমিরে যে আমারি আমার আমার।
যে আমারে আমি কি নিয়ে মুখারাণ আমি
আমি আমি উমারির আমার-আমি।
মধু আমি নিয়ে নিয়ে আমি আমার আমারির
আমারি আমারি আমি আমিরে আমার—
নিয়ে আমার আমি মুখিরাণ যে নিয়ে।
আমি আমি। আমি আমে আমি নিয়ারাণ
আমিরাণে, মুখ-মুখিরাণ!

—এই অসাধারণ রচনা ও আবেগোক্তির পরে আর একটী কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিব। এ দুইটীর মধ্যে রচনায় কালগত ব্যবধান বেশী বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু ভাবানুভবের তারতম্য খুব নয়।

আমি আমি নিয়ে-মুখর!
আমার আমার আমারাণে আমার আমি
আমারাণে আমি নিয়ে আমার নিয়ে আমি,
আমি আমি নিয়ে-মুখর।

[illegible] ও হীরার দুটি [illegible] মধুর মলিন দুটি
দর্পণ পরিয়ে দুটি ঐশ্বর্য পাশ,
তাও তার নিজে-দুখ!

এ স্নেহের তাও নহি দুর ভালবাসি অকপ।
শেষের সুখের দীপে স্নেহবর্তি তাও জ্বালি,
তাও তার নিজে দুখ!
অন্যায় অত্যাচারে যেথা পাপ স্রোতধারিনী!
এ অন্যায় প্রতিবাদ তাও নিজে-বিদ্রুপ-বাণী!
তাও তার নিজে-দুখ!

দুর্দিনে দীপহারা রাত দীপ যা তা তার—
দুর্দিনে প্রদীপ আলি দুর্দিন নাশ,
তাও তার নিজে-দুখ!

দুঃখের দুর্দিন সব [illegible] সব-অন্তরে তব
জাগি তব একাকিনী গভীর-নিশীথ!
তাও নিজ-অন্তরে [illegible] নয়নে তখন দীপি'
নিজে নিজের নিজে নিজের নিজ-সাথী—
তাও তার নিজে দুখ!

যার যেথা যতক্ষণ যখন সুন্দর করে, ততক্ষণই তাহাকে সুন্দর দেখায়,—কবি বাহির ভাষা-বিষয় হইতে অন্তর-পরিধানে আপনাকে নিবিষ্ট না রাখিলে রসভাব পরিপাটের হানি হয়। উপরি-উদ্ধৃত কবিতায় এই বিষয়ের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কবি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দিয়া, অন্তর আবেগের বশে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ভাব-সংহতি ও প্রকাশ-কৌশল পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। এ চারুটী কতখানি অন্তরঙ্গিত ও কতখানি সাধনালব্ধ, তাহাতে বিস্তর সন্দেহ। এখন ভাব-উৎসারিত-প্রায় কবিতার মধ্যে এর অধিক গাঢ়তা সন্ধান করিবার শক্তির পরিচয় নহে। এইরূপ উপমার ঘটা, ভাষার ছটা ও অনুপ্রাসের ঐকান্তিকতা বেহেতুবাদের সকল পরিচয় জানায় আছে—কিন্তু এই পরিচয়তা সর্বত্র কালক্ষয়িত নহে। তথাপি ভাব, ভাষা ও বর্ণা-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া ঐহার কবি-প্রতিভার ক্রমবিকাশ-মূলটী কেমন করিয়া ধরা যায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে, কবি এক স্থানে ঐহার 'কল্পনা'র প্রতি যে উচ্চ কবিত্বাসের ভাষা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিতে হইবে না।

কল্পনার নিভৃতে যখন আসে যায়
দুরন্ত যৌবনের ঝঞ্ঝা,
বক্ষে বিদ্যুৎ-জ্বালা যেন এক মেঘে নিয়ে—
প্রতি নিমেষে মনে হয় মরে অকস্মাৎ!
কম্পিত নিশ্বাসে ঘিরে মেলে দুই,
ছিন্ন বাস পরিধেয় তনু—
ধূলিতে লুটায়ে পড়ে নিজে নয় সে যে সুদূর,
পরাণে অনন্ত দুরন্ত,
হাসে, কিন্তু চোখে নিয়ে বিশ্বাসী-নিশ্বাস যে
অন্তরে বেদনা-অশ্রু—
সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে সারা রাত জাগরণে,
দুরন্তে প্রতি যে ক্ষণ, তার শেষ নাই!

অন্যায় সহে না—সে নিজে-ধনী
দীনজনে করুণায় দেয়ে,
অন্ধ-আতুর তরে আসে ও চলি,
তাহাদেরি দুঃখের দেবে!
এত কিন্তু তোর পাছে, তবে এ কাজে তোর
আছে তোর তোমারই তরে!—
তবে প্রকাশ নিজে, 'তুই' সবে নিয়েছিস
উচ্চ প্রভার কথা বলি কবিতা!

অর্থাৎ—ঐহার সৌন্দর্যপিপাসা যার তার রূপপ্রকাশ নহে, ঐহার সৌন্দর্য-কল্পনার আনুকূল্য যাকে তা। এ বোধের উপর ঐহার হৃদয়ের অন্যান্য স্থিতি—সর্ব-বস্তুতে সহজ স্বাভাবিক প্রীতি। ঐহার কল্পনা কেবল সুন্দরকেই আহ্বান করে নাই, অসুন্দরকেও সুন্দর করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ঐহার এই প্রীতি ও আন্তরিক, ভাবাভিব্যক্তি—সৌন্দর্যকল্পনার মত ঐহার প্রীতিকল্পনাও অসংযত। ঐহার সৌন্দর্য-কল্পনা যে পিপাসা উদ্রিক্ত করে তাহাকে কাব্যে পরিতৃপ্তি হয়, কিন্তু প্রীতিকল্পনা হৃদয়কে শান্ত করিলেও কবি-শক্তি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কেবল সেখানে এই উচ্চ কল্পনা সমান মাত্রায় সহানুভূতির

সমাবেশ করিয়াছে, সেইখানে তাঁহার সেই কবিতাগুলির জন্ম হইয়াছে।

এখানে, এই সৌন্দর্য-কল্পনা ও তাহা হইতেই প্রীতি-কল্পনার উদ্ভব ও পরিণামে ভক্তিরসে তাহার বিশ্রামের পাঠি—এই সূত্র ধরিয়া রেবেন্দ্রনাথের কাব্যবিকাশ ও কবি-শক্তির ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব। আমরা বলিয়াছি, প্রীতি তাঁহার হৃদয়ের সহজ ধর্ম এবং সৌন্দর্য-কল্পনা তাহার প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ, কিন্তু উভয়ে কোনো কালে পরস্পর বিমুক্ত ছিল, এমন কথা মনস্তত্ত্বের বিরোধী। সম্ভবতঃ, কবিশক্তির ক্রমবিকাশে কোনোটি কখন কোনোভাবে কার্য করিয়াছে, বা একটি অপরের উপর আধিপত্য করিয়াছে, তাহা নির্দেশ করা অসম্ভব নয়। কাব্যক্ষেত্রে সৌন্দর্যই প্রথম হইতে তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছে; সৌন্দর্য-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বিকাশ হইয়াছে, সৌন্দর্য-দৃষ্টি আরও গভীর হইয়াছে। তখন প্রীতি আসিয়া কল্পনার হাত ধরিয়াছে—তবে এই প্রীতির আধিপত্যে কল্পনার আদর্শের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং পরিণামে ভক্তি-সাধন-সঙ্গে কল্পনা-মোহিনীর আকুল অন্বেষণ বন্ধ হইয়াছে। প্রধানতঃ এই তিনটি সূত্রে তাঁহার কবিতাগুলিকে বিচার করা যাইতে পারে। সর্বপ্রথম ফলের বিশেষ পরিচয়ে প্রয়োজন নাই—পাঠক যাহাই সেগুলি বাছিয়া লইতে পারিবেন। এগুলিতে সৌন্দর্য-বোধ এখনো ভালো ফুটে নাই, কিন্তু কবি-হৃদয়ের আকুলিত আকুলতা ও সরল পবিত্র উচ্ছ্বাস কবিতাগুলি পঠিত করিয়াছে। ইহার পর, সৌন্দর্য-পিপাসার আকুলতা হইতে সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের আনন্দের সঞ্চারে 'মোহাগ্রহণী' নিজ কবিতার কবি নিজেই লিখিয়াছেন। সৌন্দর্য কবিকে আত্মহারা করিয়াছে,—সৌন্দর্যের মূল-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য কবি-হৃদয় উন্মুখ—সেই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কবি আনন্দ হইতে চাহিয়াছেন। যথা :—

এ কবি কে-কল নিশ্বাস সৌরভ,
কবি কবি, একটি সৌন্দর্য-প্রতিমা

এ কবি কি সুগভীর, কি অন্তরতলে
একটি নিভৃত হৃদি। একটি তার কবি
আছেন একাকিনী বসি হেথা :—

সৌন্দর্য-পীযূষ যাহা করিয়াছিল বর্ষিতেছেন, তাহা যে পূর্ব-সৌন্দর্যেই করিয়াছিল তাহারও সংশয় নাই। সৌন্দর্য-পীযূষ যাহা করিয়াছিল সে সংবাদ যথাস্থানে আলোচনা করিব।

যেই দিন হতে পশে তব সরসতা
কবিতার শুষ্ক শির অবনীতলে—
সেদিনের সেকালের মুখের কবিতা
একা ছিল তাহে মুগ্ধ আমার হৃদয়,
আমার আকাশে মুগ্ধ কবি
চাহি থাকি, আপনার কবিত্বপ্রভায়
আপনার কবি ছবি, ধ্যান-নিমগ্নতা।

এইরূপ নিজ মুগ্ধ মন তব ভোগে
এ সমুদয় মুগ্ধতায়, এ আত্মবিধি!
আপনার কবি তরে, আপনার কবিতে
দেবীরে হৃদয়ে আনি! আপনি হইয়ে
পূজিতে আপনি মুগ্ধ, আপনার সনে
পূজিতে আপনাপনি, আপনি-আপনি!
আর কবি আপনার নীরবতা সনে
আপনার চারিদিকে এক যে ভোলেক
সুগভীর উচ্ছ্বাসে কবি এ আত্মবিধি
নীরব আর এই মুগ্ধিত মুগ্ধির
কবিতা বিহনে মুগ্ধ ভোলেক কবি!
মুগ্ধ আর আমার এইরূপ
বাস্তব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য একটির
নীরবতা মুগ্ধতার ভোগ নিত কবি :

এই কবিতা, কল্পনার এই পূর্ণবিকাশ, অবশ্যই তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি আনিয়াছে। তখন কবি এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

এ যে নিজ আত্মা এ-ভোগ আমি,
আমারি মুগ্ধির ভোগ আমারে আমি—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কবিতার অভিধান, যারা মোর বুদ্ধিহীন—
ঘৃণ্য, ঘৃণ্য, ঘৃণ্য, ঘৃণ্য—এই উপমান :
দূর-আকাশে যেন গান এক মেয়েলোক গায় :
সেই গান, সেই গান, সেই গান শুধু,
সমস্ত ও আকাশে যদি ছিন্ন অভিমান।

যা যা এ আকাশের ঐশি সব মেঘ আজ—
ঐশি ঐশি নাড়ি বাঁধিয়ে ও আজ :
সব দূর দেশ ঐশি, দূর দূর দেশ ঐশি,
সেই গান, সেই গান, সেই গান শুধু,
সমস্ত ও আকাশে যদি ছিন্ন অভিমান।

সব মোর মেয়েলি মেঘের হয়ে কবির
মোর মেয়ে কবিটিরে মোর-দূর গাঁয়,
সব মোর কবিটিরে ধরি সারাক্ষণ-সঙ্গে
করেছিল তুমি যবে অভিমান-ভরা
মোর যে আকাশ-ভরে ধূসরাক্ত দূর গায়ে
একটি দুরন্ত রঙ ঐশি আজিকে।—
আজ ঐশি-মেঘে, দূরে-ঐশি-মেঘে
আর যার যে আছি, সেই যার আজ,
সমস্ত ও আকাশে যদি ছিন্ন অভিমান।

এই সকল কবিতায় মেঘেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ Sensuousness যে আকারে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাহাতে তাঁহার অনুভূতির নবিড়তা ও অনাবিলতাই সর্বত্র পরিস্ফুট। তিনি সৌন্দর্যের পূজারী—তাঁহার সাধনাও সত্যের নয় বিশ্বয়, সুন্দরের ধ্যান মাত্র। Sensation ও emotion—ইন্দ্রিয় ও হৃদয়, এই দুইএর মিলনে তাঁহার কল্পনায় যে কাব্য-চিত্রের বিকাশ দেখিতে পাই তাহাতে morbid কল্পনার অবকাশ একরূপ অসম্ভব। Morbid কল্পনা ও Intellectuality, এই দুয়ে মিলিয়া, আধুনিক কাব্যে যে বিষম্পূর্ণ ঘটাইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না—'Art for Art's sake'. আধুনিক কবিগুরুদের এই সমস্ত উক্তি অনেক স্থিত দিয়া সত্য হইতে পারে, তথাপি মেঘেন্দ্রনাথের এই বিশুদ্ধ emotion কাব্যকলার কতখানি প্রয়োজন সাধন করে তাহা কাব্য-রসিক মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন। কবি কীটসের বিখ্যাত St. Agnes'eve

আধুনিক কবিতার আরও আগে যে আরেকটা Consciousness-এর পরিচয় আছে, আমার মনে হয় নিম্নোদ্ধৃত কবিতা দুইটিতে তাহার সেই লক্ষণ আছে। প্রথমটির নাম 'শুধু' দ্বিতীয়টির কোন নাম নাই, আমরা নাম দিলাম 'দুর্বোধ-চিত্র'।

শুধু

একলা মেঘ আজি ভেসেছে সকল,
রৌদ্র নাই, শুধু ঘিরে আছে ছল।
শুধু মন্দ মন্দ বায় ;—এই আছি আমি
শুধু শুধু বসি' ছিন্ন উদাস মনে,
(আকাশের সুখ যেন !)—এই সারাদিন
মন-দূরে দূরে এই যে ভাসান—
আমারি কথা, হায়, আমার মনে
যে যেন বসিয়া মোর দুখিনী বয়ান ;
ও-প্রেম ফিরিয়ে আজো ; সেই ও এ মেঘে
ফিরিয়ে দাও, মোর আকাশ ঘিরে।
ভেসেছে আকাশে যে ; বাতাসটি নিয়ে
ভেসেছে ওরে মোর উদাসের গান ;
ওগো ধরিব মেঘে আমি-হারা—
ছড়িয়ে দিওনা-সব আমারি সমান !

দুর্বোধ চিত্র

এই দৈত আছে এই অদ্বৈত ভান :
এই দূরে দূরে আজ আকাশ-বিতান
ধরিয়াছে একটি ; আকাশ ভরা :
রাঙ্গাসন্ধ্যার পূর্ণ ভরা বিমান :
মোদেরও ভিতর এই মিলনের ভান—
ভিতরে ভিতরে তবু পরে পরে দূরে ;
এই আজ-আজ ভাবে পরিমান ভান—
'আজ এই আজ আজ—তবু আজি !
আজো ও নিজে নিজে বসিয়া দুজনে
আকাশে আজ ওরে ভাসিয়ে যে দেব
আমাদের আজ দূরে আজি বসিয়া
আজ বসিয়া আজ দুজনে ভেসে।—
এই দুর্বোধ চিত্র রেখায় রেখায়
নিয়েছে ধরি যেন যেন দুজনে।

প্রসঙ্গক্রমে একটী কথা এইখানে বলিয়া রাখিতে চাই। আর-আলো-আর-ছায়াময়ী রহস্যতন্দ্রিনী যোড়শী-বিভীষিকা যেমন করুণ কবির কল্পনার অনুকূল, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যেমন ঘোরকারে বিকশিত অভিসারে যাত্রা করে, দেবেন্দ্রনাথের কল্পনা তেমনি চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-দহিত পথে বিহরণ—অশোকের মধ্যে, চম্পকের সৌরভে মাতিয়া উঠে। 'ঘর-দোর' ও 'নবঘর' বিষয়ক অসংখ্য কবিতার মধ্য হইতে আমি যেমন একটী মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম—পাঠকগণ তাঁহাদের কবির অপূর্ব কল্পনা বিলাস লক্ষ্য করিবেন।

কখনো কখনো হাসি মুখ করি ভার
একাকী বসিয়া থাকা বসিয়া বাহুল।
পথী যায় উৎসবের আনন্দের মন
কবির নিকট যেন কিছু ভাল নয়,
কাজ নাই অভিসারে কবির প্রাণের।
কখনো দুটি ও ঠে :—এ কি অভিমান।
আমাকে আজ যেন কত কথা বলে।
কবিরে নিয়ত-কাজ কবির দুয়ারে,
তবে যাও—ফিরিয়া না ডাকিব তোমায়।
যে চাহে। এ নিশি-ভোর, নিরিবিলি মোর,
গাহিব আজ আমি।—কবিরে বলিল,
তোমার নিকটে এই যেমিল কথা :

নিরাশ কবির হাসে—"কি কব, কি কব।"
কথা-টির মাঝে—"তোমা বিনা নাহি।"
যেমিল চাহিল মুখ কবির নিকটে,
কবির অধরে-মুখে কবিতা ফুটিল।
মুখ : মুখ। যেমিলন মুখের মাঝারে
নিমেষে কবিতা, তবে আকাশে!

কত যে চৈতন্য। হায়ে অভাগিনী
দুটিল নিমেষে, কবিরে ছাড়িয়া।
পাখীটির মুখখানি পড়িল মনে।
পড়িল আজ-রাতে তোর পাখীটি।
আকাশটি শূন্যময় কবিতা নিয়ে,
নিমিল নিমিল মুখ আকাশ ভরিয়া।

আকাশ পাখীটির ও কবির তরে
কবি তোর হয়-পাখি, কবি তোর তরে।
ওদিক উদয়ে কবি গাহে গাথাটি
নিজ ভাষায় হায়—'তোমা বিনা নাহি।'
আজ আকাশ হয়ে আছে একাকার
তাহা আর কারো হয়ে পারেনা সহিতে।
কবিতা পড়িল পুঁথি ভরা পাতে,
আকাশ পড়িল কবি তোমার।
নিয়ে গেল, 'এবে আমি তোরে ও পাখি,
পড়ি গেল, 'তাই আমি এবে আমারো।'
একটী দুখিত কবি নিয়ে চলিল,
আকাশ কবির মুখ নিলে কবিরে।

—শেষের লাইনটীতে কবি নাথারের অন্যান্য প্রতিভার লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

এ পর্যন্ত যতগুলি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে কবির মানস-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার কল্পনা-বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটী উদ্ধৃত কবিতা এই দ্বিতীয় স্তরের কাব্য পরিচয় সমাপ্ত করিব।

'অশোক মূল' শীর্ষক কবিতায় কবি-কল্পনার বর্ণবিলাস উপভোগ করিয়া উঠিবার :—

তোমার নিম্নে যাও—সমস্ত দিন।
বালির মুখর তোমা স্নেহিনী-মহিমা।
তোমার মূলের ঘন আলো-ছায়া।
তোমার সমান যেন স্নেহিতে কবিতা।
তোমার ও তলে যায় সকল বেলায়।
তোমার বিভিন্ন-পত্র আসবে ঝরিয়া।
ফল-মধু তোমা আসবে ফেলে।—
ঐখানে নিমেষে কবি সকল ভোলেরে।
সমস্তটী দিন দিন তোমার আসবি'
কবি তার আসবে যাও ও চলে,
তবে তবে আসবে কবির উদয়
কবিতে আসবে মূল, কবি কি আসবে।
ঐখানে আসে নিমেষে কবিতা কবির—
এ আসবে, ও আসে আসে কি যে ঐখানে!

অকৃত কবি নিজেই ফুল হইতে আসিয়াছেন—তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্য-পিপাসা এক হইয়া মিশিয়াছে :—

> দেখিনু নিয়তি যবে মানবীর বেশে
> চলেছ অনুদ্বিগ্নচিত্তে সুদূরে সুদূরে
> পরিহরি সুখ-দুঃখ নিত্যের নিয়মে।
> সেথা এ হইতে আসা, এই সেথা যাওয়া
> সেথায় অকারণ সংসার উদাস।
> তাহে তাঁর সেথা হতে এসে সহসা,
> যাই তুমি উদাসিনী হয়ে অকাজ
> অকারণ নিরুদ্দেশে হয়ে অকাজ।
> সহসা কুসুম যবে, সহসা যামিনী
> অকারণে এ ধরণীতলে হয় ও সৌরভ,
> সহসা এ সুন্দরের নিত্য খেয়ালে,—
> তবে কেন কি উদ্দেশ্য হেরিছ সবারি!
> নিরর্থের পরিচয়ে অর্থের ধারণা—
> অকারণে এই সবে দেখে যেন মানা।

কালিদাস প্রেয়সীকে 'প্রিয়বিহগ সলিতে তুলনিয়াছেন' বলিয়াছেন, আমাদের কবি বলেন, প্রেয়সী আবার কি? :—

> সহসা, তুমি কবি—
> সহসা নিখিল দেবি
> উদাসীন,—যেন এই মধু-গীতিময়
> নিমার্ণি,—যেমন সব ফোটে ফুল!
> সব হয় অকারণ,
> তার হয় তুলিবার,
> সব উৎসব সহজ প্রতি উল্লাস!
> সহসা, সব শুধু নিরিখি যেমন।

'আজ-আসানো' শীর্ষক কবিতায় কবির অপূর্ব 'মোহিনী'-প্রভাব পরিচয় পাই। বিদেশী-পরিবেশের পক্ষপাতী দুরুহতা বিরুদ্ধবাদীদিগের যুক্তিতর্কে পরাজিত হইলেও কবির প্রয়োজনার বিরুদ্ধ প্রমুখ হইবের সম্ভব নাই।

> দেখেছ তুমিরে আজ'। আজ আজ আজি, '
> আজি তবি আজনার আজিকি আজিজ।

> এজি : এজি। বিদেশিনি কোন তুমি আজি!—
> কোন দেশ হতে তুমি এসেছ এদেশে।
> এসেছ কি —এসে থাকি, সেথা সেথায়
> (আজি যে আজ নয়) তুমিরে একাকী।
> তুমিরে তুমিরে, আজ কবি কবি!—
> এসেছিনি কিরে সেথা হইতে আবার।
> এজি তুমি সেথা যে যে মোহিনি!
> হাসিছ!—হেয়ালি কিরি! এ যে অকাজ!
> এ যে নহি এ নহে!—সেথায় যাওনি
> আজ আজি কি সেথা যে এসে আজিজ ও
> 'আজ, যাও!'—সে কি কথা! তবি তুমি এ।
> আজিও রয়েছ তবি আসন অজ!

'আসিনী' শীর্ষক কবিতায় কবির কল্পনা যে যাদাপীরিয়াছে তাহার ফুলধনি প্রেমরঞ্জিত হউক, কিন্তু ছোঁয়াচি যে অপরূপ, তাহা কবি নিজেই বলিয়াছেন :—

> যেন্দ্রা যেমন দীন নিজের আজে,
> আজ আজিজ নিজ আজিজ আজে,
> নিজিই আসার-সুখ নিজের আজারে,
> দুঃখের আজার নিজ আজিজ বাজে,
> নিজ-আজাজুর আজেজ হয়
> যেন যেনি আজারে নিজের আজারে,
> নীরবে যেজেজ-আজ নিজের আজারে
> আজেজ আজারে তবি কি আজার!
> দুইটি আজ নিজ তবি নিজ দুজ,—
> এক আজ তীর তীর। যেজে-দুজ নিজ
> আজেজ এক নিজ আজিজে—
> যেজেজ আজ-দুজ তবিজ আজুজ!
> আজার এ আজুজ এইত আজিনী
> আজেজ আজারে তবিজ আজিনী!

কিন্তু এ কবির সৌন্দর্য-পিপাসা শুধু ফুল খুঁজিয়াই বেড়ায় না, তাহা ফলনা-মনও কবিকে কম প্রলুব্ধ করিয়া যায় নাই! তাই 'সন্ধ্যে! আসো' শীর্ষক কবিতায় বলিয়াছেন :—

> এই যে 'আসো'—সে আজিজের দুঃ
> আজিজ আজ এই আজ-আজজের!

[illegible] —[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এইরূপ কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের sensuousness এক অপরূপ ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার মনে হয়, বাংলা কবিতায় এমন সহজ সরল ও প্রবল ইন্দ্রিয়-অনুভূতির উল্লেখ আর কোথাও নাই। এই অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ কবিতায় কবিত্ব স্থানে স্থানে কি সুন্দর! একটী কবিতার একটু অংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম, পাঠক ইহার কাব্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন :—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

'অদ্ভুত অভিসার' শীর্ষক কবিতায় কবি যাহাকে প্রকৃতই এক বিবাগিনী, কবিতাটি কবির একটী উৎকৃষ্ট রচনা।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

অতঃপর কবি নিজে যেমন করিয়া কাব্য-রস আস্বাদন করেন, তাহার পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের কাব্য-প্রসঙ্গ শেষ করিব। কবিবাটি রবীন্দ্রনাথের সনেটগুলির (কবি ও সোহহম) উপরে লেখা :—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

এইবার আমরা দেবেন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার মূল নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করিব।

(আগামীবারের সমাপ্য)

গান ও স্বরলিপি

কথা ও সুর—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

বিদায় গান [বৈরাগ্য—কেরবা]

বিধি ! আর ত' তোমারে নাহি ডরি'
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।
যবে কণ্টক তরুবনে ডাকাতে নয়ন জলে,—
আমি ফুলফুলে ভরি তো তারে ধরি।
হায় যদি ঝরঝরে আমারও ত আছে প্রাণ,—
সহসে করিব তারে ধরি,
তোমা পরে নিরুপায়— হবে তব পরাজয়;
সবি করিবে এলো ঝরি।
যারে আমা দিবে তুমি তারায় নয়ন চুমি'
হরষে তেমন লব নিঃ
সবারে হাসিয়ে মুখ (মোরে) কেমনে হাসিবে দুখে ?
সবারো হাসি যে তো মোরই।

II
সমা সা গমা মপা। সা সনা সা ধা। পা - । মা - । । মা সমা গমা
আ ৎ ৎ তো মা যে না হি ভ - বি বি বি -
II
গমা মপা গমা নমা। সা ধনা সা ধা। পা - । মা - । । - । - । মা মা।
আ ৎ ৎ তো মা যে না হি ভ - বি আ মি
মা গমপমা মা মা। পা মা পা মা। গমা গমা গমা গমা। পা - । মা পমা। II II
যে যে হি ন কূ লে পা ভি ত বী
মা মা। (মা) পা মমা মা। পা ধাঃ পঃ পা। । পঃ মা পঃ ধপা। (মমা মপা মপা পা) ।
ব বে ক ন টি ব ত ভ ত লে - মা সা যে ন ই ন ভ লে
মপা মপমা পপা মমা। মা গম পমা। ঃ মা। পা মা পা মা। গমা গমপমা। গমা গমা। পা - । মা পমা। II II
ই ন জনে আমি কূ কু যে বি ধ মো তারে ভ - বি
। । সা ধা পঃ পঃ গমা। মা মা মা মা। । মঃ গমপমা মঃ পমা। পা মা মা র্সা।
হা সো ই বি ধ ব ধা প আ মা ই তা' আ ছে পা ন
- - মা রে ধ্য মা বি ধে তু মি - তা মা ই ন ই ন তু মি'
মা পা মা মা। পা মা পা মা। মপা মমা গমা মমা। গঃ - । মা পমা। II II
ন্ - বি ভ ভি বে এ ভে অ ভি
স ধা মা ই মা সি বে সো সো ষই
মা র্সা মা মা। পা মা পা পমা। গমা পমা পা - । । - । - । - । - । । II
প ম্ বে তা মা বে ই ন ম' ভি'
ধ ভ লে বে ই ন ন ধ ন্ ভি'
। পঃ পা পঃ গমা। মা মা মা - । । - । পঃ পমা পঃ মপা। গমা গমপমা পা - । ।
- মো সো ও হে নি ই ন ন - ন্ বে ভ ন প মা ধ ন
- ন ধা রে মা বি ন ন্ কে মোরে যে ন লে মা বি বে ন্ বে

পাষাণের কথা

শ্রীনারায়ণ উকীল—বিহারী

মায়ের স্নেহের ছেলে-পিলেদের মধ্যে আমিই খুব রোগা ও সবার চেয়ে খুব টুচু, তাই আমাদের আস্তাবল হ'তে ঘাস বাড়িয়ে আমাদিকে ছোট-ছোট করছিলাম।

তোমরা আমাকে চিনবে কি? আমি বাকি পুথিবী। অনেক উঁচু ভালোটারে মায়ের কোলে—তার চারদিক গড়বার বাঁধে। মায়ের কোলে এক দিন শুয়ে-শুয়ে দেখ্‌ছি যে সেই বাঁধ গড়বার উপর দিয়ে আকাশের গায়ে কতক গুলি লাল মেয়ের ছেলা ছেলে বেড়াচ্ছে। ক্রমে সেই সঙ্গে কালোমেঘও উঠে এসে আকাশের আর এক কোণে জায়গা খুব ভালো ক'রে উঁচ্‌ছে। তার ভিতর দিয়ে বড় এক ধাঁরা খুব কালো মেঘের মধ্যে লড়ে যে যেন অনেক-অনেক তার বিদ্যুতের আক্রোশ-ভরা চোখ দিয়ে আমার দিকে চাইছে ও থেকে-থেকে হুস দেখাচ্ছে। হঠ আর একটু কাছে আসতেই মধ্যে মায়েকে চিন্‌লাম, সে যে আমার দিকে তার হিংসে-ভরা কটাক্ষ ফেল্‌ছে! এমন সময় কল থেকে কে যেন একবারা জল ঝর্-ঝরিয়ে ফেলে দিল। সেই জল কালো মেঘের গা বেয়ে পড়ায় খুব ভয়ে পড়তে লাগ্‌ল।

ও-দিকে আকাশের কোণের নীল পাহাড়ারা কে একটু ফুসল করেছে,—তাকে, যেন ঝিনি-ঝিনি কর্‌ছি। তার আঁচলের ফাঁক দিয়ে এক রকম আলোর ঝিকি-মিকি পিছলে এসে জলের উপর পড়তেই মেঘের গায়ে নানা রং-বেরং-এর রং ফলিয়ে কি সুন্দর এক রকমের রঙ হয়ে উঠ্‌লো। এই সব দেখ্‌তে-দেখ্‌তে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছি মায়ের কোলে—তা জান্‌তেও পারলাম না।

হঠাৎ একটা প্রবাণ আওয়াজের ধাক্কায় একেবারে জেগে উঠলাম। চক্ষু মেল্‌তেই দেখি, আমি একটা লম্বা জলধারার উপর শুয়ে পড়ে রয়েছি, আর তার চোখের জল আমার উপর থেকে-থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমাকে তাদের খেলার সাথী মনে পেয়েছে বোধ। কখন আমার কাঁধে, কখন মাথার উপর লাফিয়ে উঠে কত কালের ছেলা-খেলার মত খেলা কর্‌ছে। এ-কি স্বপ্ন! না-না! অনেকক্ষণ কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। আমার আশে পাশে, আমার ছোট ছোট ভাই-বোন্‌রাও যে কবে আমার মত মায়ের কোল থেকে খসে এসে এই কলধারার সঙ্গে খেলাধূলি কাচ্ছে তা জানতেও পারিনি। তোমার এত পুত্রে একদিন যারা টুচু করেছিলাম, আর আজ কিনা আমার এই দুরবস্থা! তাই মায়া-চক্রের কথা ভাবতে-ভাবতে, আর জল-ধারার ঝুম্-ঝুম্ ধ্বনি শুনতে-শুনতে আমার কখন্ যে ঘোর ঘুমে এলো, তা বুঝ্‌তেও পেলাম না। কত দিন যে এই ভাবে জীবনের দিনগুলি কেটে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নাই। এ কি আমার ঘুম! না—মৃত্যু! কিছুই বুঝতে পারছি না। একদিন মনে হলো—আর যেন পরশ পাচ্ছি।

একদিন ঘোরের কাটা সোণার রং-করা নূতন আলোতে চক্ষু খুলে গেল। জেগে উঠে দেখ্‌লাম—আমার সামনে একখানা ছোট চৌকীর উপর শুয়ে এক মুখ তার সোণার কাঠি আমার গায়ে বুলিয়ে দিচ্ছে। বুঝি এই শিরীষই জীবন-কাঠির পরশে যেহে নূতন প্রাণ পেলাম।

নিজের চেহারার দিকে চোখ পড়তেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। আমার শরীর এরকম সুন্দর গড়নে কবে উঠ্‌লো কি করে? চোখ, নাক, হাত পা, আঙুলগুলি এমন সুন্দর করে কে গড়ে দিল! নিজেকে বড় মনে হলো।

আমাকে প্রাণ ভরে পান করে সুখে আমার প্রাণ-ভাতারে ধন্যবাদ দিতে লাগলাম। এমনি করে শিল্পীর ও তার ছোট অবকাশের সাথে আমার প্রাণের মিল হয়ে উঠল। সকল রকম দুঃখ-সন্তাপকে চিরতরে বিদায় দিয়ে তাকে খুব আপন করে নেলাম। সে এক মুহূর্তও আমাকে না দেখে থাকতে পারে না। সে তার অন্তরতার দৃষ্টি দিয়ে সকল সময়ই আমার চারদিকে ঘিরে থাকে। তাকে দেখে মনে হয় যেন তার প্রাণের সমস্ত সার্থকতা আমাকেই সফলতা প্রদান করেছে। আমার হাত দু'খানি তার উপর রেখে সে তার চোখের পরশ বুলিয়ে নেয়, তখন আমার প্রাণ যে কত আনন্দে ভরে উঠে, তা তোমরা কেউ জান না। আমার আশঙ্কা হয়, এই শিল্পীর কল্পনা দেখে—সে এমন আমার মত কঠিন পাষাণের প্রাণ দিতে পারে। এক এক দিন নিজের মত করে থেকে পাষাণ প্রাণটাকে তুলিয়ে নি।

তোমাই তার বাসিয়ানা খুশবাই মেখে প্রাণটা ভরে। তারপর একদিন মনে মনে তার মুখে-চোখে কেমন যেন এক বিষাদের ছায়া দেখতে পাই। কিছুই ভেবে পেলাম না—এমন সুখাবাসময় মুখে আমার বিষাদের ছায়া কেন? আজ সে তার চোখ দুটি তুলে চাইতেই মনে ভয় উঠলো, আমার নিজে দৃষ্টি ধরে রাখতে পারলে না। টস্ টস্ করে দুই বিন্দু অশ্রুজল দীর্ঘ পক্ষ-রেখা বিয়ে গড়িয়ে পড়ে একটা অব্যক্ত গভীর প্রাণের ব্যথা জানিয়ে দিল।

আমার প্রাণটা ধক্ ধক্ করে উঠলো, পরীটা কেমন যেন এক বিপদের আশঙ্কায় অধীর হয়ে উঠলো। বিপদের আশঙ্কার সাথে-সাথেই প্রত্যক্ষ হল দেখলাম। অমনি ঘর লোক ঘরে এসে আমাকে দেখিয়ে শিল্পীকে কি যেন বলে ধরাধরি করে তোমার আমাকে নিয়ে চললো। ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। তখন তোমরা আমার ঘিরে এলো, চোখ মেলে দেখলাম, আমি একটা প্রকাণ্ড দালানের আঙিনায় পরপে একখানা খড় পাথর আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘর লোকের আনা-যাওয়া দেখছি, কিন্তু আমার প্রাণ-ভাতার ঘর একটী তোমরা তো চোখে পড়ছে না! কিছুই ভাল লাগছেনা—কি করব! আমার নিজের যে কিছুই করবার ক্ষমতা নাই। আমার এই তোমের ভাষা যে সেই শিল্পী ছাড়া এ জগতে আর কেউ বুঝবে না। মনে বড়ই দুঃখ হচ্ছে, যে ঘরে তুলে নিয়ে প্রাণভরে আদরে সে যেমন করে কোন্ প্রাণে কেন আমার ঘরের বার করে পরের হাতে সঁপে দিল, বুঝতে পারলাম না। এমা এমা দাঁড়িয়ে তারই কথা ভাবছি। চমকে উঠলাম, স্বপ্ন না সত্য কেমন যেন।

ঐ যে—সে উঁচু সিঁড়ির উপর বসে তার দুধ-ভাতের চাউনি দিয়ে আমার হাত দিয়ে পলক-হীন চোখে আমারই দিকে চেয়ে রয়েছে! না—সে আর ঘরে থাকতে পারলে না। তোমই সে ঐ আসনটায় বসে আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে একটা প্রাণের অস্থায়ীর ফেলবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে চলে যায়। এবার তাকে বুঝলাম—তার মনস্তাপের মূলের ব্যথা আমার বুক দিয়ে অনুভব করলাম।

• • • •

এক দিন নিশুতি রাতে আমার সেই কাল-নাগিনীর তীক্ষ্ণ কালো চোখগুলি সরিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রভাবে এ-দিক ও-দিক ছুটে-ছুটে যেন কার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে।

আমার আমার খোঁজ? মুহূর্তে পরে ঘরে তার বিদ্যুতের চোখ দিয়ে আমাকে সে দেখিয়ে দিল। মনে হয় হ'লো, এত কঠিন সৃষ্টি হয়েও আমার ভয় গেল না। বিশ্ব আমার ঘুরিয়ে এলো, আমার প্রথম জীবনের সেই সব ঘটনা আমার মনে পড়তে লাগল।

ভয়ে আমার এই পাথরের পরীটারও বেঁচে উঠল। বড় ঝঞ্ঝাবাতের আক্রোশ করে বিদ্যুতের চোখ রাখিয়ে আমার আশে-পাশে ছুটে-ছুটে পালাতে লাগল। একটা আমার উপর তার আক্রোশ যেন যায়! একটা ঘরকা বাতাস এসে কানে-কানে বলে গেল আকাশটা মেঘে এবার ভরে হবে। সুখের আশা থেকে-থেকে আকাশটা কাঁদতে লাগল। আমার পক্ষ পাঁজরকে ভেঙে দিতে কেন তোমার এত আয়োজন? কেনই-বা তোমার বিদ্যুতের বাণ আমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছ? আমার বুক দিয়ে কি তোমার অসীম শক্তির পরিচয় দিতে চাও?—আমার

—আবার ঐ—সেই ভীষণ ভৈরব রব করে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে সে অর্ণব উঠ্‌ল।

ঘর্ঘর, ঘর্ঘর, পাতাল ভেদ সেই আওয়াজে এক মুহূর্ত কেঁপে উঠ্‌ল। মুহূর্তে আবার ভীষণ বিশ্বে অর্ণবে অর্ণবে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর সময়ে এসে আমার পাষাণের বুকখানাকে ভেঙ্গে দিয়ে সে ধরার বুকে মুখ তাদা দিল।

যে জল-লাবণ্য নিয়ে পথিকের মন ভুলিয়ে আমি অহরহ আত্মহারা হয়ে থাকতাম আমার সেই জল, প্রখর মার্তণ্ড-মুখ-রাক্ষসীর আর বুকখানা চিরদিনের মতে ভেঙ্গে দিয়ে সে আমার চিরতরে বিশ্বে প্রতিহিংসার মূর্তি জাগ্রত রেখে গেল। ঐ যে—ঐ যে! আমার জীবনদাতা সে আজ প্রাণের সঙ্গীত এমন মুখরা হেসে চোখের জল আর ধরে রাখতে পারছে না। ঐ যে—আর চোখ মুছি নিয়ে সেই মেয়ের পা দিয়ে কত-ক্ষতিতে জল ধরে পড়ার মত জল-ধারা ঝরে পড়ছে। আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না,—ধরার বুকে আমার পায়ের নীচে এসে লুটিয়ে পড়ল।

আমি কি করব? তাকে ধরার বুক থেকে তুলে আন্‌বার ইচ্ছা করছে, কিন্তু পারছি না যে! পাষাণ প্রাণের সাথে শিল্পীর যে কত প্রেম হতে পারে তার মূর্তি জগতের মুখে আমাকে রেখে যেতার এক অবিনাশ রেখে গেল গেল। যে শিল্পী তার চিরদিনের সাধনার ধন দিয়ে আমাকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল, যার হাতে আমি অমর হয়ে উঠেছিলাম, সে আর নাই—একটা হাতুড়ির আঘাত পাথরের মালাটা ঝির্‌ ঝির্‌ করে উঠ্‌ছে। কত বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, কত বসন্ত, আমার চোখের সাম্‌নে দিয়ে শত শত যুগ ধরে এ ধরার বুকে আসা-যাওয়া করল। তারা কেউ আমার দিকে একবার ফিরেও চাইলে না। আর যত প্রাণ দিয়ে চাইতে আর কাউকেও এত ভাল লেগেছে না। যারা পৃথিবীর যে এমন-ধারা পরিবর্তন ঘটে তা কোন দিন ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই। যে স্থানে এক দিন শত শত লোকের সমাগম ছিল, প্রতিদিন পক্ষ-কর্তার পক্ষের সাথে যে সমারোহ মুখরিত হয়ে উঠ্‌তো, আজ সে সুখের স্থান নিয়ে বন জঙ্গল আগাছা-ভূমি ও ভীষণ জন্তুর অরণ্যে পরিপূর্ণ। কত কালের মানুষের মুখ আজ ভেসে পৃথিবীর সকলকে ভুলে গেল, আমার কথা আর ত কিছু বলবার। আমি কত যুগ-যুগান্তর ধরে এই নির্জন স্থানে অনুক্ষণ-প্রায়, আর আমার সেই ভাঙ্গা হাত-পা আর ভাঙ্গা বুকখানা নিয়ে কাঁটায়-ভরা গাছপালার ভিতরে তারই স্মৃতিটুকু নিয়ে আজ আদার আশায় পথ চেয়ে আজও বাঁচিয়ে আছি!

প্রবাসী

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক—ভূমিষ্ঠ

(১)

হে প্রবাসি, মনটা যে তোর হয়না ঘরের কোণে,
কেমন সুরে বেড়াস গহন বনে!
বেড়ায় শুধু মিষ্টি-মধুর ফাগুন মাসে মাসে
দিনের আলোর হাতে এড়ায়ে ছায়ায় সবি বাঁচে।
অন্ধকারে আঘাট-বাঁধা গভীর প্রবেশিস
বাঁধির আগে যেয় যে টানি প্রলয় রণিয়া।
সব সুখের বিনীত বেশা পায়ের নখ চাপি
বক্ষ-ভিতরে মিশা দিয়ে আনন্দ আছে হাসি,
শুধু আঘাত চাস করে উঠিছে নিশ্বসি
হাহাকারের সুরে,
হে প্রবাসি, মনটা কি তোর সেই পরশে পশি'
যেতায় ঘুরে ঘুরে?

(২)

হে প্রবাসি, মনটা যে তোর কেমন ঘুরপাকে,
বলোচিত্তায় ছুটছে কি তারকে ?
যেথায় তবুই ধূ ধূ করে বিশাল মরুভূমি,
সাধনা যেথা যে না ধরার রস আসন চুমি ;
ওড়ছবালুর ঘূর্ণিঝড়ে আকাশ ওঠে ভরি,
ধরণ দিনের ভয়ঙ্করে বিশ্বরে যায় ধরি ;
নিষ্ঠুরোষ্ণ রূপ ধরে তোমায় যেথা টানে ;
কেবল মাত্র অগ্নি মায়া সত্য জানা আছে ;
পথিক যে অন্তরেই আছাড় খেয়ে পড়ে,
মৃত্যু আসে ধেয়ে ;
হে প্রবাসি, মনটা কি তোর সেই মরু-প্রান্তরে
ছুটছে ধেয়ে ধেয়ে ?

(৩)

সেই যে, মনটা যে তোর কেমনি ঘর-ছাড়া
সূদূরেরই ছুঁইয়ে পাখনা-পাড়া !
যেথায় কোটি সূর্য তারা অনাবিষ্কার চলে,
আপন মনেই ঘুরছে সবাই মহাকাশের তলে,
ধূমকিয়ারা নেবুলো তোরাও নেবুলো পথের শেষ,
একটা বিপুল বিস্ময়েরও নেই অবসর লেশ ;
কেউ কারুরে চেয়ে না দেখা প্রবল আকর্ষণে,
সূর্যাকৃষ্ট নীহারিকায় হারায় অণু কণে ;
কারুর প্রাণে কি গান আছে কেউ জানে না তারা,
কেবল চোখেই দেখা ;
প্রবাসী রে, মনটা কি তোর সেই অদূরে, আরো,
কিসের একা একা ?

(৪)

হে প্রবাসি, মনটা যে তোর ভরসা ছাড়ার ঘরে,
কেবল ফিরে বসছে দূরে ভাবে !
তোর জন্য দূর গিরি উঠেছে গগন ছেয়ি,
ঘরে ঘরে সাজানো সব দূরত্ব-বিজয় দেখি ;
কত অচেনা রাগ প্রবাল আছে গহনে
তরল-তল মৌজিকে আছে গোপিত সব ধনে ;
সূদূরীরের অগ্নি মায়া পাখর হয়ে আছে,
কিসেরো সুবাসো সব ঘাস পেরে কেউ পায়ছ ;
আসন ছাড়ো পথ বাণি যে হারিয়ে ছেড়ে তোমা
যায় যে, কে তা জানে ?
হে প্রবাসি, মনটা কি তোর কিসের ভোলা-ভোলা
সেই পথ-সন্ধানে ?

(৫)

হে প্রবাসি, মনটা যে তোর ঘরের বারে ঘরে,
বাইরে ছোটে কোন্ বিদায়ীর তরে ?
কেবল যত সরী-ছাড়া অসন্তোষের আগে
সাথে পাওয়ার সব কবিস্ অদ্ভুত বিরাগে ;
পথ-হারানোর বেগে কেবল একলা আসা-যাওয়া,
অজানাদের সঙ্গে কতির অসীম যাওয়া-যাওয়া ;
সব ঘরেতে কবির ছেলেন, নয় তা ছলার নয়,
এত চলা সইবে না তোর, যাই যে যদি কয় ?
ঘরেই ফিরে আসার ভয়ে—ঐ যে অনুরাগি
হাসছে চাঁদের মুখে :
হে প্রবাসি, আজকে যেথায় যোজন আসন পাতি
অমর ভুবন ভুবে ।

(৬)

প্রবাসী রে, অনমনা তোর আসন ঘরে চাহি,
আসন ভুলেই গোলকে আজন যাই ।
রাত-বাসরে যা আছে তোর আনন্দে যে ভুলে,
সবই মনে না পড়া মেরে তাই যে ভুলে-ভুলে ।
যে ভুলে তুই আছিস পড়ে সেইখানে যেন্ মেনে,
অভুল ভুঁয়ে যাবি কেন আজ-ধরিত্রী ছেনে ?
ভুলের আড়ার বন্দিস্ কেন পথের বাঁধায় ভুলে ?
আসার ভুলা যে নিয়ে ভুই ভুল পরাণ ভুলে ।
সেইবেলা আজ তাই কি ভাসে ? বিদুরে ভাবি তবু ?
জাগিস্ কেন তবে ?
প্রবাসী রে, মনটা কি তোর যাদুরে বা কো তব
পথ-পথেই ভবে ?

টুটা-ফুটা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কলিকাতা

চিঠিটা যে এমন ধারা হবে, ভাবিনি। ভাবিনি বলেই ভাবতে পারিনি। আমার ভাগ্যিস বরাবর পৃথিবী উল্টো করাই ধরে' এসেছে—বরাবর।

বন্ধু জবাব দিয়েছে—তোমার বিদায়ে হাত বাড়িয়ে রেখে এখন ঘর তোমার আছে,—জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত।

এ কথাটা বড্ড বেশিদূর টানে :—এটা ও বরদাস্ত।

আরো লিখেছে—জীবনের উপর তোমা করো না। এই বহুধরা ত' বিধাতার আশ্রমের একবিন্দু অন্নসত্র। ইত্যাদি।

তারপর ওদের পাড়ার খোড়া-ওঁচা বাজা রাস্তার ছাকড়া গাড়ীর আওয়াজে যা অবিরতনীয় আনন্দের মধ্যে বাজে—তার বর্ণনা। তবে একটা চন্দ্রই আর যোলআনা একসঙ্গে খোলা খিড়কি পেয়ে ওর ঘরে ঢুকে বাস্ত বেরিয়েছিল, ঘড়িকাটার ওলায় ঘরে পড়ো বেয়ালের ঘুপ্‌সি অন্ধকার কোণে,—তবে বাংলার একটা শুকনো ঘরা ঘাস ঘুঘলা রোদা মা-হারা খোকার মতো ওর দিকে চেয়েছিল ফল রোখে,—তবে কোন্ খাঁয়ে খোড়া একটা ঝিঁঝিরি ঘেরে ঘায়া-বেলা অন্ধকার 'তলে বসে' একটা ঘাগল-ঘাবাকে খাটাস পাতা খাইয়ে দিয়েছিল,—আসই আবা,—ঘুমো, ঘ্যাপ্‌লা। এবং শেষ লাইনে সমস্ত বিষুর দুখন,—এ জীবন-প্রিয়ার প্রথম চুমনো মতো—তারপর অনেকগুলি বিশেষণ।

চিঠিটার মধ্যে মধ্যি-অর্ডারে একশোটা টাকা। ভেবেছিলাম ফিরে যোটা ফিরিয়ে। বিদায়ও আর কিছু নয়, আর চাবি বাইরে দিয়ে না গেলে আইন-চাপ থেকে নাম কেটে দিয়েছে।

কিন্তু আমার টাকা ফেরে পাঠানোর মধ্যে বিশেষ একটা আবদা ছিল—তার প্যাচেই ও অবশ হয়েছে। ওর মনটা যেখানে আলার মতো পাড়ুগেছে সেখানেই বাধ্‌না ফেরেছিলাম। কিন্তু একেবারেই একশো টাকা উঠে আসবে, ভাবিনি।

হঠাৎ দেখা বড়ুর সঙ্গে।—আরে হাজা যে, কলকাতায়?

ওর মেজেটা অঙ্কের চুপ্‌সো বাসার থেকে কিছু-ওঁচা হাত বের করে' আমার হাত ধরে' বল্ল—তোর কাছেই আসছি। কি হয়েছে তোর? জামা বুঝি চিমটে ভাঙ্‌ছেন।

গম্ভীর হয়ে বল্লাম—সে অনেক কথা।

—চল্ ঐ বেঞ্চিটায়, কিছু খাওয়াও যাক্,—আর আমাদের ছবের পারাগুলির উল্টোরো যাবে।

বেঞ্চিটা মধ্-ঘড়-ঘরা একটা গড়া ভুবুনির মধ্যে ঘুপ্ করে' পড়ে আছে যেন। ঘর গাছোয়ান আর আড়্‌লাদের আড্ডা। বেঞ্চে বসে সঙ্গে মুড়্‌মুড়ে করে ভাজা বাঁকড়ার ঠ্যাং।

চুকতে চুকতে বাজা বল্লে—এরা সমাজের জোরার লব-নীচতার খোলাটে পাঁক, আর ঐ গাছা বেশোয়ারের জন্ম জোরে আকুতে আছা খুলুয়ের ওরা এগরকার উল্টুনে জল। এরপর সঙ্গে সমার সংক্রিতে ঘরে' আনিয়ে দিয়ে হবে এরা আমাদের সংগোত্র।

বল্লাম—কিন্তু ভাই ঐ চিমটি মাছের ছিমুরে ওলো নয়। যোজাই বা ফলাই-করা পাঁজের-বেক-করা কাপ্, তাই দু' পেয়ালা চা দে।

এক ফোঁসে বললাম।

বন্ধু বলে—ওদের সমস্যাটা ভীষণ চাপের। এক ফোঁসে বলে' সমাজ নামে আমার ফোলা পিটুছে,—অবশ্য সমস্ত আলা বা বাসনা সব তাই চাপা প'ড়ে,বেরোলাম, ঘায়ালো বয়।

আবার বলে—ঐ দেখ্, ছোট্ট ছেলে অত ঠিপঠিপে বাপের মুখে ধারার তুলে দিচ্ছে।—বুড়োটার কি খোয়াস, বিশ্বচেলা ত' অভিশাপ দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেটা ভাই,—অনিমা! ওকে এক্ষুনি ছুটো টাকা দেব।

তারপর বলে—কি বোস বোস? তারপর?

চন্দ্র বলায়—বাড়ী ছেড়ে দেব—

এর পাড়ী কথাটা আমুলের চাপড় খেয়ে মুখ্যো মুখো বেচিটার সাংঘাতিক বিয়োগ করে' উঠ্ল।

—হাঁ আমরা সব বলছিলো, শুনছিস। বুঝ খেকে আমি। মুখ মুখ করে' পড়া আমাদের আহ্লাদ বন্ধুদের,—আমরা চলেছি।

এর চুমুক কালো চা গিলে বেব বলে—বেব বাড়ী ছাড়বি? বেব?

—হেডের ওপর এক থাবা থুতু ফেলে বলায়—ছোঃ!

—তবে?

—বাড়ীটা ছুড়ে-পাওয়া। বেয়াল বেঁধে বেঁধে সব জন্তুরা কবাট খুঁড়িয়ে দিলে, তাই। খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসেছি।

ছুটো হাতে কাঁধিয়া ঝাপটা ফেলে ঘরে' ঢাকা বলে—তাই বল। বন্ধ বেয়ালে আর কটা জানোয়ার বা ফোটানো যাবে? তার চেয়ে আমার এই কাঁকা আকাশ ঢের ভাল—বাঘরা তাতে বল। কিন্তু ভাই, প্রেমকে অবজ্ঞা করিস্ নে।

এর মুখ ছটো বাঘরের মতো ঘোঁৎ,—পাগল হয়ে এল। জানুয়ার, তুল আমার বল ভিজেছি। কথার চাবাটা অন্ত রাস্তায় ঘুরিয়ে দিতে হবে।

ও বলে—আমি প্রেমের জন্ত ঘর ছেড়েছি, তাই। সমস্ত পৃথিবী ত' বৈরাগিণী। সন্ধ্যারাগা থেকে ভৈরবের তপস্বীনতা।

—শ্যাম্পেন খাবে। তুল তুলতে হবে।

ঠোঁট্ কামড়ে বলায়—বিশ্রী।

ও যেন জন্তুর দেখ। বন্ধুকে সাধ্ল—অনেক কথাই। মেয়েটি বি, এ পরীক্ষা দেবে, তার ভালোবাসার অথবা বা'র নিশ্বাসের ও বন্ধুর খোরাকজরুরা আমাদের। সমাজের মুখে ভগবানের জাল ওদের আইকে ছেড়ে দিয়ে চায়, ওরা তা ছিঁড়বে। লাভবার মধ্যে লাভবার বিয়ে?

—আর যদি না দিয়ে দিয়ে চায় ছিঁড়ে যায়, বাঁধন যে ঢেলা,—তবে এই চলাচলবাণী অপূর্ণ অভ্যর্থনা,—মনু মনু এ বিরহ! বিয়ে নিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তার।

চা খাওয়া অনেকক্ষণই ফুরিয়ে গেছে, তবু একপো টাকার লোভে বাদুরে যে একগণ্ডা কেটে বাঁধিল, যেন ঘরটা ভরাট দিয়ে কেটে-কেটে।

বাঘার যে প্রথাত বেরিয়েছে। সোজা আছে, আজ নেই,—বাসিই ফেলেই চলে। আর এক কাপ্ চাও ফেলো হয়ে উঠ্ল।

এক চক্ষে বাদের ওপর প্রকাণ্ড একটা মশা বাদুরেই ও মলে' উঠ্ল—আহা!—তুই অনিলকে চিনিস্, অনিল মিত্তির?

—না। কে সে?

—কবি।

কথাটা এত ধীরে উচ্চারণ করল যেন ফেঁসিয়ে বললেই কথাটার পবিত্রতা থাকবে না।

বলে—বাসি প্রকাশ দিয়েই তুলা নিরুপম তুল ভাই। অন্তরাত্মও ত' অপ্রকাশ। নাই বা বোস রবি।

—কে হুতে বলছে? বেশ ত',—কি করেছে সে?

—ছোটো থেকে ওয়েলস্ পর্যন্ত যে যত বেশী চলেছে সে তত ও দেখেছে, তাই।—এই পারেরই ঘর। মানুষ কান্নার সমুদ্র পেরিয়ে গেছে,—কবিতার ছটি দিয়ে গেছে, তারপর মুক্তি। ও তারই অনুসন্ধান পাইয়ে।

—চল্ এবার উঠি।

—ও কি বলে জানিস্? বলে—অন্ধকারে তুলো ঘুমে ঝিমিয়ে দিয়ে যাই, বুক পেতে পেতে ফাটো রেখে দিই,—তারপরে নব তুল চোখ মেলুক,—অনেক বুক নিয়াই।

ভোর করে' উঠে পড়লাম।

বাজার বেচে ও বসে—বেমিনই দেখি, সেদিনই ফুরিয়ে যেতে। এইখানে অমিল ব্রাউনিংয়ের অর্থ।

কবিতা আওড়াবে তার হয়ত, নাক সিঁটকে বাধা দিই।

ফিরে এসে বলে—শোন্, আমি কলকাতাতেই থাকব এবার। একদিন যাস্, কবির সঙ্গে আলাপ হবে।

ঠিকানা বলে' দিল।

বহু ওর নাম রাজা। ও যেন একটা লাফি,—খেয়ে আসে। যেমন চায়ে, তেমনি খেতে,—বাড় দিলে,—আমাদের পাড়ায় হাটু পর্যন্ত এসে আর নামে না। দুপুরে চটি জুতো পা করেই থাকে,—ব্যাপারের মধ্যে ছেঁড়া-খোলা একটা গেঞ্জি গায়ে। বন্ধুদিনের চেনা বন্ধু যেন।

ও যেন বিধাতার একটা ঠাট্টা।

দুপাশের মোড়া অ্যাকাশে আকাশ লাল হইয়ে পড়ে' ঝুঁকছে পড়ে' আছে,—প্রভাত রৌদ্রের আলোয়ানটা গায়ে টেনে নিতে পর্যন্ত আলস্য।

আমাদের পাড়ার শিল্পনকার ছোট গলিটা রাতের ঘুমে এঁকে-বেঁকে যেখানটায় দুয়ে পিছে আছড়ে পথ পায়নি,—সেটা একটা বেজায়গির বস্তি। বাসিন্দারা সব ধাঙড়,—কেউ ভিস্তি, কিন-মজুর, ফিটার্-মিস্ত্রী, জুতো-সেলাই, কিরি-উলি, বেয়া ;—প্রভাত একটা বস্তির গায়ে যেন নানা রঙের ছিটের তালি দেওয়া।

আমাকে বিস্মিত হ'তে সবাই দিবে না ও। হার ধ'রে ফেলে আছে—কাল রাতে ঘুমুতে পারিনি বিলক্ষ। ভোর না হতেই পথর মুক হয়েছে।

আমি যে ঘুমি ভেঙে পথারার ক'রে রোজই এত ভোরে বাড়ী ফিরি—নাই বা বলাম। বলাম, ও যেন ক'রে—ভোরের জলে মুখ সব ধুয়ে খেয়ে। রাতের একটি তারাও মুছায় না!

ও আমার হাতটা ঠেলে ঠেলে ধ'রে বলে—আয় আমার সঙ্গে।

—এই বস্তিতে? কেন?

—আয়ই না। জীবনের বেউচির বহুতা বন্ধ ক'রে হাতে হাতে এই সব ঘিরঘিরে বহুতা খুলে দিই। সবর হাতা ছেড়ে এই মুক্তাকে আমাই তার দেখা পাই,—অমিল্ ছিল অর্থ।

যা ঘিন্‌ঘিন্ করছিল। কিন্তু হার পাড়ুলে এতদিন টাকার সংসারটার পাশে আরেকটা খুব বসতে পারে, এ কল্পনা যে আছে!

রাজা ওর টাঁক থেকে কতগুলো নোট বের ক'রে লাল-খাঁদা মাটির ঘরের লম্বা জানালার ধারে ধারে রেখে রেখে এগিয়ে চলল।

—এ কি রাজা?

—আজ এই পাড়াটা। রোজ এমনি ভোরে ওরের ঘুম ভাঙবার আগে পাড়ায় পাড়ায় পয়সা দিয়েই।

—তার মানে?

—মানে কিছুই নেই। ওরা ওরের ভোরবেলাকার জানলা খুলে অন্তত: দুদণ্ড একটিবার ভাবুবে—ভগবান আছেন। ওদের আকাশে ভোরের আকাশ লাল হয়ে উঠবে।

বলাম—ওদের ঘর-ভাঙের পয়সা জুটল।

—জুটুক! সবর দিনের হাড়-ভোড়-ভাঙা খাটুনির পর এক রাত জুটলই বা। ওরা বাস করে ওখু, দু'বেলার চাল, ঘরের ছেলের জন্য এক ফোঁটা দুধ। কিন্তু ভাবিবে তা। খুসি হবে ও' ওরা?

একটা জানলার খোপে একেবারে একটা টাকা পড়ল।

বলাম—এত জমা কা'র?

—একটি ভিখিরি-মুবতীর। রাতার মোড়ে ওর ছেলে হাতে ধরিয়ে দেবে ও ঘুমে আরেকটা মোড়ে বাঁধুতে চলে। ওদের কী বিরাট দারিদ্র্য তা ও নিজেই জানে না। ভালো ক'রে ভৈরী ক'রে খাওয়তে পারে না,—কেউ শিখিয়ে দুরস্ত ক'রে দেবারও নেই ওদের। ওর ঐ সরল হাসিটি তাই সুন্দর লাগে।

পরে ভাবে—ওর যা'র বয়স হয়েছে। যা-হাত ধ'রে ওকে আবার বাড়ী দিয়ে যায়,—আবছায়ে সবে মিশে যেন যায়।

—কে আবার ?

মেয়ে বলে—আমার ছেলে।

বাইরে এসে বলায়—রাতের বাসে ভাব-ছিটোনোর মতো এমনি ক'রে মোহাড়া সময় ছড়ালে কতুর হ'তে আর ক'তদিন ?

ও আমার কাছে হাত মেলে ধরে—আকাশের সমস্ত আলো ভেঙে মেলার আজকে কতুর হয়ে গেছে, তাই। জীবনে যে ভালবাসাকে পেল না সেই তা' অধিক, কতুর।

তোক দিয়ে বলে—ভৈরব সর্দারি তোর করার অধিকার আমাকে কে দিয়েছে,—এলে সবাইকে বঞ্চিত ক'রে ! আমার মায়ের দিল প্রকাণ্ড সুখের কারুবার,—প্রতিটি চাকায় এদের হাজার লাখ লোক আছে।

—তবু তোর চটিটার যা বুঝল না ?

—যারা চটিজুতোর মতো আর ব্যাপার নয় তাদেরই যা বুঝুক।

একটা লোক—বোবাজীবন বা-কথা তোটকার দুটো লাল উল্কা বুকের ওপর তোরে খাবুকে ধরে' ডান হাত তোল বলে—বেশ্‌লাই আছে দাদাই ?

ও খোঁজ খোঁজ বারিবারি একটি একটি ক'রে তোলা যায়;—ঠোঁটের ওপর একটা যা হওয়ায় ঠোঁটটা ফুলে গড়েছে,—মাছিরা লুব হয়ে উঠেছে তাই। ঠ্যাবাচির মতো খাবানো মেয়ে যেন জিজ্ঞাসায় চিহ্নের মতো,—বিধাতার জিজ্ঞাসা।

বলায়—তোমার ঠোঁটে ও কিসের ঘা ?

—বিড়ি বলায়ে আগুন লেগে গেছল। আধ্‌পোড়া ছোট ছোট যা বাকিছেছে।

রাজা বলে—বেশ্‌লাই ত' নেই। ঐ তোকের তোকান থেকে কিনে নাও যে।

বেশ্‌লাই নয় না থাকাটা যেন ওর অপরাধ,—এমনি ভাবটা তোকটার হাবে ও সমস্ত দিল।

তোকের তোকানটা নিশ্চয়ই বস্তির মধ্যে নয়। রাজাকে তাই বলায়।

ও বলে—তোকান এখনো তোলেনি বুড়ি। ঘুরে এসে কিনে নিয়ে যাবে।

বলায়—এটা ওর বাড়ি যেন।—আধুলার বাজে যা পেল তার উপরি-পাওনা। ও এই বস্তিতেই থাকে।

এও রাজা বলা করে। বলে—টাকির মেয়েরি বলবে। ওর পাওনাই নিয়ে যেতে,—তবু তোর ক'রে নিজের লাখী আছির ক'রে বলতে পারেনি—এই যা। আমরা ওদের থেকে বিধাতার আলো-বাতাস কেড়ে নিয়েছি চুরি ক'রে, আর ওদের সব বরাত-আছিকে চুরিয়ে নেবার আশিস্ এসেছে।

চলতে চলতে পা দিয়ে হাত ওর ছুরোটা ছেপে ধরলায়। টান মেরে ছুরোটা একেবারে ডিগি মেরে পড়ল—চিৎপাৎ হয়ে।

ও ব'লে উঠল—আহা ! মেন পথের মাঝে ওর পায়ের কাছে নীচ থেকে একটা বাধ-খোঁয়া ঘরা পাখিদের বাচ্চা মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর তোখে যেন সেই দরদ !

বলায়—কিমুতি-মুখে এক তোরা ছুরো কিনে নিয়ে যাস্,—আর ওর নিরিখির ছুরোই কিনিস্।

ও তবু বলে—আমার মায়ের ছেলের বাহুদুটি, কে আমার পায়ের বিষে চাইবে ?

সমস্ত রাতার পথটা ক'রে বিধাতা যেন ওকে একটা বাড়ি পাঠিয়েছিলেন,—বেহুদা।

রাজার প্রাসাদ খুঁজে বের করা বিষম দরে। চিহ্নিহিত অতে: পলিটার দু'ধারে খুঁটে-খেওয়া আমার বেরাদে ভাঙা,—চিহ্নিহিত বাড়ীটা সমাধানী বৃহীর জংশিতের মতো এখনো ঝিঁঝিঁ করছে।

রাজবিদ্যিরা যেমন ঘুরিয়ে তোকর তন্ত্রিল।

রাজা বলে—পাহারা বাড়াও। আর যদি তোমো চন্নুই বড়দুটো নিয়ে ঘর পাড়তে আসে !

সমস্তটা ঘর বাসিতে ঝিমুনিয় তন্ত্রর। তোলার একবেয়ে একটা ঘটো,—কাপড় হয়ে এসেছে।

বলায়—কার ?

জবাব দু'জন—ওর।

আমার হাতে এক তাড়া চিঠি দিয়ে বলে—পড়্। যে আলো ফুল ফোটায়, পাখীর ঘুম ভাঙে যাতে।

তারপর আর একতাড়া দেখা এনে বলে—এগুলো আমার চিঠির ছাপ্‌ই। মিলিয়ে মিলিয়ে পড়্,—মানে বোঝা যাবে।

মেয়েটি পাঁচার শুধু এক চাহনি। ধরন চা. ও পাঁচার পুরো এক গ্লাস বরফ-জল,—তাতে জান্ বলে। বাইশ অক্ষরও হয় না,—এমন চিঠির উত্তরে মানুষ পারা।

রাজা বলে—নাই বা থাক্ এর মধ্যে পাগলামি, রহস্য আছেরে,—কিন্তু একটি অতলস্পর্শ গভীরতা আছে। মনে হয়, অনন্ত কালের বিচিত্র পোকামাকড় থেকে আমি অনেকটি নির্বাচন প্রভাব ও জিন সত্তা ছিনিয়ে নেবে নিয়েছি অজন্ত ক'রে। আর অনেকটি নিশিযাত্রিও—মুমুক্ষা।

একটা চিঠি বেশ লাগ্‌ল।—ছুতোরের ছেলের নাম মোমাছের কবি আকন্দ মোমাছের ছেলে খুশি হলায়। ঐ গাছে-ঢেলা পক্ষিকের পাখা-চলা পাখের পানে আরো যে অনেক্, আমাদা করে' আছে—তাদের দিকেও যেন ওর চোখ্ পড়ে, তোমার থেকে ও তাই বিশুদ্ধ।

মীলে আর দশ চিঠি,—মোমাছ হিসেবের অবোধ আছে। শুধু প্রেমিকের কাছে ক'লেই হয়ত মেকাদার মুছে দিয়েছে;—নইলে ত' 'প্রীতিভাজন্—ইতি তোমার শ্ব।' —আর 'কেমন আছ? ভাল আছি।'

দু' কাঁধে দুটো মুহূরদারা দিয়ে একটা মোমা ছেলে ছেলে এসে হাজির,—আকন্দই। মনে হয়, ওকে আনালো শেষ ক'রে বিধাতা ওর মুখে একটা ধাক্কা মেরেছিলেন. —মারটা খুব একেবারে ন্যাপাপোছা। দুটো চোখের চাউনি মিউনো,—খুংনিটা যেন থেঁৎলে হয়েছে। মনে হয়, দু' হাত দিয়ে ওর মাথাটা দু' দিক থেকে চেপে ধরলে হয়ত দুফাঁক চোখা ধারালো হয়ে উঠবে।

একটা ফুর্তি—পোঁচা পড়্,—মাথার পা চাইতে বসল। একটা পায়রা ওর কাঁধের ওপর এসে বসে' গলা ফুলোতে লাগল। আকন্দ ওর ডবাকার কাঁধা-মাথা হাত দুটো দিয়ে মাথার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে—দুটো পায়রা থাকত। এক পায়রার লাই, আরেক পায়রার ভেবেনমুখ্!

—ব'লে জিভ্ বের ক'রে ঠোঁট দুটো চেটে নী ক'রে নইল।

রাজা—কবি কোথায়?

—পাশের ঘরে,—চল্।

কবি ত নয়, তালপাতার পাঁচ একটা। একটা মানুষের ওপর বুকটা পেতে উপুড় হয়ে কবিতা লিখছে।

রাজা বলে—ওরে কবি, প্রণাম নিলোও—

কবি উঠল,—বুঝো, বেহাই বাবুদাদের ঘরের,—রাজার পাশে কোটাল। কিন্তু গর্তের চোখ দুটো ডাকুর মতো,—শুধু কাটেনা, বেঁধেও।

পাল দুটো পাশে ঠাসা। দেয়ালের গায়ে পিঠ রেখে এক পাশ পায়ের পিঠ ফেলে পাতাটি বাড়িয়ে দিয়ে বলে —ও কিছু না—

পরে একটা হোমিওপ্যাথির শিশি থেকে সবটা বটি নাকে গুঁজে বলে—কবিরা তা' নয়, এক একটা পশুরি।

চারির ভিতরকার আওয়াজ বের।

শুধু ঘরা কাইলোপাস, ঘরা তারা, ঘরা বরীর গান। দেবা মাটির, ছেঁড়া তারের, ভাঙা সেতারের,—

আঙুল দিয়ে মাটির থেকে পায়ের ডিবৃত্ত গুলো তুলে তুলে এনে কবি বলে—একটা একলা দেখ দেখি।

—কারুমানার একটা ঘুসির ঘোমর পথায় দিয়ে দেখ, তাকে খারিজ্ করে' দিলে,—তার কবিতা।

মা'র গল শুকিয়ে গেছে, প্রিয়ার অধরে কণটতা, বন্ধুর আমার নীচে ঘোরা,—

রাজা বলে—কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে কবির একটি ঠাঁকির। —দেখ্‌ছিস্? ঘোরা নৌকা ফুল দেখ, ঘরা গাছে ঘর। দেখে কবি কিশলয় সজাগো মনে,—রাজা মাটির বুকে নদীর ঘোরাবা। 'আকন্দটা' ব'লে ঘোনাও না কবি।

—মা তার ছেলে ছাড়িবিনে ফেলে গেছে,—সেই ছাড়িবিন আর নেই, যেখানে একটি আকন্দ গাছ, তারে দুর্বল ডাঁক শুধু একটি ফুলমন্ত্র—

রাজা চেঁচিয়ে বলে—এই কবিকে আমি জলদের সভায় বার কবিয়ে দেব। তোমার একটা বই আমাই ছেপে দেব, বুঝলে?

বরাদ—কবিতে যদি কিছুর মতো পুল্ কবিস্, তা হ'লে তার হাড়-গোড়ই ভাঙবে, রাজা। তাকে ছুঁয়ে দে।

কবি আর এক শিশি থেকে আর এক টিপ্ নস্যি নিয়ে বিপুল বেগে টেনে ফেলে—ধারান, এত ভাল জোকো খেয়ে যাব—

হাতার এসে রাজা বলে—এর প্রতিটি কথা না শুনে শেষে ভগবান কাঁদবেন, বরদেব—

বরাদ—বলুন্। আমার বাবজাদি বড়ভুটার মতো বলেছেন। তবুবারের টুঁটি ধরে' তোলো তিনিব আছে বলতে পারিস্?

ন বলতেই লাগল—রাজা আদুরে লাউল নিয়ে, মিষ্টি হাঁড়ি-ভুরভুরে নিয়ে, মধুর পাঁইতি-পুতুল নিয়ে,—এল বলে'। সবে সবে—জলোচ্ছ্বাসের মতো। বিদ্রোহীর বল।

—ওদের মুখে কথাই কাঁদিয়ে দেখ্‌বি—

—নিশ্চয়ই। বাঁদরে প্রিয়া আমার কি, কতটুকু? বাবিস্ ঐ পথে-পড়া ভিখিরিটিরেও আমার প্রিয়া ভাববে, কবিতার মুখায়, তাদেরও বলবে—

সর্বনাশ। ওর প্রেমে যদি পেয়েছে বুঝি?

চায় থেকে মেয়েরা কবির সঙ্গে মেশা,—মুখোমুখি দুঁড়ছে।

বরাদ—এবার রাজসভার কবিতা নাকি?—খেপ্‌বে খেপ্‌বে কোন্ দিন মোটরের তলায় ছিঁড়ে মরবে—এই তোর ভোল ছেড়ে?

পাশের দিন্ ফেলে ও তবু বলে,—তার ঘোলাটে চোখ দুটো রাজপথে ঘুরে এসেছে—একটা চাকরি খুঁজতে।

—চাকরি? কেন?

ছেঁড়া শার্টের বুক-পকেট থেকে একটা ছেঁড়া চিঠি বের ক'রে বলে—বাবা তিনদিন হোল মারা গেছেন, ছোট ভাইটারও অসুখ হয়েছে।

বরাদ চলগুলো ছিঁড়ে যেন কথা বলেন।

বরাদ—চাকরির জন্য আর চৌ-চৌ তবুলেই কি ছোট ভাইর অসুখ সারবে?

—কিন্তু মোটা সংসারের খুঁটিটা এবার একেবারে আমার ঘাড়ে ভেঙে পড়ল যে। তাই রাতেই চিঠি পেয়ে রাজা একশোটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই—

বরাদ—আপনার ত' রাজাই আছে—

—আমার নয়টি অপোগণ্ড শিশুও আছে। বিধবা বোন্—তাদের মোটা পাঁচেক লোক হয়। আর যা। সেদিন একটা ছোট ভাই ছিল, সেও আজ মারা গেল।

পরে পানের ছিবড়ে গুলো থুতিয়ে ফেলতে ফেলতে বলে—রাজার কাছে কত আর হাত পাতব? অনেক লোকই ওর ঘাড়িয়ে নিজের ঘর একটা একটা মুটো করে' নেচ্ছে। আমার জন্য ওর যা হয়ে থলেটা একেবারে উপুড় ক'রেই ফেলতে হয়।

—কিন্তু এত টাকার চাকরি কি মিলবে?

—কখনো না।

—তবে?

—তবে আর কি। বেঁচে থাকব তবু। জীবনের শুকনো ডালায় একটা ভাঙা ছিঁড়ি টেনে থাকব।

হেসে বরাদ—আজ রাতে ঘরে ফিরে একটা কবিতা লিখুন তো। মুচি মেথরানির ঘরে থেকে সেলাই অসুখ মুখের পেলনা, বিস্কুলালা পেলনা ভিখারা, ছেলে জাল ফেলে পেলনা একটা চুনো পুঁটিও। উচিত পেলনা মহেশ, আর কবি পেলনা চাকরি।

চুরুটো একটু হাসিতে ওর চোখদুটো খানিক খুলিয়ে উঠে যায়।

ওর মুখের খেপ্‌ভাবে জীবন ঈশার যেন।

যে মেয়েরা গলিটা দিয়ে রাজা বেরিয়ে এল—তবে এবার আবার দেখল, মনেও ভাবিনি—সেই মেয়েরা।

—এখানে?

কাপ্‌লিয়ার মতো গাড়িগুলি ঘের ক'রে আছে—আমার জন্য সকল দরজাই খোলা। আমি যে রাজা।

—এদেরও পরনে ছিলোস্ নাকি? কত ক'রে?

এক বিকেল বারে কোন্ আলি এক ইষ্টিশানে একটী মেয়ে বাসি বারার পারে ভরে' ভরেকটা টাকা দিতে দেখেছিল। বাসী মেয়েটিকে গ্রহণ করেনি, ফেরে দিয়েছে। ও কলকাতায় মাসীর বাড়ী যাবে।

রাজা বলে—যে স্বামীর হাত অত্যাচারীকে ঠেকাতে পারেনা, সে পারে অবলা স্ত্রীকে ফেলে ফেলতে।

বরাব—মাসীর বাড়ীর নাম করে' মেয়েটা বরাবর এ পাড়াতেই উঠে এল বুঝি?

—খোকুই না—

—যাক্, আমার বোন কাজ আছে এখন। তুই হ'চার—

—তার অবস্থা খুব খারাপ, বিমুদিদি—বোধ হয় বাঁচবে না। দেখতে যেতে হয়। অকাল-পথ্যের জন্য টাকা দিতে এসেছি।

পরে খুব ধীরে ধীরে বলে—এমনি প্রতি ঘরে আবার বিরহিণী প্রিয়া তার জন্য পথ চায়—

বাধা দিয়ে বরাব—ও ও বোধে ভালবাসে বুঝি?

ও কিন্তু বলেনা, রাস্তার লোক-চলাচলের দিকে চেয়ে থাকে,—উঁহুম, মানুষ।

আবার বরাব—ওদের মধ্যেও এ ভালবাসা ঢুকেছে তা হ'লে?

ও শুধু বলে—প্রিয়া, প্রিয়া—

বরাব—ওর নয়, বোধ হয় বিমুদিদি এবার।

কবির সঙ্গে দেখা হয়েছে,—তার হাতে একটী চৌকো খাতা।

বরাব—কিসের কবিতা? সাধারণ?—না পড়া উচিত?

ও খাতাটী আমার হাতে তুলে দিল। বিমুদেরই কোম্পানির রেকিং-রেকিটের লেখা খাতা একটী।

কবি নয়,—রেকর্ডী।

পাতলের কাগজটা পুঁথির, যাকে যেখানেই তুলেছে, সেখানেই রেখে। তাইর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ঈষৎ ভরে' ঘরে—এখানেই সভ্যতাদের কবিতা লিখন জীবনের।

মনটা ভিজা,—ভারী।

ফের বলে—কোথায়-পেৎসাদ সেই বুলিটা এখন সত্যি সত্যিই আমার মতো জীবন্ত হয়ে উঠবে। আমার পাড়ার পাড়া আমাই থেকে যাবে,—তা থাক্।

খাল বেয়ে পায়ের কষ্ট পড়ে, জামার হাতা দিয়ে তা মোছে।

পরে একটা লাল খাম বের ক'রে বলে—নিন্ আপনার বেতন। আমি নিয়ে করবি।

—সে কি কথা? ক'টাকাই বা মাইনে?

—হোকনা আটাশ টাকাই। কেন অসুবিধা তুমি?

—নিজে কেন এলেন তাই জানেন না, শুধু শুধু আর কতগুলো—

—কে বলে জানিনা?—জেনে শুনে এসেছি, ঘরে, বৌমেলে ফেলে। আসুক ওরা সব ছেড়ে ছাড়ার ঘরের ছিঁকে-পড়ুয়ার মেলায়। বিধাতার হাতুড়ির ঠোকর সবাই বুক পেতে নিয়েছি—খাল ফেলে বাড়ি;—বিধাতার হাতুড়িতে!

—কিন্তু ওরা যে নিরুপায়—

—কে বলে? আর আমাদেরই বা কি অপরাধ ছিল? আমাদের পায়ের প্রাগৈতিহাসিক দেশ ছেড়ে কি ক'রে তা হলে? আমাদের রোগ, জীর্ণ জরায়, দারিদ্র্য—বাবার কাছে পচ্ছিয়ে রেখে যাব?

বলে' মুকুমুক্ করে' ফেলে পায়ের ঘাম ফেলতে—ভরের ছিটে।

বরাব—অনেকে আপনাকে নিয়ে করতে দেবনা। ফেরের ব্যাপারে আমার।

ছেলে কবি বলে—ওরা তা জানে। বলে—ও কিছু না, ফেরে যাবে। ফেরো মানুষের ফেরে নিয়ে বাদের জীবন ভাসান,—ফেরে পায়ে ধরে' ফিরে চায় তিনিয়ে। শুধু তাই নয়,—মাসে হাজারটী টাকা পর্যন্ত। একটা ফেরেন্সারে অমনি ছুরি ফেলে মন মোছে। আপনি যদি 'না' বলতে যান, তা' ঠেকাবে।

যাচ্ছে পারেনা, তাদি পড়ে।

—আপনি যাবেন বেরেন?

—নিশ্চয়ই। হাজারটী টাকা হলেই ত—

—ঐ বেরো ব্যাবের ছেলের উপায় কি হবে?

—বিধবা হবে। দেখা হয়ে হ'য়েও যেতে পারে।

—আপনি কবি হয়ে এই নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেন?

—যার কবি আমাই ত'। এই পৃথিবী যে সত্য ,হয়েছে, সেও ত প্রকাণ্ড কবি,—বেরাদী নয়। আমার সংসারে যে যাবে, আমার ফুরাবে যে লোক তোমাকে, —আমার তাবী বধূর এসেছি যে তুমি ব'লে রেখে—

—কিন্তু উপায় ব'লে ত' কেউ নেই।

—নেই?—এ যে আর যেতে হয়ে মাত্র হবিষার পড়ে —না, আছে। ভেবেছেন না, ভবনের বাড়ি ফুঁড়ে মাল বেরায়,—অবশ্যই ধনিক নক্ষাটীকুর আমার ভবাদোষী পাও। কিন্তু ভোগে—

প্রচণ্ড কাশির বেগ এল। বৃদ্ধটী যেন ছিন্ন বেতে কাহিল-কাটী হয়ে যাবে:

মার মুখ তাদি ব্যাজার।—ব্যাপার কি?

ভূপালে, আমাদা ছেলেটী আদি পালিয়েছে। বাদি হাতে অধিক নয়, আমার ভোজনের তলা থেকে যার তিনিশ দশ টাকার নোট নিয়ে।

—পুলিশে খবর দিয়েছিস্ ত'? পাজি, বেইমান ছেঁড়া—

ও শুধু যায়—টাকাটা ফুরিয়ে গেলেই ফের আসবে। আমার গায়নাগুলি ভবনার আকাশে উঁড়িয়ে দিয়েছি, আমার নিজের নিজের ভোটরে ফিরে এসেছে। দেখি বুড়িটাকে যা পেটাই পিটুনায়, আবার সন্ধ্যাবেলায় এসে পা চাইবে ফল। ও-ও আমার ফিরে আসবে।

পরে যায়—সেই ডিবিডি-ভেরেটাকে খুঁজতে এসেছিলাম। দিন তিনেক ভোগ হয়ে আদি যায়া পড়েছে। অথচ এর মা'র বন্ধকের গাওলি সব গুলিয়ে ভেজে ফেলেছে।

মা'র যা গুমিয়েছে,—এ যেন ওর প্রথম আক্ষেপ।

যায়—তবিও ত' আর ভোগ নাই,—দুই ত' তাদি এবা তা ব'লে।

—এবা? তাই একটু ভেবে যায়—ভিজের ভেবে সময় প্রাণ ভরে' হয়েছে। কাল একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে—আমরা আমাদের নিজের ভালোবাসায় পৃথিবীর সকল যায়া ভুলে গেছি, সেই নিজের ঘর ভেঙে আসি।

চিঠিটা পড়তে দিল। পেয়ে আছে—বি, এটা পেলেই ছাড়া পায়। আমাকে কে আর বাঁধে রাখবে? তুমি আমাকে চিঠির বিয়ে দেও।

যায়া চিঠিটা ফের মুড়-পকেটে ভেরে যায়—একদিন নিশ্চয়ই আসবে—যেদিন পৃথিবীতে এর অকাল দুঃখ থাকবে না।

বন্ধুকে ভোলায়—দুঃখ ভোগ নিয়ে অবাক নয়,—কর্তব্যের।

আমার কথার ভোরো ভাব না পেয়েই যায়—অধিকে ভেরাদী হয়ে দুঁকতে হবে না, পরস্পর মাঝে প্রিয়া যেন বিকিয়ে ভেবে না,—আমার সব ফুরে যাবে, ভরাট্ হয়ে উঠবে।

পরে যদিন ফুরে যায়—অনিলকে টাকা দিয়ে ভেরেছিলাম, বিয়ে না। ও এখন যে পাড়ায় আছে, —বীভৎস। যাত্রী থেকে সব এখানে এসেছে—এক-পাল। ও এমনি করেই আত্মহত্যা করতে চায়। ওকে কি বাঁচানো যাবেই না?

—না।

যায়া কিন্তুকের মতো আমার দিকে চাইল। যায়—এর পরিবার-প্রতিপালনের ভারটা আমরা দু'জনে নিই আয় না। আমিস্ অনিলের মধ্যে যদী যায়ত্রী কাজ্ছে। ওকে এরকম ভাবে ফিরে ভেরে দিলে আমাদের ভেশের আত্মার অবমান করি,—লুকোনো প্রতিভা খুঁজে বের করে' ফুটিয়ে তোলার দায়ত্ব করাও ভেশ-সেবা।

—কিন্তু সম্প্রতি আমাদের যে পরিবার-পালনের ভোক হয়েছে যজ্ঞ বেশি! আমাদের পোষাকপালে প্রিয়ার

চন্দ্রবিন্দু ত' পড়বে না, মাথা-এর পোড়া কাঠেরই লাগ পড়বে! পড়ুক।

বলে' চলে' যেলাম।

ও বাড়িতে ঢুকেছে—তারা একটা বিশালের মতো।

মাথা আবলাম দুবলা। বি, এ পাশ করেছে এ বছর।

মা বলেন—বুই খেয়ে যাস মানু, শুধু বি, এ পাশে কি হবেই?

বৌদি বলে—বি, এ পাশটা যেন শুধু চাইবি। তোরিয়া ত' আমার চেয়েও ভালো।

—হোকগে। তাই নই।

বিয়ের রাতে মেয়ে-মহলে আমি বলে' আছি বীর-বহলিস্-এর মতো। হাতে ছিপ ঘড়িয়ে বাজা এসে ঢোকির। আঙুল নেড়ে আমাকে ডাকলে।

গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। বলাম—যা বলবার, এখেনে এসেই বলে' যা।

ঠোঁট-দুটি নীলের মতো। চোখ দুটো চাদপে। এসে কানে কানে বলে—তু-কে বলিস্ না-পাওয়ার মধ্যেই—

কথা শেষ করতে পারে না—গলা আটকে আসে।

বলাম—বলবে।

তু যেন হয়ে যেতাটার তলা থেকে একটু হাসবে।

রাজা ত' নয়, পাসক-বেঁধা ঘড়ো কাক একটা। ও চলে' গেলে মেয়ের দল তবে ঘিরে ঢাঁটা করবে। কেউ বলে—ডিগডিগে যাস্। কেউ—ওঁচোমোতা।

তু খালি মুচকে মুচকে হাসেই।

খাবার আর একটা পাল পায়—রাজার বিয়ে। খাবারে তু-কে দুজনেই নেবলে।

তু-কে তখন চিমসে হয়-এর একটা কবিতার পথাথ বুঝোছিলাম। মিলেস্ নেয়াস্-এর।

বলাম—যাবে নাকি?

—যুব।

একাই যেলাম।

রাজার বাড়ী যেন পড়লাম,—এই ত ঘটে। তবে?

—যেমন ঘটুক। পড়ুক।

নয়ন ছিনে চিনে যে বাড়ীটায় উঠলাম,—রাজা আমাকে ডাকা করেনি ত'?

ঘর পিঁড়ি যেয়ে উঠে যেলাম।

এক কোণে একটা বজকোলের কাপড় একটা মেয়ে-মানুষ পোড়া,—ঘরদোর, বিছা উঠছে। বিছের রাজা,—মেঝেতে ঘুমে কোঁচা কোঁচা করে' জল চালছে—ধুয়া-মুছাই হবে।

আলো আলা হয়নি, তুদের বাড়ীর এক টুকরো আলো এসে যেয়াসে পড়েছে।

বলাম—তোর নাকি আজ বিয়ে?

তুসিক যেয়েটার ঘুঁড়কালো মুখের কাপড় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—হাঁ। যেয়াছিস্ না আয়োজন? সুন্দর করে সজির একটা ঘাট,—বরাবানুষের সিংহাসন।

যেয়েটার মুখ পর্যন্ত কাপড়টা টেনে দিয়ে বলে—তোর সিঙের পাতাবিটা খুলে ফেল্ ভাই, ছড়িটা ঐ কোণে রাখ। তোকেই বাঁধ দিতে হবে,—আর কেউ নেই।

সামনে একটা আয়নার টাব ছিল, লাঠির ওটাকে ঠেকে পিঁড়ি যেয়ে যেয়ে যেলাম।

রাজাটা যে এত বড় অমানুষ, ভাবিনি।

রাতে বিয়ের মুখে পলাশের অর্ঘ্য দিতে হবে—

দিল্লীর লাড্ডু

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশী

ঠিকই। বিয়ের-পত্র পেয়ে খোকার পত্রে পেলুম। ব্রাহ্ম-মতানুসারে বিয়েতেও কার্ডে নবিনের অনুরোধ রেখো,—পরিহাস নয় তো। বিয়ের তো ছোটই না, আর—খোকা এমন ঠক আছেন! এ ঘটা কি ব্যাপার! ভা-ভবনে যোগ্য।

বন্ধু বললেন—"ব্যাপার কিছুতেই কি,—গবেষণা চাই।

হাঃ—তাও তো বটে, সমবায়ী বলিলের মত শীঘ্র কেলো হল তো,—একটা পড়িনি। গবেষণা ব্যাপারটা কি!

আগাগোড়া সো বেরোবার, গোলোচনার মত; গুপ্ত-বিদ্যা হবে!

তাহলে অজ্ঞান-বিষয় নাকি! হুঁ, আর কি সে ব্রাহ্মণ আছিরে বাবা! খুঁজেপেতেও খুঁজিয়ে মেলে। বাবু—ওটিন কিছু নাকি?

ওটিন বই কি। বিয়েন বিক্রি, বাজাবাজা নিয়ে,—চিন্তায় পড়ে গেলেন।

আরে, বিনোদ যখন বলছে,—তখন ব্যাপারটা খুব হবে যাবে। ভালো ছেলে,—ব্রাহ্মণের ঝুঁকি আছে,—ছোলো চিন্তা নেই,—তা ছেলে নেবেন।

এই সময় প্রফেসার চট্টোপাধ্যায় এসে পড়লেন, এসে উপস্থিত হলেন।

এসেই বললেন—বিয়ে যাচ্ছেন তো,—নিমন্ত্রণ পেয়েই থাকবেন? খাঁটি আয়োজন,—খেতেই হবে। না খেলে ঠাকুর বড়ই দুঃখ হবেন।

তা তো বুঝতেই পারছি, যেরূপ ভক্তি—খেয়ে খেয়ে মহাপ্রসাদদের মতন হবেন দেখছি। যদি যোগ-ভক্তি হয়ে যায়েন—তা হলে তো খেতেই হয়,—হয়ে যাবেন। কিন্তু ওই গবেষণাটা—ওটা কি; ও আবার, ছুকলো কেনো? আপনি চট্টোপাধ্যায়, আর প্রফেসার—খুলে বলুন তো।

ওটা সেই সেকেলে ধুমের কথা, বহু প্রাচীন—রাজাদের বিয়ের দিনে গবেষণা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এর অর্থ—একটা কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো,—কিছু যার করবার ওরে। সোজা কথায়—ঠক-বোঝা।

হুঁ, তা তো আই বরং যখন থেকেই ঘরে আসছি। বাজারে প্রথাত এক বাঁধি আবলে কথা হয়েছিল, যে বরকেই বাঁধিয়ে কেউ এসে যাবে একটা মস্ত গবেষণা করতেন। বলতেন—"ভালো করে পড়ুক, ভালোমতে দিয়ে, আসল থাকুক।" আজি যাদুরে পারে বলাই। কিন্তু সব বর, চাবি বাজার কাছে। অজানতেই গবেষণা সুরু হয়ে গেলো। অনেক চিন্তার পর—খুরির পাতলা কথাটা নিয়ে আলোচনা বিলটা খুলুম। যদি কিছু নাগালের বাইরে! কেন—গবেষণা! বাবা খুলে গেল,—বাঁকাবির পাঁচালী বানিয়ে ফেলুম। এক একটি পাকড়াই, এক পাক ঘোরাই—তার পর বুঝতেই পারছেন। বিলটি বিয়ের গবেষণায়—বুঝিয়ে ২৭ ছত্রা কথা লাগে। অবশ্য বাবা বাধিয়ে বাবু করতে হয়েছিল। কিন্তু গবেষণার পেছনে তো যেমন খুব বড়, খবাই,—বাজারের হাতে ধরে খেলেও বাবার হাতে বাঁচোয়া ছিল না। তা-ই বলা বললেন,—বললেন—"ও তা বিলাতে বাইরেই বাহনে হয়।" বাবা বললেন—"খুব বাঁচবে—বৌমা-ছেলে অবর হবে, সেইটেই তো আমার ভাবনা,—বহুমান বাবে দেখছো কি!"

আসলে তো বলাই গবেষণাতেই জীবনটা কেটেছে। বাবা বাজারে কি বলছেন, সমবায়ের আর আপিসের এক

একটা ডিমার খাস্-খাস্ খুরোচ্ছে। বড়-বাবুদের বাড়িতে চলা আড়াই বছরের কথা এর মধ্যেই,—আমি ব'লে আর কিছু হবে।"

ভট্টাচার্য্য মশাই বল্লেন—"অবশ্যটা ঠিক ও সাহেবের ডিমা নয়,—একটু তফাৎ আছে। ডিমাটা এখন হওয়া চাই—যার ফল—ওপরকে মুখন কিছু দেখে।"

বসন্মুখ—"অর্থাৎ—ফলে কিছু কিছু না কিছু—আপাততঃ কিছিৎ খাই হবে। তাতে আমি রোই মশাই। ওই নিয়ে থাকগে তোরা।"

ডিমীর ওপরে আমার শ্রদ্ধা অসীম। বোধ হয় —"বাবাজীই" শোনবার আগেই "ডিমী সাহেব" কানে পৌঁছেছিল। ডিমীই তাকদের ব্যবোবার দিয়েছে। মুক্তকেশের সূত্র এইখানেই পাকানো হয়েছিল। অবশ্য আয়না কি আছে! যদি তখনকার খাঁচড়ে থেকে যথা-নির্দ্দেশের সাধনা করে দেন,—আপত্তি বোধহয়ই করবেন না। আশা হয়ে খেলো আমা ডিমারী—ডিমিরী আমার কাজ করবে কি? তাদের ঘরে মহাপ্রস্থানের পথ খুলে দিলেন,—আরো খোলাই আছে,—কেউ রোধে না। সোজা চলে যাও!

সবচে মুক্তির এখন স্নান আর ডিনমা। শ্রীকৃষ্ণের পর গুরুভক্তির জোর তালাতে এক-এক মহাপুরুষ আসছেন, আর পরিষ্কার করে দিয়ে যেতেন। আমার নূতন ডিমী বলিয়েছে,—এটি সবচে ভালো—নূতন পরিষ্কার। এখন সে-আগল নেই, তেমন অবশ্য নিজের গুরুভাইরও আর সোজা যাবার।—

যাক্, বর্ণক্ষেত্রটা এইখান থেকেই শুরু। যাক্— আপনারাই যান্। যদি ছোটোখাট মতো একটা কিছু বাধাতে পারি জো,—আর, যেমা থাকে তো,—better luck next-

প্রফেসার ভট্টাচার্য্য বললেন,—"আপনি অবশ্য তাদের জেনো—ডিমী সবচে কিছু বলবেই হবে।"

ডিমি-দা উৎফুল্লিত-কণ্ঠে বলে উঠলেন—"তবে আর কি, সে অভিজ্ঞতা তো বিলক্ষণই আছে।"

পূর্ণ-মূর্তি একটা দুর্লভ বিশ্বাস চোখে যার বসলেন। বসন্মুখ—"আচ্ছা বেশ, সেই চেষ্টাই পাবো।"

ভট্টাচার্য্য মশাই বিদায়ে এস, এ, ডিমি বল্লেন —"তবে কি জানেন, ডিমীর সকল ডিমীই ডিমীতে যাওয়া করে লিখিয়ে হয়েছে, একটু তফাৎ হলেই অমনি অমনি প্রতিবার এসে সবচে,—সত্যের ওপর তার ডিমি কি না। এই নূতন না দেখে—ডিমিনাথের চোখের ওপর এসডিমিনেশনের হাত লাগাতে ব'লে। আমার তাতে সব নেই,—যান্ সাহাপেক আছে, পাটিয়ে দেবো অমন, একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন। অমন পাঁচা পাই আর নেই।" ইত্যাদি—

বসন্মুখ—"আপনি দেখে দিলেই হবে,—ও-সব পাঁচা ডিমির ব্যাপার যার তারেন না।"

ডিমি চলে গেলেন, কিন্তু খুব খুশী হয়ে নয়। ডিমি-দা বল্লেন—"ওর বাজনা ডিমোক্রিসেস্ বিষয়ে হাত দেওয়াটা অমন-সাহসিকতা।"

ডিমিও উঠলেন, আমি ডিমুর্গা উঠলুম।

কথাটা অনেক দিনের, বোধ করি ১৮৭৯।৮০ সালে। আমাদের বর্ত্তমান রাজার বাবা তখন ডিমি খেয়ে, ওলেন্দ্, তিনি ডাকে-জমাণ এলেন। রাজা হবার আগে খাস ডামুকের আসনে আর তুষার দেখবার ডীষি। তখন রাজধানীটা তলকেজার হলেও, রাজধানী ডিমীতেই বসতো। "ডুমঞ্জনযাত্রায়" যখন যেন—ডিমী-দরবার— ভারী ধুম, রাজারা চারদিক থেকে ডুড়-ডুড় করে এসে পড়ছে, সোনার গাড়ী, রুপোর ডাণ্ডা, মুক্তোর ঝালোর। কারুর রাজীবি পালের ডাঁড়, আবার মখমলের উপর লাল ডাকের কাজ। রাজারা নানা-রাজিয়ে যোড়া— পরীর যে'র পিঠুক-চুপ্‌চি। পৃথিবীর তুরাশি এ বৈভব সম্ভব নয়। এক একজনের আজ যেন তুষারে মুখ হয়ে যাবেন।' ইত্যাদি—

বসন্মুখ—"উঃ, তাদের এত রাজাও ছিল, তবে কে যত্ন ইংরেজের যেন!"

মতি মাষ্টার বললে—"চুপ্ চুপ্, সাবে ঢিঁই দুঁই না,—সব ভারা মিথ্যে কথা। প্রয়োজন না দিলে তো বাবেই যেলো,—দিন কাটছে না।"

মতি মাষ্টার ছিল আমার,—তবু আমারি যা কেবো বলি—দেশের অর্দ্ধেক লোকের সংসার,—আমার খুড়ো মশায়েরো। ক্রমের ঘায়ারে ক্রমে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এসে ঘাড় গুঁজে আজ সাত বছর মতি মিস্ত্রেছে। এখন বয়স বাইশ বছর। তার পায়ার পড়ে আমারো তার বয়স চলছে। সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়—আমাদেরও হয়েছিল। কিন্তু কেবলি ভাবছ ভালো কেবলে পারে না,—তাদের সইলো না। তাড়াতাড়ি সব দিন বছরে দিয়ে পাস করে মাষ্টার হয়ে এলো—বলে বুড়ো বুড়ো ছেলেদের পড়াতে লজ্জা করে। আমাদের দেশের লোকেরা এমন সব অভিমান ছাড়লেন, যারা আট-বছরের ছেলে পিটতে যাবে, বা তাড়াক তড়াক করে মাঝে মাঝেই বাড়ী গ্রামে এসে ছেপে বসলো—বাড়ীর দেখে ঘর-দার নেই, ঘরে-সংসার করা নেই। ভালো—না হয় চুলোয় যাক্, হাত যশ। মাষ্টার কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে—আমরা চুপ করে থাকি,—তারা চুই উত্তর দিয়ে ঝিমিয়ে যায়, একবার কেবেও দেখে না—চুপ করে থাকি কেবো। তারপর এই সব কথি থেকে—তারপর থেকে থেকে বন্ধুকে বন্ধুত্ব—যেমটা এইবার ঘুমুলো, আর জাগাই যেই, চুলোয় যাক্, বলে বলে এসব আর হয়ে দেখি কেবো?

মতি সোর-চাঁদ ছেবে বললে—আমিও তাই ভাবছিলুম—বাপ-পিতামোর নামের জন্যই ভাবনা—দেশ যখন ঘুমুবে না, যারো সোলি,—মা-চাকা হয়ে যাক্,—যজাটা দেখুক, ছেলে তখন বুঝবেন। আমাদের কি—দিব্যেশ চন্দ্রীর কৃপা তো আছেই যে।

মতির দোষ ছিল না। সে ছিল কোকিলকণ্ঠ, আবার সব গুণেই সমান নায়েক। আমাকে বাঁয়া-তবলা দেখাচ্ছিলো। পড়বার তার সময় কোথায়?

দুজনে যাই-যাই করছি, এমন সময় মতির জাক পড়লো ভিতরে। তার বাবা সেখানে কাজ করতেন,—তাঁকে বিদ্যী-নবাবের যেতে হবে, মতি সঙ্গে আসবে।

আমি কৃষ্ণচিত্তে মাস্টারিয়ায়। বিয়েই খাওয়ার ঘাম, চই সাবমিসন পেয়ে গেলুম। বন্ধু-বিচ্ছেদের বিষম বেঁচে গেল। আমার মাস্টারিয়া, মতির দিলে, মাস্ আমাই দের কয়েকটী বাসাবাড়ীর ভাড়াক, ছোটো-খরে আর চারিদিকেই বিয়ে চীৎকার করা গেল। অভিনন্দন-গ্রাম এক বিয়েই দু'-দুটি বন্ধু হারালে। "পরিবারে পরিত্রাণ অবশ্যই ঘটে,"—বেমুক হয়।

ট্রেন ছাড়লো—চারিদিকেই আওয়াজ ছাড়লে। গাড়ী সবাই যার গ্রামে এসে ঢুকলো, ট্রেনের ঘড়ী থাকলেই লোকারণ্য—খাড়ির কি! বর্দ্ধমানে সবে ছাড়লেই—ঝিঝিরাজ আর সীতাভোগ! চুপ্ বললে—বেবিচুপ্ বিলেপ চন্দ্রীর কৃপা—সাহের কথা যে।

বিয়েটে পৌঁছলো বেলা। মতির বাবা মুরলী-বাবু আমাদের তার সংসারের ভারবাবারের ভার দিয়ে, দুধ-আলাই আর মাসের বরাদ্দ করে দিয়ে বিদ্যী দেবেন।

বিয়েটের কল ছিল কি—বেন বিলাতফেরতের চলাচল—বেলাই দিয়ে। ভোজনের ওজন দিন দিন বাড়বেই লাগলো, আহার করে উঠ্ চুপ—বেন কীর্ত্তনের করে উঠ্ চুপ—হাতের পাবার করে বেতে। দিনে বেবে গেল, মাস্টারিয়া মনেই পড়ে না।

মুরলী-বাবু দিয়ে এসে বেখলেন—আমরা বেড়া বাড়িয়ে গেছি,—তাঁরা খুসী হলেন, বিদ্যীর বেলায় মতির থাকবারেন। তারপর শুনলেন—দিয়েই মানুষ হয় পড়ছে, মতির কষ্ট-চুকলে সর্ব্বজন পড়ছুন। বিয়েটের জন্যে বেছে—বাস-ঘরবাসের ছেলে-দিয়াসেল হয়ে গেছে। ঘণ্টায় চু'-ঘণ্টা এসে পড়াবার তাঁরে—দুজনে যাস্ত-সাস্ত করে যাওয়ার পারে না। তবলাই মুস্কিল। বউদির ঘারে মতি মাষ্টারের বলার বয়স বেছে, তিনি বলেছেন—বেখা-পড়া কি চিরকাল করবে, যখন অবে গণ্য, ও তবে বিদ্যী দিয়ে গলে দিয়ুক। বেখাবলার বেশ-ঘনাই মহৎ লোক—তিনি সব ব্যবস্থা করে বেবেন,—এখানকার প্রধান কথার সাহায্য নিয়ে—তাঁর ভাষী সহজ। তাঁর কাছে তালিম বেলে মতির একটা গতি হয়।

আমরা ফিরেই মজিদের বিয়ে বাসরের জন্যে তাদের হলে পাঠালুম। দেখি মতি মাষ্টার বিছানার মাঝিদের মধ্যে বাবার পরিবারকে'জোড়া মধির-পাবক চন্দন আবিষ্টবিনির বুট রোপাচ্ছে।

বললুম—"এ আবার যোগা কি হবে?" বড় বললেন—"বাবা, যার ছাদে লাভ বছর কি বাস আইবিলুম, ইইলিনি গো—বাজনে বাবা বুঝছিস্। বিষ্টি-টই পাকা হবে যেতো। ঐ বিষ্টী যেতেই গো চাহেছার টাকা ঢালিয়েছি লো রে। আহা—কি সব তখন লোকই যাবনা হয়েছিলেন। যাকে লোক বাইরে ফেলে রাখে—তাকে সোনার বাবার দোরার বিমুকে বুলিয়ে ছিলেন। এক বলে বাবনা,—বহুমতী ফেরর! একবার চললে তার কি ছিট্ হবে, বাবনা—তেবুয়া পরনা তার কোণা হলেও আলো বড়মত্ত করে চলুছে। চাহেছার টাকার মেটিবিলেন তো এই-ই—বিষ্টীর মত বাবনার বেশ সবে যাবা দরকার রে।"

ভাবলুম, হবে—লাভ লাভ বছর বাড় ছাদে পড়েছে—মানে ভালো। আমা যেতা এক ঝাঁই চট্টি, বেশেই পড়ে রইলো, আগে কি ছাই জানতুম! অলেই!

বহুমা তত ভবিষ্যতে বিষ্টী বরবা হবরা গেল। বহুতে আর বজমল বাজিয়াবাদে পেরিয়ে—বিষ্টী পৌছে গেলুম। সেন মহাশয়ের লোক ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন,—চট্ট বাড়ী এনে ফেললেন। সে কি আদর যত্ন। এবো আর সেবাপত্ন দিবতে বাই বি বে—"পরতে এসেছে।" মাওরা হয়েছে—খীর-বাড়-চর্চাপে। তখন বাংলা দেশের ক'জনের এত বড় কুতের পাটা ছিল! একটু তল্‌তল্ বয়সে মাপেই খুব করে খেলতো। কেবল একটি রাত সাতমুর মাপ ছিলো—সবাই সারারাত ফতো,—ঐটি ছিল আমাদের নবাবের দিন, ঐ বের আমটি। তা আমো যে লিখলে তো! যাক্—

সেন মশা'র বি বন্দোবস্ত—মাছ আরশি-চিংড়ী-বল্। বৈকালে আমাদের বিয়ে বাড়ী করে বিষ্টী খেতাতে বেরুলেন—বী বিষ্টী বটে, পাবের দোকানই পাঁচ রাজার,—বেরুবার ক্ষেত্র, বিষ্টীরের তপুলি মোড়া বৈনাত,—আমরা খোলাপের গন্ধে মন্ত হয়ে গেল। বহুবার বহুবা বেরে মনে হয়,—বী, কেউর কোনো দোষ নেই—মা ঈশ্বরীত! এর চাল কি—এত লোক প্রাণে বেঁচে বই কি। সে এমনকার আজগোপড়া বহুমা ছিল না।

সেদিন ঐ পর্যন্ত খেয়ে কামাল বিয়ে। আর বহু-বাড়ন্তরের সন্ধ্যের পর আমাদের অনুরোধ করে—সেন মশাই বিয়লেন।

এসে পর্যন্ত জল-যোগ, জল-যোগ, জল-যোগ চলেছিল; এইবার রাত্রি-যোগে, বিশাল-যোগ সারা হ'ল।

মতি মাষ্টার চুল খেরাতে খেরাতে বললে—"বেবছিন তো—একে বলে বিয়েতে চতীর কৃপা! বরিতের বরা বিয়ে হবার যো নেই রে! সে চুল কিরিয়ে দে, বরলিস আছে।

আরশি ঠিকই লাগে বাবার, এসে পর্যন্ত বার বিশেক চুল আঁচড়ার খেছে। আলেবিয়ার মাথা—মত বন্ধু দাঁবে কি করে—টাঁচিয়ে উঠেছে। এবো আর আমাদের বাড়াবাড়া কোরনা ঠিকই বর যে বাবার অপে-পিটে চুলগুলো চৌরোপ করে বেরুবা—এ যে বরা বেরা। ঠিকই যে বাবা!

বর বৈঠকখানায় বজমিদ্। বুড়ি করে বড় বড় রহিম লোক এসেছেন, সবি বিশুদ্ধানী। কারুর পলায় সোনার-হার, কারুর কানে হীরে-বসানো মাকড়ি, ঘড়ি-ঘড়ির ছেন, চামেলি তেলের বাবরি চুল। তাদের কারে বিয়েবাড়ীর খুশবু আড়-আড় করে। এর পাশের মুসলমান—এক এরটী যেন আতর-বাস, গোলাপ-বাস এসেন। সবলেই তাকার সেন মশাইকে বিশেষ খাতির করেন। আহমদবাবা কি, কথাবার্তায় বিনয় যেন ঘরে পড়ছে। সেখে প্রথম ওস্তাদ কাশাল বিয়ে—সঙ্গে সারেঙ্গিবাদ আর তবলচি এলেন। বয়স মাটের কাছাকাছি, গুটি পাঁচ-সাত দাঁত আছে, গায়বর্ণ, ফুল। চুল-কাড়ি-যোগ—তাক্ তাই ঃ কথা। মুখখানাই দেখবার মিনিস্,—বেয়াগণির বললে হয়। মুখুয়া-মেয়ে কোটর চোখ। আইনে, আইনে পর পড়ে গেল।

সেন মশাই আমাদের আদর-কায়দা শিখিয়ে বেছেছিলেন। তার পড়লে আমরা বিয়ে বরকনে সেলাম করে, ওস্তাদজীর দাঁটু দু'হাতে স্পর্শ করে আশীর্বাদ নিলুম। তিনি বরের বলে বললুম।

সেন মশাই আমাদের পরিচয়টা দিয়ে বিয়ে আসর উদ্বোধন বললেন।

কামাল বিয়ে। আমাদের বিয়ে গাঁয়ের কইমাছ ভেবে, অবাক্ হয়ে বললেন—"ঐ—বাঙ্গালী বাবুরাইয়ে হোনে যাতে—বহুত্ বিয়া! বহুমাকে উস্লাদ তো আউর-আবাদ্ হয়, উও ক্যালে ভূত উঠাচ্ছে।" বার-কয়েক মাথা নেড়ে বললেন—"আজা ভূছ শুনাও তো বেটি!"

অনেকে হেসে উঠলেন, দু'একজনের মুখে বিরক্তি আর লজ্জার ভাব ফুটলো।

ভাবলুম—কে এ বাড়ির। এর বড় বড়-বিছানা এ সৌখ-কারাখানে কি করে ঘির বাঁধিছে। যদি আমার অনাচার বুঝতে পেরে বলবে—"যত ওস্তাদ যে, এরা কি সহজে যায় যে,—মুখুজ্যে ডেকো।"

মনে মনে ভাবলুম, ডেকো যদি হয় তো—আধুরোটা।

যদি আমলুরোটা তাকে এগিয়ে দিলে। তিনি বললেন—"খুব যি খুব মিলাব,—তোমারা খেল দেখে। যদি আমলুরা বেশ থাকবেই বললেন—"বেহুরা!" আবার হাঁকলে—কেন "বেহুরা!" তৃতীয় বারের ঐ এক কথা।

তখন সেন বলাই বললেন—"ও আমাদের সাকরের ছেলে এসেছে, আপনিই ডেকেছিলেন ওকে না।"

তখন বললেন—"আচ্ছা আচ্ছা:—ওরি ভালোও—বেশ-তো হয়!"

সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। যদির মুখ লাল হয়ে গেছে। সে বললে—"আপনি খুশটা ঠিক করে দিলে আমি খাইবো—বেশুরে খাইবো কি?"

"খুব তেজা ঝালমি বিটিয়া,—মসালো ভুনা দেও।"

যদিকে বললুম—"ঠিক আছে, তুই যানা!"

যদি বললে—"আমি বাংলা খান খাইব।"

"তা হলে যায়,—তবলে বজলব?"

যদি একটা ঈষৎ হাসলে।

যদির গলা ছিল যেমন চড়া, তেমনি মধুর। গলা-সাধোচ তার কোনদিনই ছিল না, তার উপর আজ হয়েছে। প্রাণ খুলে ছাড়লে।

আকাশ বাতাস স্থির, রাস্তার লোক জড় হয়ে গেল। কেন মশালচি সকলেই ছেলেন, যারা সাজ-বাজনা বেরিয়ে ছিলেন—বাড়ি যাইয়ে ঘরে এসে চুকতে লাগলেন। কেবল তারাল যিরি খুব নাকি যিরকি থাকতে লাগলো। তিনি বার কিছেক "বাস্ বন্ধে" বলেছিলেন, কিন্তু নবাবজাদের অনুরোধে থানাই আর-ঘণ্টা চললো। শেষ হলে—বাহবা বাহবা পড়ে গেল, তাকিয়ের উপর উঠলো।

তারাল যিরি বার বার চোখের কোণে হাসি টেনে বললেন—"আর যেরেকিতে খুব বহা নেহি, বাহুসাহেবে সাথ সব খুব খেয়া, না খাওয়াইয়া, না সমঝায়,—বোঝা!" তখনি যার মেজাজ ঠাণ্ডে সমর্থন করলে।

সেদিন তিনি আর হাঁ করলেন না। কি জানি কেন কেউ অনুরোধও চাইলেন না। সকলে সেলাম দিয়ে উঠে গেলেন। তখন যদিকে তিনি বললেন—"আমার শিজন লাগো তো উও সব ভুল যাও, সহজে 'খু' বানাকে শিখো, অর্থাৎ খুব-ভরি অভ্যাস করো। সা কে খু এক ঘুঙ, যে কে খু আওর ঘুঙ, তব না ঘুঙ লিখা হোগা। এই বলে—সাত রকমের ঘুঙ-ভরি দেখালেন।

তারলুঙ—ভালো বেশ এ জনে চিরবন্ধিকই থাকবে। যার আমাদের আশা নেই।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি চললেও, মজাটা জমজমাটি হয়ে গেল। সেন মশাই আমাদের উৎসাহই দিলেন। বললেন—"কাল তিনি খুবেলা-বলা বাবস্থার ব্যবস্থা রাখলে দেখেন, সেটা বিরক্তির হেতে হবে। আর বিন-ওয়ক আদি "ক্লাও চাই—বলেছেন—"তলব ঘুঙ, ঘুঙ হোনা চাহিয়ে।"—মৌলবি সাহেব ছেলেদের পড়াতে আসেন, সবকেই হয়ে যাবে।

যদি যাইয়ে বললুম—"ঠিকী দেখে সরে পড়ি চল্।"

সে বললে—"আমার ঠিকীর খানাটাই আজে খোনা যাক—অত বড় ওস্তাদ—কিছু শেখে নিতে হবে।"

ঠিকীতে তখন ৫।৭টি মাত্র মাজাজী থাকতেন। সকালে তারিণীবাবু এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন—বললেন—অমন খানাটি যাই করবেন না, আমাদের ঠিকীর পাল্লায় পড়লে পয়মাল ক'রে ফেলে। ও বড় ওস্তাদ বটে, কিন্তু খাইলে বড়-বাবুর যদি ঠিকে পাওয়া ছেড়ে গালায়। কটি ছেলেরা ওর মুখভঙ্গী দেখে ফিকে ওঠে।

যদি হেসে বললে—গলা তো আমার নিজের, ওঁর কাছে কিছু আমার ক'রে নিতে চাই।

কিছু ফেলে আমরা বেড়াতে বেরলুম। খানিকটে ঘোরার পর এক পয়সা দিয়ে এক বাক্সো দেশলাই নিলুম। একজন এসে অভিবাদন ক'রে—খোলায় তো দিয়ে ক'লে—বাক্সটি হাতে ক'রে নিলে। বললে—ও কাজ আপনাদের নয়। ওকালতি ক'রে ঠিকী দেখতে এসেছেন, এ দেহেরবাবী যদি খোলাঘরে না যোকে তো যাদের জন্যে থাকাই উচিত ছিল—ঠিকীতে তারা জায়গা কেন? আর কাঁচিনী-বা আছি, ঠিকীর উৎসব তো দেখে দেখে পাই। এতে টাকা-পয়সার তোলো কথা নেই, কতবে ঠিকে যাবাহুড়-পার কাছে খুব দেখাবো কি ক'রে! যাদের দেখ থেকে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, তার ওদের অনুরোধ কাজ করতে দেখবে এই সোভাগ্য! চলুন বন্ধু—পৌঁছে দিয়ে আসি। ভগবান আমাদের দেখেছেন—আজ যাদের থাকলে—আপনাদের আশীর্বাদ নিলে তবে তাঁর দিন্ যাত্রা হ'ত। আমরা এইরূপ

ভোরবা না। আর আছে কি—কি দেখতে এলেন! এই বলে লম্বা এক নিশ্বাস ছাড়লেন।

আমরা কথাটি কইতে পারলুম না, সবাই একটা বেদনা বোধ করলুম।

ডাক্তারি পড়া মুখ করে ঘরে গেল, বোধহয় আইডালো না।

ইস্কাবনের কাটলো, ইতিমধ্যে সেন মশাই কোথা থেকে কাগি বিছেদাগরের বর্ণ-পরিচয় এনে হাজির করে দিলেন। মৌলবী সাহেবের কাছে অক্ষর পরিচয় করতে গিয়ে হ্যাঙ্গাম হল। সোয়াদ্ সোয়াদ্—এসব কি রে বাবা! শেষে চৌদ্দো গিয়ে "সো চশমি রে" তে। মরি যায় চেহারা দেখেই হেসে উঠলো, বলে সোয়া কড়ির আবার ঠেঙারে চুলো কবে! মৌলবি চটে গেলেন, বললেন—"ছোকরে তোমা মেরি"। হেসে আকুল হা কি—বাঁচলুম।

ঘুরঘু-বিনায় দেখা হল, মরি বললে—আজ-কাল্লার-ওতে, টাকার টানাটানি থাকে বলে তা তো জানতেন না। আকাশ-পিদিম দেবার এক আশ্চর্যজনী বেরুতো বাড়িয়েছিলেন। তেল এক হপ্তার আটটি প্রদীপ জলবে—জ্বলল বেচে, তেলের দরুণ। মরি হিসেবে পাকা,—মেপে দিয়ে ছ'দ।

রবিবার আবার মজলিস। যারা এদের সকলেই মরির খাস তালুকের। কিন্তু আমোদ বিলোবার দিয়ে ছিল। তিনি আজ ইস্কে আছে বলে তা সোয়াদেন—অর্থাৎ বাড়ালেন। গরমটা পেয়ে ছিল কিছু পাতলা হ'ল। আরশোলা সেতারের তার টানাটানি করে সুরের করে মেওয়া হল। লাহেরী তোফুলো। মিয়া মরির দিকে চেয়ে বললেন—আপ্ গজল শুরু করুন তো।

ডাক্তারি বাবু মুখটুকে বললেন—"আজ আর হবে নেই—কাল থেকে হবে বলুন।

মিয়াসাহেব মুখখানা-গুটিয়ে "আ" পর্যন্ত করেন আর বলা হাক্ করেন। ক্রমে ওয়াওয়াস্ আরো-আরো। বাস্—ইমন আরম্ভ হল। আমরা যা ভয়ে তাঁর মুখ পানিয়ে হইলুম। গানের সঙ্গে সঙ্গে মরিকে নানা ইঙ্গিত করে হেসে লাগলেন—ইয়ে খুব্ খুব, ইয়ে বাত্ খুব, ইয়ে কথা খুব, ইয়ে লয় খুব, ইত্যাদি।

যা—তবাদি যার বটে, বাস্তবিকই কলা-বিদে। মুখখানা গুম হয়ে ভাবতে লাগলুম,—হেসে তখন কি হয় তবুও একটা অবলা এসে গেল।

ডাক্তারি বাবু লোকটি বোধ হয় তেমন বদরস নয়—খুব হোমরা পায়রার মাঝে ঠোকরে এক একটি কথা ছাড়তে লাগলেন,—"লোকটে ভুগে মরে, ইয়াকে আর সমনে দেখেছে—এঁখানেই শুদ্ধ (খোলস) করে উঠিয়ে।" একটু পরে "দেশ তবাই ডাক্তার মানুষ কিনা—রোগ এড়িয়ে কেন ঘাকে ঘাকে দেখাচ্ছেন, সেই জোরেই পেশেন্টেরা ভুলুক, প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখবের কাল।" বাস্তবিকই ঠিক, সেই বিদায়কাল থেকে এই মুহূর্তটি পর্যন্ত কিছু আমো আলাপেন।

আর পারা গেল না, বাইরে গিয়ে লাফুলে আফুলে ব'ল। ডাক্তারি বাবু লিবার লোক, আমরা নূতন এসেছি, তাকে কিছু বলতে পারি না।

এসে বলুলুম—"আপ বসুন, একটু শুনতে দিন্।

তিনি বললেন—"শুনলে ত হবে না মশাই, একটু দেখবেন-ও। আমাদের বাংলা দেশে অতি-ভক্তির ঘর-বাড়ী আছে। তোমাই আপনাদের—আমার যেন দেখে পারি, নিজে নিজে ভেবুয়ার পথ যাবেন না। এখানা আরো লাফুলে হেসে অন্যান—

এক সঙ্গে কয়কগুলো গজে পিটিয়ে দিলে। কয়কগুলি লোক উঠে পড়েছেন,—ব্যাপার কি!

বাজাল মিয়ার বা দিকে—ছেলেদের একটা জোর বাজা ছিল। সেন মশা'র খুকুটি তার কাঁধে চুপ্ সাদ জোর মুখে শুয়েছিল। বাঁধটি অতি মিহীর, মেয়েটি ছোট, তার গায়ে ছোঁ-অঁচড়ে সবাই সমান—ছেলেজান একদম নেই। বৈঠকখানাতেই সঙ্গে থাকে, মিনিট-ই প্রায়ই সরে যায়, চুঁ পর্যন্ত করে না। তাই সেন মশাই তার নাম রেখেছিলেন—তাকিয়া। দেখি—তাকিয়া কেউ কেউ তাকিয়া এর সঙ্গে মিলমজলে টপ্‌কিয়া তাঁর থেকে বেরিয়ে গেল।

মজলিস আটটা হয় হয়ে সেন মশাই ছড়া এগিয়ে এসে বললেন—এ্যা হুজ্জ, উঠ মুখ নেই, কোই মজমুকে বাত নেই, আপ্ চলনে বিলিয়ে। চলুন আমরি দিয়ে, উঠিয়ে মরির দিন-পুরুষে তারপুরোর দিন পুরো হয়ে গেছে—বলুছেন বা ভেলকুটী আজি বিয়েছে, খোল চুমবার, ভ্রাতৃত্বর (globe) বলাচ্ছল, বাজালকে দিয়ে সাজান-সাজান!

বাজাল মিয়া) ভয়-পেয়ারা লোক, ইস্ক বেজায় ভয়ে ওঠায় থেকে উঠেছিলেন। সময় মতের তালোর সময় তারপুরা উঠুতে ভুলে সজোরে নীচু করতে গিয়ে জোরের উপর, এবং এরার তাকিয়ার উপর পড়ে—দুই-ই চুরমার!—

তাকিয়া বাবু আমাকে বললেন—"এখন বসুন—তবাদি পান শোনবার দিবিস, কি দেখবার দিবিস। এর

আগাগোড়াই দেখবার। মতি বাবু ঠিক ওই জায়গা ঘেঁশে বসতে গিছলেন, ওঁকে ভগবান রক্ষে করেছেন! তবে তানপুরোর রক্ষে ছিলনা—সে খাস শমনের হাতে পড়েছিল। বলছিলেন—পিতৃপুরুষের জিনিস,—আহা—গয়ার কানাইলাল ঢেঁড়ির হাতে গেলে, তাঁরা তৃপ্ত হতেন। তা—এক মহাশ্মশান—বেড়কোটি কবর আছে। তুতও বিস্তর। এই সব গান আছে বলেই রক্ষে।"

অবাক্ মেরে গিছলুম,—আমি আর কি বলবো, নূতন এসেছি।

মতি বললে—"নাঃ, ওস্তাদ বটে, গলা মিষ্ট নয়, চীৎকারও অনাবশ্যক, কিন্তু সুর ঠিক থাকে, গ্রামের দিকে খুব হুঁস্। ওইটেই দরকার। পাকা লোক।"

তারিণী বাবু বললেন, তা ঠিক্,—ওই সাত-গাঁর ওপরই ত' ওদের লক্ষ্য। তবে, পেরে উঠতে শুনিনি।

বললুম—এঁরাই সত্যের সাধক।

বল্লেন—আপনারা বোঝেন ভালো, আমরা ইতরে জনা—একটু মিষ্টি মিললেই তুষ্টি। বাংলা দেশের লোক কিনা—কঠোর সত্যের চেয়ে মধুর মিথ্যেটাই লাগে ভালো। দোহাই, অমন পেয়ারা আওয়াজটা মাটি করবেন না।

মতি একটু মুখ মুচ্‌কে হাসলে। আমি ভাবতে লাগলুম—কত রকমেরি মানুষ আছে, খাঁটি-মালে এঁদের রুচি নেই।

মতি 'মু বানানে' লেগে গেল। আমি প্রমাদ গণলাম। তারিণী বাবু ঘরে ঢুকতে গিয়ে—চিতিয়ে চৌকাটের বাইরে গিয়ে পড়লেন।

দেখি—ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডিং রুমের "No admission" (প্রবেশ নিষেধ)-লেখা তক্তাখানা আমাদের ঘরের মাথায় লটকে দিয়ে গেছেন। আজব মানুষ!

পাঁচ সাতদিন কবরের কাঁড়ি দেখে বেড়ালুম। বাসায় মতি 'মু বানায়'। আমি চোখ বুজে কাটাই, না হয় বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু তাতেও বিঘ্ন। রাস্তায় বেরুলেই গাড়োয়ানেরা তেড়ে আসে। বলে—আসুন আসুন, ইয়ে তো আপিকে ওয়াস্তে হয়। গাড়ির জন্ম সার্থক হক্। ঘোড়াকে নসিব বুলেন্দ্ হয়—যে আপনার খিদ্‌মতে আসতে পাবে। এ আর কার তরে। গোলাম আপি লোগকো ঢুঁড় ঢুঁড় ফির রহা হয়। রুপয়া-পয়সা কোই বাত নেহি, উও তো মিট্টি হয়। আপ্ পায়দল চলেঙ্গে হাম্ দেখেঙ্গে! আল্লা কেও না মুক্তে অন্ধা বনায়ে! বাদশাওঁকে কবরমে ইয়ে খবর পৌঁছ যায়গা। অ্যায় আসরাফো—মেহেরবানী কিজিয়ে, হামে সরমুসে বাঁচাইয়ে। ইত্যাদি—

উঠতে হ'ল। ভাড়ার কথা মুখে আনবার জো নেই। বলে, তোবা-তোবা—মাফ্ কিজিয়ে, দেহেলিকে ইজ্জৎ তবা না কিজিয়ে। দুটি টাকা দিয়ে ছুটি। সেলামের ওপর সেলাম।

বললুম—'সরে পড়ি চ'।

মতি নড়বে না। বলে—কিছু মেরে নিয়ে যাবো। বললুম—তোমার রেস্তো আছে—ভাবনা নেই। কিন্তু কামালকে সামাল্ ভাই।

বিদায় নিলুম।

সাত বছর পরে—মাল মেরে নিয়ে মতি ফিরলো। সে চেহারা নেই, এখন সে মতি মাষ্টার নয়—মতি মিয়াঁ। দাড়ি রেখেছে, বাবরি চুল, কইদার (তুলো ভরা) মেরজাই গায়। পায়ে "সলেম্‌সাই" নাগরা। কথা কয়—ফার্সি মাখানো। গড়গড়ায় তামাক খায়।

জমিদারদের বাড়ী মজলিস্ হ'ল। অনেক খোসামোদের পর মতি একটা কানাড়া ছাড়্‌লে, তাও হাতে রেখে, পাছে কেউ মেরে নেয়। বলে—"বুঝবে কে, ইয়ে তো আওরতাবাদ হয়।"

বুঝলুম—"হাঁ, খাঁটি ব'নে বেরিয়েছে। সেন মশাই তানপুরা প্রেজেণ্ট করেছিলেন, সেটি ঘণ্টা দেড়েক বাঁধতে লাগলো। তারপর,—বাজিয়ে পছন্দ হয় না,—সবারই নাজুক্ চাল্। অনেক সাধা-সাধনায় হাঁ করলে। পাঁচ মিনিটেই মাইফেল্ খালি।

বললে—সমঝ্‌দার নেই।

আর কেউ শোনবার বেয়াদবি করলে না। কারণ তার গলার মধুটুকু কামাল নিঃশেষে উড়িয়ে দেছেন। ষ্টার 'সুকুসা' কাজ দেখিয়েছে।

সমঝদার না পেয়ে মতি দেশত্যাগ করলে। কোথায় আছে জানিনা। যেখানেই থাক্—ভাল থাকুক।

দেশের দুর্ভাগ্য,—বিদ্যেটা কেউ বুঝলে না। শাস্ত্রের সম্মান করবার লোকও ক্রমে কমে এলো, আমরা ক'জন গেলেই ফুরিয়ে যায়।

সংশোধন

৩১২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি স্থলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম, এ—সভাপতি দর্শন-শাখা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম, এ—সভাপতি বিজ্ঞান-শাখা এইরূপ হইবে।

প্রিণ্টার—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, বেনারস-ব্র্যাঞ্চ—বেনারস।
পাবলিশার—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, বি ২০।৩৩, জেলুপুরা—কাশীধাম।